Bangla E-Library

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কিশোর সাহিত্য সম্ভার

সম্পাদনা

কার্তিক ঘোষ

pathagar.net

শিশু সাহিত্য সংসদ

Premendra Mitra : Kishor Sahitya Sambhar
(Selected Works of Premendra Mitra)
ed : Kartik Ghosh

© প্রকাশক

ISBN 81-7955-004-4

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অলয় ঘোষাল

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি, মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪

মূল্য : টাকা ১০০.০০ মাত্র

pathagar.net

সূচি

প্রকাশকের কথা পাঁচ
সংকলন প্রসঙ্গে সাত
প্রেমেন্দ্র মিত্র এগারো

কল্পবিজ্ঞান
- পিঁপড়ে পুরাণ ৩
- মঙ্গলবৈরী ২০
- আকাশের আতঙ্ক ২৯
- মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী ৩৮
- হিমালয়ের চূড়ায় ৪৫
- অবিশ্বাস্য ৫১
- করাল কীট ৫৮

রূপকথা
- পরিরা কেন আসে না ৭৩
- কালরাক্ষস কোথায় থাকে? ৮০
- সানু ও দুধ রাজকুমার ৮৫
- ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা ৯০
- অপরূপ কথা ৯৭

নানারকম গল্প
- কালুসর্দার ১০৫
- গোপন বাহিনী ১১১
- পতিতপাবনের প্রতিভা ১১৭
- বন্ধু ১২১
- ভুতুড়ে জাহাজ ১২৭
- আতঙ্ক আদিম ১৪০
- হার্মাদ ১৫৩
- মাহুরি কুঠিতে এক রাত ১৬০
- নিশুতিপুর ১৬৯
- জঙ্গলবাড়ির বউরানি ১৭৪

ছড়া
- মিষ্টি মেঘ ১৮১
- মালগাড়ি ১৮২
- যাচ্ছি পুজোয় ১৮৩
- বই-টই ১৮৪
- নতুন ধারাপাত ১৮৫
- মামলা ১৮৬
- অঙ্ক ১৮৭
- দুটি বাঁশি ১৮৮
- মেঘের ঘুড়ি ১৮৯
- মিষ্টি ১৯০

উপন্যাস
- কুহকের দেশে ১৯৩
- ড্র্যাগনের নিশ্বাস ২৫৩
- সাদা ঘোড়ার সওয়ার ২৮২
- খুনে পাহাড় ৩৩২

pathagar.net

প্রকাশকের কথা

কল্লোলযুগের শেষ কীর্তিধর কবি ও কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন ছোটোদেরও একজন জনপ্রিয় লেখক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, রম্যরচনা এবং চলচ্চিত্রের জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা ও চলচ্চিত্র পরিচালনার পাশাপাশি ছোটোদের জন্যে রচনা করেছিলেন অজস্র ছড়া, কবিতা, গল্প, কল্পবিজ্ঞান এবং বিচিত্র বিষয়ের কিশোর উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যের এই সব্যসাচী লেখক ব্যক্তিজীবনেও যেমন কোনো বাঁধাধরা আবর্তে আবদ্ধ থাকতে পারেননি—তেমনই সাহিত্য সৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন চিরাচরিত ছকের বাইরে। ছোটোদের জন্যে রচনার নির্বাচিত অংশ নিয়েই প্রকাশিত হল এই সংকলন আজকের সময়ের কিশোর-কিশোরীদের জন্য। সংকলনটি তাদের ভালো লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

কলকাতা
জানুয়ারি ২০০২ *দেবজ্যোতি দত্ত*

pathagar.net

সংকলন প্রসঙ্গে

বড়োদের লেখা আর ছোটোদের লেখা, দু-রকম লেখাতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কোন লেখাগুলো বেশি ভালো সে কথা বলা ভারী শক্ত।

কতরকম লেখা যে লিখেছেন, সে কথা ভাবতেও অবাক লাগে। বড়োদের জন্যে কবিতা লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন—সত্যি কথা বলতে কী, রবীন্দ্রনাথের পর যে নতুন ধরনের সাহিত্য গড়ে উঠেছে 'কল্লোল' যুগের সাহিত্য নামে, তার একেবারে মধ্যমণি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। আবার ছোটোদের জন্যে যখন কলম ধরেছেন, মনেই হবে না এই মানুষটা আমাদের সেই চেনা লেখক। ছোটোদের জন্যে মজাদার ছড়া লিখেছেন, দারুণ সব উপন্যাস লিখেছেন আর লিখেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে অনেক অনেক গল্প। সে গল্পেও আবার ভাগ কতরকম—নতুন ধরনের রূপকথার গল্প, ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা আলো-ঝলমল গল্প, রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকর গল্প, দম বন্ধকরা হাসির গল্প, তেমনি আছে টান টান উত্তেজনা আর কল্পনার টানাপোড়েনে বোনা কল্পবিজ্ঞানের গল্প। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, সমস্ত লেখাই জাদুকাঠির মতো এমন এক সোনার কলমে লেখা যেন মনে হয় ভাষার নিঝুম অক্ষরগুলোর ওপর কে যেন বুলিয়ে দিয়েছে রূপকথার সেই সোনার কাঠি, লেখার জগৎ হয়ে উঠেছে একেবারে টগবগে জীবন্ত।

যেমন ধরা যাক ছড়ার কথা। ছেলেভুলোনো ছড়ার জগতে যে নিয়মকানুনের কোনো বালাই নেই, সে তো রবীন্দ্রনাথই বলে গিয়েছেন। সেখানে কল্পনাও একেবারে লাগামছাড়া পক্ষীরাজ ঘোড়া, ছুটলে তাকে থামায় কে! এইরকম মজার মজার উদ্ভট কল্পনার একেবারে স্বপ্নরাজ্য হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়া। সেখানে বইয়ের সঙ্গে টই-ও পড়া যায়; নদীর দু-ধারে দাঁড়িয়ে তিনটে দাঁড়কাক আর সাতটা শালিখ বেদম ঝগড়া করে মাঝখানের নদীটা কার সেটা বুঝে নিতে; আর সেখানে নীল ঘুড়ির সুতো ছেড়ে শেখা হয় এক অদ্ভুত নামতা—'দুই দুকুনে চার তো জানি/মেঘে হাওয়ায় কী!' এইসব নরমনরম উদ্ভট কল্পনা ছুটছে একেবারে ছন্দের টাট্টু ঘোড়ায়, পড়তে গেলে খুকু দোলে, খোকা দোলে, তাদের দাদু আর দিদাও দোলে। অথচ ছন্দের এই পাকাপোক্ত হাত নিয়েও প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন রূপকথার গল্পে টুকরো টুকরো ছড়া কাটেন, তখন মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই এলোমেলো করে দেন ছন্দ, কারণ ঠাকুরমার ঝুলি থেকে যেসব গল্প বেরোয় তাদের তো আর এত ঠাসবুনুনি ছন্দের দরকার নেই। যেমন কিনা এই রকম—'দুধ-পাহাড়ে দধিসায়র/তার মধ্যে কালরাক্ষসের গড়।' (কালরাক্ষস কোথায় থাকে?)

ছোটোদের জন্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয় একটু কম, কারণ কল্পনার রঙিন পাখনায় ভর দিয়ে উড়তে ভালোবাসে ছোটোদের মন, কিন্তু ইতিহাসের গল্পে যে খুঁটি বাঁধা থাকে ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনায়। লেখা হয়নি এমন অবশ্য নয়, অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'রাজকাহিনি' আর প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'সাদা ঘোড়ার সওয়ার।' বাংলা যখন ছিল অখণ্ড গৌড়বাংলা, সেই তখনকার গল্প। চারশো বছর আগেকার কাহিনি, কিন্তু লেখার গুণে মনে হবে ঘটছে যেন সব চোখের সামনে। চরিত্রগুলো সব জলজ্যান্ত হয়ে চলছে ফিরছে, কথা বলছে—তা সে মুলাজোড়ের চৌধুরিমশাই বা সূর্যকান্ত গুহই হোন অথবা সনাতন-রূপরাম-সদানন্দ, সুখা সর্দার নুরউল্লা; রডা-পেড্রো-ডুডলি। সত্যি আর কল্পনার আলোছায়ার ছক মনকে টেনে রাখে শেষ পর্যন্ত।

বড়োদের গোয়েন্দা উপন্যাসের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরাশর বর্মা, ছোটোদের জন্যে আছেন

তাঁর মামাবাবু। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু বোধ হয় এই আদলেই তৈরি, কারণ এই মামাবাবুটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি কী দারুণ করিৎকর্মা, সাহসী আর নানা বিদ্যায় পারদর্শী। দেখতে একেবারে নিরীহ গোবেচারি মানুষ হলেও, তাঁর বিচিত্র যেসব কর্মকাণ্ড প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রচুর উপন্যাসে ধরা আছে তা পড়তে আরম্ভ করলে নিশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যায় না। নাদুসনুদুস চেহারার যে লোকটি অধ্যাপক বা অফিসের বড়োবাবু হলেই মানাত ভালো, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তিনি মিচিনায় গিয়েছিলেন বর্মার জঙ্গলে প্রসপেক্টর হয়ে। তারপর পৃথিবীজোড়া বিচিত্র কার্যকলাপে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর-এক অবিস্মরণীয় চরিত্র ঘনাদার রসালো গালগপ্পের সঙ্গেই শুধু তার তুলনা চলতে পারে।

আসলে রহস্যভেদ এবং খুনখারাপি থাকলেও মামাবাবুর উপন্যাসগুলিকে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি বলাই ভালো। অনেক আগে 'ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনে' যেরকম উত্তেজক অভিযানের সত্যকাহিনি শোনা যেত, মামাবাবুর উপন্যাসগুলি প্রায় সেই আস্বাদ নিয়ে আসে, যদিও সেগুলি অতি সামান্য বাস্তবসূত্র অবলম্বন করে লেখা বানানো গল্প। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এর পটভূমি, অথচ 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন আমাদের মুহূর্তে আফ্রিকায় নিয়ে যান, প্রেমেন্দ্র মিত্রও অসীম দক্ষতায় আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করেন পৃথিবীর দুর্গমতম স্থানে।

প্রতিটি উপন্যাসেই উপলক্ষ থাকে খুব সামান্য। 'কুহকের দেশে' উপন্যাসে পাহাড়ি মধু রাখবার একটি বাঁশের চোঙায় অদ্ভুত ধরনের হুলওয়ালা এক দুর্লভ প্রজাতির মৌমাছি পেয়ে তার সন্ধানে মামাবাবু পাড়ি জমিয়েছিলেন হার্টজ কেল্লার দিকে, যেটা চীন, বর্মা আর তিব্বতের সীমান্তরেখায় অতি দুর্গম একটি 'অজানা ত্রিভুজে' অবস্থিত। মামাবাবুর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ইউনানের একটি গুপ্তদল মায়াবাদুড়ের বিশ্বাসঘাতক নেতা লাওচেন, যদিও লাওচেনের উদ্দেশ্য ছিল অন্য—আলেয়াদারু বলে একটা অদ্ভুত জাতের দেশ আবিষ্কার। কিন্তু এর ফলে শেষ পর্যন্ত যে রেডিয়ামের খনিটি আবিষ্কৃত হয়, তাকে ঘিরে চীন, বর্মা আর তিব্বতের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, মামাবাবুই সে সংঘর্ষ আটকান।

'ড্রাগনের নিশ্বাস' উপন্যাসের সূত্রপাতও এরকম খুব ছোটো একটি ঘটনা দিয়েই। উপন্যাসের প্রথমে যখন দেখি, সায়ামের উত্তরে লুয়ং পাহাড়ের পুবে এ বছর শীতের সময় এক জাতের বিগড়ি হাঁস এবার আসেনি, প্রবন্ধে এ কথা পড়ে মামাবাবু চিন্তিত, আমরা মনে করি ঘনাদার 'হাঁস' গল্পের মতো 'ঙগারুসের্চঙ' হাঁসের খোঁজে এবার যাত্রা শুরু হবে। অভিযান হয়ও শেষ পর্যন্ত, কিন্তু হাঁসের ব্যাপারটা গৌণ হয়ে যায়, কারণ সেখানে গিয়ে জানা যায়, শুধু হাঁস কেন, এক বীভৎস ড্রাগনের অত্যাচারে জায়গাটা জীবজন্তুশূন্য হয়ে গিয়েছে এবং মানুষ আর ব্যবসায়ীর দলও দ্রুত সেখান থেকে পালাচ্ছে। কাল্পনিক এই ড্রাগনের রহস্য ভেদ করে কী বিশাল এক সর্বনাশা যুদ্ধের হাত থেকে মামাবাবু পৃথিবীকে রক্ষা করেন তারই রোমহর্ষক কাহিনি আমাদের প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে রেখে দেয়।

'খুনে পাহাড়' উপন্যাসে অবশ্য এরকম পৃথিবীকে টলিয়ে দেবার মতো গুপ্ত ষড়যন্ত্র-টন্ত্র নেই, আছে একটি লোভী মানুষের বিরাট রত্নভাণ্ডার হাতাবার চেষ্টা। মামাবাবু এখানে তাঁর প্রিয় ভাগ্নেকে নিয়ে লোধমা বলে একটা জায়গায়, লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের মালিক, মামাবাবুর পুরোনো বন্ধু, লোকনাথ মহান্তির কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, এখানেও তাই হয়েছে। 'এঞ্ঝা' পাহাড় বা করালী পাহাড়ে ঘনিয়ে উঠেছে রহস্যের ঘনঘটা এবং কে বন্ধু কে শত্রু, এই নিয়ে অনেক টানাপোড়েনের পর সমাধান হয়েছে খুনে পাহাড়ের প্রকৃত রহস্যের।

উপন্যাসগুলির মধ্যে কিছুটা ছকবাঁধা ব্যাপার যে নেই তা নয়, একই চরিত্র লি-সিনকে বার

বার দেখতে পাওয়া গিয়েছে, মামাবাবু এবার সত্যিই মারা গেলেন—এই ধরনের একটা সাসপেন্সও সৃষ্টি করা হয়েছে অনেক উপন্যাসে, সমস্যাটাকে ভারতবর্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে গোটা পৃথিবীকে জড়িয়ে তার ভয়াবহতা আর রোমাঞ্চকেও বাড়িয়ে তোলা হয়েছে প্রায়ই। তবু বলব, এইসব উপন্যাসের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। ঠিক এইরকম উপন্যাস বাংলায় খুব বেশি লেখা হয়নি।

গল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র বহু রকমের—তার মধ্যে রূপকথার গল্পও আছে। রাজা নেই রানি নেই, হাতিশালে হাতি নেই ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই—তাহলে রূপকথার গল্প আসবে কোথা থেকে! সেকথা কিন্তু খুব ভালো করেই জানেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাই রূপকথার মজাটুকু রেখেও কী অদ্ভুতভাবে তাকে আজকের গল্প করে তুলেছেন তিনি। 'কালরাক্ষস কোথায় থাকে?' গল্পে শুনিয়েছেন এক গরিব রাজপুত্রের গল্প, কিন্তু তাকে যেতে হয় বনের শেষে তেপান্তরে, দুধ-পাহাড়ের রাজপুরীতে, উদ্ধার করতে হয় কুঁচবরণ রাজকন্যাকে। কিন্তু কালরাক্ষস কোথায়, যাকে হত্যা করে এত কাণ্ড করে চলেছে রাজপুত্র। না, চোখে তাকে দেখা যায় না—সে 'আছে প্রাণের লুকোনো হিংসেয়, মনের মিথ্যা ভয়ে।' 'ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা' গল্পে একটা মিথ্যে রূপকথাও কেমন সত্যি হয়ে ওঠে। 'অপরূপ কথা'-য় যেন উঠে আসে সুকুমার রায়ের গন্ধচুরির কবিতা। রূপকথার গল্প একরাশ মজা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। রূপকথা কেন হারিয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ে অপরূপ রূপকথা 'পরিরা কেন আসে না,' আর রূপকথাকে একেবারে ডট কমের জগতে টেনে আনা হয়েছে 'সানু ও দুধরাজকুমার' গল্পে। কেমন করে? সেটা গল্প পড়েই জানতে হবে।

কতরকম গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখতে পারেন তার একটা ছোট্ট প্রদর্শনী যেন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে নানারকমের গল্পে। একসময় সত্যিকারের ডাকাতের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতাম আমরা। রঘুডাকাতের গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরত। তেমনি এক ডাকাতের গল্প শুনিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কালুসর্দার' গল্পে, তবে রোমহর্ষক গল্পের বদলে এখানে নাটকীয় চমকটাই বেশি। সত্যিকারের ডাকাতির গা-ছমছম কাহিনি তিনি শুনিয়েছেন 'হার্মাদ' গল্পে যার শেষ পর্যন্ত একেবারে টান টান উত্তেজনা। হাসির গল্প জমাবার ব্যাপারে তাঁর যে কোনো জুড়ি নেই, তার প্রমাণ আছে 'পতিতপাবনের প্রতিভা' গল্পে। এখানে গল্প বলতে প্রায় কিছুই নেই, অথচ লেখার গুণে সমস্ত গল্পটা হয়ে ওঠে উপভোগ্য। আমাদের মনের কোমল অনুভূতি নিয়ে লেখা গল্পের সংখ্যা দিনকে দিন কমে আসছে। এইরকম গল্পেও একসময় প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কিশোর মন মাতিয়ে রেখেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'বন্ধু' গল্পে। আর-একটি অসাধারণ গল্পের কথা না বললেই নয়, সেটি হল 'নিশুতিপুর।' বাংলা ছোটো গল্প ঠিকঠাক লেখা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি 'তোতাকাহিনি'র মতো রূপক গল্পও লিখেছিলেন। কিন্তু ঠিক সেইরকম গল্প বাংলায় বিশেষ লেখাই হল না, কিশোরদের জন্যে তো নয়ই। সেই অভাবপূরণের গল্প 'নিশুতিপুর' যেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভরসা দিয়েছেন, অন্যায় অশুভ যতই দাপাদাপি করুক, শেষপর্যন্ত জয় হয় ভালোরই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞানের গল্প সম্বন্ধে একটু আলাদাভাবে দুটো-একটা কথা বলতেই হবে। বাংলা সাহিত্যে এই শাখাটা তেমন জোরদার নয়। কেউই যে লেখেননি এমন নয়, ভালো লেখাও কচিৎ কখনো দেখতে পাওয়া যায়—অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' কল্পবিজ্ঞান ছাড়া আর কী! কিন্তু বেশির ভাগ গল্পই হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক কালের রূপকথা—মহাকাশ আর গ্রহান্তরের অদ্ভুত জীব ছাড়া যেন কল্পবিজ্ঞানের আর কোনো বিষয়ই নেই। অথচ বিজ্ঞান তো আমাদের জীবনের সব জায়গাতেই, গল্পের বেলায় শুধু মহাকাশের অলীক গল্প শোনাতে হবে কেন! সত্যিকারের কল্পবিজ্ঞান কেমন হওয়া উচিত প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই সে কথা বলেছেন এক জায়গায়: 'যথার্থ বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প শুধু অসার অলীক কল্পনা যে নয়, বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তা যে অনাগতের আশ্চর্য পূর্বাভাস দেয়, তার বহু প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের

pathagar.net

গল্প এই জন্যেই ভালো লাগে যে যৎসামান্য হলেও সেসব গল্পে বিজ্ঞানের একটা দৃঢ় ভিত্তি আছে; তা শুধু অলীক কল্পনা নয়। 'পিঁপড়ে পুরাণ' তাঁর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গল্প। পিঁপড়েদের একটি শ্রেণি আকারে অত্যন্ত বড়ো হয়ে গিয়েছে এবং মানুষের জায়গায় যোগ্যতর জীব হিসেবে তারাই পৃথিবী দখল করে নিচ্ছে। পিঁপড়েদের শৃঙ্খলাবোধ আর কর্মনিষ্ঠার যেসব তথ্য কীটতত্ত্ববিদরা জানান, তার ওপর ভিত্তি করেই লেখা এ গল্প। ডাফনি দ্য মরিয়ারের গল্প অবলম্বন করে তোলা হিচককের অবিস্মরণীয়, ছবি 'বার্ডস্-এর কথা মনে পড়ে যায় এ গল্প পড়লে।

খানিকটা একধরনের গল্প 'আকাশের আতঙ্ক' আর 'অবিশ্বাস্য'। প্রথম গল্পে স্যার চিরঞ্জীব রায়ের গবেষণা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল, প্রাচীন যুগের সরীসৃপ-বংশ যে লোপ পায়নি, টেরোড্যাকটিলের ডিম থেকে জন্ম নেওয়া দুটি উড়ন্ত টেরোড্যাকটিল তারই প্রমাণ। সত্যজিৎ রায়ের একটি গল্পের কথা মনে পড়বেই এ গল্প পড়লে। পরের গল্পের বীভৎস প্রাণীটি যতই অবিশ্বাস্য হোক, শরীরের ওপর গ্ল্যান্ডের প্রভাবের বৈজ্ঞানিক সত্যকেই এখানে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞানের গল্পে হিমালয় আছে, সমুদ্রও আছে। গ্রহান্তরের কথা একেবারেই নেই বললে ভুল হবে, 'মঙ্গলবৈরি' গল্পে সম্ভবত 'ইউফো'-র প্রবাদ কাজে লাগিয়ে একটি চমৎকার গল্প লিখেছেন, তবে তার একটি উদ্দেশ্য আছে—'সমস্ত পৃথিবী আজ একতাবদ্ধ', এই হল গল্পের বাণী।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মানেই কোঁকড়াচুলের এক তরুণ, বয়স তাঁর যতই হোক না কেন, আমাদের মধ্যে তিনি থাকুন আর না-থাকুন। বড়োদের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আমরা ভুলিনি, কিন্তু কিশোরদের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে মনে রাখতে এ বই সাহায্য করবে, এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ব্যারাকপুর
জানুয়ারি ২০০২

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

pathagar.net

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জন্ম : ১৯০৪

মৃত্যু : ১৯৮৮

pathagar.net

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দু-বন্ধুই পড়তেন সাউথ সুবারবনে। সেসব দিনে ষোলো বছর না পুরলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসা যেত না। কিন্তু বন্ধু অচিনের সহপাঠীর বয়েস ছিল এক বছর কম। অতএব দু-বছর থাকতে হল ক্লাস টেনে। তখন বলা হত ফার্স্ট ক্লাস।

ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, এক মাথা ঘন কোঁকড়ানো চুল, বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ, সব চেয়ে সুন্দর দেখতে ছেলেটি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতেন তখনই। ফার্স্ট হতেন বাংলায়। সংস্কৃত পড়াতেন যে পণ্ডিতমশাই, তাঁর নাম ছিল রণেন্দ গুপ্ত—বলতে গেলে তিনিই লেখালেখির জন্যে অণুপ্রাণিত করতেন ইস্কুলে।

সেসব দিনে ধর্মতলা পেরিয়ে উত্তরে কলেজ স্ট্রিট বা ঝামাপুকুর গেলেই কালীঘাট আর ভবানীপুরের লোকেরা তাকে কলকাতায় যাওয়া বলত। হ্যাঁ। এসব কথা সেই তখনকার। ম্যাট্রিক পাশ করে সহপাঠী অচিনকে ছেড়ে কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তে চলে গেলেন প্রেমেন। পুরো নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহপাঠী অচিনও বড়ো হয়ে নাম করেছিলেন সাহিত্যে—অচিন আসলে অচিন্ত্য সেনগুপ্তেরই ডাক নাম।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জন্মেছিলেন বাবার কর্মক্ষেত্র বারানসীর কাশীতে। ক্যালেন্ডারের পাতায় তখন ১৯০৪। ইংরেজ আমল। বাবা জ্ঞানেন্দ্রমোহন মিত্র ছিলেন রেলের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু সুখের ছিল না শৈশব। একেবারে শিশু বয়েসেই মা সুহাসিনী দেবীকে হারালেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মাতৃহারা শিশু বাবাকে ছেড়ে দিদিমার সঙ্গে পাড়ি দিলেন উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে। দাদু রাধারমন ঘোষ তখন নাম করা ডাক্তার সেখানে। কিন্তু মায়ের পর পরই সেই দাদুও চলে গেলেন অকালে। মা-হারা ছোট্ট নাতিটিকে দিদিমা নিয়ে চলে এলেন কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িটায়। ডাক্তার দাদুই কিনে রেখে ছিলেন দিদিমার নামে।

সেই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ি থেকেই সাউথ সুবারবন ইস্কুলে পড়তে যেতেন প্রেমেন্দ্র। ম্যাট্রিকেও দারুণ রেজাল্ট করেছিলেন দুই বন্ধু। কলেজেও ভরতি হয়ে বেশ পড়াশুনো করছিলেন কিছুদিন। কিন্তু হঠাৎ যেন কী হল।

দেশ জুড়ে তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। প্রেমেন্দ্রও ভেসে পড়লেন সেই স্রোতে। পড়াশুনো মাটি করলেন একবছর।

শেষকালে কলকাতার স্কটিশচার্চ থেকে ফিরে এলেন পাড়ার আশুতোষ কলেজে। কিন্তু সে আর কদিন?

অস্থিরচিত্ত প্রেমেন্দ্র কলকাতা ছেড়ে রওনা দিলেন ঢাকায়। বিজ্ঞান নিয়ে পড়বেন বলে ভরতি হলেন জগন্নাথ কলেজে। কিন্তু না। বিজ্ঞানেও একদিন মন বসল না তাঁর। ঢাকা থেকে চলে এলেন শ্রীনিকেতনে। কৃষি নিয়ে পড়ার ইচ্ছেয় ভরতিও হলেন। কিন্তু হঠাৎই একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে আবার পাড়ি জমালেন ঢাকায়। ভরতি হলেন মেডিক্যাল ইস্কুলে। ক-মাস পরে সেখান থেকেও ছুটি। আবার কলকাতা। আবার সেই আশুতোষ কলেজ। তবুও শেষ করতে পারলেন না কলেজের পড়াশুনা।

শুরু হয়ে গেল কর্মজীবন। সেই সুবাদেই কখনো প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষকতা, কখনও টালি-খোলার ব্যবসা। কোনো সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে, রামতনু

লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, পরে সুভাষ চন্দ্রের 'বাংলার কথা' ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক, কখনো বেঙ্গল ইমিউনিটির কর্মী, ফিল্ম কোম্পানির প্রচার সচিব, ছায়াছবির চিত্রনাট্য রচনা থেকে পরিচালনা—বিচিত্র রকমের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন জীবনে।

ছোটোবেলায় কোনোদিন কবি বা সাহিত্যিক হবার কথা কখনো ভাবেননি। অবশ্য ইস্কুলের খাতায় কত কী লিখতেন লুকিয়ে লুকিয়ে। তার মধ্যে কবিতার সংখ্যাই ছিল একটু বেশি।

কলেজ জীবনেই বন্ধু অচিন্ত্যর সঙ্গে ভিড়ে পড়লেন 'কল্লোলে'। সেখানেই পেলেন নজরুল থেকে বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, সুনির্মল বসুর মতো অনেককেই। আসলে 'কল্লোল' ছিল যেন নবীন লিখিয়েদেরই নিজস্ব পত্রিকা, যারা সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে। অথচ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক অনন্য ধারার স্রষ্টা।

প্রথম গল্প 'কাদম্বিনীর ছেলে' লিখেছিলেন তেরো বছর বয়সে। প্রথম কবিতা ছাপা হল 'উত্তরা' পত্রিকায় 'বেনামী বন্দর'। কবির বয়স তখন ষোলো। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সত্যিকার আত্মপ্রকাশ ঘটল ১৯২৪-এর 'প্রবাসী' পত্রিকায়। প্রথম গল্প প্রকাশিত হল 'শুধু কেরানী'। সেই এক গল্পেই পাঠকের প্রশংসাধন্য হলেন লেখক। তারপরেই প্রকাশিত হল আর একটি গল্প 'গোপনচারিণী'।

সত্যি বলতে কী, এই দুটি গল্পেই সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তারপরেই 'সংহতি' পত্রিকায় শুরু হল ধারাবাহিক উপন্যাস 'পাঁক'।

বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও লেখা শুরু করলেন তারপরেই। 'রামধনু' আর 'রংমশাল' পত্রিকাতেই শুরু হল প্রথম। গল্প, ছড়া, রূপকথার পাশাপাশি লিখে চললেন বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প। তাঁর সেই সময়ের সার্থক সৃষ্টি বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস 'কুহকের দেশে'। তারপরেই কিশোর সাহিত্যের সেরা সৃষ্টি 'ঘনাদা'। ঘনাদার প্রথম আত্মপ্রকাশ 'মশা' গল্পটি দিয়ে।

সারা জীবনে বড়োদের উপন্যাস, গল্প, কবিতা গ্রন্থের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও রচনা করেছেন অজস্র বই। প্রায় দেড়শো গ্রন্থের লেখক তিনি। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কমকরে সত্তরটি। প্রায় চোদ্দোটি চলচিত্রের পরিচালনা করেছিলেন তিনি।

ছোটোদের জন্যে সম্পাদনা করেছেন 'রং মশাল' এবং 'পক্ষীরাজ'। ভ্রমণ করেছেন দেশে বিদেশে। ১৯৫৭-তে পেয়েছেন আকাদেমি পুরস্কার, আর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯৫৮-তে। তারপরেও পেয়েছিলেন ১৯৭৩-এ আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭৪-এ সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার এবং ১৯৭৯-তে শরৎ পুরস্কার। এসব ছাড়াও ১৯৭৯-তে লাভ করেছিলেন পদ্মশ্রী এবং ১৯৮৮-তে দেশিকোত্তম।

পাকস্থলীর ক্যানসার রোগেই তিনি পরলোক গমন করেন ১৯৮৮-এর ৩ মে। সেদিনও হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সেই পুরোনো বাড়িটাই ছিল তাঁর শেষযাত্রার সাক্ষী।

pathagar.net

উত্তরপাড়া, হুগলি — *কার্তিক ঘোষ*

কল্পবিজ্ঞান

pathagar.net

পিঁপড়ে পুরাণ

সে অনেক কাল আগের কথা।

তখন সবাই ছিল আশ্চর্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য উঠত ; আর এমন মজা যে, ঠিক রাত হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যেত। দিনের বেলা তখন আলো থাকত, আর রাত্তিরে হত অন্ধকার।

পৃথিবীই ছিল তখন কী সুন্দর! মাটিতে নরম সবুজ ঘাস। হরেকরকম গাছে হরেকরকম রঙের ফুল, আর রাত্তির বেলা আকাশে হাজার হাজার তারা—সে দেখতেই ছিল চমৎকার।

পাখিই ছিল তখন কতরকম! একরকম পাখি ছিল, তার নাম কাক। মিশকালো অন্ধকারের মতো তার রং। আর তার গলার স্বর? কেউ কেউ বলে তার গলার স্বর নাকি ভালো ছিল না। আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। যে কোকিল আজকাল আখছার আমাদের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়, তারই যদি স্বর এত ভালো হয়, তবে না জানি কাকের স্বর কী মিষ্টি ছিল! আর এই কোকিল নাকি সেই কাকেদের বাসাতে গলা সাধতে শিখত। সে কাক এখন আর পাওয়া যায় না, কেউ কেউ বলে, উত্তর-মেরুতে পৃথিবীর যে সবচেয়ে বড়ো চিড়িয়াখানা আছে, সেখানে নাকি একটি কাক এখনও আছে। তার জোড়টি মরে যাওয়ায় সেটিও নাকি ভারী মনের কষ্টে আছে—বেশিদিন আর বাঁচবে না। আরেকরকম পাখি ছিল, তার নাম চড়ুই। সে পাখি লোকের ঘরেদোরে, কড়িকাঠের ফাটলে বাসা বাঁধত। খুদে খুদে পাখিগুলি নাকি মানুষের বসতির কাছে নইলে থাকত না। মানুষের ফেলা-ছড়ানো খুদ-কুঁড়ো খেয়েই তারা থাকত।

তোমরা ঘোড়া বোধ হয় কেউ কেউ দেখেছ। সে ঘোড়া তখন পথেঘাটে গাড়ি টেনে লোক বয়ে বেড়াত। কুকুর তো তখন যেখানে-সেখানে এখনকার চিতাবাঘের মতো সস্তা ছিল। এখন যেমন লোকে চিতাবাঘ পোষে, তখন তেমনি কুকুর পুষত। আরেকরকম জানোয়ার ছিল—তার নাম বেড়াল। সে বেড়ালের কথা আমরা বেশি কিছু জানি না। সেকালের লোকেরা বেড়াল সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখে যায়নি।

একটি বহু পুরোনো সেকালের পুঁথিতে বেড়ালকে বাঘের মাসি বলা হয়েছে। তাতে মনে হয়, বেড়াল খুব প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। কিন্তু এত বড়ো জানোয়ার লোকে বাড়িতে কী করে পুষত, তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। সরকারি পশুশালার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেড়াল সম্বন্ধে গবেষণা করে একটি বই লিখেছেন। সেই বই প্রকাশিত হলে বেড়াল সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা যাবে। আরও এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার সেকালে ছিল, যা চোখে দেখলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না—ছাগল, ভেড়া, গোরু ইত্যাদি কত নাম করব!

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, তখনকার পিঁপড়ে নাকি খুব বড়ো হলেও মানুষের কড়ে আঙুলের চেয়ে বড়ো হত না। সে পিঁপড়েও ছিল নানা জাতের। মানুষের ঘরেদোরে, মাঠে-গাছে নানা রকমের পিঁপড়ে তখন গর্তের ভেতর বাসা বেঁধে থাকত। তাদের মধ্যে দু-এক জাতের পিঁপড়ে মানুষকে কামড়ে একটু যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতিই করতে পারত না। দল বেঁধে একসঙ্গে তারা তখন থেকেই থাকত বটে, কিন্তু মানুষ তখন মোটেই ভাবতে পারেনি যে, এই পিঁপড়ের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকার নিয়ে তাকে একদিন লড়াই করতে হবে। অনেকে তখন পিঁপড়ের ওপর দয়া করে তাদের বস্তা বস্তা চিনি খেতে দিত।

আর-বছরে দক্ষিণ আমেরিকায় পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা ভয়ানকভাবে হেরে গেছি, একথা তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই শুনেছ। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, তখন সমস্ত

দক্ষিণ আমেরিকায় নানাজাতের মানুষের বাস ছিল। মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেই ব্যস্ত, পিঁপড়েরা কী করছে না করছে তা দেখবার কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি। খুব বেশি পিঁপড়ের উৎপাত হলে পিঁপড়ের গর্তে খানিকটা বিযাক্ত অ্যাসিড ঢেলে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। ৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল, জানা গেছে। তারপর থেকেই আন্দিজ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এই নতুন জাতের ছ-ফুট লম্বা পিঁপড়ে বেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মানুষ তাড়াতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর আগে অনেক পর্যটক সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কেউই এই পিঁপড়ের কোনো সন্ধান পায়নি। ৬৭৫৭ সালে বিখ্যাত পর্যটক অশেষ রায় যখন দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল ঘুরে এসে আন্দিজের পার্বত্য প্রদেশে একরকম অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেন, তখন কাগজে-কাগজে তাঁকে এমন উপহাস-বিদ্রূপ করে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চুপ করে যেতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর শেষ ডায়েরিতে লিখে যান, 'আমি শপথ করে বলে যাচ্ছি—আমি যে অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেছি, তা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়!'

ওই আন্দিজ পাহাড়ের কাছেই ৬৭৬৩ সালে একদল জাপানি রুপোর খনি আবিষ্কার করে তাতে কাজ করতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর পাঁচ বছর ধরে তাদের তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তোমরা বোধ হয় জান যে, সেসময় এই ব্যাপার নিয়ে ভয়নাক হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল। অশেষ রায় যখন এই এক হাজার জাপানির অন্তর্ধানের সঙ্গে এই অদ্ভুত জানোয়ারের কোনো সংস্রব আছে বলেন, তখন লোকে তাঁকে শুধু পাগলা গারদে পুরতে বাকি রেখেছিল। অশেষ রায় এই অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে যেসব কথা জানান, তা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। সেকালের লোকেরা এই অপরূপ কাহিনিকে আজগুবি বলেছিল বলে তাদের বেশি দোষও আমরা দিতে পারি না।

অশেষ রায় তাঁর পর্যটন থেকে ফিরে কোনো কাগজে লিখেছিলেন, 'সেবার দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন আমার কাফ্রি বন্ধু, পৃথিবী-বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ্ মভুলা। আগের দিন আমরা মাসোর নদীর উৎসে পৌঁছোই। তারপর আমাদের গন্তব্য স্থল ছিল আলাগাস হ্রদ।

'সেদিন সন্ধেবেলা আমরা ক্লান্ত হয়ে সারাটার কাছে একটি ছোটো পাহাড়ের ওপর বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের চারপাশে আন্দিজের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা তাদের বিপুল দেহ নিয়ে ঘিরে ছিল। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। আমাদের পশ্চিমে ঠিক আমাদের পাহাড়ের নীচের উপত্যকার ওপর তখন অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে। উপত্যকাটি আয়তনে খুব ছোটো। চারধারে পাহাড় যেন বিশাল দেওয়ালের মতো ওইটুকু জমিকে ঘিরে আছে। উপত্যকাটি আগাগোড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। শুধু এক জায়গায় ছোটো একটি পার্বত্য জলাশয় দেখা যাচ্ছিল।

'আমি তখন আমাদের ছোট্ট তাঁবুটি রাত্রের জন্যে খাটাবার বন্দোবস্ত করছি। মভুলা তাঁর সেদিনকার সংগৃহীত নতুন জাতের কীটগুলি বাক্সবন্দি করছিলেন। হঠাৎ চাপা, উত্তেজিত কণ্ঠে মভুলা ডাকলেন, শুনুন!

'খুঁটি পুঁততে পুঁততে চেয়ে দেখি, তিনি নিবিষ্টভাবে নীচের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

'জিজ্ঞেস করলাম,—ব্যাপার কী?

'মভুলা শুধু ইশারায় তাঁর কাছে যেতে বললেন এবং তাঁর কাছে গেলে তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে নীচের পার্বত্য জলাশয়টি দেখিয়ে বললেন,—দেখতে পাচ্ছেন?

'জলাশয়ের ধারে কালো রঙের কী একটা জানোয়ারকে অস্পষ্টভাবে ঘুরতে ফিরতে দেখা যাচ্ছিল। বললাম, ও আর কী? কোনো জানোয়ার-টানোয়ার হবে বোধ হয়।

pathagar.net

'মন্তুলা ঈষৎ হেসে বললেন, কোনো জানোয়ার-টানোয়ার যে হবে তা আমিও বুঝেছি, কিন্তু কোন জানোয়ার? দক্ষিণ-আমেরিকার অত বড়ো কালো জানোয়ারের একটা নাম করুন তো দেখি! আপনি দূরবিনটা একবার বের করুন তো!

'সূর্য এরই মধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়াল হয়ে গেছে। নীচে সমস্ত জলাশয়টির ধারে একটির পর একটি করে দশটি ওই ধরনের কালো জানোয়ার এসে তখন জড়ো হয়েছে।

'আমার হাত থেকে দূরবিনটা একরকম কেড়ে নিয়েই মন্তুলা চোখে লাগালেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই দূরবিনটা নামিয়ে বললেন, যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল!

'দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই পাহাড়ে ওঠবার সময়ে কেমন করে না জানি ঠোকা লেগে দূরবিনের কাঁচ দুটি ভেঙে গেছে।

'সূর্যের আলো তখন বিরল হয়ে এসেছে। তবু সেই আলোতেই আমাদের খালি চোখে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, গভীর অরণ্যের ভেতর থেকে প্রায় দুশো ওই অপরূপ জানোয়ার জলাশয়ের ধারে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের আকৃতি অদ্ভুত—সামনের ও পেছনের দুটি বড়ো-বড়ো কালো জালা কে যেন এক-একটি খাটো কাঠিতে গেঁথে লম্বা লম্বা পায়ের ওপর সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের আকৃতি যত না অদ্ভুত, তাদের আচরণ তার চেয়েও বেশি। দলবদ্ধ হয়ে অনেক জানোয়ার থাকে বটে, কিন্তু এমন অপরূপ শৃঙ্খলা কোনো জানোয়ারের ভেতর আছে বলে শুনিনি। তাদের একসারে চলা-ফেরা দাঁড়ানোর সঙ্গে একমাত্র খুব শিক্ষিত সৈন্যের কুচকাওয়াজের তুলনা করা যায়।

'যত তাদের গতিবিধি দেখছিলাম, দূরবিনের কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় দুঃখ আমাদের ততই বাড়ছিল। সন্ধের অন্ধকারে তারা শেষে একেবারে অরণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে আমরা বিমর্যভাবে সেদিক থেকে চোখ ফেরালাম। সেদিন রাত্রে তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আমাদের আসতে চাইছিল না। মন্তুলা তাঁর বিছানায় অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে বললেন, আচ্ছা আপনার কী মনে হয় বলুন তো? এমন আশ্চর্য জানোয়ার এতকাল কোনো পর্যটকের চোখে পড়েনি, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?

'আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই। হঠাৎ চমকে জেগে উঠে দেখি, মন্তুলা উত্তেজিতভাবে আমায় ঝাঁকানি দিচ্ছেন। আমি চোখ খুলতেই তিনি বললেন, শিগগির বাইরে এসে দেখুন!

'তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি, অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'মন্তুলা উত্তেজিতভাবে বললেন, চেয়ে দেখুন, নীচে চেয়ে দেখুন!

'নীচে চেয়ে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে সেই পার্বত্য জলাশয়ের ধারে নানা জায়গায় অসংখ্য আলো জ্বলছে। সে-আলোয় আমাদের পাহাড় থেকে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু অস্পষ্টভাবে ওই জানোয়ারদের নড়াচড়া এক-আধটু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকে চেয়ে বসে রইলাম। এত বড়ো বিস্ময়জনক ব্যাপার বিশ্বাস করতে যেন আমাদের সাহস হচ্ছিল না।

'ভোর হওয়ার কিছু আগেই সমস্ত আলো নিভে গেল। আমরা কিন্তু সেখান থেকে উঠতে পারিনি। ভোরের আলোয় ওই জলাশয়ের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে প্রায় দশ বিঘা জমির জঙ্গল একেবারে সাফ হয়ে গেছে। আগের দিন সন্ধেবেলা যে প্রকাণ্ড গাছগুলি সে স্থান অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের চিহ্ন পর্যন্তও নেই।

'মন্তুলার উত্তেজনা তখনও শান্ত হয়নি। আমার হাতটা সজোরে নাড়া দিয়ে তিনি বললেন, আমার কী মনে হয় জানেন? আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখছি তারা কীটজাতীয় প্রাণী।

'এবার কিন্তু আমি না হেসে পারলাম না, বললাম, কারণ আপনি কীটতত্ত্ববিদ!

pathagar.net

'মন্ডুলা আমার পরিহাসে কান না দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তাই! কীটজাতীয় ছাড়া পৃথিবীর কোন প্রাণীর চারটের বেশি পা দেখেছেন?

'কথাটা সত্যি। আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখছি, তাদের পা কতগুলি তা গুনতে না পারলেও চারের যে বেশি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'মন্ডুলা বলে যাচ্ছিলেন, তা ছাড়া আকৃতির কথা মনে রাখবেন!

'বললাম, কিন্তু এত বড়ো কীট?

'মন্ডুলা বললেন, অসম্ভব তো নয়!

'তারপর পুরো একটি সপ্তাহ আমরা সেই পাহাড়ে ওই অদ্ভুত প্রাণী দেখবার জন্যে অপেক্ষা করি, কিন্তু আর কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।'

অশেষ রায়ের বর্ণনা এইখানেই শেষ হয়েছে। তারপর এক হাজার বৎসর এই প্রাণীর কথা আর কিছুই শোনা যায়নি। অশেষ রায় ও মন্ডুলার কথায় পৃথিবীর লোক হাসলেও কেউ-কেউ যে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে সেখানে যায়নি এমন নয়। কিন্তু আর কোনো পর্যটকের চোখে কিছু পড়েনি। এখন আমরা অবশ্য বুঝাতে পারছি যে অশেষ রায় এই পিঁপড়েদেরই দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল।

এই পিঁপড়ের কথা যখন আমরা জানলাম, তখন আর সময় নেই। ৭৭৫৭ সালে একেবারে বজ্রাঘাতের মতো আচম্বিতে মানুষকে এই পিঁপড়ের আক্রমণ অভিভূত করে দেয়। আক্রমণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ একথা কল্পনা করেনি। পিঁপড়েরা যে বহুদিন থেকে গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রমাণ ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিম ধারে দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত প্রধান নগর এক দিনে ধসে পড়ে। কতদিন আগে থেকে যে পিঁপড়েরা এই নগরগুলো ফোঁপরা করে এসেছে, কেউ তা বলতে পারে না। মানুষ মাটির ওপরেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। মাটির তলায় কোন শত্রু তার সর্বনাশের আয়োজন করেছে, একথা সে কেমন করে জানবে? ৭৭৫৭ সালের ১লা ফাল্গুন রাত একটার সময় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডরের সমস্ত বড়ো-বড়ো শহর যখন হটাৎ ভীষণ শব্দে ধসে পড়ে, তখন কেউ সন্দেহ করেনি যে, এ কোনো শত্রুর কাজ। বিরাট ভূমিকম্প ভেবেই মানুষ তখন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ধসে-পড়া নগরগুলির বিরাট বিশৃঙ্খলার ওপর যখন প্রভাত হল, তখন যে দৃশ্য প্রতি নগরের মুষ্টিমেয় জীবিত নগরবাসীদের চোখে পড়ল তা অতি ভয়ংকর। প্রতি নগরের চারধারে অসংখ্য পিপীলিকা বাহিনী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েদের সেই প্রথম আক্রমণে যে-সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায়, তার একটিমাত্র অধিবাসীই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি রায়োবোয়া নগরের ডন পেরিটো। নগর ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গেই অধিকাংশ লোক মারা পড়েছিল, যে-কয়েকজন সকালবেলা পর্যন্ত কোনোরকমে জীবিত ছিল, পিঁপড়েরা তাদের নির্মমভাবে সংহার করে। মানুষ সেবার যুদ্ধের অবসর পর্যন্ত পায়নি—প্রস্তুতই তারা ছিল না। ডন পেরিটো কোনোরকমে তাঁর এরোপ্লেনে চড়ে একেবারে মেক্সিকোতে পালিয়ে আসেন। এরোপ্লেনে চড়েও যে তাঁর নিস্তার ছিল তা নয়। এমনি এরোপ্লেনে করে আরও অনেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাখাওয়ালা পিঁপড়েরা আকাশে পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ডন পেরিটোর জীবন রক্ষা হয়েছিল শুধু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতে। অন্য সকলের মতো প্রথম থেকেই এরোপ্লেনে লম্বা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা না করে তিনি প্রথমে শুধু উর্ধ্বে আরোহণ করবার চেষ্টা করেন। পিঁপড়েরা আট হাজার ফুট পর্যন্ত তাঁকে তাড়া করে, কিন্তু তার বেশি তারা আর উঠতে পারে না বলেই তিনি রেহাই পান। পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনি পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়।

তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে পিঁপড়েরা কীভাবে গায়না, ব্রেজিল, বলিভিয়া ও আর্জেনটাইন রিপাবলিক দখল করে, তার ইতিহাস তোমরা কিছু কিছু নিশ্চয়ই জান। আশ্চর্যের

কথা এই যে, পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের পরেও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ তেমনভাবে সাবধান হয়নি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, প্রথম আক্রমণের পর দু-বৎসর পর্যন্ত তাদের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। হঠাৎ দু-বৎসর বাদে একদিন মাঝরাতে ৫২ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিমের সমস্ত শহর ধসে পড়ে। এই লঙ্গিচিউড ধরে পিঁপড়েদের আক্রমণ আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপার। এবারেও সেই আগের বারের কাহিনির পুনরাবৃত্তি হয়। শুধু অরিনকো নদীর ধারে বলিভার নগরের লোকেরা আগে থেকে সন্দেহ করে শহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ নিয়ে জড়ো হয়েছিল। তারাই কেবল যুদ্ধ করে মরবার সৌভাগ্য পেয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রথম পিঁপড়েদের অদ্ভুত অস্ত্রের ও তাদের যুদ্ধকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের শেযে কয়েকজন মাত্র বলিভার নগরবাসী নদী দিয়ে মোটরলঞ্চে অ্যাটলান্টিক সাগরে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

পিঁপড়েরা যে-অস্ত্র ব্যবহার করে, তাকে খুব ভয়ংকর একরকম বোমা বলা যেতে পারে। কিন্তু বোমা প্রয়োগ করার রীতিটাই সবচেয়ে অদ্ভুত। বলিভার নগরবাসীরা বলেন, যখন তীর থেকে বহু উড়ন্ত পিঁপড়েকে গোল গোল একরকম জিনিস নিয়ে আমাদের দিকে উড়ে আসতে দেখি, তখনই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। অনেক পিঁপড়ে সমস্ত গোলাগুলি এড়িয়েও আমাদের জাহাজ নৌকোতে এসে পড়ে। তাদের পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভয়ংকর বিস্ফোরক বোমা ফেটে জাহাজ নৌকো সব গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক বোমার সঙ্গে একটি করে পিঁপড়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়। দূর হতে নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তারা রাখে না।

পিঁপড়েদের দ্বিতীয় আক্রমণের পর সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে ওঠে। চীনের পিকিন্‌ শহরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলে কর্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করে। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ, এরোপ্লেন ও সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকার বাকি দেশগুলির অধিবাসীদের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? পিঁপড়েদের আস্তানার কোনো পাত্তাই কেউ পায় না। মাটির তলায় কোথা দিয়ে তাদের গতিবিধি, সমস্ত আমেরিকা খুঁড়ে না ফেললে জানবার উপায় নেই। সৈন্যেরা দিনের পর দিন ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে তন্নতন্ন করে সমস্ত খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন হঠাৎ এক জায়গায় গভীর রাত্রে তাদের পায়ের তলায় মাটি ধসে পড়ে। সকালবেলা তাদের আর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। এরোপ্লেনের দল ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার আকাশে বিচরণ করে বেড়ায়। পিঁপড়েদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনগুলিরও কোনোমতে বিশ হাজার ফুট নীচে নামবার উপায় নেই, কোথা থেকে একশো এরোপ্লেনের জায়গায় হাজার হাজার উড়ন্ত পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করে।

পিঁপড়েদের সঙ্গে এরোপ্লেন নিয়ে লড়াই করা শক্ত। একটাকে মারতে একশোটা এসে ছেঁকে ধরে। সবচেয়ে মুশকিল, তারা এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিনের মধ্যে ঢুকে জড়িয়ে তাকে অচল করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মরে।

বিশ হাজার ফুট ওপর থেকে পিঁপড়েদের কোনো সন্ধানও মেলে না।

এদিকে মাটির ওপর বাকি সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা তখন প্রাণপণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যেখানে যে শহর ছিল, সমস্ত শহরের লোক শহরের বাইরে নতুন করে ঘর বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করলে। কখন যে কোন শহর ধসে পড়ে, তার ঠিক কী? পিঁপড়েরা কবে থেকে কোন শহরের তলা ফোঁপরা করে রেখেছে, তা কে বলতে পারে?

কিন্তু পিঁপড়েদের তৃতীয় ও শেষ আক্রমণ এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। হঠাৎ একদিন সমস্ত নতুন শহরের ভেতর সকাল থেকে মড়ক শুরু হয়ে গেল। সুস্থ, সবল মানুষেরা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে পড়ে যায়, তারপর কয়েক মিনিট হাত-পা খিঁচে মারা যায়। কাতারে কাতারে সকাল

pathagar.net

থেকে লোক মারা পড়তে থাকে, অথচ ডাক্তার বৈজ্ঞানিকেরা রোগের স্বরূপই খুঁজে পান না। সারা পৃথিবী এ সংবাদ শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বড়ো বড়ো মাথা ঘেমে উঠল, কিন্তু এই মড়কের কারণ বোঝা গেল না। এক দিনে এইভাবে অর্ধেক আমেরিকার লোক নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর পরের দিন সকালে রোগের কারণ আবিষ্কার করল কিন্তু বাহিয়া শহরের একজন মুটে। সকালবেলা শহরের সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসনকর্তা আর তিনজন বৈজ্ঞানিকের একটি গোপন সভা বসেছে। শাসনকর্তা নিরুপায় হয়ে শহর ছেড়ে, আমেরিকা ছেড়ে, একেবারে জাহাজে করে এই ভয়ানক দেশ ছেড়ে যাওয়ারই প্রস্তাব করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও সেনাপতিদের মধ্যে এই কথা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে—এমনভাবে পিঁপড়েদের কাছে হার স্বীকার করে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরাও ভালো বলে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্য শুরু করছেন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের সভার প্রহরীকে একরকম বগলদাবাতে চেপে ধরে নিয়েই একটা বিশালকায় লোক ঘরের ভেতরে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। সভার সকলে তো স্তম্ভিত! লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া—মাংসের একটা পাহাড় বললেই হয়। কিন্তু তার সমস্ত মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে। সে মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় যে, এই অজানা ভয়ংকর রোগ তাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছে। শেষ হওয়ার তার আর দেরি নেই। সেই বিশাল বিরাট দেহ সেই ভীষণ রোগের প্রভাবে এর মধ্যেই কাঁপতে শুরু করেছে। তার ভীষণ বাহুর চাপে প্রহরীটিরও তখন প্রাণান্ত হয়ে এসেছে। প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সেনাপতি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বাহুপাশ থেকে প্রহরীকে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টিত হলেন। প্রহরী তখন চিৎকার করছে যন্ত্রণায়। কিন্তু সে বিশাল দেহের জোরের সঙ্গে কি পারা যায়! লোকটার তখন হাত-পা খিঁচুনি শুরু হয়েছে। অনেক কষ্টে প্রহরীকে যখন সবাই মিলে মুক্ত করলেন, তখন দেখা গেল যে তার একটা পাঁজরা একেবারে ভেঙে গেছে। প্রহরী তো অনেক কষ্টে জানাল যে, এই লোকটাকে সভায় ঢুকতে মানা করতে গিয়েই তার এই দুর্দশা, এবং লোকটাকে সে চেনে। সে এই শহরের একজন মুটে—তার নাম গুস্তাভ।

কেন তার সভায় ঢোকবার এত ব্যগ্রতা, সেকথা তখন গুস্তাভকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। মৃত্যুর পূর্বলক্ষণরূপ প্রবল হাত-পা খিঁচুনি তখন তার শুরু হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট বাদেই সব শেষ হয়ে যাবে। সভার সকলে বিমর্ষ মুখে তারই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু-এক মিনিটের মধ্যেই গুস্তাভ মারা গেল, কিন্তু মারা যাওয়ার আগে একটিবার চোখ খুলে সে উন্মত্তের মতো চিৎকার করে উঠেছিল, 'জল খেয়ো না!' তারপর সব শেষ।

'জল খেয়ো না!' এই ভয়ংকর দৃশ্যের সামনেও সেনাপতির কৌতুক বোধ হল। শাসনকর্তা কাতরভাবে মুখ ফেরালেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হঠাৎ একজন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মুখ-চোখ তাঁর অসাধারণভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেনাপতির পিঠ হঠাৎ চাপড়ে দিয়ে তিনি বললেন, আমরা কী গাধা!

সবাই তো অবাক! শাসনকর্তা বললেন, আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে যান, কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটিবারও তো চোখের পাতা মোড়েননি।

সবাই ভাবছিল—বৈজ্ঞানিকও বোধ হয় পাগল হয়ে গেলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পাগল হননি। সেনাপতিকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, আপনি কাল থেকে এখন পর্যন্ত কী খেয়েছেন?

ম্লান হেসে শাসনকর্তা বললেন, খাওয়ার কি সময় পেয়েছি—শুধু এক পেয়ালা দুধ।

কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরও চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, এবার বুঝেছেন?

এতক্ষণে সকলেই বুঝেছিলেন। নানান কারণে, বিশেষত এই ভয়ংকর মড়ক নিবারণের

pathagar.net

উপায়-চিন্তায় তাঁদের কারুরই এই একদিন জল তো দূরের কথা, অন্য কিছু খাওয়ারই সুযোগ হয়নি।

বৈজ্ঞানিক বললেন, যাকে আমরা নতুন রোগ বলে ভেবেছিলাম, তা কেবল বিষের ক্রিয়ামাত্র। শহরের জল বিযাক্ত হয়ে গেছে এবং কারা যে বিযাক্ত করেছে, তা বোধ হয় আর বলতে হবে না।

শহরের সব জায়গায় অবশ্য তখনই ঢেঁড়া পিঠে দেওয়া হল এবং দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত শহরে তার করেও একথা জানিয়ে দেওয়া হল।

সত্যই শহরের জল বিযাক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক শহরের প্রধান ট্যাঙ্কের জল কীভাবে কখন পিঁপড়েরা বিযাক্ত করে দিয়েছিল, তা অবশ্য কেউ জানে না।

কোনোরকমে মানুষ এ যাত্রা রক্ষা পেল বটে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অর্ধেক মানুষ কাবার হবার আগে নয়।

এ ধাক্কা আবার সামলাতে না সামলাতে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে শহরে শহরে সাড়া পড়ে গেল, পিঁপড়েরা আক্রমণ করতে আসছে! এবার যুদ্ধ মাটির ওপরে—সামনাসামনি! মানুষ এরই জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিল। মাটির ওপর যুদ্ধ করতেই সে অভ্যস্ত। এ যুদ্ধের জন্যে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পিঁপড়েদের এই তৃতীয় আক্রমণের কাহিনি রায়ো-ডি-জানেইরো-র বিখ্যাত লেখক সেনর সাবাটিনির লেখা থেকে আমরা পেয়েছি। তাঁর বিবরণই এখানে তুলে দিলাম।

সেনর সেবাটিনি লিখেছেন, 'হঠাৎ গভীর রাত্রে শহরের পশ্চিম ধারের প্রাচীরের প্রহরীরার সংবাদ দিল যে, দূরে লাখ লাখ পিঁপড়ে এসে জড়ো হয়েছে। প্রস্তুত আমরা দিনরাতই থাকতাম, সুতরাং এ সংবাদে আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছুই ছিল না। বরং এতদিন বাদে সামনা-সামনি যুঝতে পাব বলে আমরাও উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের প্রাচীরের সমস্ত সার্চলাইট তখন রাত্রিকে দিন করে তুলেছে। সেনাপতির আদেশে অন্য সমস্ত দিকে কয়েকজন প্রহরী ও সৈন্য ছাড়া আমরা সকলে পশ্চিমে নগর-প্রাকারের বাইরে এসে জড়ো হলাম।

'সেখানে যে দৃশ্য আমরা দেখলাম, তা জীবনে ভোলবার নয়। অন্ধকার রাত্রি আমাদের অসংখ্য সার্চলাইটের প্রখর আলোয় তিন মাইল পর্যন্ত একেবারে যেন পেছিয়ে গেছে। এই আলোয় আমাদের শহর থেকে দু-মাইল দূরে অসংখ্য পিঁপড়ের বাহিনী কালো সমুদ্রের বন্যার মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিঁপড়ের সারের পর পিঁপড়ে সার—যতদূর আলো পৌঁছোয়, ততদূর পর্যন্ত শুধু পিঁপড়ের সমুদ্র।

'সেনাপতির আদেশে আমাদের এক হাজার কামান গর্জন করে উঠল। ঘন পিঁপড়ের সারের মধ্যে আমাদের কামানের গোলায় যে ভয়ংকর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হল, তা বর্ণনা করা যায় না। দিকে দিকে আমাদের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়েও কিন্তু পিঁপড়েরা থামল না। মরা পিঁপড়ের স্তূপের ওপর দিয়ে নতুন পিঁপড়ের দল সমানভাবে অগ্রসর হতে লাগল।

'পিঁপড়েরা আমাদের গোলার জবাব দেয় না, শুধু নিঃশব্দে অগ্রসর হয়। সেনাপতির আদেশে এবার আমরা অগ্রসর হলাম। প্রথমে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে এক দল, তারই পিছু পিছু আমাদের আটশো ট্যাঙ্ক। প্রাচীর থেকে সার্চলাইট নামিয়ে বড়ো বড়ো গাড়ির ওপর তুলে সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

'পিঁপড়েদের দিক থেকে তবুও কোনো জবাব নেই। শুধু তারা ধীরে ধীরে এগোয়।

'সেনাপতি আদেশ দিলেন, বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ো!

'বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়েদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হল। সে গ্যাসে এবং আমাদের ট্যাঙ্কগুলির মেশিনগানের গুলিতে লাখো লাখো পিঁপড়ে মারা গেল। যেদিকে বিষাক্ত

pathagar.net

গ্যাস ছোঁড়া হয়, সেদিকে পিঁপড়ের সার যেন কে মুছে দেয়। শুধু মাটি কালো করে অসংখ্য পিঁপড়ের মৃতদেহ পড়ে থাকে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলি সেই মরা পিঁপড়ের সার মাড়িয়ে অগ্রসর হয় ; আর তাদের মেশিনগানের গুলিতে পিঁপড়ের দল ছারখার হয়ে যায়। পিঁপড়েদের এই দুরবস্থায় তখন আমরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। শহর থেকে ছেলে, মেয়ে, বুড়োরা পর্যন্ত তখন পিঁপড়েদের ধ্বংস-যজ্ঞ দেখবার জন্যে প্রাচীরের বাইরে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'পিঁপড়েরা হঠাৎ যখন পিছু হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন তাদের অর্ধেকের বেশি মারা পড়েছে। কিন্তু পেছুলে কী হবে? আমাদের ট্যাঙ্কগুলি এখন একেবারে তাদের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেই বিরাট ট্যাঙ্কগুলির চাপেই যে কত পিঁপড়ে মারা গেল, তার ঠিক নেই।

'আমার তখন মনে হচ্ছিল, এতদিন আমরা মিথ্যাই ভয় পেয়েছি। হয়তো কোনো উপায়ে তারা কিছু শক্তি অর্জন করেছে ; কিন্তু হাজার হলেও তারা কীট—সামান্য কীট মাত্র। মানুষের শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কৌশলের বিরুদ্ধে তারা লড়তে আসে কোন সাহসে? তাদের এই দুর্দশায় একটু যেন করুণাই আমার হচ্ছিল। সেনাপতির আদেশে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাদের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধটা আমার একটা বীভৎস প্রহসনের মতো লাগছিল। অসহায় পিঁপড়ের দলের পিছু হাঁটবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ছিন্নভিন্ন হয়ে পিছু হাঁটলেও তারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়নি।

'এবার সেনাপতির আদেশে পদাতিকদল অগ্রসর হল। সেনাপতির আদেশ—একটি পিঁপড়েও যেন আজ না বাঁচে। কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর না হতেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিঁপড়ে বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ-পাঁচেক সার্চলাইট জ্বলে উঠেছে। পিঁপড়েদেরও যে সার্চলাইট থাকতে পারে এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কী প্রয়োজন, ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সার্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চলাইটের আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সবজে রঙের। সে তীব্র আলোর সরু জিহ্বা যেন তারা আমাদের আগের সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সারের পর সার সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে সে আলো বুলিয়ে বুলিয়ে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

'জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নিচু হয়ে বসে সেটা বেঁধে উঠেই আমি দেখি যে, সে আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের মুখের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'আমার পাশের সৈনিকটি আমার হাতটা নাড়া দিয়ে বলল, সার্চলাইটগুলো নিভে গেল কেন বলো তো?'

'আমি হেসে উঠলাম, কানা হয়ে গেছ নাকি, সার্চলাইট আবার নিভল কোথায়? দিব্যি তো জ্বলছে।

'সে আবার ভীত কণ্ঠে বললে, কই আমি যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!

আমি তার পিঠ চাপড়ে বললাম, ওই আলোয় চোখটায় একটু ধাঁধা লেগেছে। একটু রগড়ে নাও।

'কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সামনের সার থেকে একজন চিৎকার করে কেঁদে উঠল, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

'আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা কাতরভাবে জড়িয়ে ধরে বললে, তবু যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না ভাই, কী হবে!'

'বিদ্যুতের মতো চকিতে এ ব্যাপারের আসল অর্থ আমার মনে খেলে গেল। আমাদের

pathagar.net

সমস্ত বন্দুক কামান স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমাদের ট্যাঙ্কগুলি নিঃশব্দ হয়ে গেছে, শুধু চারিদিক থেকে অসহায় সৈন্যদের চিৎকার, কলরব, বিলাপ তখন তুমুল হয়ে উঠেছে।

'আতঙ্কে পেছনে ফিরে চিৎকার করে উঠলাম, চোখ বন্ধ করো, আলোর দিকে চেয়ো না! কিন্তু চারিদিকের ভীত অসহায় সৈন্যদের কলরব ছাপিয়ে সে ক্ষীণ স্বর কতদূর আর পৌঁছোয়। পিঁপড়েরা তখন আমাদের শহরের প্রাচীরের কাছে সমবেত ছেলেমেয়ে ও বুড়োদের মুখের ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'তারপর যে ভয়ংকর বীভৎস ব্যাপার আরম্ভ হল, তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। সেই অন্ধ অসহায় সৈন্যদের ওপর অসংখ্য পিঁপড়ে হিংস্র যমদূতের মতো ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল।

'চিৎকার করে বললাম, পালাও, পালাও!

'কে পালাবে? কোথায় পালাবে?

'অন্ধ সৈন্যের দল অসহায়ভাবে পালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই মাথা ঠোকাঠুকি করে মরতে লাগল এবং পিঁপড়ের দল সেই বিশৃঙ্খল জনতাকে নির্মমভাবে সংহার করতে শুরু করল। এই হতভাগ্য সৈন্যদের কোনোরকমে বাঁচাবার উপায় না দেখে অবশেষে নিজের প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে ছুটতে হল। কিন্তু ছুটে পালানোও সোজা নয়, পিঁপড়েরা তখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। একটা বিশাল কালো পিঁপড়ে আমার পিঠের জামাটা কামড়ে ধরেছিল। হাতাহাতি লড়াই পিঁপড়েদের সঙ্গে এর আগে হয়নি। সেই বিকট কীটকে দেখে শিশুর মতো ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু চিৎকার করবার সময় সে নয়—পাশ থেকে আর একটা পিঁপড়ে তখন আমার পায়ে প্রচণ্ড কামড় দিয়ে চলেছে। সেটার মাথায় ছোরা বসিয়ে দিতেই চটচটে একরকম রসে সমস্ত হাতটা আমার ভিজে গেল এবং পরমুহূর্তেই পেছনের পিঁপড়েটার টানে একেবারে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। সমস্ত পিঠটা আমার ওইরকম রসে ভিজে ওঠাতে বুঝলাম, পেছনের পিঁপড়েটাকে দেহের চাপে থেঁতলেই ফেলেছি। পিঁপড়েদের দেহগুলো আকারে বড়ো হলেও অত্যন্ত নরম, এই যা রক্ষা। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুট দিলাম,—কোনদিকে, তা মনে নেই।'

এইখানে সেনর সাবাটিনির বর্ণনা শেষ হয়েছে। রায়ো-ডি-জানেইরোর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে একমাত্র সেনর সাবাটিনিই রক্ষা পেয়েছিলেন। পিঁপড়েদের হাত কোনোরকমে এড়িয়ে সমুদ্রে পড়ে ছোটো একটি ভেলার সাহায্যে নিকটের একটি দ্বীপে উঠে তিনি সেবার প্রাণ বাঁচান। কয়েক বছর বাদে একটি চীনে জাহাজ তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

রায়ো-ডি-জানেইরোর সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়েরা সেদিন দক্ষিণ আমেরিকার বাকি সমস্ত শহরও আক্রমণ করে। সে আক্রমণে কোনো শহরই রক্ষা পায়নি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সেদিনই মানুষের পাট ওঠে। তারপর আর মানুষ সেখানে পা দিতে পারেনি। গত বৎসর সে চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা কী ভীষণভাবে হেরে গেছি, সে খবর তো তোমরা সবাই জান।

এই হল গিয়ে পিঁপড়েদের দক্ষিণ আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস। মানুষ অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। সামান্য কীটের হাতে এই লাঞ্ছনার শোধ নেওয়ার জন্যে পৃথিবীর বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু শিগগির যে আমরা দক্ষিণ আমেরিকা ফিরে পাব, তারও বড়ো আশা নেই ; কারণ যে অদ্ভুত আলোয় তারা অমন করে মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তার রহস্য এখনও আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারেননি।

পিঁপড়েদের আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস পাঁচ বছর আগে সংক্ষিপ্তভাবে কাগজে বের হয়। তারপর সেই বিবরণ পড়ে অনেকে কৌতূহলী হয়ে আরও অনেক কথা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার কোনো সুবিধে হয়নি, কারণ এতদিন পিঁপড়েদের সম্বন্ধে ওর বেশি কিছু জানা ছিল না। পিঁপড়েদের সম্বন্ধে বিশদভাবে সন্ধান করা তো দূরের কথা, মানুষ

Pathagar.net

সেবার পিঁপড়েদের আক্রমণে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পালাবারই পথ পায়নি। পিঁপড়েরা কেমন করে এই বিপুল শক্তি অর্জন করেছে, তাদের রাষ্ট্রসমাজের গঠন কেমন, তারা দক্ষিণ আমেরিকাকে কীভাবে এখন গড়ে তুলেছে, তার কোনো বিবরণই মানুষের জানবার কোনো সুযোগ হত না—যদি না...

...যদি ভারতীয় জাহাজ 'যমুনা'র সমস্ত নাবিক আর যাত্রী একটি দুরন্ত ডানপিটে ছেলের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে না উঠত। একটি ছেলের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পিঁপড়েদের বিবরণ-সংগ্রহের সম্বন্ধ কোথায়, তা প্রথমে বোঝা একটু কঠিন বটে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করেই বলি। ভারতীয় নৌবহরের 'যমুনা' জাহাজটি সেবার ফিলিপাইনের পূর্ব-উপকূল হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোটো দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল। দ্বীপটি দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি ও পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের প্রধান ঘাঁটি। মাঝ রাস্তায় ঝড় হয়ে আগের দিন জাহাজ নির্দিষ্ট পথ থেকে একটু দূরে এসে পড়েছিল, এখন আবার নির্দিষ্ট পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল ; কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল শুধু একটি ছেলের দৌরাত্ম্যে। ছেলেটি 'যমুনা'র ক্যাপ্টেনের, বয়স তার মাত্র বারো ; কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি ও সাহসে সে পঁচিশ বছরের যুবককেও হার মানায়। ঝড়ের রাত্রে সবাই যখন জাহাজ ও নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত, এমন সময় দেখা গেল, ছেলেটি জাহাজের দুটিমাত্র লাইফবোটের একটি খুলে ঝড়ের সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে বসে আছে। ঝড় থেমে যাওয়ার পর হঠাৎ ছেলেটির খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল যে, সবচেয়ে বড়ো মাস্তুলের আগায় উঠে সে বসে আছে। নামিয়ে এনে ধমক দেওয়ায় সে বলল, আমি নতুন দেশ আবিষ্কার করছিলাম।

ঝড়ের পরের দিন রাত্রে হঠাৎ মাঝ সমুদ্রে বারবার জাহাজ থেকে সার্চলাইট জ্বলতে দেখে দু-একজন যাত্রী এসে ক্যাপ্টেনকে কারণ জিজ্ঞেস করল। ক্যাপ্টেন তো অবাক। মাঝ সমুদ্রে—যেখানে অন্য কোনো জাহাজের নামগন্ধ নেই, সেখানে সার্চলাইট জ্বালবার মানে কী? কোন নাবিক এরকম করছে, তার সন্ধান নিয়ে তাকে শাসন করবার জন্যে সার্চলাইট-টাওয়ারে গিয়ে ক্যাপ্টেন দেখেন যে তাঁর ছেলেটি পরমানন্দে সার্চলাইট জ্বালিয়ে সমুদ্রের এধার থেকে ওধার ঘুরিয়ে ফেলছে। তিনি কান ধরে তাকে শাসন করতে যাবেন, এমন সময় চকিত সার্চলাইটের আলোকে একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ায় তিনি ছেলেকে শাসন করার কথা ভুলে নিজেই সার্চলাইট ধরে বসলেন।

সে আলোয় যা দেখা গেল, তাতে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। দেখা গেল যে, জাহাজ থেকে শ-দুয়েক গজ দূরে একটি ছোট্ট ভেলা সমুদ্রের ওপর দুলছে। তার ওপর আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা একটি অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের দেহ। মানুষটি বেঁচে আছে কি না, বোঝা যায় না।

তৎক্ষণাৎ তিনি নৌকো নামিয়ে ভেলাটি ধরে আনবার আদেশ দিলেন। আর তার ফলেই সেই ভেলাতে বাঁধা লোকটির অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার পিঁপড়েদের ইতিহাস যে একটিমাত্র লোকের জানা ছিল, তাঁর উদ্ধার হল।

তিনি সুখময় সরকার। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে মানুষ পালিয়ে আসার পর পাঁচ বছর তিনি সে দেশে কাটিয়েছেন পিঁপড়েদের সঙ্গে। আর মানুষের ভেতর একা তিনিই তাদের সমস্ত ব্যাপার জেনে জীবিত অবস্থায় মানুষের দেশে আবার ফিরতে পেরেছেন। পিঁপড়েদের সঙ্গে তাঁর বাসের কাহিনি তিনি নিজ মুখে যা বলেছেন, তা-ই আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। রায়ো-ডি-জানেইরোর পতনের দিন তিনি নগরের ভেতর একটি ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় অযুত মানুষের আর্তনাদ তাঁর কানে এসে পৌঁছোয়। এখান থেকেই তাঁর বর্ণনা হয়েছে—

'প্রথমে মনে হল, আমাদের সৈন্যেরা বুঝি যুদ্ধজয় করেছে, তাই এই জয়ধ্বনি, কিন্তু

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম—না, এ তো আনন্দধ্বনি নয়, এ যেন সহস্র কণ্ঠের আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। এ শব্দ শুনলে গায়ের ভেতর যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

'তাড়াতাড়ি কী ব্যাপার দেখবার জন্যে নগর-প্রাচীরের কাছে গেলাম ; কিন্তু ওপরে আর উঠতে হল না। দূরে তোরণের ভেতর দিয়ে দেখি—অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে আসছে ; তাদের চলবার ভঙ্গি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু বিস্ময়ের সময় বেশি ছিল না। তাদের পেছন পেছনই দেখি—অগুনতি কালো পিঁপড়ের দল তাদের তাড়া করে আসছে। অসহায় সৈন্যদের পিঁপড়েদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কোনো ক্ষমতাই নেই। তারা এলোপাথাড়িভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে, কিন্তু পিঁপড়েরা অনায়াসে তাদের আঘাত এড়িয়ে একেবারে তাদের মর্মস্থলে ঘা দিচ্ছে।

'নগর-তোরণ পার হয়ে যে কয়জন এসেছিল, তাদের কেউই শেষ পর্যন্তরক্ষা পেল না, একজন মাত্র সৈন্য প্রাণপণ বেগে ছুটে পিঁপড়েদের পেছনে ফেলে আমার কাছ পর্যন্ত এসে পড়েছিল। পিঁপড়েরা তখন আমাদের ধরে ধরে। পিঁপড়েদের হাতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই, বুঝতে পারছিলাম।

'সেইজন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় মনে হল, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু এভাবে হওয়া উচিত নয়! মরতে যদি হয় তো নিজের পরীক্ষাগারের ভেতর নিজের গবেষণা করতে করতেই মরব। তা ছাড়া যে পরীক্ষাটি অসমাপ্ত রেখে এসেছি, পরীক্ষাগারের সকল দরজা-জানলা বন্ধ করে পিঁপড়েদের গতিরোধ করলে তা সমাপ্ত করবার সময়ও হয়তো পেতে পারি।

'তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এই সৈন্য বেচারিকেও তো আমার সঙ্গে নিতে পারি! পেছন ফিরে বললাম, আমার পিছু পিছু এসো। খানিকটা নিরাপদ হতে পারবে। কিন্তু সে আমার গলার আওয়াজ শুনে ভড়কে যেভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল, তাতে মনে হল, আমি যেন অদৃশ্য কোনো একটা পদার্থ। বললাম, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? এসো আমার সঙ্গে।

'কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!

'এ কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না ; কিন্তু তখন সে কথা আলোচনা করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে যখন পরীক্ষাগারে এসে পড়লাম, তখন দুটো পিঁপড়ে আমাদের পিছু পিছু এসে প্রায় ধরে ফেলেছে। সৈন্যটিকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দিয়ে নিজে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারই ভেতরে কিন্তু একটা পিঁপড়ে ইতিমধ্যে আধখানা শরীর ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। দরজার চাপে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আমার ঘরের মধ্যে পড়ল।

'দরজাটা দিয়ে আমার মনে হল, যাই হোক—এখন কিছুক্ষণের জন্যে নিরাপদ হওয়া যাবে। পরীক্ষাগারের সমস্ত জানলা আগে থেকেই বন্ধ ছিল। পিঁপড়েরা ভেঙে না ঢোকা পর্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে কাজ করা যাবে।

'এইবার আমার সঙ্গে যে সৈন্যটি এসেছিল তার দিকে ফিরে বললাম,—মাটির ওপরে যুদ্ধ, তাতেও পিঁপড়েদের কাছে পারা গেল না—কী তাদের এমন ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র?

'লোকটা মেঝের ওপর মাথা নিচু করে বসে ছিল। আমার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ঘরের আলোয় তার চোখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম—চোখের তারার জায়গায় তার রগরগে একটা ক্ষত!

'তারপর তিন দিন পরীক্ষাগারের ভেতর বন্দি হয়ে আছি। সৈন্যটির কাছে যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর যে দুর্দশার কাহিনি শুনলাম তারপর আর কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয়নি। শুধু শান্তভাবে মানুষের নতুন বিজেতাদের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। এখনও কেন পিঁপড়েরা

pathagar.net

আমাদের ধরবার চেষ্টা করেনি, তা বুঝতে পারছি না। আমাদের দরজায় তো সারাক্ষণই প্রহরীর মতো একটি পিঁপড়ে মোতায়েন আছে, দেখতে পাচ্ছি চাবির ফুটোর ভেতর দিয়ে। জানলাগুলো দিয়েও সারাক্ষণই একটা না একটা পিঁপড়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনও অক্ষত দেহে বেঁচে আছি। যারা অজ্ঞাত আলো দিয়ে মানুষকে অন্ধ করবার বিদ্যে আয়ত্ত করেছে, তারা একটা সামান্য দরজা ভেঙে ঢুকতে পারে না, এমন কথা অবশ্য মনেও স্থান দিইনি। তবুও এদের মতলব কী, বুঝে উঠতে পারছি না।

'চতুর্থ দিন কিন্তু সব দুর্ভাবনার শেষ হল। পরীক্ষাগারের ভেতর যা সামান্য খাবারদাবার ছিল, তা একদিনে আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি। সকাল থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে, পিঁপড়েরা না মারলেও উপবাসেই কয়েক দিনের ভেতর আমাদের মরতে হবে। পিঁপড়েদেরও সেই মতলব আছে কি না, বলতে পারি না। এমন করে নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করাও অসহ্য। ভাবলাম, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু তার যন্ত্র হাতে নিয়েই হোক। যে সাধনা আজীবন করে এসেছি, মরবার সময়ে যেন তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারি। এই ভেবে যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের গবেষণায় মন দিয়েছি, এমন সময় দেখি—বন্ধ দরজার কঠিন লোহার মতো কাঠ কী অস্ত্রে জানি না একেবারে মাখনের মতো কেটে যাচ্ছে। চারিধার কাটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা সশব্দে ভেতরে পড়ে গেল। অন্ধ সৈনিকটি সে শব্দে চমকে ভীত হয়ে একধারে সংকুচিত হয়ে গিয়ে লুকোল। আমিও ভয়ংকর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম।

'এক-এক করে ছটি বৃহদাকার পিঁপড়ে আমাদের ঘরে ঢুকল। তাদের এত কাছ থেকে নজর করবার কোনো সুবিধে এতদিন হয়নি। লক্ষ করলাম—একজনের ছাড়া তাদের বাকি সকলের আকৃতি এক। একজনের মাথার আকারটা একটু বৃহত্তর এবং মুখের শুঁড়গুলির রংও একটু আলাদা। কোনোপ্রকার শব্দ বা সংকেত দেখতে বা শুনতে না পেলেও বুঝতে পারলাম যে, তারই আদেশে সব কাজ হচ্ছে। পিঁপড়েদের সর্দার ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে টেবিলের ধারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার পরীক্ষার যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে পড়ে কী দেখল ও কী বুঝল, সেই-ই জানে। আমার পাশেই সেই কদাকার লোমশদেহ কীটটাকে দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এরাই মানুষের মতো প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, এক চাপড়ে এই ঘৃণ্য কীটটার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই। সে ইচ্ছে দমন করেই অবশ্য রেখেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না। এই অতিকায় পিঁপড়েদের গা থেকে এমন একটা উৎকট দুর্গন্ধ বের হয় যে, সে দুর্গন্ধ সহ্য করা কঠিন। পিঁপড়েরা আমার অতি নিকটে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে তাকে ঠেলে দিলাম। ঠেলা যে বিশেষ জোরে হয়েছিল তা নয়, কিন্তু সেই সামান্য ঠেলাতেই সে চারপাক খেয়ে ঘুরে একেবারে বহু দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। মনে হল, এবার আর নয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এদের আর বিলম্ব হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাদের দলপতির এই অপমানে কোনো পিঁপড়েকেই একটুও বিচলিত হতে দেখলাম না। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। তারা যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল। দলপতিও খানিক বাদে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। দেখলাম, তার সামনের একটা পা ওই সামান্য পড়াতেই ভেঙে গিয়েছে।

'দলপতি খাড়া হয়ে উঠেও কোনোপ্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করল না দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। তাহলে এরা কী করতে চায়? কী এদের মতলব? কিন্তু সেকথা ভাববার অবসর বেশি পেলাম না।

'হঠাৎ মনে হল, আমার পা দুটো ধীরে ধীরে যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। সেই অবশতা পা থেকে ক্রমশ আমার দেহের ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করল। সে অবশতার কোনো কষ্ট অনুভব

pathagar.net

করছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল শরীরটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে এসেছে—এখন যেন একটু কোথাও গড়াতে পারলেই বেঁচে যাই। কিন্তু মিনিট-খানেকের ভেতর যখন হঠাৎ মনে হল যে আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ—সমস্ত শক্তিই লোপ পেয়ে আসছে, তখন ভয়ংকর ভীত হয়ে উঠলাম—এ কী ব্যাপার! এই কি মৃত্যু নাকি? ধীরে ধীরে জ্ঞান লোপ পাচ্ছিল। এই আচ্ছন্ন ভাবের বিরুদ্ধে সমস্ত মনের জোর দিয়ে যুদ্ধ করেও সজ্ঞান থাকতে পারছিলাম না। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়বার আগে এই আকস্মিক অবশতার কারণ বুঝতে পারলাম। স্পষ্টভাবে দেখলাম, প্রহরী পিঁপড়েদের একজনের দুটি সামনের পায়ে একটি রেডিয়ো সেটের মতো ছোটো যন্ত্র রয়েছে। তার সামনের দিক থেকে একটা পিচকারির মতো নল উঁচিয়ে আছে ; আর সেই নল দিয়ে একরকম বাষ্প এসে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ পড়েনি, তার কারণও ছিল—সে বিষবাষ্প বাতাসের মতোই বর্ণগন্ধহীন।

'জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমি যেন কোন অতলে নেমে চলেছি। চারিদিকে অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। প্রথমে মনে হল, এই কি মৃত্যুর পরের অবস্থা! পরের মুহূর্তেই একটি উৎকট দুর্গন্ধ নাকে যাওয়ায় সে ভয় দূর হয়ে গেল। উৎকট দুর্গন্ধও যে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারে, আগে তা কখনো ভাবিনি। এখন এই দুর্গন্ধ থেকে বুঝলাম যে আমি বেঁচেই আছি—যদিও পিঁপড়েদের বন্দি। হাত বাড়িয়ে একটি পিঁপড়ের ঠান্ডা গা স্পর্শ পর্যন্ত করলাম। অনেক দূর এই অন্ধকার দিয়ে নেমে গিয়ে হঠাৎ আলো চোখে পড়ল। অনেকটা আমাদের ইলেকট্রিক আলোর মতো ; কিন্তু সেই অলোগুলির চারধারে কোনো কাচের আবরণ নেই, বৈদ্যুতিক শক্তিতেও তা জ্বলে না। পাথরের মতো এক-একটি নুড়ি নানা জায়গায় ছড়ানো, তা থেকেই এই আলো বের হয়। পরে জেনেছি, এই আলো-বিজ্ঞানে পিঁপড়েরা মানুষকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। তাপহীন যে আলো আবিষ্কার করবার চেষ্টায় মানুষের বিজ্ঞান এখনও অক্ষম, পিঁপড়েরা তাই বের করেছে। সেই আলোয় ওপর দিকে একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল, তার মাঝখান দিয়ে তামার একটি রড বসানো। সে রড বেয়েই আমাদের লিফ্‌টের মতো ঘরটি নেমে এসেছে। বুঝলাম, পৃথিবীর ওপরের স্তর থেকে নেমে একরকম পিঁপড়েদের পাতালেই নেমে এসেছি। বড়ো বড়ো খনিতে যেমন দেখা যায়, এখানেও তেমনি—চারধারে অনেক সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সেই সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অসংখ্য পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। সমস্ত সুড়ঙ্গপথটি আলোকিত। সে আলো এত উজ্জ্বল যে, দিন বলে ভ্রম হয়।

'আমার জ্ঞান হলেও হাত-পা তখনও অবশ। আমাকে ঠেলাগাড়ির মতো একটা গাড়িতে পিঁপড়েরা চাপিয়ে দিল। ভাবলাম তারা বুঝি ঠেলেই কোথাও নিয়ে যাবে ; কিন্তু ছেড়ে দেওয়ামাত্র গাড়িটি আপনা থেকেই চলতে আরম্ভ করল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাড়িটাতে না আছে বাষ্পের ইঞ্জিন, না আছে মোটর। প্রথমে এই গাড়ি পিঁপড়েদের বিজ্ঞানের আর এক কীর্তি বলে মনে হয়েছিল কিন্তু পরে এ গাড়ির রহস্য জানতে পেরে না হেসে থাকতে পারিনি। গাড়িটি আমাদের ঘোড়ার গাড়ির জাতভাই, শুধু ঘোড়ার বদলে এ গাড়ি যারা টানে তাদের নাম শুনলে বিস্মিত হবে। এ গাড়ির বাহন গণেশের বাহনের মতো বড়ো বড়ো মেঠো ইঁদুর। অতিকায় পিঁপড়েরা এই একটিমাত্র জানোয়ারকে বশ করেছে ও কাজে লাগিয়েছে। মাটির তলায় আর কোন জানোয়ারই বা তাদের কাজে লাগাতে পারে! এই ইঁদুরগুলিকে কী আশ্চর্যরকম শিক্ষিত তারা করছে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। মানুষ অনেক জানোয়ার বশ করেছে, কিন্তু পিঁপড়েদের ইঁদুর-বাহনেরা যেভাবে—যেরকম বুদ্ধি খাটিয়ে মনিবদের কাজ করে, মানুষের বশ করা কোনো জানোয়ারকে তো সেরূপ করতে দেখিনি। এই ইঁদুর দিয়েই পিঁপড়েরা তাদের ছোটোখাটো সমস্ত কাজ করায়। পিঁপড়েদের গাড়ির তলায় প্রায় গুটি-বিশেক ইঁদুর জোতা থাকে। ওপর থেকে তাদের দেখা যায় না। আদেশ পাওয়ামাত্রই তারা শিক্ষিত ঘোড়ার মতো গাড়িটি

টেনে নিয়ে যায়। আর গাড়ির বেগও বড়ো কম হয় না। মজার কথা এই যে এই মূষিকদের কোনো চালকের প্রয়োজন হয় না, তারা নিজেরাই যেন জানে যে কোথায় থামতে হবে। অন্তত আমার বেলা তো তাই হল। এক জায়গায় গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। সেখানে পিঁপড়েরা আমায় যেভাবে নামিয়ে নিয়ে গেল, তাতে বুঝলাম—তারা আমার আসার কথা আগে থেকেই জেনে প্রস্তুত হয়েছিল। আমাকে তারা যেখানে নিয়ে গেল, সেটি একটি প্রকাণ্ড হলঘরের মতো জায়গা। সুড়ঙ্গটি এখানে চওড়া হয়ে এই আকার নিয়েছে। পিঁপড়েদের নিজস্ব ঘর বলে কিছু নেই। তারা অনেকে মিলে এমনি এক-একটি হলঘরে দরকার হলে এসে বিশ্রাম ও আহারাদি করে। আমাকে হলঘরের একটি কোণে এনে তারা শুইয়ে দিল। তখন আমার ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে শরীরের এমন অবস্থা যে, একটু গড়াতে পারলেই বাঁচি। আমি সেখানে কাত হয়ে পড়লাম। কদিন ধরে অজ্ঞান ছিলাম, জানি না। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পেয়েছিল, কিন্তু সেকথা জানাবই বা কাকে এবং জানালেই বা কী হবে! আমার বন্দি জীবন সেইদিন থেকেই আরম্ভ হল।

'কিন্তু আমি না জানালেও পিঁপড়েরা মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভোলেনি দেখা গেল। পিঁপড়েদের ইঁদুর-ভৃত্যের কথা তখনও জানি না। হঠাৎ বড়ো বড়ো গুটি চার-পাঁচ ইঁদুরকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। ইঁদুরগুলি কিন্তু কোনোরকম বিচলিত না হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি করে জিনিস। সেগুলি নামিয়ে রেখে তারা আবার চলে গেল। সে জিনিসগুলি যে আহার্য, প্রথমে তা বুঝতে পারিনি, কৌতূহলভরে সেগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে একটি জিনিস যেন মুলোর মতো মনে হল। তখন আর ভাববার অবসর ছিল না। অন্য জিনিসগুলি বাদ দিয়ে সেই মুলোর মতো জিনিসটিতে এক কামড় দিলাম। জিনিসটা কোনো গাছের মূলই বটে, কিন্তু স্বাদ তার মুলোর মতো নয়। স্বাদ যে বিশেষ ভালো, তাও বলতে পারি না ; কিন্তু সেদিন তাই-ই অমৃতের মতো লেগেছিল। জিনিসটি রসালো, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই তার দ্বারা কতকটা নিবৃত্ত হল। খাওয়ার পর ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বলতে পারি না।

'তারপর পিঁপড়েদের সঙ্গে যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি, তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য একথা জানি যে, বিশদভাবে জানালেও সেই দীর্ঘ বিবরণ একঘেয়ে লাগবে না। কারণ প্রত্যেক দিনই ওই অদ্ভুত জাতের যেসব নতুন নতুন ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি, মানুষের জ্ঞানের দিক থেকে তাঁর প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ। আপাতত সংক্ষেপে পিঁপড়েদের সমাজ-গঠন প্রভৃতি জানাবার চেষ্টা করব। কেমন করে পিঁপড়েরা ধীরে ধীরে আমায় একটু একটু স্বাধীনতা দিতে শুরু করলে, কেমন করে পিঁপড়েদের নানা ব্যাপার জানবার সুযোগ আমার হল, কেমন করে শেষ পর্যন্ত আমার সেখানে একরকম প্রভাব প্রতিপত্তি পর্যন্ত হল, তার বিশদ বর্ণনা আমি করব না, শুধু পিঁপড়েদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে প্রথম যা প্রয়োজন—অর্থাৎ তাদের ভাষা শিক্ষা—কেমন করে তা আমার হল, তাই একটু জানাব।

'পিঁপড়েরা আমায় তখন স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি যেখানে-সেখানে বেড়িয়ে বেড়াই, সময়মতো আহার পাই ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই। চোখ দিয়ে যেটুকু বোঝবার, তার বেশি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। পিঁপড়েদের কোনোদিন শব্দ করতে শুনিনি, তারা কী করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে, কী করে কাজ চালায় এই ভেবে আমার বিস্ময় লাগে। এমন সময় একদিন কয়েকটি পিঁপড়ে আমার ঘুম ভাঙার পর আমার বিশ্রাম-স্থানে এসে হাজির হল। তাদের ভেতর একটি পিঁপড়ের মাথাটি অত্যন্ত বৃহৎ, দেখে বুঝলাম যে, সে সর্দার-টর্দার হবে। বিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গ-ঘরের নানা জায়গায় তখন অন্যান্য পিঁপড়েদের কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ সবে জেগে উঠেছে। বড়ো মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী দেখল, সেই জানে। দেখলাম তার মুখটা নড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দ সেখান থেকে শুনতে পেলাম না। অনেকক্ষণ

এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে কী আদেশ করলে জানি না, কিন্তু একটি পিঁপড়ে একটি গ্রামোফোনের সাউন্ড-বক্সের মতো যন্ত্র নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। সামনের দু-পা দিয়ে সেই যন্ত্রটি সে হঠাৎ আমার কানে লাগিয়ে দিল ; আমি প্রথমত প্রতিবাদ করে যন্ত্রটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পরে, অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এতদিন বাদে তারা নিশ্চয়ই আসেনি জেনে চুপ করে সব সহ্য করলাম। যন্ত্রটা পরাবার সময় প্রথমটা কানে একটু লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, যেন চারিধারে অদ্ভুত কোনো শব্দ শুনছি। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সামনের দিকে বড়ো-মাথাওয়ালা পিঁপড়েকে মুখ নাড়তে দেখে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এতক্ষণে হঠাৎ তার মুখ থেকে শব্দ শুনতে পেলাম। তার মানে অবশ্য বুঝতে পারলাম না বটে কিন্তু এতদিনে পিঁপড়েদের কথা শুনতে পাওয়ার আনন্দেই তখন আমি বিভোর। মনের আনন্দে নিজেই— সাবাস ভাই বলে ফেলেছিলাম। দেখলাম, আমি কথা বলামাত্র পিঁপড়েটা অমনি একপ্রকার যন্ত্র তার নিজের কানে লাগাল। বুঝলাম, আমাদের শব্দও সে এইভাবে শোনবার চেষ্টা করছে। পিঁপড়েটা তারপর বহুক্ষণ কথা কইল, কিন্তু তার শব্দ শুনতে পেলেও অর্থ বুঝতে না পেরে মনে হচ্ছিল, এমনভাবে শব্দ শুনতে পেয়েই বা লাভ কী? কিছুক্ষণ বাদে পিঁপড়েটা নিজে থেকেই তাদের ভাষা আমায় শিক্ষা দেওয়ার উপায় করে নিল। রাত্রের আহার্যের কিছু কিছু তখনও আমার শয্যাপার্শ্বে পড়ে ছিল, সেইদিকে একটা পা বাড়িয়ে সে একটা শব্দ করল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, খাবার। পিঁপড়েটা পূর্বের মতো শব্দ আরও কয়েকবার করে আমায় বুঝিয়ে দিল যে, খাবারের প্রতিশব্দ পিঁপড়েদের ভাষায় কী হয়।

'এরপর পিঁপড়েদের ভাষা শেখা আমার খুব তাড়াতাড়িই হতে লাগল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই বড়ো-মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমায় কয়েক মাসের মধ্যেই এমন তামিল করে তুলল যে তাদের ভাষা শুধু বোঝা নয়, কতকটা বলতে পর্যন্ত আমি পারলাম। এখন থেকে পিঁপড়েদের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভবপর হল।

'কানের যে যন্ত্রের দ্বারা পিঁপড়েদের ভাষা আমি বুঝলাম, সেইটির এবং কেন পিঁপড়েদের শব্দ মানুষ শুনতে পায় না সে-বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন। তোমরা জান কি না জানি না যে, মানুষের কান দিয়ে যে শব্দ শুনতে পাই, তা ছাড়া আরও অনেক শব্দ পৃথিবীতে হচ্ছে। সে শব্দ এত বেশি তীব্র যে, আমাদের কান তা ধরতেই পারে না। আবার অত্যন্ত ধীর শব্দও আমরা স্বাভাবিক কান দিয়ে ধরতে পারি না। আমরা যে শব্দ শুনি, তা মাঝামাঝি আওয়াজ ; কিন্তু অতিকায় পিঁপড়েদের আর কিছু না থাক, গলার আওয়াজ এমন প্রচণ্ড যে, মানুষের কান তা ধরতেই পারে না। তাই পিঁপড়েদের আমাদের বোবা বলেই মনে হত। আমাদের শব্দ করার শক্তি পিঁপড়েদের মতো প্রচণ্ড নয় বলে আমাদের শব্দও পিঁপড়েদের কানে যেত না। যে যন্ত্র পিঁপড়েরা আমার কানে পরিয়ে দিয়েছিল, সেটিকে শব্দশোধন যন্ত্র বলা যেতে পারে। তার ভেতর দিয়ে পিঁপড়েদের চড়া শব্দ নরম হয়ে আমাদের কানের উপযোগী হয়ে যায় বলেই আমি তাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। আবার আমার মৃদু শব্দও তাদের কানের মতো চড়া করে নেওয়ার জন্যে পিঁপড়েরা নিজেদের কানে অন্যরকম যন্ত্র ব্যবহার করেছিল। সেদিন থেকে সেই যন্ত্রের সাহায্যেই আমাদের কথাবার্তা চলতে শুরু হয়। আমাদের কানের এই রহস্য বুঝে যে বৈজ্ঞানিক পিঁপড়ে এই যন্ত্র আবিষ্কার করে—শত্রু হলেও তাকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

'পিঁপড়েদের সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। সাধারণ ছোটো পিঁপড়েরা কীভাবে বাস করে, তা বোধ হয় তোমরা জান। তাদের ভেতর একজন থাকে রানি। সে-ই ডিম পাড়ে ও তার ডিম থেকেই সমস্ত পিঁপড়ের জন্ম হয়। দু-একটি পুরুষ-পিঁপড়ে ছাড়া আর বাকি সমস্তই পিঁপড়ের রাজ্যে শ্রমিক, তারা রানির জন্যে খেটে মরে মাত্র। অতিকায় পিঁপড়েদের সমাজব্যবস্থা প্রায় একরকমই, শুধু তাদের ভেতর কোনো রানি নেই। তাদেরও অধিকাংশ পিঁপড়ে

শুধু দাসবৃত্তি করে জীবন কাটায়—তাদের না আছে ঘর না আছে স্ত্রী-পুত্র। কিন্তু তাদের উপরে একদল পিঁপড়ে থাকে, পালন-শাসন প্রভৃতি সমস্ত কাজ তারাই করে। তারা পিঁপড়েদের রাজবংশ। তারা কতকটা মানুষের মতো স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে ঘর বেঁধে থাকে। যা কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাজ্য-পরিচালনা, যুদ্ধে নেতৃত্ব—তাঁদের দ্বারাই হয় এবং তাদেরই ছেলেপুলেদের ভেতর যাদের বুদ্ধি অল্প ও ক্ষমতা কম, তাদের ছেলেবেলা থেকেই দাস করে দেওয়া হয়। দাস পিঁপড়েরা বিয়েও করে না, তাদের ছেলেপুলে সংসারও হয় না ; তাই বলে তারা অসন্তুষ্ট নয়—আর তারা উৎপীড়িতও হয় না। পিঁপড়েদের রাজবংশের এক-একটি দম্পতির ছেলেপুলে হয় অসংখ্য। ডিম ফুটে বেরোবার পরই বৈজ্ঞানিকেরা এসে তাদের পরীক্ষা করে যায়। প্রাচীন স্পার্টানদের মতো তাদের ভেতর একেবারে যারা অকর্মণ্য তাদের মেরে ফেলে, অপেক্ষাকৃত নির্বোধদের দাস করে দিয়ে বাকি সব শিশুদের ভেতর কার মাথা কোন দিকে খেলবে, আগে থেকে বুঝে সেইদিকে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। শিশু অবস্থাতেই প্রত্যেকের শক্তি-বিচারের বিদ্যায় পিঁপড়েরা যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, মানুষ তা ভাবতেই পারে না। পিঁপড়েদের ভেতর রাজা নেই। অনেকটা আমাদের গণতন্ত্রের মতো। তাদের রাজবংশের মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে এক সভায় বসে রাজকার্য পরিচালনা করে। সেখানে বিশেষ মতভেদ বা গোলমাল কখনো হয় না, কারণ যার মাথা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ খোলে, সে কখনো রাজনীতিতে মাথা ঘামাতে আসে না।

'পিঁপড়েদের ভেতর বড়োলোক কেউ নেই, গরিবও নেই। যার যা দরকার, রাজভাণ্ডার থেকে সবাই তাই পায়। একদল পিঁপড়ে শুধু এই কাজেই আছে। পিঁপড়েরা কেউ কিছু সঞ্চয় করে না, সুতরাং অর্থ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি সেখানে নেই। যে যার নিজের কাজ করতে পেলেই তারা সন্তুষ্ট।

'কিন্তু জ্ঞানে, বিদ্যায়, সমাজগঠনে তারা বিশেষ অগ্রসর হলেও কলাবিদ্যা তাদের নেই বললেই হয়। রাজবংশের পিঁপড়েদের মাঝেমাঝে কাজের অবসরে একত্র হয়ে নাচের মতো একরকম মজলিশ করতে দেখেছি, এ ছাড়া গান-বাজনা, ছবি-আঁকা বা চৌষট্টি কলার কোনোটিরই তাদের চর্চা নেই।

'স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতি বৃত্তিরও তাদের একান্ত অভাব। তারা শুধু ন্যায় বিচারই জানে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানও তাদের অদ্ভুত।

'এখন কী করে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম, সংক্ষেপে তা বলে এ কাহিনি শেষ করব।

'পিঁপড়েদের ভেতর পাঁচ বৎসর থেকে তাদের ভাষা শিখে তাদের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করা সত্ত্বেও মানুষের সংসর্গের জন্যে মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। শুধু পালানো অসম্ভব জেনেই চুপ করে থাকতাম। একদিন কিন্তু অভাবনীয়রূপে সে সুযোগ এসে গেল। রায়ো-ডি-জানেইরোর কাছে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। একদিন হঠাৎ সে ভূমিকম্প একটু ভীষণভাবে দেখা দিল। ভূমিকম্প হওয়ামাত্র পিঁপড়েদের নিয়ম—নীচের গর্ত থেকে ওপরে, মাটির ওপরে বেরিয়ে যাওয়া। আমি সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমেছিলাম, সেরকম সুড়ঙ্গ সেখানে আরও প্রায় পঞ্চাশটি আছে। ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার বেঁধে পিঁপড়েরা দলে দলে বেরিয়ে পড়তে লাগল। পিঁপড়েদের দলের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। পিঁপড়েরা ব্যস্ত হতে জানে না—শুধু এই ভূমিকম্পেই তাদের যা বিচলিত হতে দেখেছি। এক-এক দল করে লিফটের খাঁচায় ঢুকে আমরা ওপরে উঠে এলাম। অন্যান্য অনেকবার দেখেছি, ওপরে উঠতে না উঠতেই ভূমিকম্প থেমে যায় ; কিন্তু এবারে ভূমিকম্প অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠল। আমাদের দল ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সুড়ঙ্গ পথটি ধসে নীচে পড়ে গেল। চারিদিকে তখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা ; প্রতিমুহূর্তে পায়ের তলার মাটি ধসে পড়তে পারে জেনে পিঁপড়েরা ব্যাকুলভাবে এদিকে-সেদিকে ছুটতে শুরু করেছে।

আমিও প্রাণভয়ে একদিকে ছুট দিলাম। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে তখন ভয়ানক ঝড়ও উঠেছে। সেইসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। খানিকদূর ছোটবার পর দেখলাম—চারিধারে কোথাও কোনো পিঁপড়ের দেখা নেই। এতদিন পিঁপড়েদের সঙ্গে বাস করে তাদেরই সঙ্গী ও সহায় বলে ভাববার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা সত্যিই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ভূমিকম্পে তখন নানা জায়গায় মাটি ফেটে আগুন ও ধোঁয়া বেরোতে আরম্ভ করেছে। পিঁপড়েদের ভাষায় চিৎকার করে ডাকলাম। এই মানুষশূন্য আমেরিকায় একমাত্র পরিচিত পিঁপড়েদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে আমি কোথায় যাব! কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় আমার কণ্ঠের ডাক আপনি থেমে গেল। এই তো মুক্তির সুযোগ! পিঁপড়েরা হাজার ভালো ব্যবহার করলেও চিরদিন আমায় নজরবন্দি করে রাখবে, কোনোদিন মানুষের মাঝে ফিরতে দেবে না। আমি যে তাদের অনেক কথা জানি! হয় মৃত্যু, নয় কোনোরকমে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াই হল আমার উদ্দেশ্য, প্রাণপণে তাই ছুটতে লাগলাম।

'ভূমিকম্প যখন থামল, পিঁপড়েদের ঘাঁটি থেকে তখন আমি অনেক দূর এসে পড়েছি। এইবার আমার খোঁজ পড়বে জেনে ক্লান্ত পদেও আরও এগিয়ে চলতে লাগলাম। আমার একমাত্র মুক্তির উপায় সমুদ্রতীরে পৌঁছে কোনোরকমে ভেলা তৈরি করে সমুদ্রে ভাসা। সে সমুদ্রে যদি মৃত্যুও হয় তবুও ভালো, তবুও তো আকাশের তলায় ফাঁকা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে মরতে পারব! ইঁদুরের মতো মাটির নীচে মরতে হবে না!

'কেমন করে সমুদ্রতীরে পৌঁছে ভেলা তৈরি করে ভেসে পড়েছিলাম ও কেমন করে আমার উদ্ধার হয়, তার কথা সব সংবাদপত্রেই বেরিয়েছে ; সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি করে কাহিনি বাড়াব না।

'পরিশেষে বলতে চাই যে, মানুষ আবার দক্ষিণ আমেরিকা অধিকার করবার আয়োজন করছে—কিন্তু আমার সে আয়োজনের প্রতি আর আস্থা নেই। দক্ষিণ আমেরিকা অধিকার করা তো দূরের কথা, মানুষের বর্তমান অধিকারগুলি এই দুর্ধর্ষ কীটদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই একদিন আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস। পিঁপড়েদের আমি যেরকম করে জানবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে এরকম বিশ্বাস আমরা সহজেই জন্মেছে।'

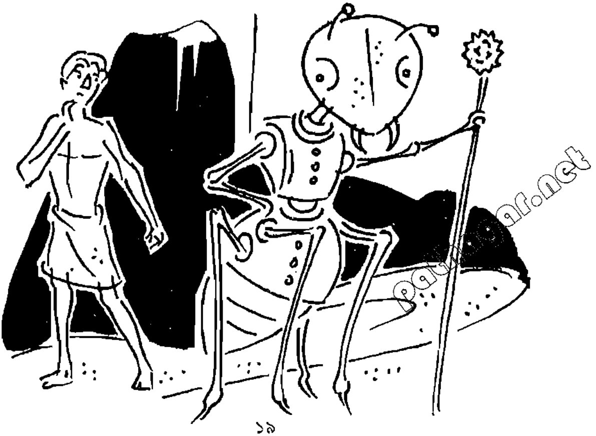

pathagar.net

মঙ্গলবৈরী

১১ই আগস্ট ১৯... বিখ্যাত মার্কিন মহিলা-বৈমানিক হিলডা স্ট্যামাস দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়া থেকে এরোপ্লেনে প্রশান্ত মহাসাগর পার হওয়ার চেষ্টায় সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ।

২২শে জুন ১৯... মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির প্রাত্যহিক বিবরণীতে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্ময়কর সংবাদ—দূরবীক্ষণে একটি অতি পরিচিত গ্রহের চেহারার পরিবর্তন।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯... থেকে ১২ই জানুয়ারি ১৯...—পোল্যান্ডের কাছে জার্মানির ড্যানজিগ দাবি। পোল্যান্ডের ড্যানজিগ সমর্পণে অসম্মতি। অতর্কিতে জার্মানির তিন দিক থেকে পোল্যান্ড আক্রমণ। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের পোল্যান্ডের পক্ষে যোগদান। ইয়োরোপে যুদ্ধের মহাপ্রলয় শুরু। এশিয়ায় সে প্রলয়ের শিখা বিস্তার। চীনজয়ী জাপানের ফরমোজা অধিকার। মার্কিন নৌবহর কর্তৃক জাপানের একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমানঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযান। আমেরিকার বিরুদ্ধে জার্মানি ও জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯... মাত্র কয়েক মাস ব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ নগর যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, কোটি কোটি প্রাণ বিনষ্ট, তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সংবাদ।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯... চীনের সাংহাই নগরে সর্বশক্তির সম্মেলন। সমগ্র পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করবার সংকল্প। পুরাতন লুপ্তপ্রায় সর্ব-জাতিসংঘের নতুনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর নানা স্থানে নতুন অবজারভেটরি স্থাপনের আয়োজন।

১লা মার্চ ১৯... অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে বিস্ময়কর সংবাদ। নতুন জাতিসংঘের আদেশে কোনো জাহাজ বা এরোপ্লেনের সেখানে যাওয়া বা সেখান থেকে আসা নিষিদ্ধ। পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে বিস্ময়, কৌতূহল ও সন্দেহের সূত্রপাত।

১৫ই জানুয়ারি ১৯... নিউগিনি দ্বীপের কাছে একটি অস্ট্রেলিয়ান রণতরীর বেতারযন্ত্রে প্রথম অদ্ভুত বেতার সংবাদ প্রাপ্তি। ক্যাপ্টেনের কৌতূহল। অন্য দুটি ব্রিটিশ রণতরীর সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। বেতার সংবাদের উৎস সন্ধান করতে সামরিক আদেশ অমান্য করে একটি ব্রিটিশ এরোপ্লেনের যাত্রা।

২০শে জানুয়ারি ১৯... ফরমোজার ওপর একটি ব্রিটিশ উড়োজাহাজ জাপানিদের গুলিতে জখম। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্লেনের আহত পাইলট জাপানিদের হাতে বন্দি।

২২শে জানুয়ারি ১৯... জাপান, জার্মানি ও ইতালির রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে গোপন বেতার সংবাদের আদান-প্রদান।

২৮শে জানুয়ারি ১৯... জার্মানি, জাপান ও ইতালির আপনা থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। জাপানের পিড়াপিড়িতে সাংহাই-এ সর্বশক্তি-সম্মেলনের প্রস্তাব।

২০শে মার্চ ১৯... নিউগিনিতে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক দলের অভিযান।

১৮ই ডিসেম্বর ১৯... নতুন তৈরি লাসার মানমন্দির থেকে বিস্ময়কর সংবাদের প্রচার জাতিসংঘ কর্তৃক রোধ।

৪ঠা মে ১৯... বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ; অস্ট্রেলিয়া, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার কল্পনাতীত মহামারীর বিবরণ প্রকাশ ; একতাবদ্ধ সমস্ত পৃথিবীর নূতন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়া।

* * *

pathagar.net

ওপরে এলোমেলোভাবে উলটোপালটা তারিখ হিসাবে সাজিয়ে যেসব ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, তার অধিকাংশই আজকের দিনে সকলের জানা। তবু এই সমস্ত এলোমেলো ঘটনার ভেতর কী গভীর সম্বন্ধ যে আছে, কত বড়ো কল্পনাতীত বিস্ময়কর ব্যাপারের এগুলি যে যোগসূত্র, তা হয়তো এখনও অনেকের সম্পূর্ণভাবে জানা নেই। একটা ভয়ংকর আবছা রহস্যে এ সমস্ত ঘটনা অধিকাংশ লোকের কাছে আবৃত।

এতদিন বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের আদেশে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করাই নিষিদ্ধ ছিল ; কিন্তু পৃথিবীর লোককে আর সংশয়, সন্দেহ ও অস্পষ্ট আতঙ্কের মধ্যে ফেলে রাখা যায় না বুঝেই সে-নিষেধ এখন তুলে নেওয়া হয়েছে। আজ তাই পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সংকটের সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

প্রথমেই ১৯... সালের ২২শে জুন তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি জাহাজে আমাদের ফিরে যেতে হবে। সাধারণ মাল-বওয়া জাহাজ। সেলিবিস থেকে চলেছে ডারুইন বন্দরে।

গভীর রাত্রি। অবজারভেশান ব্রিজে জাহাজের সেকেন্ড মেট প্রৌঢ় মি. ল্যাংডন একা পাহারায় আছেন। পাহারায় থাকবার অবশ্য প্রয়োজন কিছু নেই। তারায় ভরা নির্মেঘ আকাশ, শান্তি-নিথর সমুদ্র। প্রপেলার স্ক্রুর আওয়াজ না থাকলে জাহাজ চলছে বলেই মনে হত না।

প্রৌঢ় মি. ল্যাংডন সেই তারায় ভরা অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে বোধ হয় সুদূর স্কটল্যান্ডের উপত্যকায় তাঁর বাড়ির কথাই ভাবছিলেন। জাহাজের কাজ থেকে তাঁর অবসর নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সারা জীবন সমুদ্রপথে জাহাজেই একরকম তাঁর কেটেছে ; যতখানি উন্নতি তিনি আশা করেছিলেন, তা তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি ; কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো আফশোস নেই, এখন অবসর নিয়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে নিজের বাড়িতে, স্বদেশের মাটিতে কাটিয়ে দিতে পারলেই তিনি খুশি। নাই বা হল খ্যাতি প্রতিপত্তি বা জীবনে উন্নতি! মানুষ কি শুধু উন্নতি আর খ্যাতি হলেই সুখী হয়?

মি. ল্যাংডনের এই চিন্তার জন্যে ভাগ্যদেবী তখন বুঝি অলক্ষ্যে একটু মৃদু হেসেছিলেন। তিনি নিজে না চাইলেও একদিন পৃথিবীর যুগ পরিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত হয়ে থাকবে, কে জানত!

আকাশের তারার দিকে চেয়ে মি. ল্যাংডন যখন স্কটল্যান্ডের স্মৃতি মনের ভেতর স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করছেন, তখন হঠাৎ কল্পনার সূত্র তাঁর সবেগে ছিঁড়ে গেল।

মি. ল্যাংডন বিস্ফারিত নেত্রে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের নাবিক জীবনে তিনি অনেক অসাধারণ দৃশ্যই সমুদ্রপথে দেখেছেন, কিন্তু এমন আশ্চর্য দৃশ্য কখনো দেখেননি।

ব্যাপারটা সাধারণভাবে উল্কাপাত বলেই বোঝাতে হয় ; কিন্তু তাতে তার সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না।

নিস্তব্ধ রাত্রে জাহাজের পাহারায় থাকবার সময় উষ্ণ ট্রপিক সমুদ্রের আকাশে অনেকবার অনেকরকম উল্কাপাত দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে ; কিন্তু এখনকার দৃশ্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

এত বড়ো ও এমন উজ্জ্বল এতগুলি উল্কা একসঙ্গে পড়ার কোনো দৃষ্টান্ত তিনি কখনো শোনেননি পর্যন্ত। উল্কাগুলির সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হল, তাদের পড়ার ভেতর এতটা অপূর্ব শৃঙ্খলা। সেগুলি আতসবাজির মতো কে যেন সুকৌশলে সাজিয়ে সুদূর আকাশ থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

ভালো করে গোনবার অবকাশ না পেলেও মি. ল্যাংডনের মনে হল, সংখ্যায় উল্কাগুলি প্রায় বিশটি হবে। তাদের সবকটির দীপ্তিতে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে অন্ধকার আকাশ একেবারে

pathagar.net

চোখ-ঝলসানো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, মি. ল্যাংডনের মনে হল—আকাশপথে সেই জ্বলন্ত উল্কাঝাঁকের দুরন্ত গতির একটা অদ্ভুত শব্দও যেন তিনি শুনতে পেলেন।

তারপরেই আবার নিস্তব্ধ অন্ধকার। ঘুমের ঝোঁকে স্বপ্ন, না ব্যাপারটা সত্যি দেখেছেন, মি. ল্যাংডনের যে সে-সন্দেহও একবার না হয়েছিল, এমন নয়।

মি. ল্যাংডন পরের দিনই জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রভৃতি আরও অনেককে এই অদ্ভুত উল্কাপাতের কথা জানালেন। নাবিকদের মধ্যে আরও একজন উল্কা না হলেও মধ্যরাত্রের সেই আশ্চর্য আলো দেখেছিল বলে শোনা গেল। জাহাজের 'লগ-বুকে' সে-রাত্রের উল্কাপাতের উল্লেখও রইল।

ব্যাপারটার সমাপ্তি তখনকার মতো একরকম ওইখানেই। মি. ল্যাংডন দেশে ফিরে কোনো এক নগণ্য কাগজে বুঝি এই উল্কাপাতের বিবরণ লিখেছেন। সে বিবরণ কজনেরই বা চোখে পড়েছে! যাদের চোখে পড়েছে, তারাও তার কতটুকু রহস্যই বা আর বুঝেছে!

দীর্ঘ পনেরো বৎসর পরে ১৯...সালের ১১ই আগস্ট দক্ষিণ-আমেরিকার প্যাটাগোনিয়া থেকে দুঃসাহসী মার্কিন মহিলা মিস হিলডা স্ট্যামার্স যদি এরোপ্লেনে প্রশান্ত মহাসাগর পার হওয়ার চেষ্টা না করতেন এবং তারও প্রায় আড়াই বছর বাদে ১৯...সালের ১৩ই জানুয়ারি একটি অস্ট্রেলিয়ান যুদ্ধজাহাজের এক কর্মচারী নিউগিনি দ্বীপের কাছে একটি অদ্ভুত বেতার সংবাদ পেয়ে চঞ্চল হয়ে না উঠতেন, তাহলে এ রহস্যের সময়মতো মীমাংসা করবার সৌভাগ্য মানব জাতির হত কি না সন্দেহ!

সেই যুদ্ধের জাহাজেই এ কাহিনির দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু করা যাক।

* * * *

সমস্ত পৃথিবীতে তখন মহাসমরের প্রলয়শিখা জ্বলে উঠেছে। দলছাড়া একটি অস্ট্রেলিয়ান ডেস্ট্রয়ার জাপানি নৌবহরের ভয়ে সাগরপথের একটি বিপজ্জনক অঞ্চল দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে দলের মধ্যে ফিরে আসবার চেষ্টা করছে। বেতার ঘরের অপারেটারদের কাজের আর বিরাম নেই। ক্ষণে ক্ষণে সেখানে বেতার কোডে দলের জাহাজদের সঙ্গে সংবাদ বিনিময় করতে করতে ডেস্ট্রয়ারটিকে এগোতে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা। একটা বেতার খবর ঠিকমতো না পেলে, একটা নির্দেশ বুঝতে ভুল করলে জাহাজ হয় শত্রুর হাতে, নয় নিউগিনির বিপদসংকুল সমুদ্র-উপকূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

নানা বেতার যন্ত্রের নানারকম সংবাদের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একজন অপারেটার অতি ক্ষীণ একটা সম্পূর্ণ নতুন বেতার সংবাদ পেয়ে চমকে উঠল। এই যুদ্ধের সময়ে এমন সাধারণ কোডে এত ক্ষীণভাবে কোথা থেকে বেতার ডাক পাঠাচ্ছে?

অন্য জরুরি সংবাদ ফেলে এই বেতার ডাকে মনোযোগ দেওয়ার তখন সময় নেই, কিন্তু বেতার অপারেটারের কৌতূহল তখন অদম্য হয়ে উঠেছে। একবার কাজে একটু ফাঁক পেতেই নতুন বেতার ডাকটি সে সম্পূর্ণভাবে ধরবার ব্যবস্থা করলে। ধরবার পর তার বিমূঢ়তা বেড়েই গেল।

এমন অদ্ভুত বেতার সংবাদ কোনো পাগল ছাড়া কেউ পাঠাতে পারে কি?

'নিউগিনির সেপিক নদীর উৎস সন্ধান করে এসো। সমস্ত পৃথিবীর সর্বনাশ আসন্ন—সময় নেই! সময় নেই!!'

এ সংবাদের কোনো অর্থই তো হয় না! অর্থ খুঁজে না পেলেও এ সংবাদের প্রতি উদাসীন থাকা সেই অপারেটারের পক্ষে সম্ভব হল না। প্রথমে সঙ্গী অপারেটারদের এবং পরে জাহাজের ক্যাপ্টেন কম্যান্ডারকে এই অদ্ভুত সংবাদ সে না শুনিয়ে পারল না।

pathagar.net

তাদের জাহাজ তখন শত্রুর এলাকা ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় এসে পড়েছে ; কাছাকাছি দুটি ব্রিটিশ রণতরীর আশ্বাস পেয়ে তখন তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত। এই অদ্ভুত বেতার সংবাদই তখন তাদের প্রধান উত্তেজনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

বেতার সংবাদটি তখনও অনবরত বেজে চলেছে—কোনো মুমূর্ষুর সুদূর আর্তনাদের মতো।

ডেস্ট্রয়ারের কম্যান্ডার ঠিক সাধারণ কেতাদুরস্ত রুটিনসর্বস্ব কর্মচারী ছিলেন না। জাহাজের বাঁধা রুটিনের বাইরে যাওয়ার মতো কল্পনা ও সাহস তাঁর ছিল।

তাঁরই আদেশে নিকটের দুটি ব্রিটিশ রণতরীর মনোযোগ এই অদ্ভুত বেতার সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে জিজ্ঞাসা করা হল— এ সংবাদের কোনো অর্থ তারা বোঝে কি না।

ব্রিটিশ রণতরী দুটির বেতারযন্ত্রেও তখন সে ডাক ধরা পড়েছে ; কিন্তু তারাও এ বিষয়ের কিছু বোঝে না, দেখা গেল। একটি ব্রিটিশ রণতরীর কম্যান্ডার এককালে নিউগিনির ভেতর ভৌগোলিক অভিযানে গিয়েছিলেন, তিনি শুধু এইটুকুই জানালেন যে, নিউগিনির সেপিক নদীর উৎস এখনও সভ্য মানুষের অজানা—সেখানে কোনো সভ্য জাতির লোকের পদার্পণ এ পর্যন্ত হয়নি।

শেষ পর্যন্ত এ সংবাদকে কোনো পাগলের আজগুবি বেতার প্রলাপ ভেবেই হয়তো ছেড়ে দেওয়া হত ; কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের ওপর দৈব নিতান্ত নিষ্ঠুর নয়। ব্রিটিশ রণতরীগুলিতে ডুবোজাহাজ সন্ধানের জন্যে দু-একটি করে এরোপ্লেন রাখবার ব্যবস্থা থাকে। এরোপ্লেনের চালক মি. বেনকে এই বেতার সংবাদ নিয়ে আলোচনা করার খানিক পরে এরোপ্লেন-সমেত আর খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত্রির অন্ধকারে কোনোরকম সরকারি আদেশ না পেয়ে কখন যে তিনি জাহাজ থেকে এরোপ্লেন নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, কেউ জানে না।

বিনা আদেশে নিজের খেয়ালে জাহাজের এরোপ্লেন নিয়ে বার হওয়া সাংঘাতিক অপরাধ। সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর মি. বেনের এই অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেল ; কিন্তু মি. বেন সে শাস্তি নেওয়ার জন্যে শীঘ্র ফিরে আসবেন বলে মনে হল না।

মি. বেনের এরোপ্লেনকে অনুসরণ করেই নিউগিনির গভীর অজানা পার্বত্য অঞ্চলে সেপিক নদীর উৎস-সন্ধানে এখন যাওয়া যাক।

ভোর হয়ে আসছে। এরোপ্লেনের দু-দিকের ডানা প্রভাত সূর্যের আভায় রাঙা হয়ে এল। নীচে নিউগিনির অরণ্য এবং পর্বত তখনও অন্ধকারে ঢাকা। সেখানে তখনও সূর্যের প্রথম আলো পৌঁছোয়নি। গাঢ় অন্ধকারের মাঝে সরু সুতোর মতো একটি অনুজ্জ্বল রেখা শুধু দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। সেইটি সেপিক নদী।

দেখতে দেখতে নীচের অরণ্য-পর্বত ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেপিক নদীর ম্লান রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রুপোর সুতোর মতো। মি. বেন তাঁর এরোপ্লেন খানিকটা নামিয়ে নিলেন। নিউগিনির একেবারে অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের ওপর দিয়ে তাঁর এরোপ্লেন এখন চলেছে। এই অজানা অনাবিষ্কৃত প্রদেশে বেতার সংবাদের রহস্যের মীমাংসা করতে না পারলেও তাঁর অভিযান একেবারে ব্যর্থ হবে না। এখানকার যে বিবরণ তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারবেন, তার মূল্য ভৌগোলিক আবিষ্কারের দিক থেকে কম নয়।

এরোপ্লেন আরও নেমে এল। সেপিক নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে—তার উৎস আর খুব বেশি দূরে নয়। একটা অনুচ্চ পর্বতমালা ইতিমধ্যেই পার হওয়া গেল। সেপিক নদী তার ভেতর দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে।

মি. বেন আরও নীচে নামলেন। জঙ্গলের ভেতর নিউগিনির অসভ্য অধিবাসীদের মাচায় বাঁধা এক-একটি গ্রাম মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য! গ্রামগুলিতে কি মানুষ নেই? এরোপ্লেন সম্বন্ধে অসভ্যদের কী দারুণ কৌতূহল, মি. বেন জানেন ; কিন্তু একটি মানুষেরও তো

কোথাও কোনো চিহ্ন নেই! আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ পেয়েও কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে না আসা তাদের পক্ষে তো স্বাভাবিক নয়!

একটি-দুটি নয়, এক-এক করে অনেকগুলি গ্রামই মি. বেন পার হয়ে গেলেন। সব গ্রামগুলিরই সেই এক অবস্থা।

সেপিক নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। দূরে যে পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে, সেখানেই তার উৎস এবার নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

ভালো করে জায়গাটা সন্ধান করবার জন্যে মি. বেন আরও নীচে নামলেন।

আশ্চর্য! এদেশের অসভ্যদের গ্রামে শুধু নয়, জঙ্গলের গাছপালার ওপরও যেন কী একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে! সমস্ত গাছপালা কেমন যেন নিস্তেজ—নিষ্প্রাণ। পাহাড়ের দেশে নিখুঁতভাবে গোলাকার করে কাটা অনেকগুলি বিরাট জলাশয়ও তাঁর কাছে আশ্চর্য লাগল। এমনভাবে এতগুলি জলাশয় এই অসভ্যদের দেশে কারা কেটেছে?

তখন পাহাড়গুলি অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে। মি. বেন এরোপ্লেন আবার উঁচুতে তোলার জন্যে লিভার টানতে যাচ্ছেন, এমন সময় নীচের একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ল।

বিশাল একটি ভাঙা এরোপ্লেনের পুচ্ছ জঙ্গলের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে।

মি. বেনকে এবার ব্যাপারটার সন্ধান নেওয়ার জন্যে নীচে নামতেই হল। জঙ্গলের ওপর দু-বার চক্কর দিয়ে একটি ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে তিনি এরোপ্লেন নামালেন।

এরোপ্লেন থেকে নামবার পর প্রথমেই যে জিনিসটি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল, সেটি সেখানকার হাওয়ায় একটি অদ্ভুত অপরিচিত গন্ধ। কোনোরকম দুর্গন্ধ তা নয়, তবু কেমন যেন তাতে একটা অস্বস্তি আসে। কোনো বুনো ফুল থেকেই এরকম গন্ধ আসছে মনে করে মি. বেন চারিদিকে ভালো করে তাকালেন ; কিন্তু সেরকম কিছুই দেখতে পেলেন না। কোথা থেকে এই গন্ধ এসে সমস্ত বাতাস ভারী করে রেখেছে বুঝতে না পেরে মি. বেন বিস্মিতভাবেই ভাঙা এরোপ্লেনটির দিকে এগোলেন ; কিন্তু সেখানে যে আরেকটা বিস্ময় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তা তিনি ভাবতে পারেননি।

কাছাকাছি এসে মি. বেন এরোপ্লেনের পুচ্ছের সাংকেতিক চিহ্নগুলি পড়তে পারলেন। এরোপ্লেনটি যে মার্কিন মুলুকের এবং এখানে খুব সম্প্রতি যে সেটি ভেঙে পড়েনি, এটা বুঝতে তাঁর বিশেষ অসুবিধে হল না।

এরোপ্লেনটি যেখানে পড়ে আছে, তার কাছে জঙ্গলের ভেতর ডালপালা ও বুনো ঘাসে তৈরি একটি কুঁড়ে দেখে সেইদিকে এবার তিনি যাচ্ছিলেন। জংলি কোনো লোকের সেখানে দেখা পেলে তার কাছে এই এরোপ্লেন সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ; কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। সেই কুঁড়ের ভেতর থেকে তাঁর নিজের ভাষায় কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আর এগিয়ো না। ওইখানেই থাকো।'

এরকম আশ্চর্য ব্যাপারে একটু হতভম্ব হওয়াই স্বাভাবিক। এই অজানা, অনাবিষ্কৃত দেশে কে ইংরেজিতে কথা কয়? এই ভাঙা এরোপ্লেনের চালক কি এখনও জীবিত? তা যদি হয়, তাহলে নিজের জাতির লোককে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়েও কাছে যেতে নিষেধ করার মানে কী?

খানিক বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মি. বেন আবার কয়েক পা অগ্রসর হলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কুটিরের ভেতর থেকে আরও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ এল, 'বারণ করছি, আর এগিয়ো না! বিপদ আছে!'

নিজের অনিচ্ছাতেই এই আদেশে দাঁড়িয়ে পড়ে মি. বেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বিপদ?'

জবাব এল, 'ক্রমশ সব জানতে পারবে।'

'কিন্তু তুমি কে?'—মি. বেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি...আমি যেই হই না, তোমার তাতে কোনো প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আমি জানতে চাই, তুমিই এখান থেকে অদ্ভুত বেতার সংবাদ পাঠাচ্ছ কি না!'—মি. বেন একটু উষ্ণ হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাহলে বেতার সংবাদ পেয়েই তুমি আমার খোঁজে এসেছ? ধন্যবাদ!'

'ধন্যবাদের দরকার নেই—তোমার পরিচয় দাও।'

'বলেছি তো, তাতে কোনো লাভ নেই। আমি এখন সব পরিচয়ের বাইরে।'

'এসব পাগলামি আমি শুনতে চাই না।' বলে মি. বেন আবার অগ্রসর হলেন।

কুটিরের ভেতর থেকে এবার যেন একটু কাতরভাবেই অনুনয় শোনা গেল, 'না না, এখানে এসো না—আমার পরিচয় আমি দিচ্ছি—আমি হিলডা স্ট্যামার্স।'

হিলডা স্ট্যামার্স! মি. বেন আপনা থেকেই থমকে দাঁড়ালেন। আড়াই বছর আগে আমেরিকা থেকে যে মহিলা-বৈমানিক প্রশান্ত মহাসাগর পার হতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হন, সেই হিলডা স্ট্যামার্স এখনও এখানে জীবিত! নাঃ, এ যে বিশ্বাস করা যায় না! মি. বেন অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যদি হিলডা স্ট্যামার্স হও, তাহলে আমায় দেখা দিতে তোমার আপত্তি কীসের? এখান থেকে ওরকম অদ্ভুত বেতার-সংবাদ পাঠাবারই বা উদ্দেশ্য কী?'

'সবই বলছি একে-একে—বলবার জন্যেই আমি বেঁচে আছি ধৈর্য ধরে।'

'কিন্তু তার আগে আমি তোমায় দেখতে চাই।'—বলে, মি. বেন এবার জেদ করে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেখান থেকে আরেকবার কাতর অনুরোধ এল, 'দোহাই তোমার, এখানে এসো না!'—তারপর একটা ভয়ের চিৎকার শোনা গেল।

সে চিৎকার মি. বেনের। সত্যি, এমন দৃশ্যের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের দেহের যে এমন বিকৃতি হতে পারে, এ তাঁর কল্পনাতীত ছিল! তিনি যা দেখলেন, তা সুন্দরী হিলডা স্ট্যামার্স নয়, একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন! মানুষের দেহকে রবারের বেলুনের মতো অসম্ভবরকম ফাঁপিয়ে তুললে যে একটা আকারহীন কুৎসিত বস্তু হতে পারে—এ তার চেয়েও বীভৎস। হাজার হোক মোটা লোকের দেহের মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু এই স্ফীতি একেবারে অস্বাভাবিক—অবিশ্বাস্য ব্যাধি! তা দেখলেই যেন একটা আতঙ্ক আসে। একটা বিশাল কুৎসিত বর্তুলের মাঝে দুটি চোখ আর মুখের একটু চিহ্ন ছাড়া মানুষের দেহের সঙ্গে তার আর কোনো মিল নেই।

মি. বেন চিৎকার করেই কুটিরের দরজা থেকে বাইরে ছুটে এলেন। কীসের লজ্জায়, কেন যে হিলডা স্ট্যামার্স তাঁকে দেখা দিতে চায়নি, কেন যে বারবার কুটিরের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্যে সে কাতর অনুরোধ জানিয়েছে—তা বুঝতে তাঁর আর বাকি নেই। বেশ একটু কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বাইরে থেকে বললেন, 'কেমন করে তোমার এ অবস্থা হল, আমি বুঝতে পারছি না!'

ভেতর থেকে বেশ একটু বিলম্বে মৃদু স্বরে জবাব এল, 'সেই কথাই বলছি। মরবার আগে পৃথিবীর এই উপকারটুকু করে যেতে পারলে আমার মনে কোনো আফশোস থাকবে না।'

* * * *

মি. বেন নিউগিনির অজানা, অনাবিষ্কৃত প্রদেশে নিরুদ্দিষ্ট হিলডা স্ট্যামার্সের কাছে কী মূল্যবান আশ্চর্য সংবাদ সংগ্রহ করলেন, তার বিবরণ ভালো করে দেওয়ার জন্যেই ২০শে জানুয়ারি তারিখে ফরমোজা দ্বীপের ওপর যে ব্রিটিশ উড়োজাহাজটি জাপানিদের গোলায় জখম হয়ে পড়ে যায়, তার প্রসঙ্গে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই ব্রিটিশ উড়োজাহাজের চালক

pathagar.net

আর কেউ নন—মি. বেন। নিউগিনি থেকে তিনি সোজা ইয়োরোপের উদ্দেশ্যেই চলেছিলেন। মাঝপথে এই বিপদ।

এখানেও দৈব যেন পৃথিবীর মানুষের সহায়। জাপানিদের গোলায় জখম হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত এরোপ্লেনের সঙ্গে মি. বেন মারা গেলে মানুষ তার চরম পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সময় পেত কি না সন্দেহ ; কিন্তু মি. বেন সে-যাত্রা প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে জাপানিদের হাতে বন্দি হলেও প্রাণে বেঁচে গেলেন।

যেসব জাপানি কর্মচারীদের কাছে মি. বেনকে তারপর নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের তিনি কী বলেছিলেন, নিজের কথার কী প্রমাণই বা তিনি দিয়েছিলেন, তাঁর সেকথা কীভাবে উপরওয়ালা থেকে উপরওয়ালা, তাঁর কাছ থেকে একেবারে জাপানের খোদ রাষ্ট্রনেতাদের কাছে পৌঁছোয়, তার বিস্তারিত বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই। এইটুকু শুধু এখানে জানলেই যথেষ্ট যে, সামান্য একজন বন্দি বৈমানিকের কথায় হঠাৎ সেদিন পৃথিবীর তিনটি প্রধান রাষ্ট্র নিজে থেকেই প্রতিপক্ষের কাছে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিল। সে প্রস্তাব যে ব্যর্থ হয়নি, যুদ্ধে মত্ত হয়েও মানুষ তার শুভ বুদ্ধি যে তখনও একেবারে খুইয়ে বসেনি, ১৯...সালের ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারিতে সাংহাই-এ সর্বশক্তি-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনই তার প্রমাণ। সে অধিবেশন সম্পূর্ণ গোপনেই বসে। পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনায়ক ছাড়া একমাত্র মি. বেনের সে অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সে অধিবেশন চিরস্মরণীয়। সেই অধিবেশনেই নিখিল জাতিসংঘকে আবার নতুন করে বিশেষ কয়েকটি ক্ষমতা দিয়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেই অধিবেশনেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে মি. বেনের দেওয়া আশ্চর্য সংবাদ সম্বন্ধে সন্ধান নিতে নিউগিনিতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিকদলের অভিযান নিউগিনি থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই জাতিসংঘ অবশ্য একেবারে কায়েমি হয়নি। কারণ তখনও এই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহ করবার লোকের অভাব ছিল না। ফ্রান্সের বিখ্যাত সেনাপতি মার্শ্যাল রেনো বিশেষ করে এই জাতিসংঘের গোড়া থেকে বিরোধী ছিলেন। সন্ধান শেষ করে নিউগিনি থেকে বৈজ্ঞানিকদলের ফিরতে যত দেরি হচ্ছিল, ততই তিনি দেশকে এই জাতিসংঘের কল্পনার বিরুদ্ধে আরও উত্তেজিত করে তুলছিলেন। ১৯... সালের ২৩শে জুলাই তারিখে জাতিসংঘের বৈঠকে দাঁড়িয়েই তিনি সংঘকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করলেন না।

যে জাতিসংঘ একবার ব্যর্থ হয়েছে, তাকে আবার গড়ে তোলবার চেষ্টা যে বৃথা, কয়েকজন ক্ষমতালোভী স্বার্থপর লোকের চক্রান্ত ছাড়া ওটা যে আর কিছু নয়, মি. বেনের মতো একজন নগণ্য বাতুল বৈমানিকের আজগুবি কাহিনিটি বিশ্বাস করে তাঁরা যে মূঢ়তার চরম পরিচয় দিচ্ছেন, এইসব কথা উত্তেজিতভাবে যখন তিনি অন্য সভ্যদের বোঝাচ্ছেন, তখন শুভ্রকেশ এক প্রৌঢ় জাপানিকে ধীরে ধীরে সভায় ঢুকতে দেখা গেল।

প্রৌঢ় জাপানিকে দেখেই সভার সকলে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চঞ্চল হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ বৃদ্ধ আর কেউ নন—নিউগিনির অভিযানের নেতা স্বয়ং ডা. সানুচি। ডা. সানুচিকে একা এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে দেখে সমস্ত ব্যাপার জানবার জন্যে সকলেই তখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ; কিন্তু মার্শ্যাল রেনোর তখনও থামবার কোনো লক্ষণ নেই। বক্তৃতার মাঝেই ডা. সানুচিকে ব্যঙ্গ করে তিনি বললেন, 'নিউগিনি থেকে পৃথিবীর কী ভয়ংকর বিপদের আভাস পেলেন ডা. সানুচি, অনুগ্রহ করে আমাদের বোঝাবেন কি?'

সৌম্যমূর্তি ডা. সানুচি এবার দাঁড়িয়ে উঠে হেসে বললেন, 'তা বোঝাতে পারব বলেই আশা করি ; কিন্তু তার আগে একটা কথা বোধ হয় জানানো দরকার। পৃথিবীর বিপদ নিউগিনি থেকে নয়, তার চেয়ে অনেক দূর থেকে আসছে।'

'নিউগিনির চেয়েও দূর!'—মার্শ্যাল রেনো একটু বিস্ময়ের স্বরেই বললেন, 'সে আবার কোন জায়গা?'

ডা. সানুচি আবার একটু ম্লানভাবে হাসলেন। বললেন, 'পৃথিবীর কোনো জায়গা সে নয় মার্শ্যাল রেনো, পৃথিবীর বিপদ এবার মঙ্গলগ্রহ থেকে।'

মার্শ্যাল রেনো এবার আরও জোরে হেসে উঠলেন, 'মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী আক্রমণ করবে নাকি?'

'করবে নয় মার্শ্যাল, আঠারো বছর আগে করেছে।'

শুধু মার্শ্যাল রেনো নয়, সভার অন্য সকলকেও এবার বিস্মিত—বিচলিত হতে দেখা গেল। ডা. সানুচি বলেন কী! নিউগিনি ঘুরে এসে তাঁর মাথা খারাপ হল নাকি!

সভার মনোভাব অনুমান করেই ডা. সানুচি বললেন, 'আমার কথা সহজে বিশ্বাস করবার মতো না হলেও একান্ত সত্য। নিউগিনিতে বিশদভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করে এবং তার সঙ্গে গত ত্রিশ বৎসরের সমস্ত জ্যোতির্বিদদের বিবরণী মিলিয়েই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। আজ থেকে আঠারো বছর আগে মঙ্গলগ্রহ আমাদের পৃথিবীর বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। ১৯...সালের ২২শে জুন মাউন্ট উলিসন অবজারভেটরি থেকে যে উল্কাপাতের বিবরণ বেরোয়, একটি মাল-বওয়া জাহাজের সেকেন্ড মেট মি. ল্যাংডন যে উল্কাপাতের বিবরণ একটি নগণ্য কাগজে প্রকাশ করেন, তা এই অভিযানেরই প্রমাণ।'

'অভিযানটা কিন্তু বড়ো নিরীহ-গোছের মনে হচ্ছে', মার্শ্যাল রেনো ব্যঙ্গ করে বললেন, 'অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য সামন্ত কিছুই তো দেখছি না!'

ডা. সানুচি হাসলেন, 'কোনো রোগীর ঘর জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে শোধন করতে আপনি কি কামান-বন্দুক ব্যবহার করেন মার্শ্যাল রেনো?'

'ফিনাইল কি ক্লোরিনের মতো ওষুধ থাকতে কামান-বন্দুক ব্যবহার করব কেন?' মার্শ্যাল একটু চটেই জবাব দিলেন।

ডা. সানুচি বললেন, 'মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবী শোধনের জন্যে তেমনি ব্যবস্থাই হয়েছে মার্শ্যাল রেনো। তাদের কাছে আমরা পৃথিবীর নগণ্য কীটমাত্র। অস্ত্রশস্ত্রের বদলে তাই তারা পৃথিবী শোধনের এমন ওষুধ প্রয়োগ করেছে, যা আমাদের পক্ষে মারাত্মক বিষ। এই মারাত্মক বিষেই সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে।

ডা. সানুচি তারপর বিস্তারিতভাবে তাঁর দলের গবেষণার ফল সভার সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। আঠারো বছর আগে মি. ল্যাংডন যে আশ্চর্য উল্কার ঝাঁক দেখেছিলেন, সেগুলি সত্যি উল্কা নয়, মঙ্গলগ্রহের অজানা অধিবাসীদের ছোঁড়া একরকম আশ্চর্য হাউইগোলা। বৃহৎ উল্কার মতো সে গোলা নিউগিনির ওপর এসে পড়ে ফেটে যায়। মি. বেন সেখানে যে অদ্ভুত গোলাকার জলাশয়গুলি দেখেছিলেন, সেগুলি এই বিরাট গোলার আঘাতেই তৈরি। হ্রদগুলির ভিতর সেই গোলার খোলসের অনেক টুকরো ডাক্তার সানুচি ও তাঁর সঙ্গীরা পেয়েছেন। এই গোলাগুলির ভেতর পৃথিবীর সম্পূর্ণ অজানা একজাতীয় বিষাক্ত উদ্ভিদের বীজ এমনভাবে ভরা ছিল, যাতে গোলাগুলি ফেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। মাটিতে পড়ার পর সেই বীজগুলি থেকে অনেক বিষাক্ত উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। বহুদিন ধরে সেই উদ্ভিদগুলি বেড়ে ওঠে—নিউগিনির অধিকাংশ স্থানই এখন তারা ছেয়ে ফেলেছে। মি. বেন নিউগিনিতে নেমে যে অজানা গন্ধ পেয়েছিলেন, তা এই বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকেই বেরিয়েছে। মাটির সঙ্গে শ্যাওলার মতো লেগে থাকে বলে মি. বেন তখন এ উদ্ভিদের কোনো খোঁজ পাননি। তবে, এই উদ্ভিদের বিষাক্ত গন্ধেই যে মানুষের সর্বনাশ, একথা তিনি হিলডা স্ট্যামার্সের কাছে শুনেছিলেন। নিশ্বাসের ভেতর দিয়ে রক্তে মিশে এই বিষ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর নিদারুণ সর্বনাশ করে। প্রথমে দেহ, পরে বুদ্ধি ও মন ক্রমশ এই বিষের ক্রিয়ায় বিকৃত, বিকল হয়ে যায়।

হিলডা স্ট্যামার্স প্রশান্ত মহাসাগর পার হতে গিয়ে এই অজানা প্রদেশে এরোপ্লেন ভেঙে পড়ে যান। তারপর সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করবার সময় সেখানকার অসভ্য জাতিদের দুর্গতি দেখে এই ভয়ংকর সত্য তিনি আবিষ্কার করেন ; কিন্তু তখন তিনি নিজেই এই বিষে আক্রান্ত। এই বিষ হাওয়ার সঙ্গে মিশে সমগ্র পৃথিবীর কী সর্বনাশ করতে পারে তা বুঝে তিনি একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়বার আগে কোনোমতে এরোপ্লেনের বেতার সেটটি মেরামত করে কাজের যোগ্য করে নেন। তারপর হতাশভাবে বহুদিন ধরে তিনি শুধু পৃথিবীর মানুষকে এই বিষয়ে সাবধান করবার চেষ্টা করেছেন।

পৃথিবীর মানুষ তাঁর বেতার সংবাদে সাবধান হওয়ার চেষ্টা যখন করল, তখন কিন্তু সর্বনাশের সূত্রপাত হয়ে গেছে। পৃথিবীর মানুষের নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম এই বিশ্বব্যাপী বিপদের মুখে থামল বটে, কিন্তু এই বিষাক্ত হাওয়ার গতি রোধ করা গেল না। নিউগিনি থেকে নানাদিকে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় ও সেখান থেকে সমস্ত চীন এবং দক্ষিণ আমেরিকার এই বিষাক্ত উদ্ভিদের বীজ ও তার আনুষঙ্গিক রোগ দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। জাতিসংঘ বহুদিন পর্যন্ত সাধারণের আতঙ্ক নিবারণ করবার জন্যে এ খবর চেপে রেখেছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হল না। অস্ট্রেলিয়া, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকা ক্রমশ শ্মশান হয়ে গেল। সেখানে মঙ্গলগ্রহের বিষাক্ত উদ্ভিদের বিষে ভারাক্রান্ত বাতাস মানুষের নিশ্বাস নেওয়ার পক্ষে একেবারে অযোগ্য। অন্যান্য দেশে এ বিষ যাতে ছড়াতে না পারে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রাণপণে এখন তার চেষ্টা করছেন। সে চেষ্টায় অনেকটা সফল হলেও আমাদের খুব বেশি আশান্বিত হওয়ার কিছু আছে কি?

সুদূর মঙ্গলগ্রহ থেকে যারা এরকম কল্পনাতীত উপায়ে পৃথিবীতে মৃত্যু-বিষ পাঠাতে পারে, তাদের বুদ্ধি ও কৌশল যে অসামান্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আর কারো নেই। একবার ব্যর্থ হয়ে তারা যে হাল ছেড়ে দেবে, তা মনে হয় না। তাদের দ্বিতীয় আক্রমণের পদ্ধতি যে কী হবে, তাও আমাদের ধারণার অতীত। সশঙ্কভাবে শুধু আমারা পৃথিবীময় নানান জায়গায় মানমন্দির বসিয়ে মঙ্গলগ্রহের দিকে অত্যন্ত জোরালো অসংখ্য দূরবীক্ষণ লাগিয়ে বসে আছি। শত্রুর আক্রমণ কবে কীভাবে যে আসবে, কিছুরই স্থিরতা নেই। সে আক্রমণে হয়তো পৃথিবী থেকে আমরা লুপ্তও হয়ে যেতে পারি।

এই পৃথিবী-জোড়া বিপদের দিনে এইটুকুই শুধু আনন্দের কথা যে, মানুষের দেশ, বর্ণ ও জাতিগত সমস্ত ভেদ হঠাৎ একনিমেষে যেন মন্ত্রবলে দূর হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী আজ একতাবদ্ধ। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরার মূর্খতা এতদিনে মানুষ বুঝতে পেরেছে।

আকাশের আতঙ্ক

আজকাল খবরের কাগজের দিনে আমরা নিত্যনতুন বিস্ময়কর খবর শুনতে শুনতে কীরকম মিথ্যা উত্তেজনার মধ্যে যে বাস করি—একদিন যে খবর আমাদের অবাক করে দেয় পরের দিন আরও বিস্ময়কর ঘটনায় সে খবর কেমন অনায়াসে আমাদের মনে চাপা পড়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

বেশি দূরে যেতে হবে না। ১৯... সালের বৈশাখ মাসের কথা। খবরের কাগজগুলো একদিন স্যার চিরঞ্জীব রায়ের অবিশ্বাস্য ভয়ংকর খুনের মামলা নিয়ে তুমুল হইচই বাধিয়ে তুলেছিল। হপ্তাখানেক ধরে খবরের কাগজে আর অন্য কথাই বুঝি ছিল না। সোজা কথা তো নয়! স্বয়ং স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ। স্যার চিরঞ্জীব ইদানীং একটু যেন কেমন অবশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মস্তিষ্ক বিকৃতির একটা গুজব চারিধারে শোনা যেতে আরম্ভ করেছিল ; কিন্তু তা বলে এতটা কেউ কি কল্পনাও করতে পারে! তাঁর পূর্ব কীর্তির কথা তখনও তো লোকে ভোলেনি। স্যার উপাধির দ্বারা তো তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় বাংলার বরপুত্র ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে। পৃথিবীর শৈশবাবস্থার সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের খোঁজে মধ্য এশিয়ায় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে অভিযানের অসামান্য সার্থকতায় সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। বাংলা থেকে এরকম অভিযান যে হতে পারে, তা কেউ আগে ভাবতে পারেনি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রাণীতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার জন্যে নিউগিনির অনাবিষ্কৃত প্রদেশে। সে অভিযানের ফলে প্রাণীবিদ্যা আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ বুঝি দেখা দেয়। তাঁর অদ্ভুত সব নতুন মতামত শুনে বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁর মাথা ঠিক আছে কি না সন্দেহ প্রকাশ করে। স্যার চিরঞ্জীব চিরদিন অত্যন্ত অহংকারী প্রকৃতির। খ্যাতির শিখরে যতদিন তিনি আরূঢ় ছিলেন, ততদিন তাঁর প্রতিভার খাতিরে এ অহংকার সকলে নিঃশব্দে সহ্য করেছে ; কিন্তু তাঁর মানসিক দুর্বলতার পরিচয় যেদিন তাঁর অদ্ভুত কথাবার্তা ও মতামতের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগল, সেদিন কেউ কেউ যে আগেকার আক্রোশের শোধ নিতে ছাড়ল না, একথা বলাই বাহুল্য। কাগজে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করে অনেক প্রবন্ধও বেরোল। প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত এক ডাইনোসরের পিঠে চড়ে স্যার চিরঞ্জীব শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই ব্যঙ্গচিত্রটি তখনকার দিনে বিশেষ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। ব্যঙ্গচিত্রটি অকারণে আঁকা হয়নি। বুদ্ধিভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে চিরঞ্জীবের অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছিল যে, মেসোজোইক যুগের সরীসৃপের কঙ্কাল বলে বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলি লক্ষাধিক বছরের পুরোনো মনে করেন, সেগুলি নাকি অত পুরোনো মোটেই নয়। তিনি নাকি এমন সব ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন, যেগুলিকে আধুনিক কালের বলে নিশ্চিত বোঝা যায়। তা ছাড়া তাঁর মতে সরীসৃপ বংশ নাকি এখন একেবারে লুপ্ত হয়নি।

নানাদিক থেকে আঘাত খেয়ে আহত অভিমানের জন্যেই কি না বলা যায় না, স্যার চিরঞ্জীব শেষাশেষি একেবারে নিঃসঙ্গই থাকতে আরম্ভ করেছিলেন। শহরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নির্জন বিশাল বাড়ির পরীক্ষাগারের বাইরে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যেত না। নিজেকে যেন তিনি সেখানে জীয়ন্ত কবর দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কোনো কাগজ মজা করবার জন্যে বা অনুগ্রহ করে তাঁর যে দু-একটা লেখা ছাপত, তাতেই তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। সে-সমস্ত লেখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেত, তাতে শত্রুপক্ষ

pathagar.net

হাসলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সমাজ এত বড়ো মনীষীর এমন পতনে বেদনাই অনুভব করতেন। কিন্তু ঘরে বসে আজগুবি সব ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা এক কথা, আর মানুষ খুনের দায়ে আসামি হওয়া আরেক কথা। একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সে ঘটনার কথা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। শুধু সাধারণ হত্যা সে তো নয়, তার ভেতরে যে উন্মত্ত পৈশাচিকতার পরিচয় ছিল, তাতেই সকলে বেশি স্তম্ভিত হয়ে গেছল। স্যার চিরঞ্জীবের নির্জন বাগান বাড়িতে হঠাৎ একদিন তাঁর একটি ভৃত্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে সে খুন হয়নি। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অমন নৃশংসভাবে নরহত্যা কেউ করতে পারে না। চাকরটির দুটি চোখ ওপড়ানো, এবং তার সর্বাঙ্গের আঘাত দেখে মনে হয়, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন তার সারা গায়ের মাংস উন্মত্তভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।

স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সবেচেয়ে সন্দেহের কারণ এই যে, তাঁকে যখন ধরা হয়, তখন তিনি দমদম থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে পালাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করলে তাঁকে ধরতেই পারত না। এরোপ্লেনে তিনি উঠে বসে চালাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় পুলিশ দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে তাঁকে ধরে। পুলিশের আদেশেও প্রথমে তিনি নামতে রাজি না হয়ে তাদের সামনেই প্রপেলার চালিয়ে দিয়ে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ অফিসার তখন গুলি করে তাঁর প্রপেলার ভেঙে দিয়ে তাঁকে থামায়। এরোপ্লেনে তাঁর সঙ্গে একটি বন্দুকও পাওয়া গিয়েছিল।

এরোপ্লেন থেকে নামবার পরও তাঁর রোখ কমেনি। পুলিশের লোককে যা নয় তা বলে গাল দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জেদ করেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে কিছুই তিনি বলতে চান না। তাঁর চাকরের হত্যা সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। মস্তিষ্ক-বিকৃতির পর তাঁর অহংকারী প্রকৃতি যেন আরও উগ্র হয়েছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তাঁকে যখন অকারণে ধরে অপমান করা হয়েছে, তখন তাদের কোনো কথার আর তিনি জবাব দেবেন না।

এই বিখ্যাত নরহত্যার মামলা আদালতে ওঠার পর কয়েকদিন পর্যন্ত খবরের কাগজগুলির উত্তেজনার আর অবধি ছিল না। মানুষের মুখে মুখেও এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে নানান অতিরঞ্জিত আজগুবি খবর তখন ফিরেছে।

তারপর এই রোমাঞ্চকর হত্যার খবর কোথায় যে গেল তলিয়ে, কেউ তার সন্ধানও রাখলে না। দার্জিলিঙের বিমান-ডাকের ভয়ংকর রহস্য তখন মানুষের মন ও সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে বসেছে। তখন সবে কলকাতা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এরোপ্লেনে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ডাকবাহী বিমানপোত আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘন টেরাই-এর জঙ্গলে ভাঙা এরোপ্লেনটির সন্ধান যদি বা মিলল, তার চালকের কোনো পাত্তা নেই। কেমন করে যে এরোপ্লেনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তার কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হল না।

শুধু এই ব্যাপারেই শেষ হলে হয়তো সাধারণের আতঙ্ক এত বেশি হত না ; কিন্তু এ ব্যাপারের রহস্য আরও গভীর হয়ে উঠল পরের ঘটনায়। একজন ইংরেজ বিমানবীর জলপাইগুড়ি থেকে এরোপ্লেনে কলকাতা আসছিলেন তার পরের দিন ভোরের বেলা ; কিন্তু যাত্রা করবার খানিক বাদেই তাঁর এরোপ্লেনটিও অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ে তিস্তা নদীর ওপর। তিস্তার অনেক জেলে নৌকো থেকে তাঁর পড়ার দৃশ্য দেখেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে, ভোরের আগে আবছা অন্ধকারে তারা চোখে ভালো না দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে মাতালের মতো পাক খেতে খেতে নামতে থাকে। নীচে নেমেও এরোপ্লেনটি আরেকবার ওপরে গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো উঠেছিল ; কিন্তু বেশিদূর

pathagar.net

নয়। তারপর সশব্দে তিস্তার জলে সেটি ভীষণ বেগে এসে পড়ে। এবারে এরোপ্লেনের ভেতর ইংরেজ চালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সমস্ত মুখ ক্ষত-বিক্ষত এবং একটি চোখ খোবলানো।

এই ভয়ংকর খবর বাসি হতে না হতেই পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, দার্জিলিং থেকে সন্ধ্যায় ফেরার সময় আরেকটি ডাকবাহী বিমানপোত টেরাই জঙ্গলের ওপর পূর্বদিকের আকাশপ্রান্তে দুটি অদ্ভুত আকারের বিমানপোত দেখেছে। ভালো করে লক্ষ করবার আগেই সেগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই রহস্যময় দুটি অজানা বিমানপোতের খবরে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, আই. এন. এ. অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজের জানিত কোনো এরোপ্লেন সেদিন ওদিকে যায়নি। তা ছাড়া বিমান-ডাকের চালক যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল, সে ধরনের বিমানপোত ভারতের কোথাও নেই।

নতুন এই আতঙ্কের হুজুগে চিরঞ্জীব রায়ের মামলা কোথায় চাপা পড়ে গেল, কে জানে। খবরের কাগজের কোণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লোকের বোধ হয় আর চোখেও পড়ে না।

প্রত্যেকে আমরা তখন খবরের কাগজ খুলেই এরোপ্লেন রহস্যের সংবাদ রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করি ; প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এ রহস্যের ওপর নতুন কোনো আলোকসম্পাত হল কি না তা জানবার আশায়।

হাজার রকমের গুজব ও আলোচনা চারিধারে চলতে থাকে। এই অদ্ভুত অজানা বিমানপোত দুটি কাদের? যে দুটি এরোপ্লেন আশ্চর্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের ভেঙে পড়ার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক আছে কি না? আপাতত কোনো দেশের সঙ্গে যখন আমাদের কিংবা কারুর যুদ্ধ বা বিরোধ নেই, তখন এমনভাবে কারা নিরীহ আকাশপথের যাত্রীদের আক্রমণ করছে? তাদের উদ্দেশ্যেই বা কী? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই কেউ দিতে পারল না। শুধু চারিধারে আতঙ্কই বেড়ে যেত লাগল।

আই. এন. এ. বাধ্য হয়ে বাংলার উত্তরাঞ্চলে রাত্রে এরোপ্লেন চালানো নিষেধ করে দিল, কারণ দেখা গেল যে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা রাত্রে ওই অঞ্চলেই ঘটছে। ডাকবাহী বিমানপোত ও ইংরেজ চালকের এরোপ্লেনের পর আরও তিনটি এরোপ্লেন ওই অঞ্চলে রাত্রে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশ আরোহীর পাত্তা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেও দেখা গেছিল তাদর দেহ ছিন্নভিন্ন।

শুধু আকাশপথের এরোপ্লেনই নয়, সাধারণ লোকও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ। রংপুরের একটি গ্রামের রাস্তায় একদিন সকালে একজন চাষির ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সে তার হারানো বলদের খোঁজে রাত্রে বাইরে বেরিয়েছিল। অনেকে অবশ্য এ ব্যাপারটির সঙ্গে রহস্যময় এরোপ্লেনদুটির কোনো সংশ্রব আছে তা স্বীকার করতে চান না ; কিন্তু সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ বলে যে, সেদিন রাত্রে আকাশে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ সে শুনেছিল।

সত্য-মিথ্যা নানারকম খবর এইবার রটতে থাকে। হুজুগের দিনে খবরের কাগজগুলি বাচবিচার না করে তার সবগুলিকেই প্রায় স্থান দেয় নিজের পাতায় ; আমাদের কাগজের মফস্‌সল-বার্তাগুলি একেই যত গাঁজাখুরি সংবাদের ডিপো। মফস্‌সলের প্রতিনিধিরা সুযোগ পেয়ে যা খুশি আযাড়ে গল্প সেখানে চালাতে লাগল। কোথায় জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এক গাঁয়ে এক বুড়ির একটা বাছুর হারিয়েছে, মফস্‌সল-বার্তায় তার খবরের সঙ্গেও বেরোল যে, সে বুড়ি নাকি দেখেছে, আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা জিনিস নেমে তার বাছুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বন্ধু অশোক রায়ের বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম সেদিন সকালবেলা। এই খবরটা হঠাৎ চোখে পড়ায় হেসে উঠে অশোককে বললাম, 'খবরটা দেখেছ? এরপর কোনদিন

শুনব, আকাশ থেকে নেমে কার হেঁসেল থেকে মাছ ভাজা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুগ হলেই হল!'

অশোক রায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু গম্ভীরমুখেই বলল,. 'হুঁ', আমি আশ্চর্য হচ্ছি শুধু, আই. এন. এ. বা আর কেউ এ সম্বন্ধে কিছু এখন করছে না দেখে।'

ঠাট্টা করেই বললাম, 'বেশ তো, তোমার তো নিজেরই প্লেন রয়েছে। তুমিই এ আজগুবি এরোপ্লেনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে লাগো না!'

ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম, অশোক অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তার যা উত্তর দিলে তা শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অশোক বলল, 'লাগবই তো ঠিক করেছি।'

খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরোল না। তারপর অস্ফুটস্বরে বললাম, 'তুমি পরিহাস করছ নিশ্চয়ই?'

'না, পরিহাস নয়, সত্যিই আমি যাব ঠিক করেছি, এবং আজই।'

আমি এবার ব্যাকুল স্বরে বললাম, 'কিন্তু তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? এ পর্যন্ত কত জন বৈমানিক মারা গেছে জান? তাদের মধ্যে ওস্তাদ বিমানবীরও ছিল। তুমি তো সবে সেদিন 'বি' সার্টিফিকেট পেয়েছ। তা ছাড়া তোমার প্লেনও ডাকের উড়োজাহাজগুলির তুলনায় অনেক খারাপ।'

অশোক বললে, 'বিপদ আছে জেনেই তো যাচ্ছি।'

আমি আরেকবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'বিপদ যে কতখানি, তা কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না। এই রহস্যময় এরোপ্লেনগুলি যারা চালাচ্ছে, তারা যেমন পৈশাচিকভাবে নিষ্ঠুর, তেমনি ধূর্ত ও শক্তিমান। আই. এন. এ. কিছু করছে না, এমন তো নয়; তারা দল বেঁধেও কিছু করতে পারছে না এদের বিরুদ্ধে। তারা যেখানে অক্ষম, তুমি সেখানে একলা কী করতে পার!'

অশোককে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না, সে শুধু অদ্ভুত একটা উত্তর দিল, 'হয়তো আই. এন. এ.-র চেয়ে আমি এ ব্যাপারের মর্ম বেশি বুঝি। অন্তত কোথায় তাদের দেখা পাব, তা আমি জানি।'

তার কাছ থেকে আর কোনো কথা না বের করতে পেরে অবশেষে আমি হতাশ হয়ে বললাম, 'নেহাতই যখন যাবে, তখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছিনে।'

অশোক খানিকক্ষণ আমার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বললে, 'এ প্রস্তাব আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম!'

সেইদিন দুপুরেই অশোকের প্লেনে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। অশোকের প্লেনটি খুব দামি নয়, কিন্তু বেশ মজবুত। টেনেটুনে তাকে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলও চালানো যায়। সামনে অশোকের ও পেছনে আমার সিট। অশোকের অনুরোধে একটি রাইফেল ও একটি রিভলভার নিয়ে আমায় উঠতে হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটি জিনিস সে যে কেন সঙ্গে আনতে বলেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারিনি। সেটি একটি লোহার শিরস্ত্রাণ, মধ্যযুগের ধরনে তৈরি। আই. এন. এ. রাত্রে এরোপ্লেন, চালানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, সেইজন্যে আমরা ঠিক করেছিলাম—প্রথমে গন্তব্যস্থানে দিনের বেলা পৌঁছে গোপনে রাত্রে কাজ আরম্ভ করব। গন্তব্য স্থান অবশ্য আমার জানা ছিল না। উত্তর দিকে যাত্রা করে ঘণ্টা কয়েক বাদে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরকোটায় পৌঁছে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত জায়গা থাকতে এই শহরটিকে অশোকের বেছে নেওয়ার কারণ তখনও আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু নাগরকোটার প্রধান অসুবিধে হল এরোপ্লেন নামাবার জায়গা নিয়ে। দিনের বেলা নগরের বাইরে যে ফুটবলের মাঠে আমরা নেমেছিলাম, রাত্রের অন্ধকারে তাতে অবতরণ করা অসম্ভব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দূরের একটি গাঁয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁজা মাঠ পাওয়া গেল, কিন্তু জোরালো আলোর বন্দোবস্ত করতে না পারার দরুন প্রথম রাত্রে আমাদের কিছু করা হল না। দ্বিতীয় রাত্রে যথাসম্ভব জোরালো দুটি পেট্রলের আলো মাঠের দু-ধারে চিহ্ন হিসেবে রেখে মাঝ রাতে আমরা আকাশে উঠলাম।

সেই ভয়ংকর রাত্রির কথা কোনোদিন বোধ হয় ভুলতে পারব না। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর এগিয়ে এলেও সেই সময়ে মনে যে একটু দ্বিধা না হয়েছিল, এমন নয়। যে রহস্যময় শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি, তাদের নৃশংসতার ও শক্তির পরিমাণ আমাদের অজানা নয়। নিজেদের সামান্য শক্তি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কী করতে পারব! মনে হচ্ছিল, এ শুধু গোঁয়ার্তুমি করে মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয় ; কিন্তু তখন আর পেছুবার সময় নেই।

জয়স্টিক টেনে সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে এরোপ্লেন তখন মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। একটিমাত্র ক্ষীণ আশা তখনও মনের মধ্যে আছে—হয়তো সত্যিই আমরা কোনো কিছুর দেখা নাও পেতে পারি ; কিন্তু সে আশাও সফল হওয়ার নয়।

দেখতে দেখতে এরোপ্লেন কয়েকবার পাক খেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে পড়ল। নাগরকোটা শহরের ক্ষীণ আলো দূরে থাকায় আমাদের নামবার মাঠের চড়া আলোও তখন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা কিছু আলো আমাদের মাথার ওপর। সেখানে তারায় ভরা আকাশ ঝলমল করছে। শুক্লপক্ষের দশমী না একাদশী তিথির ভাঙা চাঁদের সামান্য একটু লালচে রেখা পশ্চিমের দিগন্তে দেখা যাচ্ছিল। মাটির ওপর থেকে সে চাঁদ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম বলে এখন তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে রেখাও খানিক বাদে মুছে গেল। তারাগুলির আলো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। নীচে সমস্ত পৃথিবীর ওপর গাঢ় কালির ছোপ। সে ছোপ কোথাও কোথাও বেশি গাঢ়, কোথাও বা একটু ফিকে। সেই সামান্য একটু রঙের তারতম্য থেকেই আমরা মাঠ, গ্রাম ও জঙ্গলকে যথাসম্ভব আলাদা করে ধরতে পারছিলাম।

শহরের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে অশোক উত্তরের জঙ্গলের ওপর প্লেন চালিয়ে এনেছিল। আমাদের গতি তখন খুব বেশি নয় ; ঘণ্টায় আন্দাজ আশি মাইল বেগে মাটি থেকে হাজার তিনেক ফুট ওপরে আমরা বিশাল বৃত্তাকারে জঙ্গলের ওপর পাক খাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকালের উপযুক্ত বৈমানিকের পোশাক থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের মতো যে হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তাতে শীত করছিল। মোটরের গর্জন ছাড়া আর কিছু শব্দ নেই ; তারা-খচিত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

খানিকক্ষণ বাদে এই একঘেয়েমিতে যেন বিরক্তি ধরে গেল। মোটরের আওয়াজের ভেতর কথা কইবার সুবিধের জন্যে অশোকের ও আমার বসবার জায়গার মধ্যে চোঙ্-লাগানো রবারের নল আমরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সেই চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম, 'এরকমভাবে কতক্ষণ ঘুরব! এতে লাভই বা কী?'

অশোক চোঙের ভেতর দিয়ে উত্তর দিল, 'অত অধীর হয়ো না। রাত্রে ওড়ার একটা আনন্দও তো আছে!'

আমার কিন্তু এটাকে ঠিক আনন্দ বলে মনে হচ্ছিল না। যাই হোক, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা বলে চুপ করে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে আমরা সেই একভাবে চক্কর দিয়েছিলাম, তা বলতে পারি না। পুবের আকাশ যখন একটু ফিকে হয়ে আসছে প্রভাতের সূচনায়, তখন আমার খেয়াল হল। আবার চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম, 'সকাল তো হতে চলল। আর কতক্ষণ ঘুরবে এমন করে?'

pathagar.net

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব এল, 'শিগ্‌গির তোমার শিরস্ত্রাণ পরে ফেলে প্রস্তুত হয়ে বোসো।'

সত্যিসত্যিই সেইকথায় ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোত যেন সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে শিউরে দিয়ে গেল।

কম্পিত স্বরে বললাম, 'দেখতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, আমাদের দক্ষিণে চেয়ে দেখো! আমি এরোপ্লেনের বেগ বাড়িয়ে আরও ওপরে উঠছি। সেখান থেকে ওদের ওপর ছোঁ মেরে পড়তে চাই—অবশ্য যদি ওদের বেগ আমাদের চেয়ে বেশি না হয়।'

এরোপ্লেন হঠাৎ কার্নিক খেয়ে ওপরদিকে নাক তুলে প্রচণ্ডবেগে ঊর্ধ্বে উঠতে লাগল ; সেই মুহূর্তে আমিও দেখতে পেলাম। অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ়, কিন্তু তারই ভেতর দুটি বিশাল আবাছায়া অদ্ভুত মূর্তি বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু এগুলি কী ধরনের এরোপ্লেন! আমি এরকম এরোপ্লেনের কথা কখনো তো শুনিনি! সামনে তার কোনো প্রপেলার আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনেকটা বাদুড়ের ধরনে তাদের দু-ধারে ডানা যে ওঠা-নামা করছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ পদ্ধতিতে কোনো এরোপ্লেন যে নির্মিত হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

এরোপ্লেনদুটির আকৃতিও অদ্ভুত। অস্পষ্টভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম তাতে মনে হল কোনো সাধারণ প্লেনের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই।

তাদের বেগ বেশি হোক বা না হোক, আশ্চর্য তাদের ঘোরাফেরার কৌশল! সাধারণ এরোপ্লেনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মোড় ফিরতে হয়, কিন্তু এরা যেন যেকোনো জায়গা থেকে যেদিকে খুশি হঠাৎ বাঁক নিতে পারে। সামনে যেতে যেতে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সোজা পেছন দিকে যাওয়াও এদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

সবেগে এরোপ্লেন চালিয়েও এই কৌশলের জন্যেই কিছুতেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারছিলাম না। ওপর থেকে তাদের কাছ দিয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে নামবার আগেই তারা অদ্ভুত কৌশলে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। গুলি করবার মতো নাগালের মধ্যে তাদের কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, তারাও বুঝি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে পারে ; কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তারা যেন শুধু কোনোরকমে আমাদের প্লেনের ল্যাজের দিকটা আক্রমণ করবার ফিকির খুঁজছে মনে হল।

বন্দুক বা কোনো অস্ত্র কেন যে তারা ব্যবহার করেনি তা অবিলম্বেই বুঝলাম এবং সেইসঙ্গে সত্যিই আতঙ্কে ওই ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও আমি এতক্ষণে ঘেমে উঠলাম।

পুবের আকাশ ফিকে হতে হতে তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের তারা ম্লান, আর নীচের মাঠ গ্রাম জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমন সময় আমাদের প্লেন তাদের শ-দুয়েক গজের মধ্যে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম—যাদের আমরা এরোপ্লেন ভেবেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের তৈরি কোনোপ্রকার যন্ত্র নয়, কল্পনাতীত একরকম প্রাণী—অতি বড়ো দুঃস্বপ্নেও যাদের রূপ ভাবা যায় না। আবছা অন্ধকারে তাদের অতিকায় বাদুড়ের মতো দেহ ও হিংস্র দাঁতাল মুখের যে আভাস আমি পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে অতীত বা বর্তমানে কোনো প্রাণীরই মিল নেই।

নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, ভুল আমার হয়নি। যতই অবিশ্বাস্য হোক, সত্যিই অদ্ভুত ভয়ংকর দুটি প্রাণীর সঙ্গেই আমাদের আকাশ যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

অশোক নলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'কার সঙ্গে লড়তে হবে, এবার বুঝতে পেরেছ?'

আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি আগে থেকেই জানতে?'

উত্তর এল, 'না, ঠিক জানতাম না বটে, কিন্তু একটু আঁচ করেছিলাম।'

আর আমাদের কোনো কথা হল না। কথা কইবার আর সময়ও ছিল না। অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রুদের চেহারার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরস্পরকে বাগে পাওয়ার জন্যে তখন আকাশে তাদের সঙ্গে আমাদের প্লেনের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলছে ; কিন্তু প্রতিযোগিতায় আমরাই যেন ক্রমশ বেকায়দায় পড়ছিলাম মনে হচ্ছিল।

আমাদের এরোপ্লেনের গতি হয়তো তাদের চেয়ে বেশি কিন্তু তাদের ওড়বার কৌশল আমাদের চেয়ে ভালো। আমি এর মধ্যে কয়েকবার দূর থেকে বন্দুক চালিয়েছি, কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হয়নি। পাখার নানারকম কায়দায় উলটেপালটে তারা শুধু আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছিল না, দুটোতে আমাদের দু-পাশে সরে গিয়ে আমাদের পেছনদিকে আক্রমণ করবার সুযোগ করে নিচ্ছিল।

কিন্তু আক্রমণের কৌশল যে তাদের অমন হবে, আক্রান্ত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তা ভাবতে পারিনি। খানিক আগেই একবার সুবিধে পেয়ে আমি তাদের একটির পাতলা চামড়ার ডানা গুলিতে ফুটো করে দিয়েছিলাম। তাতে সে খুব বেশি জখম হয়নি, কিন্তু যে ভয়ংকর চিৎকার ছেড়েছিল, আমাদের মোটরের গর্জন ছাপিয়েও তা তীক্ষ্ণভাবে আমাদের কানে বিঁধেছে। আমাদের প্লেন একটিকে পাশে রেখে তাদের আরেকটির শ-দুয়েক ফুট তলা দিয়ে এখন যাচ্ছিল। আমি ওপর দিকে লক্ষ রেখে বন্দুকও ছুঁড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ংকরভাবে আমাদের প্লেন দুলে উঠে পাক খেতে খেতে নীচের দিকে প্রচণ্ডবেগে পড়তে শুরু করল। প্লেনের সিটের ধারটা সজোরে সে-সময়ে ধরে না ফেললে আমি বোধ হয় ছিটকে পড়ে যেতাম।

হল কী? কী আর হবে? শকুনেরা যেমন করে উঁচু থেকে নামবার সময় পাখা মুড়ে ভারী জিনিসের মতো অনেক দূর থেকে দ্রুতবেগে পড়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সেই বিশাল প্রাণীটি আমাদের পেছনের পাখার ওপর এসে পড়েছে। এই সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

প্রথমটা সত্যিই আমি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছি এই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বিপদের ভীষণতায়। হাতের বন্দুকটা তুলে ধরবার কথাও আমার মনে ছিল না। প্লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, বিদ্যুদ্বেগে নীচের মাঠ-ঘাট-জঙ্গল আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাটিতে আছাড় খেয়ে যখন মরতেই হবে, তখন আর বন্দুক ছুঁড়ে লাভ কী?

কিন্তু সে বিমূঢ়তা আমার কেটে গেল অশোকের কথায়। সে তাহলে মাথা ঠিক রেখেছে এত বিপদের ভেতরও! চোঙের ভেতর দিয়ে সে চিৎকার করে বললে, 'দেখছ কী? গুলি করো, আমি প্লেন সামলে নিচ্ছি!'

এইবার আমি সামনে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। সেদিকে চেয়ে অবশ্য মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সামনের ও পেছনের পায়ের হিংস্র নখরে আমাদের প্লেনের পেছনের দিকটা আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে সেই ভয়ংকর প্রাণীটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র দাঁতাল মুখ একেবারে আমার সামনে। জানোয়ারটির বর্ণনা করা কঠিন। অতিকায় একটা গোসাপের সামনের পা-দুটো থেকে বাদুড়ের মতো পাতলা চামড়ার ডানা বেড়িয়েছে বললে তার খানিকটা বর্ণনা হয়, কিন্তু তার হিংস্র মুখের ও সাপের মতো কুটিল ভয়ংকর চোখের ভীষণতা বোঝানো যায় না।

অশোক সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তখন আমাদের প্লেন পেছনের ল্যাজের ভারে টাল হারিয়ে একেবারে মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেই সময়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি

boiRboi.net

সংগ্রহ করে আমি বন্দুকের নলটা সেই হিংস্র প্রাণীর একেবারে দাঁতাল মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং তারপরই দুটো ঘোড়াই দিলাম পর পর টিপে।

আর কিছু করবার দরকার হল না। প্লেনের ওপর একবার একটু নড়ে উঠেই জানোয়ারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। আমাদের বিমানপোতও মাটিতে আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ তিরের মতো ওপরে উঠে গেল ভারমুক্ত হয়ে।

পুবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে আমি চোঙের ভিতর দিয়ে বললাম, 'এবার তো নামতে হয়!'

অশোক বলল, 'না, আরেকটা যে এখনও বেঁচে আছে!'

'কিন্তু আমার বন্দুক যে সেই জানোয়ারটার সঙ্গে পড়ে গেছে!'

'বন্দুক পড়ে গেছে!'—সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠে অশোক খানিক চুপ করে রইল, তারপর আবার বলল, 'তাহলেও ফেরা যায় না। এমন সুযোগ আর কখনো পাব কি না সন্দেহ। এই ভীষণ জানোয়ার বেঁচে থাকলে আরও কত সর্বনাশ করবে, কে জানে। তুমি প্যারাসুট দিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত থাকো।'

সে যে কী করতে চায়, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তার একটি জানোয়ারের নাগাল আমরা তখন ধরে ফেলেছি। চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠার দরুন কিংবা তার সঙ্গীর মৃত্যুতে ভয় পেয়ে কি না ঠিক বলা যায় না, সে তখন আক্রমণের বদলে পালাবার ফিকির খুঁজছে। বিশাল পাখাগুলো সবেগে আন্দোলিত করে পশ্চিম দিকের ঘন জঙ্গলের দিকেই সে যাওয়ার চেষ্টা করছে মনে হল।

অশোক হঠাৎ চোঙের ভেতর দিয়ে বললে, 'লাফিয়ে পড়ো এইবার।'

কিন্তু লাফাব কী, আমি তখন অশোকের কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের প্লেন সোজা সেই জানোয়ারটির দিকে বন্দুকের গুলির মতো ছুটে চলেছে। যন্ত্রপাতি সব ঠিক করে অশোক তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এবার শুধু সিটের ধারটুকু ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল। তার ইঙ্গিতে আমিও তখন তাই করছি ; তারপর একটি, দুটি, তিনটি সেকেন্ড। তার ইশারায় এবার হাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। প্যারাসুটের বোতাম টেপবার আগেই শুনতে পেলাম ওপরে ভয়ংকর সংঘর্ষের আওয়াজ। আমাদের এরোপ্লেন প্রচণ্ড বেগে গিয়ে জানোয়ারটিকে আঘাত করেছে।

আমাদের প্যারাসুট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একরকম গায়ের পাশ দিয়েই সেই ভয়ংকর প্রাণীটার মৃতদেহ সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল ; আমাদের এরোপ্লেনটি মাতালের মতো তখনও পড়তে পড়তে পাক খাচ্ছে।

নাগরাকোটা থেকে ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছোবার আগেই আমাদের খবর কীরকমভাবে সেখান পৌঁছে গিয়েছিল। এই আশ্চর্য জানোয়ারের মৃত্যুর খবরে সেখানে কীরকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, আই. এন. এ. থেকে আমাদের, বিশেষত অশোককে কীরকম সম্মান করা হয়েছিল, সে খবর অনেকেরই জানা।

এখানে শুধু আমাদের এই অভিযানের অদ্ভুত পরিণতির কথাটাই বলব।

সে পরিণতি স্যার চিরঞ্জীবের মুক্তি। শুধু মুক্তি নয়, বৈজ্ঞানিক হিসেবে এই ব্যাপারে তাঁর খ্যাতির পুনরুদ্ধারও হয়ে গেল। প্রাচীন যুগের সরীসৃপ-বংশ যে লোপ পায়নি, তার চাক্ষুষ প্রমাণ তো আমরাই পেয়েছি।

যে ভয়ংকর প্রাণী দুটিকে আমরা মেরেছিলাম, স্যার চিরঞ্জীব নিউগিনি অভিযান থেকে তাদের ডিম এনে কৃত্রিম উপায়ে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর পরীক্ষাগারে ফুটিয়ে তাদের ছানাগুলিকে

পালন করছিলেন বৈজ্ঞানিক জগৎকে দেখিয়ে স্তম্ভিত করে দেবেন বলে। সেগুলি নাকি প্রাচীন যুগের টেরোড্যাক্টিলেরই সুদূর বংশধর—আরও হিংস্র, আরও বিশালকায়। জানোয়ারগুলিও আশাতিরিক্তভাবে বেড়ে ওঠে ; কিন্তু একদিন হঠাৎ তাঁর চাকরের অসাবধানতায় তাদের খাঁচা থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে বলেই বিপদ হয়। চাকরটিকে অমন নৃশংসভাবে তারাই হত্যা করেছিল।

তারা ছাড়া পেয়ে কী সর্বনাশ করতে পারে, তা বুঝেই স্যার চিরঞ্জীব বন্দুক নিয়ে এরোপ্লেনে তাদের মারবার জন্যে বেরোচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেই অবস্থায় বাধা দেওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে তিনি একেবারে মৌন হয়ে যান।

খবরের কাগজে যে সংবাদ একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল, অশোক স্যার চিরঞ্জীবের সেই খুনের রহস্যের যোগসূত্র হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার না করলে অবশ্য সব দিক দিয়েই সর্বনাশ হয়ে যেত। আর মফস্‌সল-সংবাদে বুড়ির বাছুর চুরির যে খবর গাঁজাখুরি বলে আমি পরিহাস করেছিলাম, তার থেকেই কিন্তু জানোয়ারটিকে কোথায় সন্ধান করতে হবে, অশোক তার আভাস পায়। নইলে নাগরাকোটার নামও সে জানত না দু-দিন আগে।

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী

পৃথিবীর চারটি বড়ো বড়ো দেশের উৎসাহে ও টাকায় একেবারে প্রথম শ্রেণির একটি সাবমেরিন এখন অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে ডুব দিয়ে সাগরের জল প্রায় খ্যাপার মতো ঘুলিয়ে তুলেছে বললে হয়। এটা কারুর খামখেয়াল নয়। পৃথিবীর বড়ো বড়ো বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মতে, বিজ্ঞান ও মানুষের ভাবী ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুতর একটি সমস্যার সমাধান এই সাবমেরিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ওপর নির্ভর করছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে কী যে সাবমেরিনের বৈজ্ঞানিক নাবিকরা খুঁজে ফিরছে, কেন যে মানুষের পক্ষে সেটা এমন গুরুতর ব্যাপার, সেই কাহিনিই বলছি।

ব্যাপারটা পৃথিবীর অনেক গুরুতর ঘটনার মতোই আরম্ভ হয়েছিল অত্যন্ত নিঃশব্দে। চীন-জাপানের যুদ্ধ, স্পেনের বিপ্লব, ইয়োরোপের গণ্ডগোল নিয়েই তখন সবাই মত্ত। অস্ট্রেলিয়ার দু-একটা কাগজের কোণে যা সামান্য একটা খবর বেরিয়েছিল তার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েনি। যাদের পড়েছিল তারাও সেটাতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

খবরটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে উগি নামে ছোটো নগণ্য একটি দ্বীপের মালিক মি. বাফেট সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি সামুদ্রিক জীবের অস্তিত্বের পরিচয় পেয়ে কাগজে তার বিবরণ পাঠিয়েছিলেন। সেই বিবরণটিকে কেটে ছেঁটে খবরের কাগজের এক কোণে নেহাত জায়গা ভরাবার জন্যেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। এরকম বিবরণ খবরের কাগজে হামেশাই আসে, অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত আজগুবি গালগল্প বলে ধরা পড়ে। সুতরাং কাগজে এই বিবরণটিকে যে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, এ বিষয়ে যাদের উৎসাহ থাকার কথা, সেই প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের কেউ এ বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল বলে মনে হয় না।

মি. বাফেট নিজেও তাঁর আবিষ্কারটির গুরুত্ব অবশ্য কিছুই বোঝেননি। সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা আগাগোড়া দুঃস্বপ্ন কি না, এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই একটু সন্দেহ ছিল।

মি. বাফেট উগি দ্বীপটি অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছ থেকে কিনে সেখানে নারকেলের চাষ করেছেন। নারকেলের চাষ ছাড়া আশেপাশের দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে মুক্তো প্রবাল প্রভৃতি নানা জিনিসের কারবারও তিনি করে থাকেন।

উগি দ্বীপটি নিতান্ত ছোটো, লম্বায়-চওড়ায় বারো মাইলের বেশি কোথাও নয়। এই দ্বীপটিতে জন-পঞ্চাশ সেই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা তাঁরই নারকেল বাগান ও কারবারে চাষি মজুর ও চাকরের কাজ করে।

ঘটনার দিন ছিল উগি দ্বীপের একরকম হাটবার। আশেপাশের দ্বীপগুলি, বিশেষ করে পাশের সান ক্রিস্টোভাল দ্বীপ থেকে, লম্বা লম্বা ক্যানোয় করে বড়ো বড়ো সর্দারেরা এসেছে মুক্তো আর প্রবাল, নারকেলের শাঁস আর গজদন্ত ফলের বদলে রঙিন ছিট আর তামাক, সস্তা, আয়না চিরুনি আর পুঁতির মালা কিনতে।

সারাদিন কেনা-বেচা ও মুখ্যু সর্দারের হিসেব বোঝাবার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মি. বাফেট বিকেলবেলায় ভাঙা হাটের ভার বিশ্বাসী চাকর টিঙ্কোর হাতে ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ধারে একটু মাথা ঠান্ডা করতে এসেছিলেন।

সন্ধে তখনও হয়নি। প্রবাল দ্বীপের সমুদ্রতট দুধে-ধোওয়া শ্বেতপাথরের মেঝের মতো ঝকঝক করছে, সমুদ্রের জলের রং শুধু একটু গাঢ় হয়ে এসেছে নারকেল গাছের সারির পেছনে অস্তমান সূর্যের মরা আলোয়।

pathagar.net

মি. বাফেট উঁচু একটা পাথরে চাঁইয়ের ওপর গিয়ে বসেছিলেন। এইটেই তাঁর প্রিয় বিশ্রামের জায়গা। এখান থেকে অনেক দূরে সমুদ্র যেখানে ফেনা-ছিটোনো সাদা ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ছে সেদিকে চেয়ে থাকতে তিনি ভালোবাসেন।

অধিকাংশ প্রবাল দ্বীপের মজা এই যে, চারিধার প্রবালের তৈরি ডুবো দেওয়ালে ঘেরা থাকায় তীরের কাছে ঢেউয়ের দাপট আর থাকে না। জলের ডুবো প্রবাল-প্রাকারে ধাক্কা খেয়ে নিস্তেজ হয়ে ঢেউগুলি সেখানে পৌঁছোয়। সেই অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে দুটি বড়ো বড়ো কচ্ছপের সাঁতরে বেড়ানো অন্যমনস্কভাবে দেখতে দেখতে হঠাৎ মি. বাফেট চমকে উঠলেন।

সমুদ্রের নীল জলের ভেতর থেকে রুপোর মতো চকচকে কী একটা প্রাণী তীরের দিকে উঠে আসছে। প্রথমে মি. বাফেট সেটাকে একটা সামুদ্রিক মাছই ভেবেছিলেন। কিন্তু সে ভুল ভাঙতে তাঁর দেরি হল না। মাছের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্যই নেই।

তবে প্রাণীটি কী? রংটা রুপোর মতো পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চকচক করে না উঠলে গোড়ায় হয়তো আরেকটি কচ্ছপ বলেও সেটাকে ভাবা যেত। মনে করা যেত তার আঁশগুলোই অমন চকচক করছে।

কিন্তু শুধু গায়ের রঙে নয়, আকারেও তো তার কচ্ছপের সঙ্গে কোনো মিল নেই।

মি. বাফেট চোখটা একবার রগড়ে নিলেন। সারাদিন হিসেবের অঙ্ক লিখে লিখে চোখটা খারাপ হল নাকি? না, চোখ তো খারাপ হয়নি! প্রাণীটি সত্যিই অদ্ভুত। দশ বছর ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপটিতে তিনি বাস করছেন, তার আগেও প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে তাঁর অনেক দিন কেটেছে। এখানকার গাছপালা মানুষ ও জলস্থলের সব প্রাণীর প্রায় নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা। কিন্তু এমন প্রাণী তিনি কখনো দেখেননি।

প্রাণীটি তখন সমুদ্রের জল ছাড়িয়ে তীরের ওপর উঠে এসেছে। মাছ তো নয়ই, কচ্ছপ বা হাঙর কোনো কিছুর ধার দিয়েও সে যায় না। তার সঙ্গে মিল অবশ্য একটা কিছুর আছে, কিন্তু সে মিলের কথা ভাবতে যাওয়াটাই মনে হয় যেন মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ।

রুপোর মতো ঝকঝকে প্রাণীটি ঠিক যেন একটা বিকৃত চেহারার কবন্ধ বামন। মানুষের মতো মাথাটাই তার খালি নেই, কিন্তু ঠিক মানুষের মতোই তার দুটি মোটা মোটা পা এবং দেহের দু-ধারে আজানু নয়, একেবারে আপাদলম্বিত দুটি হাতের মতো অঙ্গও তার আছে। দৈর্ঘ্য অবশ্য তার তিন ফুটের বেশি না হলেও পরিধি তার বেশ।

টলমল পায়ে প্রাণীটি তীরের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে—মি. বাফেট মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বিশ্বাসী চাকর টিক্কো যে তাঁর খোঁজে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল তার নেই। হঠাৎ তার ভয়ার্ত চিৎকারে তিনি চমকে উঠলেন।

'দানব! দানব! সমুদ্রের দানব!' —মি. বাফেট মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, ভয়ে টিক্কো একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, শুধু চিৎকারের তার কামাই নেই।

সে চিৎকারের ফল যা হবার তাই হল। দেখা গেল প্রাণীটি দ্রুতবেগে সমুদ্রের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছে। মি. বাফেট তাড়াতাড়ি তার পিছনে যাবার উপক্রম করতেই টিক্কো একেবারে পাগলের মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে বললে, 'দোহাই আপনার, যাবেন না সমুদ্রের দানবের কাছে—তাহলে আর রক্ষা নেই!'

টিক্কোর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতেই প্রাণীটি যখন সমুদ্রের জলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মি. বাফেটের আপশোসের আর সীমা রইল না। ধমকে গালাগাল দিয়ে টিক্কোকে বললেন, 'আহাম্মুক কোথাকার! কী করলি বল দেখি!'

টিক্কোর কিন্তু গালাগালে লজ্জিত হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ভয় তখনও তার

pathagar.net

সম্পূর্ণ কাটেনি। অম্লান বদনে তবু সে জানাল যে অন্যায় সে কিছু করেনি। সমুদ্রের দানবের পরিচয় জানলে সাহেব আর তার কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত হতেন না!

'সমুদ্রের দানব না ছাই! মুখ্যু জানোয়ার কোথাকার! ভালো করে দেখতে পেলুম না তোর আহাম্মুকিতে!'

টিক্কো এবার একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, 'তার ভাবনা নেই। একবার যখন দানব এ দ্বীপে উঠেছে, তখন ভালো করে দেখা না দিয়ে সে যাবে না।'

বলতে বলতে তার চোখে-মুখে যে আতঙ্ক ফুটে উঠল তাতে মি. বাফেট সত্যি একটু অবাক হতেন, যদি না এদের নানা অর্থহীন কুসংস্কার তাঁর জানা থাকত। তাই তিনি শুধু একটু হেসে তাকে বললেন, 'এ দানব তুই আগে দেখেছিস?'

টিক্কো জানাল,—না, তার নিজের দেখা এই প্রথম, কিন্তু দানবের সব কথা সে জানে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ নাকি ঝড়জল ভূমিকম্পে মহামারীতে নয়, এই দানবের অত্যাচারেই শ্মশান হয়ে গেছে। অসভ্যদের বল্লম আর সাহেবদের গুলি, কিছুই নাকি এদের ক্ষতি করতে পারে না।

এই মূর্খ কুসংস্কারগ্রস্ত অসভ্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা বৃথা বুঝে মি. বাফেট বেশ একটু ক্ষুণ্ণ মনেই তাঁর বাংলোয় ফিরেছেন এবং তারপর তিনি নিজে যা দেখেছেন, তার বর্ণনার সঙ্গে অসভ্য অধিবাসীদের কুসংস্কার-জড়িত কাহিনি সমেত একটি বিবরণ অস্ট্রেলিয়ার কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাটাছাঁটা হয়ে তা থেকে যেটুকু বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে তার পরিণামের কথা আগেই বলা হয়েছে। তারপর সভ্য জগৎ এই ব্যাপারটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কতদিনে যে সজাগ হয়ে উঠত কে জানে যদি না—

—যদি না সান ক্রিস্টোভালের রেসিডেন্ট কমিশনার মি. সেরিফের কাছে উগি দ্বীপ সম্বন্ধে কয়েকটি ভাসা-ভাসা গুজব গিয়ে পৌঁছোত, যদি না তিনি স্বয়ং এ ব্যাপারটার খোঁজ নেবার সাধু সংকল্প করতেন, এবং যদি না ঠিক সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক মি. মিচেল তাঁর বার্ষিক সাগরশিকারে বেরিয়ে সান ক্রিস্টোভালে মি. সেরিফের অতিথি হতেন।

মি. সেরিফ কিছুদিন থেকেই উগি সম্বন্ধে নানানরকম গুজব শুনতে পাচ্ছিলেন। উগি দ্বীপ সান ক্রিস্টোভালের অধীন, সেখানকার মালিকও তাঁর জাতভাই। সেই হিসেবে উগি দ্বীপের মালিকের বিপদআপদে সাহায্য করা কমিশনারের কর্তব্য। তবু খবরগুলো এমন আজগুবি, এবং কমিশনার হিসেবে মি. সেরিফের অন্য কাজের চাপ এত বেশি যে, এ বিষয়ে কিছু করার ফুরসত তাঁর এ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু একদিন আর চুপ করে বসে থাকা তাঁর চলল না। সকালবেলায় খাবার টেবিলেই তাঁকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখে মি. মিচেল একটু আশ্চর্য হলেন, 'কী ব্যাপার মি. সেরিফ? আপনাকে সকালেই যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে!'

'চিন্তিত নয় ডা. মিচেল, বিরক্ত বলতে পারেন।...একে তো সরকারি কাজের এই চাপ, তার ওপর এদেশের লোকের ভূতের ভয়; জুজুর ভয় সারিয়ে বেড়াতে হলেই তো গেছি!'

'জুজুর ভয় আবার কোথায় সারাতে হবে?' ডা. মিচেল জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই উগি দ্বীপে, আর কোথায়! সেখানকার মালিক মি. বাফেট শুনছি ভয়ানক নাকি বিপদে পড়েছেন। জুজুর ভয়ে তাঁর চুক্তি-করা সমস্ত চাকরবাকর, চাষি, নাকি তাঁকে একা ফেলে পালিয়েছে। বেচারার সান ক্রিস্টোভালে এসে খবর দেবার মতো একটা ডিঙিও নাকি তারা রেখে যায়নি।'

মি. সেরিফ একটু থেমে আবার বললেন, 'জুজুটা কী তা জানেন?—সাগর-দানব। সাগর থেকে তারা নাকি উঠে সব ধ্বংস করে দেয়। শুনেছেন এমন কথা!'

ডা. মিচেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শুনেছি।'

মি. সেরিফ একটু অধৈর্যের সুরে বললেন, 'শুনেছি আমিও। এ দেশে এ কুসংস্কার বহুকাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন এসব গাঁজাখুরি গল্প?'

ডা. মিচেল তেমনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'এইটুকু শুধু বিশ্বাস করি, যে গাঁজাখুরি গল্পেও একটা কিছু সত্যের ভিত আছে।'

মি. সেরিফ তাঁর দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, 'তাহলে চলুন না মশাই আমার সঙ্গে! সত্যের ভিতটা একটু খুঁড়ে আসবেন! অনেকরকম নতুন প্রাণী তো আপনার সংগ্রহ হয়েছে, একটা সাগর-দানবই বাদ যায় কেন? কেমন, যাবেন?'

মি. সেরিফের ঠাট্টাটুকু উপেক্ষা করে ডা. মিচেল বললেন, 'আমি প্রস্তুত।'

সেইদিনই বিকেলে সান ক্রিস্টোভাল থেকে সরকারি বড়ো মোটরবোট 'মিন্ডিনি' উগি দ্বীপে গিয়ে নোঙর করল। মাঝিমাল্লাদের বোটেই রেখে জনকয়েক দেশি কনস্টেবল নিয়ে মি. সেরিফ ও ডা. মিচেল মি. বাফেটের বাংলোয় গিয়ে উঠলেন।

বাংলোয় পৌঁছে তাঁরা সত্যি অবাক হলেন। দেশি চাষি-মজুর, চাকরবাকর না-হয় সব পালিয়েছে, কিন্তু স্বয়ং মি. বাফেট গেলেন কোথায় এই সন্ধেবেলায়! বাংলো এবং আশেপাশের সমস্ত জায়গা সন্ধান করেও তাঁর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। সরে পড়বার আগে দেশি লোকেরা কি তাঁকে শেষ করে দিয়ে গেছে তাহলে? কিন্তু আশ্চর্য! গুদোমঘর বা বাংলোর কোনো জিনিসপত্রই চুরি যায়নি। মনিবকে মেরে ফেলে চাকরেরা সেসব লুট করবার লোভ নিশ্চয় সংবরণ করতে পারত না।

যাই হোক রাত্রিটা তাঁদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। সকালের আগে আর মি. বাফেটের অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা বৃথা বুঝে রাতটা তাঁরা বাংলোতেই নিশ্চিন্ত বিশ্রামে কাটাবার সংকল্প করলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে রাত্রিটা বিশ্রাম করে কাটানো তাঁদের হল না।

সন্ধ্যা তখন সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে টেবিলের দু-ধারে বসে মি. সেরিফ ও ডা. মিচেল সাগর-দানবের কিংবদন্তি সম্বন্ধে গল্প করছিলেন।

মি. সেরিফ বলছিলেন, সাগর-দানব বলতে একটা কিছু আছে বলে আপনি কেন মনে করেন ডা. মিচেল?

'মনে করি এইজন্যে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে সাগর-দানবের কিংবদন্তি বহুদিন থেকে চলে আসছে। তার সবটাই কুসংস্কার আর বাজে কল্পনা বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু তাহলে এতদিন সভ্য মানুষ তার খোঁজ পেত না, আপনাদের বিজ্ঞানও কিছু জানত না?'

ডা. মিচেল একটু হেসে বললেন, 'সভ্য মানুষ আর বিজ্ঞানকে সবজান্তা মনে করছেন কেন? বিজ্ঞান তো সেদিনের। পৃথিবীর রহস্যের এখনও অনেক কিছু জানবার সে সুযোগ পায়নি।'

'কিন্তু সাগর-দানব তাহলে কী হতে পারে?'

'ঠিক করে কিছু বলা যায় না।' বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার কোনোরকম কল্পনাও সাজে না। তবে আমার অনুমান, সাগর-দানব গভীর সমুদ্রের কোনো অজানা প্রাণী।'

ডা. মিচেলের কথা আর শেষ হল না। হঠাৎ বাইরে একটা অত্যন্ত গোলমাল শোনা গেল। দুজনে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়তেই একজন পুলিশ এসে জানল একটি লোক লুকিয়ে বন্দুক বারুদ প্রভৃতি রাখবার ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিল, তাকে ধরতে গিয়েই এই গোলমাল।

pathagar.net

এই জনশূন্য দ্বীপে কেউ নেই বলেই তো তাঁরা জানতেন। এখানে বারুদঘর লুট করার শখ আবার কার হল? ডা. মিচেল ও মি. সেরিফ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুলেন। কিন্তু চোরকে দেখেই তাঁদের চক্ষুস্থির!

'একী, এ যে মি. বাফেট!'

জ্যোৎস্নারাত্রি হলেও বড়ো বড়ো নারকেল গাছের ছায়ায় বারুদঘরের দিকটা বেশ অন্ধকার। তারই দরুন পুলিশ মি. বাফেটকে চিনতে পারেনি। তারা এবার তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সসংকোচে দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

মি. বাফেটের কিন্তু তখনও রাগ যায়নি। তাঁকে ভয়ানক উত্তেজিতও মনে হচ্ছিল। চড়া গলায় তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি মি. বাফেট। আপনারা কে শুনতে পাই? পরের এলাকায় মাতব্বরি করতে এসেছেন?'

উত্তর না দিয়ে মি. সেরিফ একটু আলোয় গিয়ে দাঁড়াতেই মি. বাফেটের সুর বদলে গেল, 'আপনি মি. সেরিফ! আমি ভাবতেই পারিনি! যাক ভালোই হয়েছে, ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন।'

রাগ পড়ে গেলেও মি. বাফেটের উত্তেজনা তখনও একটুও কমেনি দেখা গেল।

মি. সেরিফ সেটুকু লক্ষ করে বললেন, 'তা তো এসেছি। কিন্তু আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথা? এত রাত্রে বারুদঘরেই বা ঢুকছিলেন কেন?'

'বারুদঘরে ঢুকছিলাম গেলিগ্নাইট নেবার জন্যে? তারা এসে পড়েছে যে মি. সেরিফ! এসে পড়েছে!'—মি. বাফেটের ভাবভঙ্গি অনেকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো।

'কারা এসে পড়েছে?' ডা. মিচেলই জিজ্ঞেস করলেন এবার।

'কারা আবার, সাগর-দানব! সারাদিন আমি সেই পাহারাতেই ছিলাম। কিন্তু একটি দুটি নয়, দলে দলে তারা এসেছে! সেই জন্যেই বন্দুকের বদলে গেলিগ্নাইট নিতে এসেছি। আর সময় নেই মি. সেরিফ! গেলিগ্নাইট নিয়ে এখুনি আমাদের যাওয়া দরকার!'

এবার মি. সেরিফের স্থির বিশ্বাস হল, লোকজন পালাবার পর কদিন একা-একা নির্জন দ্বীপে কাটিয়ে ভয়ে ভাবনায় মি. বাফেটের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি মি. বাফেটকে একরকম জোর করে বাংলোর দিকে ছেলে-ভোলানোর মতো সুরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে বললেন, 'আসুক তারা! আমরা এখান থেকেই তাদের সঙ্গে লড়ব।'

কিন্তু মি. বাফেট সজোরে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অধীরভাবে বললেন, 'আপনারা কি আমায় পাগল ভাবছেন? শুনুন, এর আগেও তারা দু-বার এখানে হানা দিয়েছে। আমাদের বন্দুকের জোরে অনেক কষ্টে তাদের তাড়িয়েছি। কিন্তু একটিকেও মারতে পারিনি। বন্দুকের গুলি যেন তাদের গায়ে লাগে না! আমার লোকজন কি অমনি পালিয়েছে মনে করেন? আপনারা কি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা?'

মি. সেরিফ কী বলতেন কে জানে, কিন্তু ডা. মিচেল এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় বিশ্বাস করছি। চলুন কোথায় যাবেন।'

এ অঞ্চলের প্রায় সব দ্বীপেরই বারুদঘরে মাছ ধরা, পাহাড় ভাঙা প্রভৃতি কাজের জন্য বেশ কিছু গেলিগ্নাইট রাখা হয়। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খালি টিনে সেই গেলিগ্নাইট ভরে পট্‌কা ও পলতে লাগিয়ে গোটাকয়েক চলনসই বোমা তৈরি করা হল। তারপর মি. বাফেটের পিছু পিছু নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে সবাই তীরের দিকে চললেন।

কিন্তু বেশিদূর তাঁদের যেতে হল না। নারকেল বাগানের আবছা অন্ধকার যেখানে জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধবে বালুতটে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পৌঁছোবার আগেই মি. বাফেট হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। আলো-ছায়ার সতরঞ্চ-কাটা ঘন নারকেল বাগানের পথে চকচকে কোনো জিনিসে প্রতিফলিত আলোর ঝিলিক তখন আরও অনেকে দেখতে পেয়েছে।

সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনের দৃশ্য সত্যই বিশ্বাসের অতীত! টলটলে পায়ে একসার দিয়ে প্রায় কুড়িটি যে অপরূপ মূর্তি একবার ছায়ায় ঢাকা পড়ে একবার চাঁদের আলোয় ঝলমল করে এগিয়ে আসছে, তারা সত্যই বাস্তব জগতের কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। তারা যেন প্রাচীন কালের ভূত-প্রেত দানা-দৈত্যের কোনো কাল্পনিক কাহিনির বই থেকে বেরিয়ে এসেছে!

মি. সেরিফ ডা. মিচেলের কানে চুপিচুপি বললেন, 'এরা যে দু-পায়ে মানুষের মতো হাঁটে, ডা. মিচেল! সমুদ্রে আবার এরকম প্রাণী কী আছে! আর সমুদ্রের প্রাণী ডাঙায় বা বাঁচে কী করে?'

ডা. মিচেল নিজের হাতের বোমাটা বাগিয়ে ধরে বললেন, 'সব রহস্যের এখনই মীমাংসা হবে।'

কিন্তু মীমাংসা অত সহজে হল না। অপরূপ মূর্তিগুলি নাগালের মধ্যে এসে পড়তেই সকলে বোমার পলতেতে আগুন দিয়ে সেগুলি তাদের মধ্যে ছুড়ে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে সেগুলি ফেটে যাবার পর দেখা গেল, উদ্দেশ্য তাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি।

ভীত প্রাণীগুলি তখন সবেগে সমুদ্রের দিকে পালাচ্ছে। মোটামোটা টলটলে পায়ে তারা যে অত জোরে ছুটতে পারে তা গোড়ায় ভাবা যায়নি।

তাদের অনুসরণ করবার চেষ্টা না করে বোমা যেখানে ফেটেছিল সেখানেই সকলে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা-আধটা মৃতদেহ নিশ্চয় সেখানে পড়ে আছে। ডা. মিচেলের আগ্রহ সেই বিষয়েই।

একেবারে আস্ত না হলেও গোটাকতক অসম্পূর্ণ লাশ পাওয়াও গেল, কিন্তু উৎসাহ ভরে সেগুলি আলোয় টেনে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডা. মিচেল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন!

এ আবার কীরকম প্রাণী। প্রাণীর দেহ কি শক্ত ধাতুর পাত আর তার দিয়ে তৈরি হয়!

মি. সেরিফকে তার পরদিনই সান ক্রিস্টোভালে চলে যেতে হয়েছে। সাগর-দানবের রহস্য যত গভীরই হোক, রেসিডেন্ট কমিশনারের পক্ষে তার মীমাংসার জন্যে বসে থাকা চলে না। ডা. মিচেল কিন্তু সেই থেকে মি. বাফেটের সঙ্গে উগি দ্বীপেই আছেন। আহার নিদ্রা তিনি একরকম ভুলে গেছেন বললেই হয়, সাগর-দানবের অদ্ভুত রহস্য এমন করে তাঁকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু ভেবে তিনি কোনোদিকেই কূল-কিনারা পাননি। পরের দিন সকালেই যতগুলি সম্ভব বোমার আঘাতে ফাটা সাগর-দানবের দেহের টুকরো তিনি সংগ্রহ করে আনিয়েছেন। তন্নতন্ন করে সেগুলি বারবার পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু তাতে, সেগুলি যে কোনোপ্রকার ধাতু ছাড়া আর কিছু নয়, তাই আরও বেশি করে প্রমাণ হয়েছে। প্রোটোপ্লাজম ছাড়া কোনো প্রাণীদেহ হয় না, কিন্তু প্রোটোপ্লাজম দূরে থাক, মাছের পটকার মতো একটি করে বড়ো রবার-গোছের জিনিসের থলে ছাড়া এ প্রাণীর দেহে কোনো নরম জিনিসই নেই। সবই কঠিন—একরকম মিশ্রিত ধাতুর পাত আর তার।

ডা. মিচেলের মাথা ক্রমশই বেশি গুলিয়ে গেছে। এগুলি যন্ত্রই যদি হয় তাহলে এ যন্ত্র সৃষ্টি করেছে কারা? পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক জাত কোথায় আছে? এ যন্ত্র প্রশান্ত মহাসাগরের এই নগণ্য দ্বীপে পাঠাবার তাদের উদ্দেশ্য কী? আর যন্ত্র হলেও এগুলি কোথা থেকে কে চালাচ্ছে?

এসব প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত সামান্য একটা দেশি পুলিশের ছেলেমানুষির ফলে সম্ভব হবে কে জানত! ডা. মিচেল কদিন ধরে এ রহস্য ভেদ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হতাশ মনে তখন সান ক্রিস্টোভাল হয়ে আবার অস্ট্রেলিয়া ফিরে যাবার সংকল্প করেছেন। এত বড়ো আবিষ্কারের কথা কিছুই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে জানাতে পারবেন না, এই তাঁর দুঃখ। আসল রহস্য সমাধান

pathagar.net

না করতে পারলে সাগর থেকে যন্ত্র-দানব ওঠার কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোলেও যে পাগলামি বলে গণ্য হবে, একথা তিনি জানেন। তাই তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকাই উচিত বলে ঠিক করেছেন।

রওনা হবার আগের রাত্রে একজন দেশি পুলিশকে তাঁর জিনিসপত্র গোছাতে বলে তিনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন মি. বাফেটের সঙ্গে। ফিরে এসে পুলিশের কাণ্ড দেখে তিনি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সে হতভাগা তাঁকে তখন লক্ষ করেনি। মাছের পটকার মতো রবারের থলেটা সে ঘুসি মেরে ফাটাবার মজাতেই মত্ত।

তার গালে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করবার জন্য ডা. মিচেল পেছন থেকে হাত তুললেন, কিন্তু চড় মারা আর হল না। হঠাৎ ফট্ করে পটকার মতো থলেটা ফেটে গেল এবং তার থেকে কিলবিল করে যে জিনিসটা বেরিয়ে এল তার দিকে চেয়ে ডা. মিচেলের চোখে আর পলক পড়ল না বলা চলে!

জিনিস নয়, সেটি একটি প্রাণী—অদ্ভুত জাতের একটি অক্টোপাস। তাঁর চোখের সামনেই তার চেহারা ফুঁ-দেওয়া বেলুনের মতো ফুলে উঠে ফুটি-ফাটা হয়ে গেল। ডা. মিচেল বিস্ময়ে উত্তেজনায় খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি!'

মি. বাফেট ছুটে এলেন, 'কী পেয়েছেন মি. মিচেল?'

'কী আবার! সাগর-দানবের রহস্যের কিনারা! আসল সাগর-দানব কে জানেন? ওই দেখুন। মানুষ যেমন সমুদ্রে সাবমেরিন চালায় এও তেমনি স্থলের ওপর ওঠার যন্ত্র আবিষ্কার ও আয়ত্ত করেছে।'

ডা. মিচেল তারপর একটু বিশদ করে রহস্যটা বুঝিয়ে দিলেন।

যে যন্ত্রটি তারা দেখেছেন, সেটি সাগর-দানবের বাহন মাত্র। সাগর-দানব আসলে ওই ছোটো অক্টোপাস।

সমুদ্রের বুকে অত্যন্ত গভীর স্তরে যে তার বাস, রবারের থলে ফেটে যাবার পর তার দেহ ফেঁপে ফুলে ওঠাই তার প্রমাণ। সমুদ্রের নীচে জলের চাপ অনেক বেশি, সেই চাপ ও স্বাভাবিক জলের আবেষ্টন রবারের থলেটির ভেতর বজায় রাখবার ব্যবস্থা আছে। রবারের থলেটির ভেতর থেকেই সাগর-দানব তার যন্ত্র চালায়। ফেটে যেতে বাইরের চাপ হালকা হয়ে যেতেই সাগর-দানবের দেহের রবারের থলেটি ফেঁপে ফুলে এই অবস্থা হয়েছে।

মি. বাফেট সবিস্ময়ে বললেন, 'কিন্তু সামান্য অক্টোপাসের—'

ডা. মিচেল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'সামান্য নয় মি. বাফেট! অক্টোপাস যে সমুদ্রের সব জীবশ্রেণির মধ্যে সবেচেয়ে বুদ্ধিমান, এ প্রমাণ আমরা আগেও পেয়েছি। তবে, এতদূর যে তারা যেতে পারে তা ভাবতে পারিনি।'

তারপর ডা. মিচেল সাগর-দানবের রহস্য সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর প্রবন্ধ নানা বৈজ্ঞানিক কাগজে লেখেন, সাধারণের কাছে তা দুর্বোধ্য হলেও পৃথিবীর সর্বত্র বড়ো বড়ো দেশের টনক তাতে নড়ে উঠেছে। সাগরের অতলে অক্টোপাস জাতীয় যে প্রাণী ক্ষমতায় এতদূর অগ্রসর হয়ে মানুষের সঙ্গে টেক্কা দেবার উপক্রম করছে, তাকে অবজ্ঞা করা আর উচিত মনে হয়নি। সকলেই বুঝেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো গোপন কোণে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী জলজ প্রাণীর এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তার সন্ধান সময় থাকতে আর না নিলে নয়।

অত্যন্ত শক্তিমান একটা সাবমেরিন তাই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জল ঘুলিয়ে ফিরছে। সন্ধান কিন্তু এখনও মেলেনি।

হিমালয়ের চূড়ায়

সম্প্রতি যে-কটি হিমালয় অভিযান হয়ে গেছে তার কথা আমরা সবাই জানি। অবশ্য কোনো অভিযানই এ পর্যন্ত সফল হয়নি, একটি দুটি মানুষকে প্রত্যেক অভিযানে প্রাণও দিতে হয়েছে ; কিন্তু কুড়ি বৎসর আগে প্রথম যে হিমালয় অভিযান হয় তার মতো সর্বনাশা ব্যাপার কোনোটিতেই ঘটেনি। একশো কুলি ও ইয়োরোপের বাছা বাছা বাইশ জন পাহাড়ে ওঠার ওস্তাদ বীরের ভেতর একজন মাত্র সে অভিযান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরেছিলেন। তিনিই অভিযানের নেতা।

মানুষের স্মৃতি বড়ো দুর্বল, তাই কুড়ি বৎসর আগে যে অভিযান নিয়ে কাগজে কাগজে কৌতূহল-প্রশ্ন ও নানা প্রকার আলোচনার আর অন্ত ছিল না, আজ তার কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। সে অভিযান যে রহস্যের মাঝে শেষ হয়, আজ তার সমাধান না হলেও কেউ আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে অভিযানের নেতা মি. লজ তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কোথায় যে আত্মগোপন করে ছিলেন তা নিয়ে তখন কিছুদিন নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা হলেও এখন আর সাধারণের সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল নেই।

হিমালয়ের শৃঙ্গে আরোহণের সেই রহস্য অভিযানের সঠিক বিবরণ চিরকালই হয়তো মানুষের অজ্ঞাত থাকতে পারত, মি. লজের সন্ধানও সাধারণের কোনোদিন হয়তো মিলত না।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরকম। আমার মতো অত্যন্ত সাধারণ একজন লোকের মারফত সেই রহস্যের সমাধান হবে কে তা জানত?

তাহলে গোড়ার কথাই বলি। গ্ল্যাসগোতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া সাঙ্গ করে আমি তখন কিছুদিনের জন্যে টহল দিতে বেরিয়েছি। প্রথমত ইংল্যান্ডের নানা জায়গা ঘুরে একদিন স্কটল্যান্ডের ছোটো একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পাহাড়ের উপত্যাকায় ছোটো গ্রামটি। আড়ম্বর নেই, ঐশ্বর্য নেই। লোকজনদের আচার ব্যবহার সেই সনাতন ধরনের। এ গ্রামে এলে ভুলে যেতে হয় যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা সমৃদ্ধ ব্রিটেনে আছি। গ্রামের এক ধারে পাহাড়ে ঝরনায় সেই মান্ধাতার আমলের উইন্ডমিল ঘুরছে। গ্রামের একটিমাত্র সরাইয়ে সাবেক কালের সাইনবোর্ড কালের সঙ্গে যুঝে যুঝে সাদা হয়ে গেছে।

সরাইটি প্রাচীন হলে কী হয়, খাবারদাবার ব্যবস্থা ভালো ; গ্রামটিও ছবির মতো। সুতরাং একদিনের জায়গায় কয়েকদিন না থেকে পারলাম না। রোজ সকালে উঠে খেয়েদেয়ে মাছ ধরতে যাই। ফিরে এসে সরাইয়ের বাইরে খোলা হাওয়ায় টেবিল পেতে আবার খাওয়া। বিকেলে বেড়িয়ে এসে খেয়েদেয়ে রাত্রে ঘুম। এ ছাড়া কাজ নেই। সরাইয়ে লোকজন খুব কম আসে। একজন মাত্র সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। লোকটি বৃদ্ধ। শুনলাম আজ বিশ বছর নাকি তিনি এখান থেকে নড়েননি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে সারাদিন তিনি বাইরে একটি চেয়ার পেতে বসে থাকেন। সরাইয়ের কর্তা বলেন, 'লোকটি বড়ো ভালো, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, তবে—'

'তবে কী'—জিজ্ঞাসা করায় সরাইয়ের কর্তা গলা নামিয়ে বললেন, 'লোকটির মাথায় ছিট আছে।'

দু-দিন বাদে আমিও সে পরিচয় পেলাম। এ কয়দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও সামান্য একটু সম্ভাষণ ছাড়া তার কোনো কথা হয়নি। সেদিন সকালে ছিপটিপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরোব, এমন সময় শুনলাম বৃদ্ধ ডাকছেন। কাছে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে একটা কাগজ, এবং ভদ্রলোক তা পড়ে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। কোনোরকম ভূমিকা না করেই তিনি বললেন, 'সব মুর্খ গোঁয়ারের দল!'

pathagar.net

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাদের কথা বলছেন?'

তিনি তেমনি উত্তেজিতভাবে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'কখনো পারবে না, কখনো না!'

তাঁর কথা কিছুই না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। বৃদ্ধ এবার বোধ হয় আমার অবস্থা সম্বন্ধে একটু সচেতন হয়ে বললেন, 'আজকের কাগজ পড়েছ? হিমালয় অভিযানে একজন মারা পড়েছে যে!'

হিমালয় অভিযানের এই দুর্ঘটনায় এই সুদূর স্কট পল্লির এক বৃদ্ধের এত উত্তেজিত হবার কী কারণ থাকতে পারে বুঝতে না পারলেও, বললাম, 'পড়েছি। যে লোকটি মারা গেছেন তিনিই পাহাড়ের সবচেয়ে ওপরে উঠেছিলেন। অত উঁচু পাহাড়ের ওপরকার পাতলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে না পেরেই সম্ভবত মারা গেছেন।'

বৃদ্ধ আমার প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে চেয়ে বললেন, 'ছাই জান তুমি!'

এবার আমার আত্মসম্মানে সত্যি আঘাত লাগল। রাগ একটু হলেও বৃদ্ধের বয়স স্মরণ করে সংযত হয়ে বললাম, 'স্কটল্যান্ডের পাহাড়ে আর হিমালয়ের শৃঙ্গে একটু তফাত আছে তা জানেন কি? সেখানকার হাওয়া এত পাতলা যে মানুষের পক্ষে নিশ্বাস নিতেও পরিশ্রম করতে হয়। যত ওপরে ওঠা যায় তত হাওয়া আরও পাতলা হয়ে যায়।'

বৃদ্ধ এবার শুধু একটু হাসলেন। তারপর খানিক চুপ করে থেকে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হিমালয়ের শৃঙ্গে তার চেয়ে ঢের বড়ো বিপদ আছে!'

বৃদ্ধের সঙ্গে এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা বৃথা বুঝে তখনকার মতো চলে গেলাম।

ঘণ্টা দুই বাদে ফিরে এসে দেখি, বৃদ্ধ তখনও বাইরে তেমনিভাবে বসে আছেন। সামনে তাঁর খবরের কাগজের হিমালয় অভিযানের পাতাটিই খোলা। বললাম, 'আপনার হিমালয় অভিযানে বিশেষ আগ্রহ দেখছি!'

বৃদ্ধ শুধু বললেন, 'হুঁ।' তারপর খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'বসুন।'

কী আর করি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বসতে হল। বৃদ্ধ বললেন, 'অভিযানের সমস্ত বিবরণ ভালো করে পড়েছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ বললেন, 'অত উঁচু শৃঙ্গে বরফের ওপর কোনোপ্রকার জানোয়ার থাকা সম্ভব না হলেও পায়ের দাগের মতো একরকম চিহ্ন দেখা গেছে তার কথা পড়েছেন?'

বললাম, 'ও তো সত্যি পায়ের দাগ নয়!'

বৃদ্ধ ব্যঙ্গ করে বললেন, 'সত্যি পায়ের দাগ নয়, কেমন?'

'তাহলে আপনি কী বলতে চান?'

বৃদ্ধ আবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি বলতে চাই, হিমালয় পাহাড়ে প্রাণীবিজ্ঞানের এখনও অনেক কিছু জানবার আছে!'

আমি একটু ব্যঙ্গ করেই বললাম, 'আপনি কী করে জানলেন?'

বৃদ্ধ ব্যঙ্গটুকু বুঝতে পেরে খানিক চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে অবশেষে বললেন, 'আমি মি. লজ।'

প্রথমটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভাবলাম, লোকটা পাগল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই সমস্ত কথা মনে পড়ে গেল। কয়েকদিন আগেই বিলেতের এক কাগজে হিমালয় অভিযান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে প্রথম অভিযানের নেতা হিসেবে মি. লজের সামান্য একটু বিবরণ বেরিয়েছিল—সেটা পড়েছিলাম। অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি মি. লজ'।

pathagar.net

বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন, 'আমিই মি. লজ, এবং আমার অহংকারে আঘাত দিয়ে তুমিই প্রথম এ খবর জানতে পারলে।'

এরপর আর আমার কিছু লেখবার নেই। সেইদিন রাত্রে মি. লজের কাছে তাঁর অভিযানের যে কাহিনি শুনলাম, তা-ই তাঁর নিজের ভাষাতেই তাঁর ডায়েরি থেকে এখানে প্রকাশ করছি। মি. লজের কাছে অনেক কষ্টে এ বিবরণ সাধারণে প্রকাশ করবার অনুমতি পেয়েছি। শুধু তাঁর বর্তমান ঠিকানা তাঁর নিজের অনুরোধে গোপন রাখলাম। এ বিবরণে শুধু সেই ভয়ংকর অভিযানের পরিণাম নয়,—কেন মি. লজ তারপর আত্মগোপন করেছেন, তাও জানতে পারা যাবে।

মি. লজের বিবরণ—

৭ই জুন, ১৯০৯

'আজ প্রায় ২৬০০০ ফুটের কাছাকাছি আমরা পৌঁছেছি। নিশ্বাস নেওয়া বেশ কষ্টকর। অক্সিজেন ঘন ঘন ব্যবহার করতে হচ্ছে। চারদিকের সাদা বরফের ওপর প্রতিফলিত উজ্জ্বল রোদের দিকে চেয়ে চেয়ে এর মধ্যেই আমাদের দুজনের চোখ উঠেছে ; বাকি সবাই রঙিন কাঁচের চশমা নিয়েছি।

'যে শৃঙ্গটিতে আমরা উঠতে চেষ্টা করছি তা এভারেস্টের মতো অত উঁচু না হলেও পৃথিবীর যেকোনো পাহাড়ের চূড়াকে লজ্জা দিতে পারে। যত এগিয়ে চলেছি তত নতুন বাধা এসে জমছে। এখন মনে হচ্ছে তিব্বতের দিক দিয়ে ওঠবারচেষ্টা না করে ভারতবর্ষের দিক দিয়ে গেলেই বোধ হয় ভালো হত। কাল একটি স্খলিত বরফের স্তূপের সামনে পড়ে আমাদের একটি তাঁবু পিষে গেছে। কী ভাগ্যি তখন সেখানে লোকজন ছিল না!

'তিব্বতি কুলিরা এর মধ্যে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। তাদের সামলানোই শক্ত হবে দেখছি। পাহাড়ে উঠতে তারা ওস্তাদ, খাটুনিকেও তারা ভয় করে না ; কিন্তু তারা উপরি পয়সার লোভেও আর উঠতে নারাজ ; তাদের বিশ্বাস পাহাড়ের ওপরে একরকম পিশাচের জাত আছে। ওদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের আজগুবি কল্পনা শুনলে হাসি পায়। আমি সেদিন ওদের সর্দারকে বললাম, 'বেশ তো, পিশাচ থাকে থাক, আমাদেরও বন্দুক আছে।' সর্দার তাতে খুব গম্ভীরভাবে হেসে বললে, 'বন্দুকে কী হবে? পিশাচেরা অদৃশ্য!' আমাদের হাসতে দেখে লোকটা চটেই গেল।

'তবে, পরশুদিন বরফে যে পায়ের দাগ দেখা গেছে সেটা ভারী রহস্যজনক। এত ওপরে অত বড়ো পায়ের দাগওয়ালা কোন জানোয়ার থাকা সম্ভব নয়। কুলিরা তো ভয়েই অস্থির! ওদের তাঁবুতে এর মধ্যে পিশাচ-পুজো আরম্ভ হয়ে গেছে। মি. আরভিং-এর চোখ-ওঠাটা এ সময় ভারী অসুবিধের হল দেখছি। তিনিই আমাদের ভেতর প্রাণীবিজ্ঞানবিদ। ওটা পায়ের দাগ না কী, তিনি বোধ হয় দেখলে বলতে পারতেন। বোধ হয় আমাদেরই ভুল হবে। বরফের ওপর অন্য কোনো স্বাভাবিক কারণে দাগ পড়েছে হয়তো।

৮ই জুন, ১৯০৯

'না, এবার আমাকেও ভাবিয়ে তুলল! আজ সকাল থেকে ভয়ানক বরফ পড়া আর ঝড় আরম্ভ হয়। তাঁবুর ভেতর গুটিসুটি মেরে সবাই ছ-সাত ঘণ্টা বসে কাটিয়েছি। দুপুরের দিকে একটু পরিষ্কার হতেই মি. বেন বললেন, আমি একটু বেরোব। এভাবে বসে থাকা যায় না। এখনি আবার ঝড় উঠতে পারে—বলেও তাঁকে নিরস্ত করা গেল না। পায়ে বরফ-জুতো বেঁধে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। এই ফিরবেন ফিরবেন করে সন্ধে হলেও তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। অথচ ঝড়ও থেমে গেছে। সন্ধে হতেও তিনি যখন ফিরলেন না তখন খুঁজতে বেরোতে হল। মি. বেনের পায়ের দাগ বরফের ওপর বেশ স্পষ্ট। বহু দূর পর্যন্ত তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, খানিক দূর গিয়েই তাঁর পায়ের দাগ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে কোনো খাদ নেই যে ভাবব তিনি পড়ে গেছেন, সেখানকার বরফ ঠুকে দেখলাম, তাও বেশ শক্ত। বরফের ভেতর

মাঝে মাঝে যে ফোকর থাকে সেরকম কোনো ফোকর দিয়েও তিনি গলে পড়েননি। তবে তিনি হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন কী করে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানেও সেইরকম রহস্যজনক পায়ের দাগ। বিপদের ওপর বিপদ ; আমাদের সঙ্গে যে দুজন কুলি মশাল নিয়ে এসেছিল তারা এই পায়ের দাগ দেখেই হঠাৎ মশাল নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তাঁবুর দিকে ছুট দিলে। অন্ধকারে বিনা আলোয় এই পাহাড়ের ভেতর পথ খোঁজা একেবারে অসম্ভব জেনে বাধ্য হয়ে তাদের পেছু পেছু ছুটতে হল। ভালো করে আশেপাশে দেখবার অবসরও পেলাম না। খানিক দূর গিয়ে একজনকে ধরে ফেলে তার হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিলাম বটে, কিন্তু তখন আবার ঝড় ওঠবার সূচনা দেখা দিয়েছে। বিষণ্ণ মনে তাঁবুতে ফিরে গেলাম। দ্বিতীয় ঝড়ের বেগ একটু শান্ত হয়ে এলে আমরা নিজেরা ক-জন মশাল নিয়ে আবার বেরোলাম বটে, কিন্তু নতুন বরফ পড়ে এবার সমস্ত পায়ের চিহ্ন ঢেকে গেছে। কিছুই পাওয়া গেল না।

৯ই জুন, ১৯০৯

'কুলিরা এবার খেপে উঠেছে। তাদের মাইনে চুকিয়ে বিদায় না দিলে তারা বোধ হয় আমাদের আক্রমণ করতেও পেছপাও হবে না। তিব্বতি কুলিদের এত কুসংস্কার আছে জানলে কখনো এদিক দিয়ে আসতাম না। তাদের অনুনয় করে, ভয় দেখিয়ে, ধমক দিয়ে, কিছুতেই কিছু ফল হয়নি। আজকের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এতদূর এসেও শেষকালে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে ভাবতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। অবশ্য ভয় যে আমারও একটু হয়নি এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। আজ সারাদিন আমরা সবাই আকাশ পরিষ্কার থাকায় মি. বেনের সন্ধান করেছি। কোথাও তাঁর চিহ্ন নেই। শুধু তাই নয়, আজ সকালে আমাদের তাঁবুর চারিধারে সেইরকম পায়ের দাগ দেখা গেছে। এ পায়ের দাগের অর্থ কী?

১০ই জুন, ১৯০৯

'সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ! মনে হচ্ছে আমার মাথা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে! আজ সকালেই আমাদের তাঁবুর আধ মাইল উত্তরে মি. বেনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। এ মৃতদেহ এখানে কী করে এল বুঝতে পারছি না। শুধু মৃতদেহ পেলে এমন কিছু ভয়ের কথা ছিল না। কিন্তু সে মৃতদেহ অর্ধভূক্ত, রক্তাক্ত। এই ২৬০০০ ফুট পাহাড়ের ওপর কী এমন জানোয়ার থাকা সম্ভব যা একটা জোয়ান মানুষকে মেরে ফেলে তাকে আহার করতে পারে? প্রাণীবিজ্ঞানে এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো লেখে না!

'কী ভাগ্যি কুলিরা কেউ সে মৃতদেহ দেখেনি! আমরা চুপেচুপে সেইখানেই তা গোরস্থ করেছি। এর মধ্যেই অর্ধেকের বেশি কুলি মাইনে বুঝে নিয়ে নেমে গেছে। বাকি ক-জনকে অনেক কষ্টে অনেক বকশিশের লোভ দেখিয়ে রাখা গেছে।

'আজ সবচেয়ে আশ্চর্য যে ঘটনা ঘটেছে তার মানেও এখনও বুঝতে পারছি না। মি. বেনের দেহ কবর দিয়ে আর সবাই চলে যাবার পরও আমি খানিকক্ষণ সেখান দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। আমার সঙ্গীরা তখন বহুদূরে। এ পায়ের শব্দ হঠাৎ কোথা থেকে এল ভেবে পেলাম না। হয়তো মনের ভুল ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম, কিন্তু পরক্ষণেই আমার ডান ধারে আবার সেই পায়ের শব্দ। চারিধারে ভালো করে চেয়ে দেখলাম, শুধু বরফে ঢাকা পাহাড় রোদে ঝলমল করছে, কোথাও কিছু নেই। সত্যিই এবার ভয় হল। এক পা এক পা করে তাঁবুর দিকে ফিরছি, মনে হল পেছনে যেন সেইরকম পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কিন্তু পরক্ষণেই কীসের ধাক্কায় একেবারে উলটে পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়েই রিভলভারটা খাপ থেকে বার করে উপরোউপরি দুটো গুলি সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার পরেই পায়ের শব্দ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আমার সঙ্গীরা গুলির আওয়াজ শুনে সবাই আবার

ছুটে এল। কিন্তু তাদের এ আজগুবি কথা কেমন করে বলি! বললাম—অমনি একটু গুলি ছুঁড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। তারা আমার মাথা খারাপ হয়েছে ভাবল কি না কে জানে!

১১ই জুন, ১৯০৯

'আজকের ডায়েরি এমন জায়গায় বসে লিখতে হবে কে জানত! তিব্বতি কুলিদের তাঁবুতে, তাদের ময়লা কাপড়ের অসহ্য দুর্গন্ধের সঙ্গে ধুনির ধোঁয়া সহ্য করে কোনোরকমে বসে লিখছি। আমার সমস্ত আশা একদিন হঠাৎ সফল হতে হতে একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। আমার সঙ্গীরা যে কোথায় আছে জানি না। নিজে কোনোদিন যে দেশে ফিরব, তাদের বিশেষ আশা নেই।

'সকালবেলাই আকাশ পরিষ্কার দেখে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠবার জন্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেশি উঁচুতে উঠবার সময় দরকার লাগবে বলে অক্সিজেনের গ্যাসওয়ালা একরকম মুখোস তৈরি করিয়ে আনিয়েছিলাম। সেগুলো ছাড়া বরফে গাঁথবার সড়কি ও বন্দুক রইল সঙ্গে। কুলিরা আর এগুবে না। আমাদেরই ভেতর কয়েকজন খাবারদাবার ও হালকা তাঁবুর সরঞ্জাম নিয়ে পেছনে আসবে। আজকে যত দূর উঠতে পারা যায় ততদূরে নতুন করে সাময়িকভাবে আমাদের তাঁবু ফেলতে হবে।

'ওঠার পথ এখানে ভয়ানক বিপজ্জনক। কিছুদূর একা একা ওঠা যাবে, তারপরেই একটি লম্বা দড়িতে সকলকে বদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকলে হঠাৎ একজনের পা ফসকালেও বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে। একজন পড়লেও অপর সকলের দ্বারা সে রক্ষা পায়।

'কিন্তু দড়ি ব্যবহারের সময়ই আর পেলাম না। আমি আর মি. সটন সকলের আগে ছিলাম, কিছুদূর যাবার পরই দেখা গেল, দু-দিক দিয়ে পাহাড়ে ওঠা যায়। কোন দিকে কীরকম সুবিধে আছে দেখবার জন্যে আমরা দুজনে দু-ধারে আলাদা হয়ে গেলাম। খানিক দূর পর্যন্ত দেখলাম, আমার দিকে পথ বেশ সোজা। পাশে অতল খাদ হলেও পাহাড়ের গায়ে-গায়ে পথ বেশ চওড়াভাবে উঠে গেছে। এদিকে এসে সুবিধে হয়েছে ভেবে মনের আনন্দে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে প্রথমে মনে হল, মি. সটন বুঝি ওধারে পথ না পেয়ে আমার দিক দিয়ে আসছেন। বললাম, আমার ভাগ্যই ভালো তাহলে আজ মি. সটন। কোনো উত্তর না পেয়ে কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। পেছু ফিরে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। সেদিন মি. বেনের গোরের কাছে যেরকম ধাক্কা খেয়েছিলাম, এই সংকীর্ণ জায়গায় সেরকম ধাক্কা খেলেই অতল খাদে পড়ে যাব বুঝে অত ভয়ের ভেতরও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু কার বিরুদ্ধে দাঁড়াব? কোথাও কিছু নেই। মনে হল, এই বিংশ শতাব্দীতে সত্যই কি তাহলে তিব্বতিদের অদৃশ্য পিশাচের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে হবে! পিশাচই হোক আর নাই হোক আমি লড়াই না করে মরব না পণ করে সামনে শূন্যের দিকে দু-বার গুলি ছুঁড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল তা কেউ বোধ হয় কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। অদ্ভুত এক আর্তনাদের সঙ্গে মনে হল, আমার গায়ে দু-মনি একটা বস্তা কে ছুঁড়ে দিয়েছে! টাল সামলাতে না পেরে সেই অদৃশ্য বস্তার সঙ্গে গড়িয়ে গভীর খাদে আমি পড়ে গেলাম। মনে মনে বুঝলাম, এই শেষ।

'....কিন্তু আয়ু আমার তখনও ফুরোয়নি। খাদ অতল হলেও বিদ্যুৎগতিতে তা দিয়ে গড়াতে গড়াতে বুঝতে পারলাম, খাদের গা একটু ঢালু। যতক্ষণ সমানভাবে এইরকম ঢালু থাকবে ততক্ষণ বিদ্যুৎগতিতে নামলেও আমার প্রাণের আশঙ্কা নেই ; কিন্তু সে আর কয় সেকেন্ড! অদৃশ্য বস্তুটাও আমার সঙ্গে কখনো আমার ওপরে, কখনো আমার নীচে গড়িয়ে পড়ছে টের পাচ্ছিলাম।

'কতক্ষণ এভাবে গড়িয়ে আসছি স্মরণ নেই। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার নামবার গতি মন্দ হয়ে এসেছে। ঢালু ক্রমশ কমে আসছে। আরও কিছুক্ষণ এইভাবে গড়িয়ে সামনের একটা বরফের ঢিবির গায়ে আটকে যখন থেমে গেলাম তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, অত বড়ো

পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গিয়েও সামান্য দু-একটা আঁচড় ছাড়া কোনো ক্ষতচিহ্নও আমার গায়ে নেই। বিধাতার দয়া ছাড়া একে আর কী বলতে পারি! কিন্তু একী?

'আমার সামনে বিশাল এক অদ্ভুত জীবের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। একমাত্র উত্তর-মেরুর ভাল্লুকের সঙ্গে সে জীবের তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে ভাল্লুকের চেয়ে এ জীব আকারে বড়ো এবং এর মুখের আকার ও চেহারাও ভীষণ। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, জানোয়ারটি যেন আগাগোড়া স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে তৈরি। তার গায়ের ভেতর দিয়ে তলার বরফ দেখা যায়। কিন্তু দেখতে দেখতে সে কাঁচের চেহারা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে এল। মিনিট দু-এক বাদে অবাক হয়ে দেখলাম, সে দেহ ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বাদে সে দেহ একেবারে কালো হয়ে গেল। এই কি তবে তিব্বতিদের অদৃশ্য পিশাচ? মি. বেন কি এরই হাতে প্রাণ দিয়েছেন?

'কিন্তু তখন এ রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে। বিধাতা আমার সেদিন সহায়। যে পাহাড়ে আটকে গিয়েছিলাম সেটা ঘুরে একটু এগোতেই দেখি, যে কুলিরা ক-দিন আগে আমাদের কাছে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে নেমে গিয়েছিল, তাদের তাঁবু। তারা ক-দিনে পাহাড়ের বাঁকা পথে যতটুকু নেমেছে, আমি এক ঘন্টার মধ্যে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে তার চেয়ে কম নামিনি।'

মি. লজের ডায়েরি এইখানেই শেষ। তারপর তিনি নিজের মুখে আমায় জানিয়েছেন যে সেই কুলিদের তাঁবুতে গিয়ে তাদের আবার ওপরে সঙ্গীদের খোঁজে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা কিছুতেই রাজি হয়নি। একা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সে চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে একেবারে পাগলামি বলেই তিনি নিজে আর কিছু করতে পারেননি। দু-দিন সে তাঁবুতে থাকবার পর তাঁরা ওপরের পাহাড়ের এক বিরাট বরফের স্তূপ খসে পড়ার শব্দ পান। এরপর কুলিরা আর সেখানে এক মুহূর্তও থাকতে চায় না। সেই অদ্ভুত জানোয়ারের মৃতদেহটাও তারা পিশাচের দেহ বলে তাঁকে আনতে দেয় না। তাদের সঙ্গে আরও নীচে গিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গীদের জন্যে আরও বহুদিন অপেক্ষা করেন, কিন্তু তাদের আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না। কুলিরা বলে যে সেই বরফের ধস নামার সঙ্গে সঙ্গেই তারা মারা পড়েছে। হয়তো তাই সত্য। তারপর তিনি যে কষ্টে তিব্বত থেকে দেশে ফেরেন তার বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এতগুলি লোকের মৃত্যুর গৌণ কারণ হবার দরুন তাঁর মনে যে গভীর অনুশোচনা হয়, তার জন্যেই তিনি গত ছয় বছর একেবারে আত্মগোপন করে আছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এগিয়ে আলাপ করবার মতো উৎসাহ ও মনের জোর তাঁর নেই।

সেই অদ্ভুত রহস্যময় জীব সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য জানিয়ে এ কাহিনি শেষ করলাম। মি. লজ বলেন যে তাঁর গোড়া থেকেই বোঝা উচিত ছিল—তিব্বতিদের এরকম বদ্ধমূল সংস্কারের কোনো একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। হিমালয়ের যেসব উঁচু জায়গায় কোনো জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয় বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, সেইখানেই এই অদৃশ্য জীব ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির যে অদ্ভুত জাদুতে উত্তর মেরুর ভাল্লুক সাদা হয়, সমুদ্রের তলায় মাছের গা দিয়ে আলো বেরোয়, জিরাফের গলা লম্বা হয়, তাতে কোনো জানোয়ারের দেহ অদৃশ্য হওয়া আশ্চর্যজনক হলেও অসম্ভব নয়। দেহের মাংস যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে অদৃশ্য হতে পারে এ সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় যে দেহ অদৃশ্য, মৃত্যুর পর রক্তের স্রোতের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে সেই দেহই, মি. লজ মনে করেন, তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। মি. লজ আশা করেন যে ভবিষ্যতে কোনো দুঃসাহসী শিকারি হিমালয়ের দুর্গম শিখর থেকে এই অদৃশ্য জানোয়ার এনে তাঁর কথা প্রমাণ করে দেবে। এবং তাঁর বিশ্বাস, এ জানোয়ারের অস্তিত্ব না জেনে ও তার বিরুদ্ধে প্রস্তুত না হয়ে হিমালয়ের শিখরে আরোহণের চেষ্টা গোঁয়ার্তুমি ; সে চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।

অবিশ্বাস্য

সত্যেনবাবুর শেষ জীবনে আমিই তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলাম। এই বিশালকায় বৃদ্ধের জীবন সাধারণ বাঙালির জীবনের চেয়ে যে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়, তাও জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

মধুপুরের তাঁর ছোট্ট নির্জন বাংলো-বাড়ির বারান্দায় বসে সন্ধ্যার পর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর পূর্বজীবনের অনেক কাহিনিই আমায় বলেছিলেন। সে সমস্ত কাহিনি নিয়ে চমৎকার একটা বই লেখা হতে পারে। তাঁকে কতবার সে কথা বলেছি। তিনি একটু ম্লান হেসে খানিক চুপ করে থেকে বলতেন, 'কিন্তু লোকে বলবে গল্প।'

তাঁর নিজের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাগুলিকে কেউ গল্প বলবে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেই ভয়েই বোধ হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর কাহিনিটি তিনি আমার কাছেও গোপন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের সবজান্তা ভাবকে তিনি সবচেয়ে ভয় ও ঘৃণা করতেন। কতবার তিনি আমার কাছে বলেছেন, 'সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এত বড়ো বিস্ময়ের জগতে বাস করেও মানুষ অন্ধ হবার বড়াই করে। তার ছোট্ট জগতের যেটুকু সে জানে তার বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে, এ তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও সে বিশ্বাস করবে না।' তারপর প্রায়ই দেখতাম কী যেন একটা বলতে গিয়েও তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করতেন। আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও স্নেহ থাকা সত্ত্বেও আমিও হয়তো তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারি, এই সন্দেহ তাঁর যায়নি। তাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমি জানতে পারলাম তাঁর মৃত্যুর পর।

নীচের কাহিনিটা তাঁর নিজের হাতে লেখা। যৌবনে তিনি যখন সায়ামের জঙ্গল জমা নিয়ে কাঠের কারবার করতেন, ঘটনাটি তখনই ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের ভেতরে যেভাবে, ও যে ভাষায় কাহিনিটা পাই, সেই ভাব ও ভাষা বরাবর বজায় রেখে কাহিনিটা প্রকাশ করলাম। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভার এখন পাঠকের ওপর। তবে, পৃথিবীর আর কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, শেষ পর্যন্ত সেই বিশালকায় ও বিশালহৃদয় বৃদ্ধের সরলতায় আমার বিশ্বাস অটুট থাকবে।

সত্যেনবাবুর কাহিনি

রাত অনেক হয়েছে। পাম্প-করা কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোটা মাঝখানে রেখে কেবিনের ভেতর দু-ধারে দুই ইজিচেয়ারে আমি আর ডাক্তারবাবু বসে আছি। কেবিনের ভেতর বসে এই গভীর রাত্রেও বাইরের অরণ্যকে ভোলবার উপায় নেই। দূরে কোথা থেকে হায়েনার লোমহর্ষক হাসি শোনা যাচ্ছে। বিকট সে শব্দ! হায়েনা জানোয়ারটি যে খুব ভীষণ তা নয়, কিন্তু শয়তানের অট্টহাসির মতো তার এই ডাকে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শিউরে ওঠে—শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে উঠতে চায়।

কেবিনের ভেতর সুখ-সুবিধের বন্দোবস্ত যথাসম্ভব আছে। আমাদের সবচেয়ে নিকটের লোকালয় যে একুশ মাইল দূরে এবং একুশ মাইলের ভেতর নিরবচ্ছিন্ন বিপদসংকুল দুর্গম জঙ্গল ছাড়া আর কিছু যে নেই, এই কেবিনের ভেতর বসে সেকথা মনে না হবারই কথা। কিন্তু ওই হায়েনার ডাক সেকথা ভালোভাবেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ডাক্তারবাবু গড়গড়ায় আরেকবার টান দিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন। কাঠুরেদের তাঁবুতে

হঠাৎ একরকম জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখেই তাঁকে সুদূর ব্যাংকক থেকে আনানো হয়েছে। প্রচুর ফি দেবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কোনো ডাক্তারকে প্রথমত এই বিপদসংকুল বনের ভেতর আসতে রাজি করানো যায়নি। শিকারপ্রিয় বলে ইনি নিজে থেকেই আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আজ সকালে চারজন অনুচর ও তিনজন মাঝি নিয়ে এসে তিনি নদীপথে পৌঁছেছেন।

হায়েনার ডাক থামতে না থামতেই আমাদের কাঠুরেদের তাঁবুতে হট্টগোল উঠল। এমন রোজই প্রায় ওঠে। বোধ হয় ছাগলের খোঁয়াড়ে চিতা পড়েছে। কাঠুরেদের সোরগোলেই বোধ হয় চিতা বেচারিকে ছাগমাংসের আশা ত্যাগ করে পলায়ন করতে হল। কিছুক্ষণ বাদেই আবার সব নিস্তব্ধ। অরণ্যের এ নিস্তব্ধতা ভয়ংকর। কেরোসিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় আকৃষ্ট হয়ে নানা জাতের পোকামাকড় ঘরে এসে জুটেছে, কেরোসিনের দেওয়ালে একটি টিকটিকি তাদের সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত। সেইদিকে চেয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনি তো এই জঙ্গলে অনেক দিন বাস করছেন। কেমন—না?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় তিন বচ্ছর হবে।'

'এর ভেতরে কোনো আশ্চর্য ঘটনা আপনার চোখে পড়েনি?'

'আশ্চর্য তো অনেক ঘটনাকেই বলা যেতে পারে। আপনি কীরকম ঘটনার কথা জানতে চাইছেন?'

'এই ধরুন কোনো নতুনরকম জানোয়ার। এ জঙ্গলে তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত আপনি ছাড়া কোনো মানুষ প্রবেশ করেছে কি না সন্দেহ। কতরকম রহস্যই তো এ জঙ্গলে গোপন থাকতে পারে।'

হেসে বললাম, 'তা পারে। কিন্তু আমার চোখে তো পড়েনি। আর-বছর একটা সাদা বাঘ মেরেছিলাম। কিন্তু সাদা বাঘ তো নানা জায়গাতেই দেখা যায়। তা ছাড়া বিশেষ নতুন কিছু দেখিনি। সেই পুরোনো অতি সাধারণ বাঘ, হাতি, অজগর, চিতা আর বুনো মোষ।...'

ডাক্তারবাবু আমার কথার ধরনে হেসে ফেলে বললেন, 'কিন্তু এই অরণ্যে মানুষের অজ্ঞাত অনেক রহস্য গোপন থাকতে পারে এ কথাও কি আপনি মানেন না?'

'তা মানি বই কী।'

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, 'ওই টিকটিকিটার দিকেই চেয়ে দেখুন না। সাধারণ যেসব টিকটিকি দেখেছি, তা থেকে একটু তফাত নয় কি?'

সত্যই টিকটিকিটা একটু ভিন্নরকমের, পিঠের কাছে যেন তার একটু কুঁজ আছে বলে মনে হল।

বললাম, 'এটা হয়তো একটা জাতের টিকটিকি। তাই বলে একে রহস্যময় জানোয়ার তো আর বলা যায় না!'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না।' তারপর টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে টিকটিকিটার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আচ্ছা, ঘা খেলে সব জাতের টিকটিকিরই তো ল্যাজ খসে যায়। দেখা যাক এটারও যায় কি না!'

কথা শেষ করার পূর্বেই তিনি ছুরিটা ছুঁড়ে মারলেন। দুঃখের বিষয়, ল্যাজে না লেগে ছুরির ফলাটা টিকটিকিটার গলার কাছ দিয়ে তার সামনে ডান পায়ের থাবার উপর গিয়ে পড়ল। টিকটিকিটা দেওয়াল থেকে মেঝেয় চিত হয়ে পড়ল। ভাবলাম বেচারি বুঝি মারাই গেল। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে একটা কাগজের ওপর তুলে নিলেন। দেখা গেল চোটটা থাবাতেই বেশি লেগেছে। তিনটে আঙুল কাটা গেছে। গলার কাটাটা সামান্য।

বললাম, 'মরে গেছে নাকি?'

'না, বড়ো কড়া জান এ জাতের। সহজে মরবার নয়। একটু অজ্ঞান হয়েছে মাত্র।'

pathagar.net

ডাক্তারবাবু কথা শেষ হতে-না-হতেই টিকটিকিটা ধড়মড় করে যেন জেগে উঠে, এক লাফে কাগজের ওপর থেকে নীচে পড়ে, কেবিনের তলার একটা ফাটল দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বললাম, 'আপনার রহস্যময় জানোয়ার যে পালাল!'

ডাক্তারবাবু হাসলেন। কত বড়ো ভয়ংকর রহস্য আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে তখন যদি জানতাম!

তারপর তিন-চার দিন কেটে গেছে।

ডাক্তারবাবুর ওযুধে অধিকাংশ কাঠুরে ভালো হয়ে উঠেছে। ডাক্তারবাবুর থাকবার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই, শুধু শিকারের লোভ ছেড়ে তিনি যেতে পারছেন না। একজন কাঠুরে খবর দিয়েছে যে নদীর ধারে একটা উঁচু গাছের ওপর থেকে সে ওপারে একপাল বুনো হাতি দেখেছে। তারা এইদিকেই নাকি আসছে। বুনো হাতি মারবার লোভে ডাক্তারবাবু আর কয়েকদিন যাওয়া স্থগিত করেছেন।

এত দিনের ভেতর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো ঘটনাই ঘটেনি। আমাদের চীনে রাঁধুনি একদিন অন্ধকারে কী-একটা জানোয়ার দেখে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু সে সাধারণত ভীষণ ভয়-কাতুরে। জানোয়ারের যে ভয়ংকর বর্ণনা সে দিয়েছে, তাতে কেউ বিশ্বাস করেনি। আর সেটা করাও শক্ত। কারণ একাধারে বাঘ, অজগর, কুমির ও হাতির সমাবেশ এক প্রাণীতে হওয়া সম্ভব নয়।

সকালবেলা কেবিনের সামনে পায়চারি করছিলাম। এক ভেলাবোঝাই কাঠ আগের সন্ধ্যায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদীর প্রবল স্রোতে সে ভেলা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বহুদূরে চলে গেছে। মনটা হালকা বোধ হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু তাঁর রাইফেলটা পরিষ্কার করছিলেন, হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমাদের চীনে রাঁধুনি এসে হাজির।

প্রথমে সে তো কথা কইতেই পারে না। খালি হাঁফায়। অনেকক্ষণ বাদে দম নিয়ে অসংলগ্নভাবে যা বললে তার অর্থ এই যে, আমাদের ছাগলের খোঁয়াড় ভেঙে সবকটি ছাগল কীসে খেয়ে গেছে। আজ সকালে ডাক্তারবাবুর জন্যে ভালো করে একটু মাংস রাঁধবে বলে সে একটা ছাগল কাটতে গিয়ে দেখে, ছাগলের খোঁয়াড়ের দরজা ভাঙা। ভেতরে খালি কটি হাড় আর মাংসের টুকরো ছাড়া অতগুলো জানোয়ারের কিছুমাত্র নেই।

সত্যিই ভয়ংকর সংবাদ। ছাগলের খোঁয়াড়ে চিতাবাঘ আগে পড়েছে বটে, কিন্তু দরজা ভেঙে এর আগে কোনো বাঘ ঢুকতে পারেনি। খোঁয়াড়ের দরজা বেশ মজবুত—চিতাবাঘ তো দূরের কথা, কেঁদো বাঘেরও সাধ্য নেই সে দরজা ভেঙে ঢোকে। এর আগে ছুট্‌কো দুটো-একটা ছাগল বাঘে নিয়ে গেছে। কিন্তু এমন সর্বনাশ কখনো হয়নি। তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে খোঁয়াড়ে গিয়ে দেখি, তার কথা মিথ্যে নয়।

ডাক্তারবাবু দরজাটা পরীক্ষা করে বললেন যে, বাইরে থেকে যে জানোয়ার ঠেলে দরজা ভেঙেছে, তার গায়ে অসীম ক্ষমতা। কারণ লোহার মজবুত কড়া ভেঙে একেবারে দুমড়ে গেছে।

সত্যি অবাক হয়ে গেছলাম। এত জোর কোন জানোয়ারের হতে পারে? বাঘ তো নয়ই, কারণ যদি-বা অসম্ভব বলশালী কোনো বাঘের দ্বারা সম্ভবও হত, তাহলেও একটার বেশি দুটো সে খেয়ে উঠতে পারত না। অন্যগুলো হয়তো মেরে যেত। কিন্তু এ যে সব বিলকুল সাবাড়! আর এরকম দরজা ভাঙতে পারে বটে হাতি, কিন্তু হাতি তো আর ছাগল খায় না।

আমাদের হতভম্ব ভাব দেখে চীনে রাঁধুনি অনেকক্ষণ বাদে সাহস করে বললে, 'আপনারা সেদিন ঠাট্টা করলেন বাবু! আমি কী আর অমনি-অমনি ভয় পেয়েছিলাম! এ সেই শয়তান জানোয়ারের কাজ! চোখে দেখলে হয়তো বিশ্বাস করবেন!'

আজ আর তাকে যেন ঠাট্টা করতে পারলাম না। ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরে বললাম, 'মেঘ না-চাইতেই জল এল নাকি! রহস্যময় জানোয়ারের কথা বলতে-না-বলতেই যে এসে হাজির!'

ডাক্তারবাবু মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে কী পরীক্ষা করছিলেন। কথা কইলেন না।

তরপর থেকে আমাদের বিপদের দিন শুরু হল। কাঠুরেদের ভেতরে কী যে ভয় ঢুকে গেল, সন্ধে হবার দু-ঘণ্টা আগে থেকে তারা কাজ-টাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। কার সাধ্য তাদের তখন কাজ করায়! আমরা নিজেরাও যে ভয় পাইনি, এমন নয়। তবে, মুখে সাহস না দেখালে চলে না। সারারাত পালা করে আমি আর ডাক্তারবাবু বন্দুক ধরে পাহারা দিই। খোঁয়াড়ের দরজা যে জানোয়ার অনায়াসে ভেঙে ফেলতে পারে, আমাদের কেবিনের দেওয়াল সে যে ভেঙে ঢুকবে, তা আর কী এমন আশ্চর্যের কথা!

দু-দিন বেশ ধীরেসুস্থে কেটে গেল। একজন কাঠুরে এসে খবর দিলে যে, বুনো হাতির দল নদী পার হয়ে বনে এসেছে! ডাক্তারবাবু ও আমি সারাদিন হাতি ধরবার সাজসরঞ্জাম করে প্রস্তুত হলাম। তার পরদিন সকালেই বেরোনো হবে ঠিক হল।

সর্বনাশ ঘটল ঠিক সেই রাত্রে।

রাত তখন প্রায় একটা হবে। হঠাৎ কাঠুরেদের তাঁবুগুলো থেকে ভীষণ সোরগোল উঠল। অভ্যাসমতো প্রথমেই মনে হল, ছাগলের খোঁয়াড়ে বুঝি বাঘ পড়েছে। তারপরেই মনে পড়ল, ছাগলের খোঁয়াড় তো আর নেই! তা ছাড়া এ তো বাঘ তাড়াবার শব্দ নয়, এ যে মানুষের ভীতি-কাতর আর্তনাদ! কাঠুরেদের তাঁবুগুলোর চারিধারে বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ির উঁচু বেড়া, সে বেড়া ডিঙিয়ে বাঘও ঢুকতে পারে না। বাঘের অত সহসও সাধারণত হয় না। তবে ব্যাপারটা কী! আমি ও ডাক্তারবাবু বেশ একটু গোলমালের ভেতর পড়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি আমাদের চাকরবাকরগুলোকে গোটাকতক মশাল জ্বালবার হুকুম দিয়ে টর্চলাইট ও বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাঠুরেদের আর্তনাদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু বেশিদূর এগোতে-না-এগোতেই জন-পঁচিশেক কাঠুরে প্রাণভয়ে পাগলের মতো হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল। ভয়ে তাদের গলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ কপালে উঠেছে। মুখে জল-টল দিতে দু-এক জনের জ্ঞান একটু ফিরে এল। কিন্তু তারা যা বললে, তার স্পষ্ট কোনো মানে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাত। এক হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। হঠাৎ মাঝরাতে নাকি তারা চমকে জেগে উঠে শোনে, বাইরের কাঠের বেড়া মড়মড় করে কীসের ধাক্কায় ভেঙে যাচ্ছে। তারপর কী যে হল, কে যে কোথায় গেল, কিছুই তারা বলতে পারে না। হঠাৎ যেন তাদের মনে হল, প্রলয় শুরু হয়েছে। তাঁবু, কাঠের ঘর, সব ধুপধাপ করে ভেঙে পড়তে লাগল কীসের চাপে। তারই ভেতর কীসে যেন ধরেছে এমনিভাবে অনেক কাঠুরে নানা জায়গা থেকে চিৎকার করতে লাগল। তারা কজন কীভাবে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তারা নিজেরাই জানে না। তাদের একজনের শুধু হাত ভেঙে গেছে। সে বললে, ঠান্ডা একটা একশো-মনি পাথর যেন তাঁবুর ওপরকার ছাদ ফুঁড়ে তার হাতের ওপর পড়ল! শোলার মতো হাতটা তৎক্ষণাৎ মুড়মুড়িয়ে ভেঙে গেল। সে ভাঙা হাতটা নিয়েই কোনোরকমে পালিয়ে এসেছে।

তাদের কথা থেকে কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার ডাক্তারবাবু? বুনো হাতির দল চড়াও হয়ে এল নাকি?'

'তাই হবে!' বলে ডাক্তারবাবু সেইদিকে বন্দুক তুলে ছোঁড়বার উদ্যোগ করতেই বললাম, 'ও কী করছেন! কাঠুরেদের গায়েও যে লাগতে পারে!'

'তাইতো!' বলে বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে কয়েকবার আওয়াজ করলেন। তারপর আমায় বললেন, 'আসুন দেখি! ব্যাপারটার অনুসন্ধান এক্ষুনি দরকার।'

মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন সব প্রায় আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কাঠের বেড়া, তাঁবু ইত্যাদি সব ছারখার হয়ে সে জায়গার যে অবস্থা হয়েছে, তাতে ভেতরে ঢোকে কার সাধ্যি! প্রায় একশোজন কাঠুরের ভেতর মাত্র জন-পঁচিশ পালিয়ে এসেছে। বাকি সকলের পরিণাম কী হয়েছে ভাবতে ভাবতে ভেতরে গিয়ে যা দেখলাম, সে ভয়ংকর দৃশ্য জীবনে ভোলবার নয়। মশালের আলোয় দেখা গেল, চারিদিকে রক্ত আর রক্ত! কোথাও একটা কাটা হাত, কোথাও কাটা পা। পঁচাত্তর জন কাঠুরেকে এমনি করে কোনো ভয়ংকর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

সভয়ে বললাম, 'এ কি বুনো হাতির পালের কাজ, ডাক্তারবাবু?'

'দেখা যাক।' বলে ডাক্তারবাবু কী যেন ভাবতে বসলেন।

পরের দিন সকাল হতে-না-হতেই ডাক্তারবাবু বললেন, 'বুনো হাতির পেছনে ধাওয়া করতে হবে। না হলে এরকম দৌরাত্ম্যের শেষ কোথায় কে জানে!'

যে জন-পঁচিশেক কাঠুরে বেঁচে ছিল, তারা কি আর সঙ্গে যেতে চায়? অনেকরকম অনুনয় বিনয় করে, ও শেষে ভয় পর্যন্ত দেখিয়ে তাদের রাজি করানো হল। আমাদের কেবিনের উত্তর দিকের জঙ্গলে বুনো হাতির দল চরছে বলে সংবাদ পাওয়া গেল। সে জঙ্গলটা বিশেষ ঘন নয়। শুধু মাঝে মাঝে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু গাছের সার। দুপুর নাগাদ আমরা হাতির পালের সন্ধান পেলাম। বিরাট জঙ্গলের ভেতর ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে হাতির পাল চলে বেড়াচ্ছে। কী ভীষণ তাদের চেহারা! দেখলেই ভয় করে। গর্জন শুনলে শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়।

হাতির পালের সন্ধান পেয়েই কিন্তু ডাক্তারবাবু কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। বুনো হাতি মারবার নিয়ম হচ্ছে, হাতির পালের পেছু-পেছু থেকে একটু ছটকানো হাতি বাছাই করে তার কানে বা বুকে অব্যর্থ লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমাদের সকলকে একটা করে খুব উঁচু ও মজবুত গাছ দেখে একেবারে ডগায় চড়ে বসতে বললেন। শুধু তাই নয়, বললেন গাছের ডালের সঙ্গে বেশ করে নিজেদের বেঁধে রাখতে ও তিনি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত একদম গুলি না ছুঁড়তে। এরকম অদ্ভুত প্রস্তাবের কোনো মানে খুঁজে না পেলেও তাঁর কথা আমরা অমান্য করলাম না।

গাছে চড়ে বসে আছি তো বসেই আছি। কিছুই আর হয় না। পায়ের তলায় আমাদের গাছের নীচে হাতির পাল চরছে, নীচের ডালপালা ভেঙে খাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু একবার তাঁর গাছ থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'সব ভালো করে নিজেদের গাছের সঙ্গে বেঁধেছ তো?' তারপর আবার সব চুপচাপ। বসে বসে শেষে ডাক্তারবাবুর পাগলামিতে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ডাক্তারবাবু সোল্লাসে উত্তরের দিকে হাত দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'টির‍্যানোসোরাস! টির‍্যানোরাস!'

গাছের ওপর থেকে জঙ্গলের বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর চিৎকারে অবাক হয়ে তাঁর নির্দেশমতো উত্তর দিকে দেখবামাত্র ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। হাত-পা সব তখন শিথিল। বাঁধা না থাকলে সত্যিই গাছ থেকে পড়ে যেতুম। উত্তরের জঙ্গল থেকে যে জানোয়ারটি বেরিয়ে আসছে, চোখে না দেখলে তার আকার ও ভীষণতা কল্পনা করা অসম্ভব। প্রথমে মনে হল, হয়তো স্বপ্ন দেখছি! পাহাড় কি চলতে পারে? কিন্তু স্বপ্ন নয়। পাহাড়ের মতোই বিশাল তার চেহারা! সেই পাহাড়ের মতো বিরাট দেহ থেকে যে দীর্ঘ গলাটি বেরিয়ে এসেছে, পৃথিবীর কোনো জিনিসের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সবচেয়ে বীভৎস বিকট তার দাঁতাল প্রকাণ্ড মুখ। সে মুখ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আগুনের মতো লাল একটা বিরাট জিভ লক লক করে বেরিয়ে আসছে, আবার ফুড়ুৎ করে ভেতরে চলে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবুর চিৎকারে স্মরণ হল, টির‍্যানোসোরাস। এই কি তবে পৃথিবীর আদিম যুগের

সেই বিশালকায় সরীসৃপ? বুনো হাতির পাল তখন ভয়ে খেপে উঠেছে। কোনদিকে যে কে পালাবে, তার ঠিক নেই। এই বিশালকায় টির‍্যানোসোরাসের কাছে হাতিগুলোকেও যেন ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছিল। ইঁদুরের মতোই এক-একটা হাতিকে সে থাবার এক চাপে বা ল্যাজের এক ঝটকায় মেরে ফেলছিল। এ অসম্ভব দৃশ্য কল্পনাও বুঝি করা যায় না। ভীত হাতির পাল প্রাণপণে চেষ্টা করলে কী হবে? হাতির পাল পঞ্চাশ পা দৌড়োলে টির‍্যানোসোরাস এক পা বাড়িয়ে তাদের ধরে ফেলে। দেখতে দেখতে সেই ভয়ংকর জানোয়ার আমাদের কাছে এসে পড়ল। ভয়ে আমি চোখ না বুজে পারলাম না। শুনলাম ডাক্তারবাবু চিৎকার করে বলছেন, 'খবরদার, আমার আগে কেউ গুলি ছুঁড়ো না! সাবধান! সাবধান!' তারপরই ডাক্তারবাবুর গাছ থেকে দড়াম দড়াম করে দু-বার শব্দ।

চোখ খুলে যা দেখলাম, তা মনে করলে এখন গায়ে কাঁটা দেয়। ডাক্তারবাবু গুলি খেয়ে উত্যক্ত জানোয়ারটা পেছনের দু-পায়ে ভর করে ডাক্তারবাবুর গাছ ধরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মাথা গাছের ডগার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে। ডাক্তারবাবুকে ধরে আর কি! উন্মাদের মতো হয়ে তার ওপর গুলি ছুঁড়লাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কথা নয়। অন্যান্য গাছ থেকেও তার গায়ে গুলি এসে পড়তে লাগল। কিন্তু তার যেন ভ্রুক্ষেপও নেই। শুধু ডাক্তারবাবুকে ধরাই তার একমাত্র লক্ষ্য। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, এত বড়ো বিপদেও অবিচলিত হয়ে ডাক্তারবাবু জানোয়ারটার মাথার দিকে লক্ষ করে বন্দুক ধরেছেন। টির‍্যানোসোরাসের লকলকে জিভটা একবার বেরিয়ে ডাক্তারবাবুকে স্পর্শ করল, তারপরেই গুড়ুম গুড়ুম দু-বার আওয়াজ। আর কিছু প্রয়োজন হল না। কাটা গাছের মতো জানোয়ারটার বিশাল গলা যেন হুড়মুড় করে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল। সে বিশাল দেহ একটু বুঝি নড়ে উঠল, তারপর কাত হয়ে স্থির হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু গাছ থেকে নেমে এলেন। আমরা তখনও সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'একেবারে দু-চোখের ভেতর দিয়ে গুলি মগজে বিঁধেছে। আর ভয় নেই।'

সেই বিরাট লাশটার পাশে দাঁড়িয়েও যেন ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ডাক্তারবাবু বললেন, 'কাঠুরেদের তাঁবু আক্রমণের দিন থেকেই আমার এরকম সন্দেহ হয়েছিল। তাই তোমাদের কিছু না জানিয়ে গাছে উঠেছিলাম। ওই শক্ত কাঠের বেড়া ভেঙে যে জানোয়ার অনায়াসে খাদ্যের লোভে ঢুকতে পারে, হাতির পালও যে সে আক্রমণ করবে, এ আমি জানতাম। তবে, সে জানোয়ার যে টির‍্যানোসোরাস হবে, তা ভাবিনি। পৃথিবীতে বিস্ময়ের বস্তু এখনও আছে!'

কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বাকি ছিল। টির‍্যানোসোরাসের লাশটার দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'এ কী! ডান থাবায় মাত্র দুটি নখ!'

সত্যিই তো। আর সব পায়ে পাঁচটা করে নখ থাকলেও সামনের ডান পা-টা যেন কেটে গেছে মনে হল। সে পায়ে দুটি মাত্র নখ!

ডাক্তারবাবু নিজের মনেই বলে যাচ্ছিলেন, 'প্রথম চীনে রাঁধুনির ভয় পাওয়া, তারপর ছাগলের খোঁয়াড় সাবাড়, তারপর কাঠুরেদের তাঁবু আক্রমণ।' ডাক্তারবাবু হঠাৎ পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে! সমস্ত বিজ্ঞান জগৎকে এবার আমি স্তম্ভিত করে দেব! এত বড়ো থিসিস কেউ কখনো ভাবতেও পারেনি! এমন ঘটনা দেখবার ভাগ্য কারোর হয়নি!'

লোকটা পাগল হল নাকি? বললাম, 'কী বকছেন ডাক্তারবাবু?'

'কী আবার বকছি!' দেখতে পাচ্ছেন, সামনে ওটা কী?'

'পাচ্ছি বই কী। আপনিই তো বললেন টির‍্যানোসোরাস।'

ডাক্তারবাবু হেসে উঠলেন, 'টির‍্যানোসোরাস না ছাই! টিকটিকি। টিকটিকি। ওটা আমাদের দেয়ালের সেই সামান্য টিকটিকিটা!'

আমাদের বিমূঢ় ভাব দেখে ডাক্তারবাবু আরেকটু স্পষ্ট করে বললেন, 'বুঝতে পারছেন না? সেই টিকিটিকিটাই বেড়ে বেড়ে এত বড়ো হয়েছে! মনে নেই, ছুরিতে তার তিনটে নখ কাটা গিয়েছিল—ওই ভালো করে দেখুন দেখি ওর ডান থাবাটা!'

'তা তো দেখছি, কিন্তু—'

'কিন্তু কিছু নেই এর ভেতর। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কারো এমন ঘটনা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে কি না জানি না। জানোয়ারটির ঘাড়ের কাছে খালের মতো একটা কাটা লক্ষ করছেন কি? মনে আছে, টিকটিকিটার গলাটায় একটু ছুরির আঁচড় লেগেছিল? সেই দাগই অত বড়ো হয়েছে। আমার ছুরি অজান্তে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে!'

'আরেকটু বুঝিয়ে বলুন ডাক্তারবাবু!'

'বুঝিয়ে আর বলব কী, আমিই কি সব বুঝি? শুধু বুঝেছি, ছুরিটা লেগে কোনোরকমে টিকটিকিটার ঘাড়ের গ্ল্যান্ড কীভাবে কেটে যায়। তারপর কেমন করে কী হয়েছে জানি না। গ্ল্যান্ডটা কাটা যাওয়ার ফলেই তার শরীরে এই অপূর্ব পরিবর্তন শুরু হয়েছে হয়তো। কোনো কোনো গ্ল্যান্ডের শরীরের ওপর এই প্রভাব আছে বলে শুনেছি। যেমন ধরুন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। এক্ষেত্রে কোন গ্ল্যান্ড কীভাবে কাটা গেছে জানি না ; শুধু বলতে পারি যে তারই ফলে ওই জানোয়ারটি বড়ো হয়ে আমাদের রাঁধুনিটাকে ভয় দেখিয়েছেন, আরও বড়ো হয়ে ছাগলের বংশ নাশ করেছেন, তারপর আমাদের কাঠুরেদের সর্বনাশ করে এখন আমাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আরও কিছুদিন বাঁচলে আরও বড়ো হতেন কি না জানি না।'

'কিন্তু এ কি সম্ভব? শুধু একটা গ্ল্যান্ড কাটা গিয়ে এমন হতে পারে?'

এই প্রথম ডাক্তারবাবুকে একটু বিরক্ত দেখলাম।

'সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু হয়েছে তো দেখছি।' বলে তিনি জানোয়ারটার ঘাড়ের কাটা দাগটার ওপর ঝুঁকে কী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর ডাক্তারবাবু কয়েক দিন বাদেই চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তিনি সে থিসিস বোধ হয় লেখেননি। লিখলে বিজ্ঞান জগৎ সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে যেত, আর ডাক্তারবাবুর যশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহকারী হিসেবে আমার নামটাও বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকত।

করাল কীট

পেনাঙের সরকারি কীটতত্ত্ববিদ ড. সূর্যকান্ত সরকারের রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথা শোনেনি এমন লোক তখন সেখানে কেউ ছিল না। আমরা তখন ছোটো তবু আমাদের মনে আছে, কী গণ্ডগোলই না এই ব্যাপার নিয়ে হয়।

ড. সরকার সাধারণ লোক হলে এতটা হইচই হয়তো নাও হতে পারত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে তাঁর নাম তখন ইয়োরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত গবেষণা ও মতামত বিদেশের বড়ো-বড়ো বৈজ্ঞানিককে বিস্মিত করে দিয়েছে। সেই অসাধারণ লোকটি হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে একেবারে পৃথিবী থেকে যেন মুছে গেছে।

অনেকরকম কথাই তখন এই ব্যাপার সম্বন্ধে শোনা গিয়েছিল। পুলিশের লোক এ রহস্যের কিনারা করবার চেষ্টাও কম করেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ড. সরকারের কোনো সন্ধানই কেউ পায়নি। ড. সরকার অত্যন্ত সাদাসিধে লোক ছিলেন, বিজ্ঞানই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান ; বাইরের লোকের সঙ্গে তিনি বড়ো মিশতেন না। সুতরাং তাঁর কোনো শত্রু ছিল, এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

শহরের প্রান্তে ছোটো একটি বাড়িতে নিজের পরীক্ষাগারে রাতদিন তিনি কাজ করতেন। যেদিন সকালবেলা জানা যায় যে ড. সরকারের পাত্তা নেই, তার আগের রাত্রে পর্যন্ত তাঁর চাকর তাঁকে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেখেছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ড. সরকারের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগারের অধিকাংশ জিনিসও কেমন করে লোপাট হয়ে যায়। এই সূত্রটুকু ধরে পুলিশ অনেক দিকে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ড. সরকারের সঙ্গে তাঁর পরীক্ষাগারের জিনিস ও কাগজপত্র সরানোতে কার স্বার্থ থাকতে পারে কিছুই ভেবে উঠতে পারেনি।

এই ব্যাপার নিয়ে যাঁরা তখন নিজেদের মতামত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কীটতত্ত্বের অন্যতম পণ্ডিত প্রফেসর রসের কথাই একটু বিস্ময়কর। তিনি বলেন যে কিছুদিন থেকে ড. সরকারের ভেতর উন্মাদ হবার লক্ষণ তিনি টের পেয়েছিলেন। ড. সরকার নাকি এমন একটি অদ্ভুত মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিলেন, যা পাগল না হলে কেউ করে না। সেই মত যে সত্য তাই প্রমাণ করতেই তিনি ইদানীং ব্যস্ত ছিলেন। রস বলেন যে সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ড. সরকার উন্মাদ অবস্থায় তাঁর সমস্ত ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র নিয়ে জলে ডুবে বা ওইরকম কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে তাঁর মনে হয়। ড. সরকারের প্রতি তাঁর খ্যাতির জন্যে প্রফেসর রসের একটু ঈর্ষা ছিল জেনে লোকে এ মত অবশ্য হেসেই উড়িয়ে দেয়, কিন্তু তবুও পুলিশ কদিন কাছাকাছি নদীতে খোঁজাখুঁজি করেছিল। অবশ্য তাতে কোনো ফলই হয়নি। ড. সরকার তাঁর অন্তর্ধানের আগে কী পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তা জিজ্ঞাসা করায় রস কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে পারেননি। ভাসা ভাসা ভাবে তিনি যা বলেন তাতে শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে কীটদের শক্তি যে তাদের দেহের অনুপাতে মানুষ ও অন্যান্য যেকোনো প্রাণীর চেয়ে বহুগুণ বেশি—এই তত্ত্বটুকু ধরে তিনি নাকি কী অসাধ্য-সাধনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। রস এর বেশি আর কিছুই বলেননি বা বলতে চাননি এবং তারপর বহু বৎসর কেটে গেলেও ড. সরকারের এ অন্তর্ধান-রহস্যের কোনো সমাধানই হয়নি।

ড. সরকারের সেই রহস্যজনক অন্তর্ধানের সঙ্গে আমার জীবনের খানিকটা অংশ জড়িয়ে আছে, তাই তাঁর কথা একটু বিশদ করে লিখলাম। যে কাহিনি আজ বলতে চলেছি তা বিশ্বাস

করবার সাহস বেশি লোকের আছে বলে আমার মনে হয় না। অনেক বার তাই লিখি লিখি করেও এ কাহিনি লিখতে সাহস করিনি। মানুষের অবজ্ঞার চেয়ে মানুষের উপহাসকেই আমার ভয় বেশি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করে এ কাহিনি লেখা উচিত বলেই আমি স্থির করেছি। ড. সরকারের মহা সাধনার সামান্য একটু পরিচয় দেবার জন্যে হাস্যাস্পদ হবার ভয় তুচ্ছ করা যায়।

সেবার আমেরিকার এক ফিল্ম কোম্পানির কাছ থেকে মোটা লাভের একটা কাজ পেয়ে গিয়েছিলাম। ব্রহ্মদেশের বনে জঙ্গলে ঘুরে অনেক জায়গায় আমি শিকার করে ফিরেছি। বুঝি তার জন্যে শিকারি হিসেবে একটু নামও ছিল। আমেরিকান কোম্পানি একেবারে খাস জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেখানকার জন্তুজানোয়ারের ছবি নিতে চান। তাই জন্যেই তাঁরা আমার সাহায্য চেয়েছিলেন।

ছোটো একটি স্টিমলঞ্চে যাত্রী আমরা,—খালাসি সারেং বাদে মাত্র তিনজন। ফিল্ম কোম্পানির ক্যামেরাম্যান, কোম্পানির একজন প্রতিনিধি—তিনিই ফিল্মের পরিচালক, আর আমি। চলেছিলাম সরু একটি নদীপথ দিয়ে। সাধারণত এপথে স্টিমলঞ্চ চলে না। স্টিমলঞ্চ দূরে থাক, দেশি নৌকোও সে পথে ক্বচিৎ দেখা যায়। চারিধারে ঘন জঙ্গল। সেখানে মানুষ বাস করতে পারে না।

ইতিমধ্যে দু-এক জায়গায় আমরা নেমে ছবি তুলেছি, কিন্তু তেমন সফলকাম হতে পারিনি। শিকার করা আর বুনো জানোয়ারের ফিল্ম তোলা এক কথা নয়। কোনোরকমে লুকিয়ে-চুরিয়ে থেকে একটা তাগ করে গুলি করতে পারলেই শিকার সার্থক, কিন্তু ফিল্ম তুলতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। জানোয়ারকে মারা চলবে না, এমনকী তাকে জানতে দিলেও চলবে না যে তার গতিবিধি কেউ লক্ষ করছে।—এরকম হওয়া বড়ো শক্ত।

ছোটো নদীটি ক্রমশ সমুদ্রের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে চওড়া হয়ে আসছিল। খানিক বাদেই দেখা গেল, বিশাল এক গাঙের সঙ্গে সে গিয়ে মিলেছে। সমুদ্র তখনও দূরে, কিন্তু পারাপারহীন জলের বহর দেখে সমুদ্র বলেই ভ্রম হয়। সেই কূলহীন পারাবারের ভেতর মাঝে মাঝে এক-একটি দ্বীপ—ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন। দ্বীপগুলিকে নেহাত ছোটো বলা ঠিক নয়। লম্বায় চওড়ায় কোনো কোনোটা পাঁচ-ছ ক্রোশেরও ওপর। এমনি একটি দ্বীপে আমার লঞ্চ নোঙর করে সেখানে ছবি তুলব ঠিক করেছিলাম। দ্বীপগুলির সুবিধে অনেক। জন্তুজানোয়ারের সেখানে অভাব নেই, অথচ চারিধার জলে-ঘেরা হওয়ার দরুন তাদের বাগে পাওয়ার সুবিধে হয়।

যেতে যেতে আমাদের ডানদিকে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ দেখা গেল। দ্বীপটির গড়ন একটু অদ্ভুত। মানুষকে প্রবেশ করতে না দেবার জন্যেই সে যেন পাহাড়ের দেওয়াল তুলে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। দু-দিকে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ছোটো একটি নদীর মতো জলস্রোত দ্বীপের ভেতর গেছে। আমাদের ডিরেক্টর মি. নোব্‌ল্‌ তো দ্বীপটি দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এই দ্বীপেই তিনি ছবি তুলবেন, তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে গেল। সারেংকে ডেকে তৎক্ষণাৎ সেই দ্বীপের মাঝেকার জলপথ দিয়ে লঞ্চ চালাতে তিনি আদেশ দিলেন।

কিন্তু সারেং আদেশ পেয়েও নড়ে না। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, তার মুখ ভয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার হে?'

সে মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, 'আজ্ঞে, ও শয়তানের দ্বীপে আমরা যেতে পারব না!'

এদেশের লোকেদের অনেকরকম কুসংস্কার ও ভূতের ভয়ের কথা জানি, কিন্তু গোটা একটা দ্বীপের প্রতি এমন ভয়ের কথা কখনো শুনিনি। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শয়তানের দ্বীপ কীরকম?'

pathagar.net

'আজ্ঞে গত দশ বছর ধরে এদেশের লোক ও দ্বীপের কাছে ঘেঁষে না—এখানে শয়তান আছে!'

আমরা সবাই তো হো-হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, 'তা থাক, আমরা তাকেই খুঁজছি।'

কিন্তু সে নড়ল না। ভীত মুখে বললে, 'হাসবেন না সাহেব ; ওখানে যারা যায় কেউ ফেরে না।'

এবার মি. নোব্‌ল্‌ এই ছেলেমানুষি ভয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা রাখো। লঞ্চ ওইখানেই নিয়ে যেতে হবে। আমার আদেশের ওপর কথা চলবে না।'

সারেং শুকনো মুখে চলে গেল। কিন্তু তার ও খালাসিদের ভাবগতিক দেখে মনে হল, জীবনের আশা তারা একরকম ত্যাগ করেই দিয়েছে। দু-ধারে খাড়া পাহাড়, তার মাঝখান দিয়ে খানিক দূর স্টিমলঞ্চ চালিয়েই দেখা গেল, পাহাড় ঢালু হয়ে এসেছে। সামনে সমতল দ্বীপ একেবারে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢাকা। সুবিধে মতো একটা জায়গায় নেমে আমরা তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। তখনও সন্ধ্যা হতে ঘণ্টাখানেক বাকি আছে। আমাদের ক্যামেরাম্যান মি. লং বললেন, 'চলুন পাহাড়ে উঠে দ্বীপটা কত বড়ো দেখে আসি।'

তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়টি নিতান্ত কম উঁচু নয়, তবে ঢালু হওয়াতে উঠতে বেশি কষ্ট হল না। পাহাড়ের একেবারে উপরে উঠে দেখলাম যে, দ্বীপটিকে সামনে থেকে যতখানি মনে করেছিলাম তার চেয়ে সেটি অনেক বড়ো। অত উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকেও দ্বীপের অপর প্রান্ত ভালো করে দেখা গেল না। মেরগুই দ্বীপপুঞ্জের এইটি অন্যতম বড়ো দ্বীপ।

নেমে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ভুল করে সঙ্গে টর্চ আনিনি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অন্ধকার হয়ে গেলে পথ চিনতে বিশেষ কষ্ট হবে বুঝে তাড়াতাড়ি চলেছি। এমন সময় মি. লং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'ওকী!'

আমি তাঁর পেছন পেছন যাচ্ছিলাম, কিছু লক্ষ করিনি ; বললাম, 'কী?'

মি. লং উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার। আমার মনে হল ওই দূরের ঝোপটার কাছ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে একটা জানোয়ার চলে গেল!'

আমি এবার হেসে উঠে বললাম, 'সারেঙের কথায় আপনিও দেখছি ভড়কে গেছেন! জানোয়ার যাওয়া আর আশ্চর্য কী! এ দ্বীপে একেবারে কোনো জানোয়ার নেই ভেবেছিলেন নাকি?'

মি. লং একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'না না জানোয়ার শুধু নয়, অদ্ভুত রকমের জানোয়ার। এরকম জানোয়ার আর কখনো দেখিনি।'

মি. লং-এর ভয় দেখে এবার আমি মনে মনে হাসলাম। তিনি লজ্জিত হবেন ভেবে মুখে শুধু বললাম, 'আবছা আলোয় হয়তো ভুল দেখেছেন।'

আবার আমরা এগিয়ে চললাম।

কিন্তু বিপদ সেদিন আমাদের ভাগ্যে ছিল। খানিক দূর যেতেই একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাওয়ার দরুন একটু আগে থাকতেই যে এখানে অন্ধকার হয়ে যাবে, এ খেয়াল আমাদের হয়নি। শুধু অন্ধকার নয়, মনে হল পথও আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এই নতুন জায়গায় জঙ্গলের মাঝে পথ হারিয়ে ফেলা বিশেষ ভয়ের কথা।

মি. লং ভীত মুখে বললেন, 'আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না। অজানা জঙ্গলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে নাকি?'

আমি তাঁকে কী সাহস দেব বুঝতে পারলাম না। তাঁবুতে খবর জানাবার জন্যে দু-বার বন্দুকের আওয়াজ করলাম। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে শুধু সে আওয়াজ ধরে আমাদের খোঁজ

boiRboi.net

করা অসাধ্য। তা ছাড়া এ বন্দুকের আওয়াজকে বিপদের ইঙ্গিত বলে তারা নাও ভাবতে পারে। আবছা অন্ধকারে এবার কোনোরকমে দিক নির্ণয় করবার চেষ্টা করে যেতে লাগলাম।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, আমার সামনে লোহার তারের বেড়া। এ দ্বীপে লোহার তারের বেড়া এল কোথা থেকে কিছুই বুঝতে পারলাম না। সামনে চেয়ে অন্ধকারে লক্ষ করে দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অত্যন্ত জীর্ণ একটি কাঠের বাড়ি কোনোরকমে খাড়া আছে দেখা গেল। তারই চারিধারে তারের বেড়া। বেড়া অনেক জায়গাতেই ধূলিসাৎ হয়েছে।

মি. লং বললেন, 'এ দ্বীপে তো জনমনিষ্যি থাকে না, তাহলে এ কাঠের বাড়ি এল কোথা থেকে?'

বললাম, 'যেখান থেকেই আসুক, আপাতত ভগবানের দান বলে গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। এই অন্ধকারে তাঁবুতে ফিরে যাবার বৃথা চেষ্টা না করে এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক, অনেকটা নিরাপদ হওয়া যাবে।'

তারের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা সেই জীর্ণ বাড়িটিতে গেলাম। বাড়ি বলতে তার আর কিছুই নেই, তবু বন্য শ্বাপদের আক্রমণ থেকে রাতের মতো আত্মরক্ষা করবার জন্যে এর চেয়ে ভালো আশ্রয় মেলা ভার। ঠিক হল পালা করে আমরা সারা রাত জাগব। ছড়ানো কাঠ-কুটরো জোগাড় করে আগুনও জ্বালাবার বন্দোবস্ত করা গেল। ঠিক হল, প্রথমে মি. লং অর্ধেক রাত পাহারা দেবেন এবং বাকি রাত পাহারা দেব আমি। আলো জ্বেলে যা দেখলাম তাতে আমাদের বিস্ময় কিন্তু বেড়ে গেল। কাঠের ঘরটি প্রকাণ্ড। তার যে কোণে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সে কোণ থেকে আমাদের অগ্নিকুণ্ডের সামান্য আলোয় সমস্ত ঘর ভালো করে দেখা যায় না, কিন্তু অস্পষ্টভাবে তবু বুঝতে পারলাম, সাধারণ ঘর এটি নয়। অত্যন্ত ভগ্ন হলেও সে ঘরটির চারধারে বড়ো বড়ো তাক, এক ধারে একটি বড়ো টেবিল। তাক ও টেবিলের ওপর অসংখ্য যন্ত্রপাতি আর কাচের শিশি-বোতল ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। অবাক হয়ে তাই দেখছি, এমন সময়ে মি. লং একদিকের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি চমৎকার বাঁধানো খাতা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো, এর ভেতর থেকে এ বাড়ির রহস্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কি না! কোন দেশি ভাষায় লেখা বলে মনে হচ্ছে!'

খাতাটি হাতে নিয়ে তার ওপর একবার চোখ বুলোতেই আমার শরীর উত্তেজনায় কেঁপে উঠল থরথর করে। খাতাটির ওপর বড়ো অক্ষরে একটি নাম লেখা। বাংলা হরফে পড়লাম, 'ডায়েরি—সূর্যকান্ত সরকার।'

প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটলে অধীর আগ্রহে খাতাটা খুলে ফেললাম। পেনাঙের রহস্যের মীমাংসা বুঝি এতদিনে হল!

কিন্তু পড়া আর হল না। দরজার কাছে সহসা যে হুংকার শুনলাম তাতে বুকের রক্ত পর্যন্ত হিম হয়ে গেল। চেয়ে দেখি, দরজায় বিশাল আকারের একটি কেঁদো বাঘ। বাঘেরা এইরকম পুরাতন ভাঙা বাড়িতে কখনো কখনো আস্তানা পেতে থাকে জানতাম, কিন্তু এই বিশেষ বাড়িটি যে কোনো একটি ব্যাঘ্রের বর্তমান আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা ভাবিনি। বাঘের গর্জন শুনে বোঝা গেল, তাঁর গৃহে অনধিকার প্রবেশ তিনি মোটেই পছন্দ করেননি।

কোনো দিকে পালাবার পথ নেই। বন্দুক দুটোও যেখানে শোবার বন্দোবস্ত করেছিলাম সেখানে রেখে এসেছি। এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় দেখতে পেলাম না। একেবারে নিরুপায় হয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হবে জেনে ভয়ের চেয়ে আপশোসই হচ্ছিল বেশি। আর বেশি দেরি নেই, বাঘ আমাদের ওপর লাফ দিল বলে।

এমন সময়ে এক নিমেষের মধ্যে এমন একটি কাণ্ড ঘটে গেল যা ভাবলে এখনও গা

শিউরে ওঠে। বাঘের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেলাম, কিন্তু যেভাবে রক্ষা পেলাম তাতে আতঙ্ক আমাদের দশগুণ বেড়ে গেল বই কমল না।

হঠাৎ বাঘটা একবার পেছনে তাকিয়ে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ করে উঠল। বাঘের হুংকার শুনেছি ; কিন্তু বাঘের গলা থেকে যে ভীত আর্তনাদের মতো আওয়াজ বেরোতে পারে এ কখনো কল্পনাও করিনি। আশ্চর্য ব্যাপার! দরজা থেকে বাঘটা অদ্ভুত এই ভয়ের শব্দ করে হঠাৎ মনে হল যেন পালাবার চেষ্টা করছে।

পরমুহূর্তেই যে ব্যাপারটি ঘটল, অতি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নেও তেমন ব্যাপার বোধ হয় কেউ দেখেনি। বাইরে কোথা থেকে অদ্ভুত আকারের একটা হিংস্র জানোয়ার বাঘটার ঘাড়ের ওপর লাফ দিয়ে এসে পড়ল। সে জানোয়ারের ভীষণ হিংস্র মূর্তি বর্ণনার অতীত। এখন গোনবার সময় নয়, তবু আন্দাজে মনে হল গোটা আষ্টেক তার পা হবে, আর তার কুৎসিত বিপুল দেহের সামনে প্রকাণ্ড একটি হিংস্র মুখ। চোখগুলো তার মাথার ওপর বড়ো বড়ো দুটো ইলেকট্রিক বালবের মতো জ্বলছে। মনে হল সে চোখে কুটিল হিংসার যে রূপ দেখলাম পৃথিবীর কোনো পশুতে তা সম্ভব নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য সে জানোয়ারের শক্তি। অত বড়ো একটা বিশাল বাঘকে ঠিক ইঁদুরছানার মতো সে ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে তুলি নিল। তারপর চক্ষের নিমেষে আমাদের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে এক লাফে তাকে সহজে বয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঘটার কাতর চিৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে। কতক্ষণ যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে পারি না।

তারপর সে রাত যে কী কষ্টে কাটিয়েছি বলতে পারি না। এই ভয়ংকর দ্বীপে দীর্ঘ রাতের প্রত্যেক মুহূর্তটি মনে হচ্ছিল আর কাটবে না।

ভোর হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কোনোরকমে আমাদের তাঁবুতে না পৌঁছোতে পারলে আর উপায় নেই। সেখানেও সকলকে এই ভয়ংকর জানোয়ার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া দরকার। তাঁবু কোন দিকে হবে ঠিক জানি না, তবু দক্ষিণ দিকে সোজা গেলে নদীটি মিলবে এবং নদীর ধারে গেলে তাঁবু পাওয়া শক্ত হবে না জেনে সেদিকেই চললাম। চলা অবশ্য সোজা নয়। গভীর জঙ্গলে প্রতি পদে বাধা। দিনের আলোতেও তার অধিকাংশ জায়গা অন্ধকার। সেই জানোয়ারের কথা মনে করে চারিদিকে চোখ রেখে অতি সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। একটা ব্যাপার কাল থেকে আমার মনে হয়েছে। এ দ্বীপে এ পর্যন্ত ওই বাঘ ছাড়া সাধারণ কোনো জানোয়ার চোখে পড়েনি ; এ ভারী আশ্চর্যের কথা। এমনকী একটা পাখির গলাও ভোরেরবেলা শুনতে পাইনি। লংকে সেই কথাটা বলছি এমন সময়ে তিনি হ্যাঁচকা দিয়ে আমার হাতটা ধরে টেনে ঊর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা দৌড়ে গেলেন।

তিনি থামতে অবাক হয়ে বললাম, 'ব্যাপার কী?'

তিনি বললেন, 'দেখুন!'

এইবার দেখতে পেলাম। দূরে ছোটোখাটো একটি পিপের মতো মোটা ও হাত-দশেক লম্বা একটি অদ্ভুত জানোয়ার। সারা গায়ে তার সজারুর মতো বড়ো-বড়ো তীক্ষ্ণ কাঁটা আর একটু হলেই আমি সে জানোয়ারটার গায়ের ওপর পড়ছিলাম। অতি নিঃশব্দে তার চলা, এবং সৌভাগ্যের বিষয় গতি তার মৃদু। তার চলবার ভঙ্গি অনেকটা কেন্নো বা শুঁয়োপোকার মতো বলা যেতে পারে। আমি গুলি করতে যাচ্ছিলাম, মি. লং বারণ করলেন।

কিছুক্ষণ বাদে নদীর দেখা পেলাম। সে নদী ধরে অনেক দূরও গেলাম। কিন্তু কোথায় তাঁবু? সামনে নদীর একটা বাঁক, হয়তো সেখানেই সঙ্গীদের দেখা পাব ভেবে এগোতে যাচ্ছি এমন সময় বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। একটা-আধটা নয়, অনেকগুলি বন্দুকের একসঙ্গে অবিশ্রান্ত আওয়াজ। কী ব্যাপার কিছুই বোঝা গেল না। এ তো রীতিমতো যুদ্ধের বন্দুক ছোঁড়া বলে মনে হচ্ছে! তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলাম।

নদীর বাঁক ফিরতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে নিজেদের চোখকে প্রথমত বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। আমাদের তাঁবুগুলির ওপর প্রচণ্ড তুফান গেলেও বোধ হয় তাদের অত দুর্দশা হত না। সেগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে, আর সেই জায়গায় একটি দুটি নয়, গোটা-দশেক আগের রাতে যা দেখেছিলাম সেই হিংস্র জানোয়ার উন্মত্ত হয়ে সামনের দিকে একবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার গুলির শব্দে অসম্ভব লাফ দিয়ে পেছিয়ে আসছে। অত বড়ো একটা জানোয়ারের পক্ষে যে ওরকম লাফ দেওয়া সম্ভব, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নদীর ধারেই একটা উঁচু পাথরের ঢিবি। তারই ধারে আমাদের স্টিমলঞ্চের সবাই দেখলাম জড়ো হয়ে কোনোরকমে বন্দুক ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করছে, কিন্তু বেশিক্ষণ তারা তা পারবে বলে মনে হল না। হিংস্র জানোয়ারদের গতি বিদ্যুতের মতো দ্রুত। তাদের তাগ করে গুলি করা কঠিন। আমাদের লোকদের কাছে যা গুলি-বারুদ আছে তা ফুরিয়ে যেতে আর কতক্ষণ? তার পরে কী যে হবে কল্পনায় বুঝে শিউরে উঠলাম। কোনো উপায়ই কি আমাদের রক্ষা পাবার নেই? স্টিমলঞ্চটা নদীতে নোঙর ফেলা আছে। তাতে পৌঁছোলে হয়তো রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু ওই জানোয়ারদের ভেতর দিয়ে কে সেখানে যাবে। মরিয়া হয়ে একবার ঠিক করলাম যে পেছন থেকে ওই জানোয়ারগুলিকে গুলি করবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে কী ফলই বা হবে? গুলি আমাদের নিজেদের লোকের গায়েও তো লাগতে পারে। হঠাৎ মনে হল একটি মাত্র উপায় এখন আছে। তাতে ফল হবে কি না বলা যায় না, কিন্তু শেষ চেষ্টা একবার করা উচিত। মি. লংকে ইঙ্গিত করে আমি সন্তর্পণে নদীর ধারে গিয়ে নামলাম। মি. লং অবাক হয়ে বললেন, 'কী করছেন কী?'

বললাম, 'কথা বলবেন না, বন্দুকটা এক হাতে তুলে ধরে সাঁতরে আমাদের স্টিমলঞ্চ ধরতে হবে।' মি. লং বুঝলেন কি না জানি না কিন্তু নীরবে জলে নামলেন। যতদূর নিঃশব্দে পারা যায় সাঁতরে গিয়ে আমরা লঞ্চের কাছি ধরলাম। তারপর সন্তর্পণে ওপরে উঠে বললাম, 'চালাতে জানেন মি. লং?'

বিপদের ওপর বিপদ। মি. লং বললেন, 'জানি একটু-আধটু কিন্তু আগে কয়লায় আগুন দিয়ে স্টিম তৈরি করতে হবে।'

এ কথাটা আমার খেয়ালেই আসেনি। বললাম, 'কতক্ষণ লাগবে?'

লং বললেন, 'ঘণ্টাখানেকের কম তো নয়।'

ঘণ্টাখানেক অনেক দীর্ঘ সময়। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লোকেরা যুঝতে পারবে কি না জানি না। কিন্তু তখন ও ছাড়া আর উপায় নেই।

সেদিন যেভাবে কাজ করেছি এখনও মনে পড়লে ভয় হয়। স্টিমলঞ্চটি একেবারে নদীর ধারে বাঁধা। যেকোনো মুহূর্তে একটা জানোয়ার এসে ওপরে উঠতে পারে। ওদিকে প্রতিমুহূর্তে আমাদের লোকদের গুলি-বারুদ ফুরিয়ে আসছে।

কতক্ষণ বাদে যে স্টিম তৈরি হল বলতে পারি না। কিন্তু তখন আগুনের তাতে অনভ্যস্ত কাজে আমাদের সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। মি. লং লঞ্চটি চালিয়ে দিয়েই ভোঁ দিলেন। আমি ওপরে এসে একটা নিশান দুলিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'তৈরি থাকো সবাই, আমরা লঞ্চ নিয়ে যাবামাত্র লাফিয়ে উঠতে হবে!'

আমাদের লোকেরা প্রথমে স্টিম লঞ্চের ভোঁ শুনে তো অবাক। তারপর সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা জানোয়ার একেবারে তাদের মাঝে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। মি. নোব্‌ল্ দেখলাম বন্দুক ছুঁড়লেন। কিন্তু জানোয়ারটা এলিয়ে মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যে খালাসিটাকে সে ধরেছিল সেও মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—এমনি ও জানোয়ারের কামড়ের জোর! এ ব্যাপারেই বোঝা গেল বিপদ আমাদের এখনও শেষ হয়নি।

স্টিমলঞ্চ তাদের কাছে নিয়ে লাগাতেই খালাসির দল তো একেবারে উন্মাদের মতো এসে

তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। আশ্চর্য দেখলাম মি. নোব্‌লের মহত্ত্ব! শিকার পালায় দেখে জানোয়ারগুলো তখন মরিয়া হয়ে চারিদিকে অতি কাছে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তাদের একটা না একটা লাফিয়ে আমাদের লোকদের ওপর পড়বার চেষ্টা করছিল ও শুধু বন্দুকের আওয়াজেই ভয় পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। মি. নোব্‌ল্ কিন্তু সকলে না ওঠা পর্যন্ত সমানে সামনে দাঁড়িয়ে তাদের রুখলেন। তারপর সকলে ওঠার পর লাফিয়ে এসে স্টিমারে উঠে বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'গুলি শেষ হয়ে গেছে, আর এক মিনিট দেরি হলে আমরা কেউ বাঁচতাম না!' স্টিমার তখন পুরো দমে নদীর মাঝে এগিয়ে চলেছে। জানোয়ারগুলো তীরের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। এখন তাদের সেই হিংস্র দৃষ্টি মনে করলে আমার আতঙ্ক হয়! বিপদ তখনও কিন্তু দেখা গেল শেষ হয়নি। হঠাৎ একটি জানোয়ার উন্মত্ত হয়ে লাফিয়ে একেবারে আমাদের লঞ্চের ওপর এসে পড়ল এবং চক্ষের নিমেষে একটি খালাসিকে তুলে নিয়ে স্টিমার থেকে নদীর পাড়ের সেই প্রায় ত্রিশ গজ ব্যবধান অনায়াসে লাফিয়ে চলে গেল। বন্দুক তোলবার অবসর পর্যন্ত আমি পেলাম না।

দু-দুজন খালাসিকে সেবার এমনি করে হারিয়ে আমরা পরিত্রাণ পেলাম।

আমাদের প্রথম কথাবার্তা হল সে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যখন আমরা বহু দূরে নদীতে গিয়ে পড়েছি। মি. নোব্‌লের কাছে জানতে পারলাম যে ভোরবেলাই এ অদ্ভুত জানোয়ার আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে, এবং একটিকে ঠেকাতে না ঠেকাতে তাদের দশটি এসে জড়ো হয়। তারপর কীভাবে সবাই লঞ্চে না যেতে পেরে ওই পাথরের ঢিবির কাছে আশ্রয় নেয় সে কথাও শুনলাম। মি. নোব্‌ল এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু ও কী জানোয়ার বলতে পার মি. বোস? পৃথিবীর কোনো শিকারির কাছে এ জানোয়ারের কথা তো শোনা যায়নি!'

হঠাৎ মি. লং তাঁর পকেট থেকে একটা খাতা বার করে বললেন, 'বোধ হয় এই খাতায় এ রহস্যের সমাধান হতে পারে।'

দেখলাম, এ সেই 'সূর্যকান্ত সরকারের ডায়েরি'। এতক্ষণের উত্তেজনায় এ খাতার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সৌভাগ্যের কথা মি. লং এ খাতাটি বিপদের ভেতরেও হাতছাড়া করেননি। তাড়াতাড়ি সে খাতা লঙের হাত থেকে টেনে নিয়ে সেইখানেই পড়তে শুরু করলাম।

সে বৃহৎ খাতার সব কথা জানাবার এ জায়গা নয়। হয়তো কোনোদিন সে লেখা আমি প্রকাশ করতেও পারি। শুধু যে অদ্ভুত কথা সেই খাতা থেকে প্রথম আমরা জানতে পারলাম সেইটুকুই জানাব।

পৃথিবীর যে হিংস্রতম জানোয়ারের হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়ে এসেছিলাম, তা কী জান?

সে হল অসম্ভব আকারের মাকড়সা।

একথা বিশ্বাস করা কঠিন ; কিন্তু এই মাকড়শা ও ড. সরকারের অন্তর্ধান-রহস্য সেই খাতার দ্বারাই পরিষ্কার হয়ে গেল। পড়ে জানতে পারলাম ড. সরকার নিজের ইচ্ছেতেই তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুবিধে হবে বলে একদিন গোপনে একটি লঞ্চ ভাড়া করে তাঁর সমস্ত ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র সমেত এই নির্জন দ্বীপে অজ্ঞাতবাস করতে আসেন। নিজের পরীক্ষা সমাপ্ত করে একদিন আবার লোকালয়ে তাঁর ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল। সেই ইচ্ছে তাঁর পূর্ণ হয়নি। যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তিনি করতে চেয়েছিলেন তা সফল হওয়ার দরুনই তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

কীট-পতঙ্গের অসাধারণ শক্তি লক্ষ করে তাঁর মনে হয় যে এই কীটপতঙ্গকে কোনো উপায়ে আকারে বৃহৎ করতে পারলে মানুষ অন্যান্য পালিত পশুদের কাছ থেকে যা কাজ পায়

তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ পেতে পারে। তাদের আকার বাড়াবার গোপন উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ওই দ্বীপে যে রাক্ষুসে মাকড়শা ও শুঁয়োপোকা আমরা দেখেছি সে তাঁরই সৃষ্টি। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি কীট নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যের বিষয় আমরা সে দ্বীপে তাদের দেখা পাইনি। কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত হয়েছিল তাঁর কাল। ওই বৃহদাকার হিংস্র মাকড়সার হাতেই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণ যায়। বিজ্ঞানের সাধনায় নিঃস্বার্থভাবে অনেক তাপস নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন। ড. সরকার সেই মহাপুরুষদেরই একজন।

পরিশিষ্ট

ইচ্ছে ছিল, ড. সূর্যকান্ত সরকারের ডায়েরি একটু ধীরেসুস্থে ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে বার করা যাবে। সেবারের সেই ভয়ংকর দ্বীপের অভিযান থেকে ফিরে এসে সেই কাজেই মন দিয়েছিলাম। সাধারণ লোক হয়তো আমাদের কথা অবিশ্বাস করে হেসেই উড়িয়ে দেবে জেনেও আমি পেছপাও হইনি। কিন্তু দু-একজন বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত লোককেও আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলে এবং ড. সরকারের ডায়েরি দেখিয়ে বুঝেছিলাম যে শুধু সাধারণ লোক নয়—বিদ্যাবুদ্ধি যাঁদের আছে তাঁরাও এমন আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করতে বিশেষ উৎসুক নন। কিন্তু অবজ্ঞার হাসি ও উপেক্ষার লজ্জার ওপরেও যে জিনিস আছে তাই আমায় এ কাজে জোর দিয়েছিল। আমি মনে মনে জানতাম যে ড. সরকারের কীর্তিকে মানুষ একদিন না একদিন স্বীকার করবেই—সেই কীর্তিতে মানুষের উপকার হোক বা না হোক।

অবশ্য এখানে মনে হতে পারে যে দুঃস্বপ্নের দ্বীপে ড. সরকারের কীর্তির চাক্ষুষ প্রমাণ থাকতে আমাদের তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এত ভাবনার কী প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণ থাকলেই কি লোকে দেখতে চায়! সে চেষ্টা করতেও বাকি রাখিনি। স্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেন্টের গভর্মেন্টকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে আমি নিজে অনেক অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা তাতে গা করেনি। এমনকী আমাদের এই অভিযানের সংবাদ পর্যন্ত অধিকাংশ কাগজে ছাপতে রাজি হয়নি, গাঁজাখুরি গল্প বলে।

সেইজন্যে অন্য সব চেষ্টায় বিফল হয়ে অবশেষে আমি ঠিক করেছিলাম, ড. সরকারের ডায়েরিই আগে প্রকাশ করব। যদি তা পড়ে কারো এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার আগ্রহ হয়।

সেই কাজ নিয়েই আছি, এমন সময় মি. লঙের এক তার পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মি. লঙ ও মি. নোব্‌ল তাঁদের কাজ শেষ হলে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। যাবার আগে মি. লঙ এ ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্যে আয়োজন করবেনই বলে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিনি—এ কথা স্বীকার করছি। সুদূর আমেরিকায় গিয়ে এ কথা তাঁর মনে থাকবে ও এই নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যস্ত করবেন একথা আমার মনে হয়নি। কিন্তু কোনো কিছু মতলব করে গাফিলতি করার জাত তাঁরা নন। পৃথিবীর নতুন নতুন জিনিস জানবার অক্লান্ত উৎসাহ না থাকলে আজ তাঁরা এত শক্তিমান হয়ে উঠতে পারতেন না।

মি. লঙের টেলিগ্রামে ছিল—শিগগির চার হাজার ডলার পাঠাচ্ছি। দুঃস্বপ্নের দ্বীপে দ্বিতীয় বার অভিযান করবার আয়োজন করুন।

টাকা আসছে বুঝলাম, কিন্তু কীভাবে আয়োজন করতে হবে বুঝতে না পেরে একটু ফাঁপরে পড়লাম। অবশ্য কয়েকদিন বাদেই মি. লঙের লম্বা চিঠিতে সব পরিষ্কারভাবে জানা গেল। আমেরিকার এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমিতিকে আমাদের অভিযানের কথা জানিয়ে মি. লং এ বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছেন। তাদের নামেই অভিযান হবে—টাকাও দিচ্ছে তারা। সেখান থেকে মি. লং পরের স্টিমারেই একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে নিয়ে

pathagar.net

আসছেন,—তাঁর নাম ড. পামার। আমায় এখান থেকে দুটি ভালো ছোটো আকারের স্টিমার ও কয়েকজন বাছা বাছা খালাসি জোগাড় করতে হবে।

আমার এ সমস্ত জোগাড় করা শেষ হতে না হতেই একদিন মি. লং ও ড. পামার জাহাজ থেকে এসে নামলেন। সঙ্গে তাঁদের একবাকসো মালপত্র।

ড. পামারকে আমার প্রথম দিন থেকেই ভারী ভালো লাগল। ছোটোখাটো মানুষটি, বয়স পঞ্চাশের ওপরে, কিন্তু ছেলেমানুষের মতো উৎসাহ ও কাজ করবার ক্ষমতা। মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে। তাঁদের মালপত্র দেখে তো আমি অবাক। তার ভেতরে শুধু দুটি জিনিসের নাম করছি—একটি মেশিন-গান ও অপরটি একটি প্রকাণ্ড পিচকিরি। সে পিচকিরি দিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে কুড়ি হাত জমি একেবারে ভিজিয়ে দেওয়া চলে। পিচকিরি দেখে তো আমি অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ আবার কী?' ড. পামার উত্তরে একটু হাসলেন মাত্র—কোনো কথা ভাঙলেন না।

আমাদের কজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কদিনের ভেতরেই সব আয়োজন শেষ হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের দুটি স্টিমার নানারকম অস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে বোঝাই হয়ে যাত্রা করল। সন্ধ্যাবেলা আমরা ইচ্ছে করেই যাত্রার সময় ঠিক করেছিলাম, কারণ তাহলে পরের দিন ঠিক ভোরবেলা দুঃস্বপ্নের দ্বীপে পৌঁছোনো যাবে।

এ কদিন ধরে ড. সরকারের ডায়েরিতে আমি হাত দিতে পারিনি। ড. পামার ও লং কেউই সে কথা তোলেনওনি। রাত্রে স্টিমারের ডেকে তিনজনে মিলে বসে আছি, এমন সময় ড. পামার বললেন, 'সেই ডায়েরিটা সঙ্গে এনেছেন তো?'

আমি 'হ্যাঁ' বলাতে তিনি বললেন, 'আমাদের কিছু পড়িয়ে শোনান না।'

ডায়েরিটা আমার কেবিন থেকে নিয়ে এসে বললাম, 'এর অধিকাংশতেই কী করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পোকামাকড়ের আকার বৃদ্ধি করা যায় তার বর্ণনা আছে—সে আমি তো ভালো করে বুঝতেও পারিনি।'

ড. পামার তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে বললেন—'আছে নাকি? কই, একথা তো মি. লং আমায় বলেননি!'

মি. লং বললেন, 'আমি জানলে তো বলব!'

ড. পামার অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'যাক, আর কোনো ভাবনা নেই। ড. সরকারের কাজ আমি এই থেকেই বুঝে নিতে পারব। মাঝে মাঝে দেখছি ইংরেজিও আছে। যাক, বাকি সবের জন্যে না-হয় বাংলা আমি শিখে নেব।'

এই বয়সে ড. পামারের এই উৎসাহ দেখে সত্যই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'ড. সরকারের ডায়েরির শেষ পাতাগুলিই পড়ি শুনুন।'

মি. লং ও ড. পামার চেয়ার দুটো আরেকটু কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে বসলেন। আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পড়তে আরম্ভ করলাম।

রবিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, রাত্রি একটা।

'ঘুমোতে পারছি না। উৎকণ্ঠায় ঘুম কিছুতেই আসছে না। আজ দু-সপ্তাহ হল মাকড়সার ছানাগুলি তাদের যে জায়গায় আটকে রেখেছিলাম সেখানকার লোহার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের কোনো সন্ধান পাচ্ছি না। আমার একান্ত বিশ্বাসী মগ চাকরকে পাহাড় থেকে তাদের সন্ধান পাওয়া যায় কি না জানতে পাঠিয়েছিলাম। তারও কোনো সন্ধান নেই। ব্যাপার কী?

pathagar.net

'আমার পরীক্ষা সফল হয়েছে। যে কটি কীট নিয়ে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলাম, তাদের ভেতর মারা গেছে অতি সামান্য ; তা ছাড়া বাকি সবগুলিই আকারে যেভাবে বাড়তে শুরু করেছে, তাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি! কিন্তু তাদের যদি ধরে রাখতে না পারি তাহলে তাদের এই আকার বৃদ্ধির সকল তথ্য বিজ্ঞানের দিক দিয়ে জানা যাবে কেমন করে? এই সমস্ত বৃহদাকার কীটের শক্তি আমি যা অনুমান করেছিলাম তার চেয়েও এত বেড়ে গেছে যে তাদের ধরে রাখাই এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। একটা জোয়ান বাঘকে যে খাঁচায় ধরে রাখা যায়—তার গরাদ এদের কেউ কেউ অনায়াসে বেঁকিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।'

সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর।

'বন্দুক নিয়ে সারা রাত জেগে বসে আছি। বুঝতে পারছি—আমার এ পরীক্ষার ফল সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে আর জানানো হবে না। এ জংলা জনহীন দ্বীপে আমার সঙ্গেই তারা লোপ পাবে। আমি মরি তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু কোনোরকমে যদি আমার এতদিনের গবেষণার ফলাফল কোনো জায়গায় সভ্য জগতে পৌঁছোনো যেত! এখন মনে হচ্ছে, কেন সবাইকে লুকিয়ে এমন করে এই নির্জন জঙ্গলময় দ্বীপে যন্ত্রপাতি নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম! এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলময় দ্বীপে সভ্য মানুষের কোনোদিন আসবার সম্ভাবনা নেই আশেপাশের জংলি মগেরা পাঁচ-সাত বছরে এক-আধবার এখানে কাঠ কাটতে আসে। তারা আমার কাগজপত্র পেলেই বা কী বুঝবে! কিন্তু তখন অমন গোপনে না এলে আমার এ অদ্ভুত পরীক্ষায় কত বাধাই না জুটত! গভর্মেন্ট এরকম একটা দ্বীপ আমায় ছেড়ে দিত কি?

'কিন্তু এখনও কি আশা নেই? আমার যন্ত্রপাতি থাক। শুধু আমার বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা-লেখা এই ডায়েরিটি নিয়ে কোনোরকমে আমি এই জায়গা থেকে পালিয়ে যেতে পারি না কি?

'না, কোনো উপায় নেই। জীবনে শুধু বিজ্ঞানচর্চাই শিখেছি। নৌকো যদি বা মেলে, চালনো দূরের কথা কোন দিকে চালাতে হবে তাই ঠিক করতে পারব না, যেকোনো মুহূর্তে তারা এসে পড়তে পারে। আমারই সৃষ্টি থেকে আমার সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাধনা ধ্বংস হবে।

'এখনও আমার চাকরের মৃত্যুটা চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি! দু-দিন পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে কোনোরকমে সে আমার কাছে আসবার চেষ্টা করছিল। এসেও প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। হঠাৎ এই ভয়ংকর ব্যাপার। আমার চোখের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি হাত তোলবার অবসরও পেলাম না। মাকড়সাগুলো এই দুই সপ্তাহে যে এতখানি বেড়ে উঠতে পারে তা আমি কল্পনাও করিনি। হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় আছে, কিন্তু এদের আমি কোন অস্ত্রে ঠেকাব?'

মঙ্গলবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর।

'আজ সারাদিন তারা আমার ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখনও তাদের হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কেন যে সাহস করে তারা ভেতরে ঢোকেনি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি কতক্ষণ এই ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে পারব? তৃষ্ণায় বুকের ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে। বাইরের কুয়া ছাড়া জল পাবার কোনো উপায় নেই। কতক্ষণ আর তৃষ্ণার সঙ্গে যুঝব—তিন দিন, তিন রাত একটু ঘুমোতে সাহস করিনি। যেকোনো মুহূর্তে মনে হচ্ছে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জাগরণের ক্লান্তিতে বেহুঁস হয়ে পড়তে পারি। তারপর কী হবে? এই এতদিনের সব সাধনা লুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের কোনো কাজেই আমার এ জ্ঞান লাগবে না—এইটেই সবচেয়ে বড়ো দুঃখ। যদি কাউকে আমার এ অজ্ঞাতবাসের কথা জানিয়ে আসতাম।

pathagar.net

'কিন্তু সব ভেবেছিলাম ; শুধু, আমার সৃষ্টি এমন ভয়ংকর হয়ে উঠবে যে তাকে আর বাগ মানানো যাবে না, এ কথা কেমন করে জানব?

'না, তৃষ্ণা অসহ্য! সমস্ত রাত কি ওগুলো এমনি করে আমার ঘর পাহারা দেবে? তার চেয়ে একেবারে ঘরে ঢুকে আমায় শেষ করে দিক, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!

'জল আনতেই হবে। অন্ধকারে হয়তো দেখতে নাও পেতে পারে...'

পড়া শেষ হলে ড. পামার খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'ওই জল আনতে যাবার পথেই ড. সরকার মারা পড়েন, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মাকড়সাগুলি ঘরে কেন ঢোকেনি বুঝতে পারলাম না।'

তারপর খানিক আরও কী ভেবে বললেন, 'আগে থাকতে আর কেমন করেই বা জানবেন! নইলে ড. সরকার আরও নিরীহ কীট নিয়ে পরীক্ষা করলেই পারতেন।'

ভোর হতে না হতেই অদূরে দ্বীপের তীর দেখা গেল। আগের বারে যেদিকে আমরা নেমেছিলাম এ সেদিক নয়। এবার আমরা ইচ্ছে করেই দ্বীপের অপর প্রান্তে নামব ঠিক করেছিলাম। এদিকে কোনো পাহাড় নেই। সমতল তীর শুধু। স্টিমার তীরে লাগবার আগে আমরা দূরবিন দিয়ে সবাই একবার সমস্ত তীরটা ভালো করে দেখে নিলাম। এদিকে জঙ্গলও খুব পাতলা, যতদূর দৃষ্টি গেল সমতল খোলা প্রান্তরের মাঝে মাঝে কয়েকটা নারকেল গাছের সার। তার ভেতর কোনোপ্রকার জন্তুজানোয়ার দেখা গেল না। ঠিক হল এই তীরে জলের খুব কাছ ঘেঁষে আমাদের আস্তানা পাতা হবে। সে আস্তানা নানাদিক দিয়ে সুরক্ষিত করতেও আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম।

প্রথম দিন শুধু সেই আস্তানা পাততেই কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত যা তৈরি হল তা একটি ছোটোখাটো দুর্গবিশেষ। কাঁটাতারের বেড়া ও মোটা লোহার জাল দিয়ে ঢেকে তার ভেতরে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে আমরা যতদূর সম্ভব তা নিরাপদ করতে ত্রুটি করলাম না।

দ্বিতীয় দিন আমরা তিনজন কয়েকজন খালাসি নিয়ে দ্বীপের অন্ধি-সন্ধি জানবার জন্যে বেরোলাম। আশ্চর্যের বিষয়, মাইল চারেক এগিয়েও কোনো ছোটোখাটো জানোয়ারও আমরা দেখতে পেলাম না। অবশেষে একজন খালাসিকে একটা খুব উঁচু নারকেল গাছের ওপর উঠে দেখতে বলা হল। কিন্তু জঙ্গল এখান থেকে গভীর হবার জন্যেই হোক, বা যে কারণেই হোক, খালাসি নেমে এসে জানালে, কোথাও সে কিছু দেখতে পায়নি। আশ্চর্য ব্যাপার! আরও এগোব না পেছুব ভাবছি এমন সময় নিকটেই কোথা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনে আমরা চমকে দাঁড়ালাম। আওয়াজটা বিশেষ জোর যে তা নয়—অনেকটা করাত দিয়ে কাঠ চেরার শব্দের মতো।

একজন খালাসি বললে আওয়াজটা সে অনেক আগেই কবার শুনেছে। আমরা বন্দুক বাগিয়ে সতর্ক হয়ে একটু এগিয়ে গেলাম। আমাদের সঙ্গে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে সেই বিরাট পিচকিরিটা, ডাক্তার পামার কেন এনেছিলেন জানি না। সেটাও তিনি সঙ্গে আনতে বললেন। কিন্তু বেশি দূর আমাদের যেতে হল না। কিছু দূরেই কয়েকটা গাছের আড়াল সরে যেতেই শব্দ কোথা থেকে আসছে স্পষ্ট বোঝা গেল।

সামনেই দেখা গেল, দুঃস্বপ্নের দ্বীপে আগের বারে আমরা যা দেখেছি তার চেয়ে অনেক বড়ো একটি মাকড়সা! আমি দেখবামাত্র গুলি করতে যাচ্ছিলাম, ড. পামার বাধা দিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান একটু দেখি, গুলি করবেন না।'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'এ জীবটিকে তো আর চেনেন না! একটু দেখতে গিয়ে জীবনের মতো দেখার সাধ মিটে যাবে! বিদ্যুতের মতো ওর গতি!'

কিন্তু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আশ্চর্য হয়ে বন্দুক নামালাম। ব্যাপার কী? বিদ্যুতের মতো যে জানোয়ারের গতি, সে অতি কষ্টে ধুঁকতে ধুঁকতে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে কেন? শুধু তাই নয়, সেই এক পা যেতেই তার পাগুলো যেন মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ছে। আমাদের দেখে আক্রমণ করা দূরে থাক একটু তাড়াতাড়ি নড়বার চেষ্টাও তার নেই। অথচ আকারে আগের সে মাকড়শার প্রায় দ্বিগুণ এটিকে বলা যেতে পারে। সাহস করে আমরা এবার তার অত্যন্ত কাছে এগিয়ে গেলাম, একজন খালাসি একটা ঢিল পর্যন্ত তার গায়ে ছুঁড়ে মারল ; কিন্তু সেই করাতের মতো শব্দ করে অতি কষ্টে এগোবার চেষ্টা ছাড়া আর সে কিছু করলে না।

ড. পামার বললেন, 'না মি. বোস, দাও ওর ভবযন্ত্রণা শেষ করে। কোনোরকমে সাংঘাতিক জখম হয়েছে বোধ হয়।' কিন্তু আমি বন্দুক তোলবার আগেই বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, আস্ত শরীরটা পেতে চাই, গুলি করলে নষ্ট হয়ে যাবে।' তারপর তাঁর পিচকিরির মুখ খুলে আস্তে আস্তে একটু তার হাতলে চাপ দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের মতো খানিকটা কী জলীয় জিনিস বেরিয়ে পড়ে মাকড়সাটার সমস্ত গা ভিজে গেল। জলীয় জিনিসটার গন্ধটা কেমন যেন অদ্ভুত। আশ্চর্যের কথা এই যে পিচিকিরি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সাটা একেবারে নেতিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর দু-চার বার দু-একটা পা একটু নাড়বার পরই বোঝা গেল তার প্রাণ আর নেই।

মাকড়সাটাকে সযত্নে ঠেলাগাড়িতে তুলে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে যেতে ড. পামারকে পিচকিরিতে কী ছিল জিজ্ঞেস করলাম। তিনি একটু হেসে বললেন, 'বিশেষ কিছু নয়, মশা-মাছি পোকামাকড় মারবার জন্যে যে জিনিস আমরা ব্যবহার করি তারই একটু কড়া মিকশ্চার। মি. লণ্ডের কাছে সকল কথা শুনে আমি তখনই এ জিনিস তৈরি করতে অর্ডার দিই। আমি ঠিক জানতাম যে পোকা যত বড়োই হোক, পোকাই থাকবে। তাকে তাগ করে গুলি মারা শক্ত হতে পারে, কিন্তু এ বাষ্প বাতাসের সঙ্গে মিশে একবার গায়ে লাগলেই ওদের মৃত্যু।'

তারপর খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলেন, 'ব্যাপার যে কীরকম গুরুতর তা আপনারা ভেবে দেখেছেন কি না জানি না। কিন্তু আমি শুধু বিজ্ঞানের নতুন কথা জানবার জন্যে আসিনি, মানুষের এ থেকে কী ভয়ংকর সর্বনাশ হতে পারে সব ভালো করে ভেবে তা এড়াবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে এসেছি।'

আমাদের অবাক হতে দেখে তিনি আবার বললেন, 'পৃথিবীতে এমনিই তো হিংস্র জন্তুজানোয়ারের অভাব নেই। মানুষ অনেক যুগ ধরে তাদের সঙ্গে লড়াই করে বহু কষ্টে অনেক প্রাণ দিয়ে আজ পৃথিবীকে খানিকটা মানুষের বাসের যোগ্য করে তুলেছে। নগর বসিয়েছে, গ্রাম গড়ে তুলেছে, নির্ভয়ে শান্তিতে বসবাস করবার আয়োজন করেছে। এই সময়ে, ধরুন, যদি এই ভয়ংকর জানোয়ারের বংশ ধীরে ধীরে এই দ্বীপ থেকে ব্রহ্মদেশ, ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতবর্ষ, এশিয়া প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, কী ভয়ংকর ব্যাপার হবে! একেই এদের মারা কীরকম শক্ত তা তো দেখেছেন, তারপরে এই দ্বীপটুকু ছাড়িয়ে বড়ো জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে তাদের খুঁজে খুঁজে মারা একরকম অসম্ভব, এ বোধ হয় আপনাদের বোঝাতে হবে না। আর এইবেলা এই দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে থাকতে এদের সমূলে না মারলে পৃথিবীময় এদের ছড়িয়ে পড়া কিছুই আশ্চর্য না। তখন এই হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে যুঝতে পৃথিবীর কত গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে, কত বসতি লোপ পাবে তা কি ভেবেছেন? ড. সরকারের বৈজ্ঞানিক সাধনার কী ভয়ংকর পরিণামই তাহলে হবে বলুন দেখি! সুতরাং যেকোনো উপায়ে এই দ্বীপ থেকে এদের বংশ আমাদের নির্মূল করতেই হবে। আমরা যদি এ কাজ পারি, তাহলে পৃথিবীর লোক জানুক বা না জানুক, আমরা তাদের এত বড়ো উপকার করে যাব পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা নেই। এইজন্যেই আমাদের বৈজ্ঞানিক সমিতির দেওয়া টাকা ছাড়া আমার যা কিছু আছে সব আমি এই কাজে ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

সত্যি এভাবে আমরা কেউ এ ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি। ড. পামার যেভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এঁকে দেখালেন তাতে গা শিউরে উঠল! কিন্তু এই দ্বীপের ভেতরই যত এই জাতের জানোয়ার আছে তা কি আমাদের দ্বারা মারা সম্ভব? আমার মন কেমন হতাশ হয়ে গিয়েছিল, তবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এই মহৎ হৃদয় বৈজ্ঞানিককে প্রাণ দিয়ে আমি সাহায্য করব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আমাদের অভিযান যে এভাবে শেষ হবে তা কে জানত!

তারপর দু-দিন উপরোউপরি আমরা দ্বীপের এদিকের অর্ধেক অংশ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু গুটিকয়েক মরা ও কয়েকটি মুমূর্ষু মাকড়সা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। এতগুলি মাকড়সা কী করে একসঙ্গে এত জখম হল তাও আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না।

তৃতীয় দিন আমাদের সাহস বেড়ে গেল। কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আমরা পশ্চিম দিকের পাহাড় পর্যন্ত সমস্ত দ্বীপটা খুঁজে বেড়াতে বেরোলাম। সন্ধ্যাবেলা যখন সবাই আস্তানায় ফিরে এলাম তখন সকল দলের মুখেই সেই এক কাহিনি—দ্বীপময় নানা জায়গায় শুধু মরা ও মুমূর্ষু মাকড়সা পড়ে আছে। আমরা যা দেখে গিয়েছিলাম আকারে তারা তার চেয়ে ঢের বড়ো, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে জানি না ওই অত বড়ো হিংস্র জানোয়ারগুলির একটিও সারা দ্বীপে সজীব ও সতেজ নেই। দ্বীপে অন্যান্য জানোয়ার কয়েকটা পাওয়া গিয়েছে। একদল একটি হরিণ ও আর একদল একটি চিতা মেরে এনেছিল ; কিন্তু সে রাক্ষুসে মাকড়সা কোথাও কাউকে আক্রমণ করেনি।

ড. পামার একধারে এতক্ষণ চুপ করে বসে কী ভাবছিলেন। এইবার উঠে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কী করা যাবে, ড. পামার?'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'কী আর করা যাবে—সটান বাড়ি ফিরে যাওয়া!'

'সে কী, এত আয়োজন উদ্যোগ করে, এই জানোয়ারের বংশ নির্মূল না করেই যাব? আপনিই তো সমস্ত পৃথিবীর ভয়ংকর পরিণামের কথা বলে সেদিন ভয় দেখিয়েছেন!'

ড. পামার বললেন, 'না, আর আমাদের কিছু করবার নেই। প্রকৃতি নিজেই আমাদের কাজ সেরে নিয়েছে। ড. সরকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছোটো কীটকে বড়ো করেছিলেন, কিন্তু আর কিছু করবার সাধ্য তাঁর ছিল না। ওদের বাড়ই ওদের কাল হয়েছে। ওদের দেহের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে ওদের প্রাণশক্তি পাল্লা রাখতে না পারায় ওরা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে ধীরে ধীরে সব মারা পড়েছে। যাইহোক, ড. সরকারের সাধনা নিষ্ফল হবে না। এই থেকে মানুষ একদিন কিছু-না-কিছু উপকার পাবেই।'

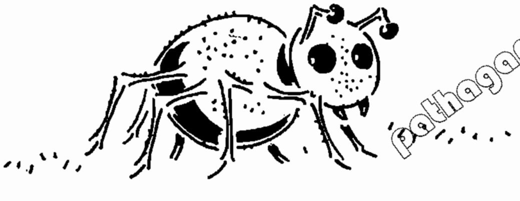

pathagar.net

pathagar.net

পরিরা কেন আসে না

পরিরা আর আসে না।

জামতাড়া কি জাঞ্জিবার—কোথাও না।

মেঘলা দুপুর কি জোছনা রাত,—কক্ষনো না।

পরিরা বলতে গেলে একেবারে ফেরারি। তাদের আর পাত্তাই নেই। গা-ই তাদের নেই, তবু বলা যায় তারা বেমালুম গা ঢাকা দিয়েছে।

অথচ এই সেদিন পর্যন্ত তাদের কখন না দেখা যেত, কোথায় বা নয়।

একটু নিরালা নির্জন জায়গা পেলে তো কথাই নেই! ঝিলের ধারে ঝাউতলা কি বনের পারে বড়ো জলায় গিয়েছ কি, কোনো-না-কোনো পরি হাজির আছেই।

আর পরি দেখেছ কি, অমনি বর পেয়েছ। বর দেওয়া সম্বন্ধে তারা একেবারে মুক্তহস্ত, মানে মুক্তকণ্ঠ। বর দেবার জন্যে রীতিমতো তাদের গলা সুড়সুড় করছে রাতদিন।

আর, বর বলতে সে কী যেমন-তেমন বর!

রাজ্য, রাজকন্যা তো কথায় কথায়! এমনকী হাঁচি কাশি দাঁত কনকন পর্যন্ত সারাবার বর তারা আপনা হতেই, না চাইতেই দিয়ে বসে আছে।

তখন তাই ভাবনা-চিন্তা একরকম ছিল না বললেই হয়।

থাকবে কোথা থেকে?

গরিব গৃহস্থের বউ হয়তো শাশুড়ির ভয়ে ভেবে সারা—বেড়ালে মাছ খেয়ে গিয়েছে হেঁসেল থেকে, এখন দজ্জাল শাশুড়িকে বোঝায় কী!

কিন্তু পরিরা থাকতে আবার ভাবনা!

ঠিক সময় বুঝে এক জলপরি কোথা থেকে এসে হাজির!

কাউকে কাঁদতে দেখলে তো আর রক্ষে নেই। জলপরি বর দেবার ফিকিরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গেরস্ত-বউয়ের চোখের জল দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'কাঁদছ কেন গা?'

গেরস্ত-বউ হয়তো অতটা খেয়াল করেনি, কে এসেছে না এসেছে। তা ছাড়া পরিদের আসাটাও নেহাত নিঃসাড়ে আবছারকম তো। সে ঝংকার দিয়ে বলে, 'আমি কাঁদছি তো তোমার কী গা? আমি তো আর তোমার ছেরোদ্দের পিণ্ডি কেঁদে ভাসাইনি!'

জলপরি এবার রেগে আগুন হয়ে ওঠে ভাবছ?

উঁহুঃ, তাদের চটানো অত সহজ নয়। অত চট করে চটলে তাদের চলেই না। একেবারে মধুর মতো মিষ্টি গলায় জলপরি বলে, 'আহা রাগ করো কেন? আমায় বলোই না কী তোমার দুঃখ!'

গেরস্ত-বউ এতক্ষণে জলপরিকে চিনতে পারে। চিনতে পেরে একেবারে জিভ কেটে লজ্জায় জড়োসড়ো। প্রথমে তো কথাই বলবে না, তারপর অনেক পেড়াপীড়িতে অনেক কষ্টে জানায় যে তার হেঁসেল থেকে বেড়ালে মাছ চুরি করে খেয়ে গেছে। শাশুড়ি জানলে আর রক্ষে থাকবে না।

গেরস্ত-বউয়ের মুখ থেকে কথাটা খসেছে কি না—ব্যস, জলপরি আর সেখানে নেই। তারপর চক্ষের পাতা পড়েছে কি না পড়েছে, আবার সে এসে হাজির।

আর, হাজির কি শুধু-হাতে?

মোটেই না।

pathagar.net

তার সঙ্গে মস্ত একটা—

ওমা, তাইতো! সঙ্গে মস্ত একটা হুলো বেড়াল!

গেরস্ত-বউ ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। জলপরির মুখে হাসি আর ধরে না। ভাবটা এই আর কি—কেমন, বলেছিলাম না, আমি থাকতে আর ভাবনা নেই!

পরিই হোক আর যে-ই হোক, গেরস্ত-বউ আর তোয়াক্কা রাখে না। তার মেজাজ দস্তুরমতো বিগড়ে গেছে। খরখরিয়ে বলে ওঠে, 'বলি, কেমনতর পরি গা তুমি!'

জলপরি বেশ একটু হকচকিয়ে যায়। বলে, 'কেন এই তো—মানে এই তো সেই হুলো বেড়াল, যে তোমার হেঁসেলের মাছ খেয়েছে!'

'—তা, আমি কি ওই হুলো বেড়াল ভেজে শাশুড়িকে দেখাব?'—খেঁকিয়ে ওঠে দুখিনী গেরস্ত-বউ।

জলপরি একেবারে অপ্রস্তুত।

ছাড়া পেয়ে হুলো বেড়াল তখন আড়াই পা গেছে কি না গেছে, জলপরি মস্ত বড়ো এক মাছ—জলজ্যান্ত, জলের মাছ নিয়ে এসে হাজির।

সে মাছ নিয়েও কম ফ্যাসাদ নয়। মাছ বলে মাছ! সে মাছে অমন দশটা গেরস্তের জ্ঞাতি-ভোজন হয়ে যায়!

এত বড়ো মাছ নিয়ে এখন গেরস্ত-বউ করে কী?

যা-ই করুক, আমাদের এখন তা ভাবলে তো চলবে না। আমাদের আসল কথাই বাকি।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম,—পরিরা আসে না। আসে না আজ অনেক দিন।

পরিদের শেষ আবির্ভাবের তারিখ হল ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সাল। এখানে অবশ্য জানিয়ে রাখা ভালো যে, এই তারিখ নিয়ে সামান্য একটু মতভেদ পণ্ডিত-মহলে আছে। বিশ্ববার্তা-সংগ্রহের সম্পাদকের মতে পরিদের শেষ আবির্ভাব ঘটে ৭ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সালে। সাল ও মাস সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করলেও বিজ্ঞান কল্পতরুর রচয়িতা বিশ্ববার্তা-সংগ্রহের দেওয়া তারিখ সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে মনে করেন। তাঁর মতে পরিরা শেষ পৃথিবীতে দেখা দেয়—৭ই নয়, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সাল।

বিশ্ববার্তা-সংগ্রহ ও বিজ্ঞান-কল্পতরুর মধ্যে এই তারিখের তর্ক নিয়ে দু-বছর ধরে যা যা লেখা হয়েছিল এবং পরে এই তর্ক মানহানির মোকদ্দমায় গড়ালে তাতে উভয় পক্ষ থেকে যা যা জেরা ও জবানবন্দিতে বলা হয়েছিল, সমস্ত পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তই করেছি যে, ৭ এবং ১১ এই তারিখ নিয়ে যে গোলযোগ, এই তারিখ দুটি যোগ করে দিলেই তার মীমাংসা হয়ে যায়। কারুরই তখন কিছু আপত্তি করবার থাকে না এবং আপত্তি করলেই বা শুনবে কে?

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সালেই সর্ববাদিসম্মতরূপে শেষবার পৃথিবীতে দেখা দেয়।

কোথায় দেখা দেয় জানো? বিষমগড় রাজ্যের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানবাটিকায় যুবরাজ পরমভট্টারক শ্রীশ্রীধুরন্ধররাম ধনুষ্টঙ্কারের সামনে।

পরির আবির্ভাবের কাহিনি শুরু করবার আগে বিষমগড় রাজ্যের একটু বর্ণনা বোধ হয় দেওয়া দরকার।

বিষমগড় রাজ্যটি হল ঠিক রামখেলখণ্ড রাজ্যের দক্ষিণে। রামখেলখণ্ড রাজ্যটি কোথায় যদি না জানা থাকে, তাহলে আমি নাচার। তবে, নিতান্ত অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞের জন্যে বিষমগড় রাজ্যের একটি চৌহদ্দি এখানে দিয়ে দেওয়া হল।

বিষমগড় রাজ্যের দক্ষিণে বিরাট মরুভূমি। তার পূর্বদিকে এক বিশাল তৃণপাদপহীন

pathagar.net

বালুকাময় প্রদেশ, তার পশ্চিমে যতদূর দেখা যায় শুধু বন্ধ্যা বালির সমুদ্র এবং তার উত্তরে—ওঃ! উত্তরে রামখেলখণ্ড বুঝি আগেই বলেছি? তা, যাই বলে থাকি, রামখেলখণ্ড আসলে এমন একটি জায়গা—যেখানে কি আকাশে, কি নীচে, কোথাও জলের বাষ্পটি নেই। সেখানে না জন্মায় কিছু, না থাকে জনমানিষ্যি। সত্যি কথা বলতে কী, রামখেলখণ্ডকে মরুভূমি বলে কেউ বর্ণনা করলে তার নামে মামলা আনা যায় না।

বিষমগড় রাজ্যের চারিধার যেমন নীরস, সে রাজ্যের বাসিন্দাদের ভেতরটাও প্রায় তাই। তারা খায় দু বেলা ভুট্টার দানা, আর চেনে শুধু সোনা। সে সোনা তাদের মাঠে ফলে না ; তবু সিন্দুকে কেমন করে জমা হয়, সেইটেই তাজ্জব ব্যাপার!

এই সোনা সর্বস্ব দেশের মধ্যে সবচেয়ে সোনা-সেয়ানা হলেন কুমার শ্রীশ্রীধুরন্ধর ইত্যাদি। এই কুমার শ্রীশ্রীধুরন্ধরের সামনেই সেই ১১১৯ সালের অগ্রহায়ণের এক স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে শেষ পরির আবির্ভাব। তখন অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণে আকাশ পৃথিবীর—মানে, যা-যা হবার হয়েছে, বাগানে ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস যা-যা করবার করেছে, এবং সাধারণত এরকম সময় আর যা-যা ঘটে থাকে, সবই ঘটেছে।

কুমার ধুরন্ধর তন্ময় হয়ে সূর্যাস্তের আলোয় রঙিন একটি মেঘের দিকে চেয়ে ছিলেন। (কেন চেয়ে ছিলেন সেটা পরে প্রকাশ পাবে।) হঠাৎ কাছেই মধুর গলায় তাঁর নাম উচ্চারিত হতে শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, এক পরি।

এমন পরি দেখা কিছু অদ্ভুত নয়, কিন্তু এ পরি আবার ডাকল, '—কুমার ধুরন্ধর!'

বোঝা গেল পরি কুমারকে চিনে ফেলেছে। চিনে ফেলাটা সত্যিই অবশ্য আশ্চর্য। কারণ চেহারা দেখে ধুরন্ধরকে রাজকুমার বলে সন্দেহ করা অত্যন্ত কঠিন—প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। মাথায় কেলে হাঁড়ি বসানো সগাঁট এবং সুদীর্ঘ একটি বংশদণ্ড, না তিনি,—দেহ-সৌষ্ঠবে কে যে শ্রেষ্ঠ, তা বলা যায় না। তার ওপরে তাঁর একটা পা একটু খোঁড়া ও একটা চোখ কানা।

পরিদের সেই প্রাদুর্ভাবের দিনে এ-হেন পেটেন্ট চেহারা কেমন করে যে পরিদের নজর ও বর বাঁচিয়ে এতদিন তিনি মজুদ রেখেছেন, তা ভাবলে অবাক হবার কথা। তবে শোনা যায়, দশ মাসের জায়গায় আট মাসে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পরিরা গোড়াতেই তাঁর পাত্তা পায়নি। তারপর থেকে একটু জ্ঞান হতেই তিনিও তাদের আমল দেননি। প্রথম বিষমগড়ের রাজা অর্থাৎ তাঁর বাবার খেয়ালে কুমার ধুরন্ধর ছেলেবেলা থেকেই দেশ-দেশান্তরে ঘুরেই বেড়িয়েছেন এতদিন। সৌরাষ্ট্রের পরিরা তাঁর সন্ধান পেতে-না-পেতেই তিনি ঠিকানা বদলে গেছেন কোশলে, আর কোশলের পরিরা বাড়ি ঘেরাও করতে এসে দেখেছে তিনি বাসা তুলে নিয়ে গেছেন কপিশায়।

এরকম ঘন ঘন বাসা বদলাবার মূলে অবশ্য কুমারের বাবা, স্বয়ং বিষমগড়ের রাজা। মন্দ লোকে বলে যে, বাড়িভাড়া ফাঁকি দেবার জন্যেই নাকি তাঁর এই ফিকির। দেশে থাকলে রাজার উপযুক্ত ঘটা করে থাকতে যে খরচটা হত, বিদেশে বেনামিতে থাকার দরুন সেটা তো বেঁচে যায়ই, তার ওপর বাড়িভাড়াটা ফাঁকি দিতে পারলে সোনায় সোহাগা। মন্দ লোকের এসব কথা অবশ্য কানে না তোলাই উচিত। আমরা যতদূর জানি, ছেলেকে গোড়া থেকে দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বুদ্ধিতে পাকা করবার জন্যেই বিষমগড়ের রাজার এই বন্দোবস্ত।

এত সব বাধা সত্ত্বেও দু-একটা উটকো পরি কখনো কখনো কুমার ধুরন্ধরকে আচমকা ধরে যে না ফেলেছে এমন নয়, কিন্তু কুমারকে কায়দা করতে পারেনি কেউ। ছেলেবেলা থেকেই ধুরন্ধরের কেমন পরি-টরির ওপর কোনো প্রীতি নেই। আর সব ছেলে যখন খেলার নেশায় পরিদের সঙ্গে মেঘের দেশে উধাও হয়ে গিয়েছে, তখন কুমার ধুরন্ধর ঘরের কোণে বসে নামতা

pathagar.net

মুখস্থ করেছেন চক্রবৃদ্ধি সুদের। পরিরা পরিচয় করতে এসে ধমক খেয়ে গেছে ফিরে। বহুদিন বাদে দেশে ফেরবার পর আজ এই প্রথম তাঁর পরির হাতে পড়া।

আজকেও পরি বলে চেনামাত্র ধুরন্ধরের মুখের চেহারা যা হয়ে ওঠে—তাতে সে বেচারার বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু তারও আজ বড়ো দায়। সারাবেলাটা একদম বরবাদ গেছে। কাউকে বর দেবার সুযোগ মেলেনি। সেই দুঃখেই গতিক বিশেষ সুবিধের নয় বুঝেও, চট করে সে উবে যেতে পারে না। কোনো রকমে সাহস করে দাঁড়িয়ে থেকে আপ্যায়িত করার চেষ্টায় হেসে বলে, 'আপনি মেঘের বাহার দেখছিলেন বুঝি!'

'দেখছিলাম তো হয়েছে কী?' খেঁকিয়ে ওঠেন ধুরন্ধর, 'মেঘের বাহার বুঝি আমাদের দেখতে নেই? ওরকম একখান মেঘে পাড় বসাতে ক-ভরি সোনার জরি লাগে কযে বলুক তো, কে কেমন ওস্তাদ দেখি!'

আস্ফালনটা করে ফেলার পর ধুরন্ধরের বোধ হয় খেয়াল হয়, সামান্য একটা পরির কাছে এসব গভীর কথার কোনো কদর নেই। ধমক দিয়ে তাই তিনি বলেন, 'কিন্তু তুমি এখানে কী মন করে এসেছ বাপু?'

পরি থতমত খেয়ে একটু শুকনো হাসি হেসে বলে, 'আমি সন্ধ্যাপরি! আপনার যদি কোনো বর-টর দরকার থাকে—'

ধুরন্ধরের ধমকে পরিকে আর শেষ করতে হয় না, 'যাও যাও, যাও যাও! ওসব বর-টর নিয়ে আমার কাছে সুবিধে হবে না। সরে পড়ো এইবেলা।

সন্ধ্যাপরি তবু একেবারে আশা ছাড়ে না। মিনতি করে বলে, 'কিন্তু দেখুন, এই আপনার চেহারা...'

'—কেন, আমার চেহারাটা কি খারাপ?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করেন ধুরন্ধর।

অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে সন্ধ্যাপরি আমতা-আমতা করে বলে, না তা ঠিক নয়, মানে কিনা...'

'যাক, আর অত ঢোক গিলতে হবে না! আমার চেহারার ছিরি কি আর আমি জানি না? কিন্তু এ চেহারা বদলাব কেন বলো তো বাপু! বদলে আমার লাভ?'

এমন কথা পরি তার পাখার জন্মে শোনেনি! সে একেবারে থ হয়ে যায়।

ধুরন্ধর বলে চলেন, 'তুমি বর দিয়ে আমার চেহারাটি ভালো করে দিতে চাও, এই তো? কিন্তু ভালো চেহারার ফ্যাসাদ জানো? এমন নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে নিজের ব্যবসা আর করতে হবে না। আজ অমুক রাজকুমারীর উদ্যানসভা, কাল অমুক রাজার সঙ্গে নৌকাবিহার, এখানে নেমন্তন্ন, ওখানে বৈঠক—সবার ভালোবাসার টানটানিতে প্রাণ একেবারে যায় আর কি! চেহারা এমন বলেই না কেউ আর কাছে ঘেঁষে না! উঁহু বাপু, এ চেহারা আমি লাখ টাকাতেও বদলাচ্ছি না!'

সন্ধ্যাপরি হতাশভাবে শেষ চেষ্টা করে বলে, 'তাহলে আর কোনো বর?'

'কী বিরক্ত করো বলো তো তোমরা! রীতিমতো চটে ওঠেন কুমার ধুরন্ধর, 'কটা বর তোমরা দিতে পার? কী বর? দুনিয়ার সেরা চুনি, চুনারের আঞ্জনি আমায় এক্ষুনি এনে দিতে পার?'

সন্ধ্যাপরি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে, 'এনে দিতে পারতুম, কিন্তু এইমাত্র আরেক পরি এসে সেটা মদ্রদেশের এক ময়রাকে বর দিয়ে ফেলেছে। এখন সেটা টানাটানি করতে গেলে মাঝখানেই আটকে যাবে, কারুর কাছে পৌঁছোবে না। এসব হিরে-জহরতের দোষই এই। সবাই রাতদিন টানা-হ্যাঁচড়া করছে।'

কুমার ধুরন্ধর দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন, 'থাক থাক! ওসব বক্তৃতা আর শুনতে চাই না। মুরোদ তো তোমাদের কত, তা বেশ বোঝা গেছে!'

pathagar.net

মুখখানি কাঁচুমাচু করে সন্ধ্যাপরি বলে, 'কিন্তু আর কিছু যদি চান, তাহলে আমি আপনাকে তিন-তিনটে ইচ্ছে...'

ধুরন্ধর ইতিমধ্যে কী যেন ভাবেন। তাঁর কোটরে-ঢোকা খুদে চোখটি যেন চকচক করে ওঠে। অত্যন্ত প্যাঁচালো এক হাসি হেসে ধুরন্ধর বলেন, 'তিন-তিনটে বর দিতে পার?'

ভালোমানুষ পরি অতশত হাসির মর্ম বোঝে না, খুশি হয়ে বলে, 'নিশ্চয়ই! তিনটে বর দিতে পারি এখুনি।'

'হুঁ!' ধুরন্ধর খানিক পায়চারি করে বলেন, 'আচ্ছা বলো দেখি সমতটে সোনামুগের ভাও এখন কত?'

সন্ধ্যাপরি, সাধুভাষায় যাকে বলে, ভ্যাবাচাকা! এমন বর কেউ কখনো ত্রিভুবনে শুনেছে! হতভম্ব হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কী বললেন?'

'কেন, এই সহজ কথাটা আর বুঝতে পারলে না!' ধুরন্ধর হেঁকে ওঠেন, 'বলছি, সমতটে সোনামুগের এখন দর কত? সৌরাষ্ট্রের ব্যাপারীদের কাছে ধরো যদি এখন বায়না নিই, সঠিক দরটা জানা থাকলে সুবিধে কী কমখানি!'

'কিন্তু এরকম বর তো হয় না!' সন্ধ্যাপরি কাতরভাবে জানায়।

'হয় না কীরকম? বাঁকা নাক সোজা হয়, কানা চোখ ভালো হয়, আর সোনামুগের দর ঠিক হয় না? আলবত হয়!' ধুরন্ধরের চোখ রাঙা হয়ে ওঠে—অবশ্য একটিমাত্র চোখ।

সন্ধ্যাপরি নিরুপায়। কী কষ্টে যে তাকে ধুরন্ধরের বায়না মেটাতে হয়, সে-ই জানে। এ বর দান করে তাকে রীতিমতো হাঁপাতে হয়। কিন্তু ধুরন্ধরের কি তা বলে দয়ামায়া আছে! তাঁর উৎসাহ এখন দেখে কে! একগাল হেসে বলেন, 'এবার আমার দ্বিতীয় বর, কেমন? আচ্ছা, বলো তো বাপু,—

'তেরো টাকা মণ সাঁচ্চা,
ভেজাল সেরে সতেরো কাঁচ্চা।
যায় নৌকায়
মণে ছটাক কলসিতে খায়।
কেরায়া যোজনে আধ পণ,
যায় দু-কুড়ি সাত যোজন।
কোটালের ঘুস গণ্ডায় তিন কাক,
বাটখারায় টানি সেরে ছটাক।
কী দরে বেচে ঘি,
কাহনে তেরো পণ গুনে নি?'

সন্ধ্যাপরি এবার কেঁদে ফেলে আর কি! বলে, 'এ বর কিছুতেই সই নয়!' কিন্তু ধুরন্ধরও নাছোড়বান্দা।

সন্ধ্যাপরিকে এ বরও দিতে হয়। উড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, তার আর বুঝি দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। নেহাত মরণ নেই বলেই বুঝি ঠোঁটের ডগায় তার প্রাণটি এসে ঠেকে থাকে।

কুমার ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কার খুশি হয়ে হেসে বলেন, 'যাক খুব একটা হাঙ্গাম ঘুচল। এই হিসেব নিয়ে তেরোজন সরকার আজ তিন দিন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।'

'নিন শেষ বর চেয়ে, তারপর এবার আমায় রেহাই দিন।' করুণস্বরে মিনতি করে পরি।

'এই যে দিচ্ছি!' বলে ধুরন্ধর হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, 'বরের হোক এমনি গুণ, যত পেলাম পাই তার তিনগুণ।'

সন্ধ্যাপরি একেবারে আঁতকে উঠে বলে, 'তার মানে?'

pathagar.net

'তার মানে, যত বর পেয়েছি, এখন তার তিনগুণ অর্থাৎ তিন তিরিক্কে ন-টি বর আমার পাওনা। এই আমার তিনের ইচ্ছে।'

'কক্ষনো না! কিছুতেই না! এ আপনার জুয়াচুরি।' নেহাত প্রাণের দায়েই সন্ধ্যাপরি রুখে দাঁড়ায়।

ধুরন্ধর হেসে বলেন, 'জুয়াচুরি নয় গো, জুয়াচুরি নয়, এরই নাম ব্যবসাদারি! তোমাদের এত গুণ আগে কি বুঝেছি! এখন চলো দেখি, খাতায় হিসেবটা লিখিয়ে ফেলিগে, বর ফুরোবার আগেই আবার বাড়িয়ে নিতে না ভুলে যাই!'

তারপর বিষমগড়ের রাজকুমারের ব্যবসা দিন দিন যেমন ফেঁপে ওঠে, সন্ধ্যাপরির দুঃখের তেমনি আর সীমা থাকে না। নিজের কথার ফাঁদে, দিনরাত ধুরন্ধরের সেই কারবারি গদিতে সে বন্দি। একদফা বর ফুরোতে-না-ফুরোতেই কুমার ধুরন্ধর তিনদফা বর বাড়িয়ে নেন—সন্ধ্যাপরির ছুটি পাবার আশা অনেকদিন আগেই ঘুচে গেছে।

সন্ধ্যাপরি কোনোদিন যদি মিনতি করে ছুটি চায়, কুমার ধুরন্ধর অমনি সরকারকে খাতা খুলে হিসেব দেখতে বলেন। 'দেখো তো সরকার, সন্ধ্যাপরির হিসেবটা।'

সরকারমশাই খাতা খুলে পড়েন,—'জমা ২১০৬৮১, খরচ ১৭১৯৮।'

কুমার ধুরন্ধর একটু হেসে বলে, 'এখন যে অনেক বর বাকি! এ হিসেবটা চুকে যাক আগে, তারপর তো ছুটি!'

সন্ধ্যাপরি জানে, এ হিসেব আর কোনোদিন চুকে যাবার নয়। মনের দুঃখে তার কাঁচবরণ রূপে কান্নার চিড় ধরে, তার সোনালি পাখায় পড়ে পেতলের কলঙ্ক।

এমনি করেই দিন হয়তো যেত। ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কারের কারবারের ভেতর গোটা দুনিয়াই যেত বাঁধা পড়ে। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় এক কাণ্ড যায় ঘটে।

সন্ধ্যাপরি তখন প্রায় সব আশাই ছেড়েছে। সারাদিন ব্যবসাদারি হিসেব আর দেশ-বিদেশের বাজারদর কষে তার মাথা ঝিমঝিম—চোখে সরষে ফুল।

ধুরন্ধর কিন্তু সারাদিনের লাভের হিসেবে তখন মশগুল। নেহাত মরিয়া হয়েই পরি শেষবার ঝংকার দিয়ে ওঠে। কাঁদুনিতে কিছু হবার নয় সে বুঝেছে।

'আচ্ছা, তোমার প্রাণে কি একটু শখও নেই! আমোদ, আহ্লাদ, ফুর্তি—কিছু না। লাভের সোনা তো থাকে সিন্দুকে, চোখেও দেখতে পাও না ; শুধু খাতার হিসেব দেখেই সুখ?'

ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কার একগাল হেসে বলেন, 'কী সুখ তা যদি বুঝতে ! ইচ্ছে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই হিসেবের স্বপ্নই দেখি...'

'অ্যাঁ!' সন্ধ্যাপরি হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপর ধুরন্ধর হাঁ করবার আগেই বলে দেয় 'তথাস্তু!'

পরেরদিন সকালে চাকরবাকর ঘরে এসে দেখে, কুমার শ্রীশ্রী ইত্যাদি হিসেবের খাতা বুকে করে হাসিমুখে ঘুমোচ্ছেন। সে ঘুম আজও তাঁর ভাঙেনি।

আর সন্ধ্যাপরি? সে আর সেখানে একদণ্ড থাকে!

পরিমুল্লুকে সেই যে সন্ধ্যাপরি ফিরে গেছে, তারপর থেকে কোথাও কোনো পরি আর মানুষের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। সাহস করে না বোধ হয়।

সত্যি, পরিরা আর আসে না।

pathagar.net

কালরাক্ষস কোথায় থাকে ?

অনেক কাল আগের কথা।

কতকাল জিজ্ঞেস করলে কিন্তু বলতে পারব না। তারিখ সাল যদি জানতে হয় ইতিহাসের পণ্ডিতদের কাছে যাও।

মোট কথা, তখন পরি-হুরিদের যেখানে-সেখানে দেখা যেত, রাক্ষস-খোক্কসরা বনে-জঙ্গলে ভয় দেখাত, আর তেপান্তর পেলেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি সেখানে গাছে বাসা বেঁধে রাজপুত্রদের ভালো ভালো মতলব দেবার জন্য বসে থাকত।

রাজপুত্ররাও তখন কথায় কথায় পক্ষীরাজে চড়ে দেশ-বিদেশ ঘুরতে বেরোত...।

কিন্তু রাজপুত্র হলেই তো হয় না। দু-বিঘে দু-কাঠা হোক রাজ্য চাই, ছেঁড়া-খোঁড়া হোক—ভারী মখমলের পোশাক চাই, মরচে-ধরা হোক, ভাঙা হোক—তলোয়ার চাই ; আর কানা হোক, খোঁড়া হোক—একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া চা-ই। তার ওপর তিন বন্ধু—মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, সদাগরপুত্র হলে তো কথাই নেই!

আমাদের রাজপুত্র খুদকুমারের সেসব কিছুই নেই!

রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু মন্ত্রীমশাই কুমতলব দিয়ে সেটিকে লাটে তুলেছেন। কোতল করবার মানুষ না পেয়ে কোটাল গেছেন ভিন রাজ্যে চাকরি খুঁজতে, আর সদাগর লোকসানের ব্যবসা গুটিয়ে, দোকানপাট তুলে নিয়ে কোথায় গেছেন, কেউ জানে না।

তাঁরাই নেই তো তাঁদের পুত্ররা আর থাকবে কোথায়! তাই রাজপুত্র একা একা মনের দুঃখে কুঁড়েঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ান। আর আকাশ যেখানে দূর পাহাড়ের পেছনে নুয়ে পড়েছে, সেইদিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ ছলছল করে।

খুদকুমারের বড়ো সাধ—দেশ ভ্রমণে যাবেন। কিন্তু সাধই আছে, সাধ্য কোথায়?

তবু দুখিনী মার আশীর্বাদ নিয়ে খুদকুমার একদিন বেরিয়ে পড়লেন।

রাজপোশাক নেই। ছেঁড়া জামা মা দিয়েছেন সেলাই করে। তলোয়ার নেই, ফলা-ভাঙা ছুরিটা আছে ট্যাকে গোঁজা। পক্ষীরাজ নেই, রোঁয়া-ওঠা একটা রাস্তার কুকুর শুধু পেছু পেছু চলেছে, কীসের টানে সে-ই জানে। যাবার সময় মা শুধু চিঁড়ে-মুড়ি বেঁধে দিয়েছেন পথে খেতে, আর মনে রাখতে দিয়েছেন একটি শ্লোক—

কান পাতবে বনে,
শত্তুর মারবে মনে।

মাঠ-বন পেরিয়ে যান খুদকুমার। খেয়ার কড়ি নেই—নদী নালা পার হতে হয় সাঁতরে। রোঁ-ওঠা কুকুরটা যায় সঙ্গে।

সুয্যি ডোবে যেখানে, সেখানে গহন অরণ্যে গিয়ে খুদকুমার থামেন। গাছের ডালে নিজের জায়গা করে নেন, কিন্তু কুকুরটা থাকবে কোথায়?

কুকুরের ভাবনা ভাবতে হয় না। দেখা যায় গাছের কোটরে ছেঁড়া লতাপাতায় সে বেশ আয়াসে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে।

রাত বাড়ে। গাছপালা অন্ধকারে একাকার হয়ে যায়। ঘন ডালপালা লতাপাতার ফাঁকে একটা-দুটো তারা যেন ভয়ে ভয়ে এক-আধবার উঁকি দেয়।

খুদকুমারের চোখে ঘুম নেই। এক পহর, দু-পহর, তিন পহর রাত কেটে যায়।

হঠাৎ খুদকুমারের কান খাড়া হয়ে উঠল। গাছের মাথায় হাওয়ার শিস।

pathagar.net

হাওয়ার শিস, না কাদের ফিসফিস?

ফিসফিসই তো বটে!

'বুক যে ফেটে গেল গো!'—কে যেন বলছে।

'ফাটুক, তবু রা না শুনি'—কার যেন ধমক।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

খুদকুমার তবু যেন শুধু দুটি কান হয়ে আছেন।

আবার সেই ফিসফিস—'আর যে পারি না।'

তার জবাবে—'না পারিস তো মর না।'

আগেরটা যেন মেয়ে আর পরেরটা যেন পুরুষের গলা।

এরা আবার কারা?

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি নয়তো?

হ্যাঁ, তাতে আর ভুল নেই। খানিকটা বাদেই ডানা ঝটপট করে ব্যাঙ্গমি শুধোয় ফিসফিসিয়ে, 'আচ্ছা, সব না হয় একটু।'

'একটু কেন সবই বলো।'

ব্যাঙ্গমা এবার রেগে গলা ছেড়ে দেয়, 'আর না বলেই বা করবি কী? যেমন আমাদের কথা। কত খুঁজে-পেতে এসে বাসা বাঁধলাম, কত নিশুতি রাত জেগে কাটালাম। কোথায় হেন রাজপুত্তুর ঝলমলে সাজে পক্ষীরাজে আসবে, আশ মিটিয়ে পেটের কথা বলব, সুলুক সন্ধান দেব—না কোথাকার এক উইয়ে খাওয়া পুঁইয়ে পাওয়া—অখদ্দে রাজপুত্তুর এল রোঁ-ওঠা এক ঘেয়ো কুকুর নিয়ে।'

'বলো, বলো, ওকেই বলো।'

'বললে কি শুনবে? হয়তো ঘুমেই ন্যাতা। শুনলে কি বুঝবে, হয়তো বুদ্ধিই ভোঁতা।'

'আহা, তবু বলি। শুনে না বুঝুক, বলে তো সুখ।'—ব্যাঙ্গমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তারপর মিহি সুরে ধরে, 'দিন-রাত্তির দুয়ারে ঘা।'

ব্যাঙ্গমা মোটা গলায় বলে, 'দুয়ার তবু খোলে না।'

ব্যাঙ্গমির মিহি গলায় আবার, 'রাজকন্যা করেন কী?'

ব্যাঙ্গমার মোটা গলা, 'এখনও চুল বাঁধেননি।'

মিহি সুরে, 'চুল বাঁধবেন কবে?'

মোটা সুরে, 'কালরাক্ষস ঘায়েল যেদিন হবে।'

এবার মিহি-মোটা একসঙ্গে—

'বনের শেষে তেপান্তর
তা ছাড়িয়ে নদীর চর
নদীর ধারে দুধপাহাড়
সেথায় পুরী চার দুয়ার
চার দুয়ারে একটি খিল,
খুলবে তো তাল করো তিল।'

pathagar.net

বুকের বোঝা হালকা করে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি বুঝি ঘুমোল। খুদকুমারের চোখে কি ঘুম আসে! রাতের আঁধার ফিকে হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েন।

গহন বন ছাড়িয়ে তেপান্তর। তেপান্তর পেরিয়ে নদীর চর। নদীর পারে মেঘের রাশি। কিন্তু দুধ-পাহাড় কই?

এপারে দাঁড়িয়ে খুদকুমার আকুল চোখে চারিদিকে তাকান। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি কি তাহলে ভুল

ঠিকানা দিয়েছে! কিন্তু তা তো দস্তুর নয়। রাজপুত্র বলে তাকে না হয় পছন্দ হয়নি, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে খবর! ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির তাহলে তো জাত যাবে। রূপকথার রাজ্যে মুখ দেখাতে পারবে না।

ভুল নয়, ঠিক।

আকাশের কোলে সাদা মেঘ নয়—দুধপাহাড়!

ঘেয়ো কুকুর সঙ্গে নিয়ে খুদকুমার দুধপাহাড়ে গিয়ে ওঠেন। দুধপাহাড়ের মাঝে চার-দুয়ার বিশাল পুরী। কিন্তু এ কী ব্যাপার? বিশাল পুরীর চার দুয়ারে হইহই হট্টগোল, থইথই ভিড়।

খবর তো আর সে একা পায়নি, পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ যেখানে যত রাজপুত্র ছিল, কেউ আর আসতে বুঝি বাকি নেই।

কী তাদের চেহারা আর কীসব সাজপোশাক। দুধপাহাড়ের গা ঝলমল করছে তাদের হিরে মুক্তো চুনি পান্নার জেল্লায়।

কিন্তু দুয়ার তো খোলে না। রাজপুত্রদের ঝকঝকে ধারালো সব তলোয়ার ভোঁতা হয়ে গেল। দরজায় দাগ পড়ে না। দল বেঁধে বড়ো বড়ো গাছ আর পাথর নিয়ে তারা চড়াও হল। দরজা নড়ে না। খুদকুমার কিছু করবেন কী, হোমরা-চোমরাদের দলে তিনি পাত্তাই পান না।

রাজপুত্রদের ভারী মখমলের সাজ ছিঁড়ল, মাথার ঘাম পায়ে পড়ল। দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রইল।

হয়রান হয়ে সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, খুদকুমার ভয়ে ভয়ে গেলে এগিয়ে।

চার দুয়ারের একটি খিল
খুলবে তো তাল করো তিল।

কিন্তু কোথায় তাল আর তিলই বা করবে কী?

অনেক খুঁজে পাথরের মতো নিরেট দরজায় চুলের মতো সরু একটি ফুটো যদি বা বেরোল, তাও ধুলোয় ঢাকা।

কিন্তু ধুলো সরাতে একটি ফুঁ যেমনি দেওয়া অমনি কড়কড় ঝনঝন করে চার দরজা একসঙ্গে গেল খুলে।

আর তখন রক্ষে আছে। পিলপিল করে রাজপুত্ররা খুদকুমার আর তাঁর ঘেয়ো কুকুরকে কোথায় ঠেলে সরিয়ে ফেলে মাড়িয়ে চার দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল পুরীতে।

খাঁ-খাঁ পুরী। কেউ কোথাও নেই।

দেউড়ি থেকে দালান, এ মহল থেকে সে মহল, রাজপুত্রের দল খুঁজতে খুঁজতে একেবারে পুরীর মাথার মণিকোঠায় রাজকন্যার দেখা পেল।

কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল মেলে ভুঁয়ের ওপর শুয়ে আছেন।

সকলকে দেখে কান্নায় ভেজা চোখ মুছে শুধোলেন, 'কে খুলল দরজা?'

হাজার রাজপুত্র একসঙ্গে হাঁক দিয়ে উঠল, 'আমি!'

দুঃখের মধ্যে রাজকন্যা হাসলেন। বললেন, 'শুধু দরজা খুললে তো হবে না, এ পুরীর এমন দশা যে করেছে, সেই কালরাক্ষসকে যে ঘায়েল করবে, তার জন্যেই গলার মালা আছে তোলা।'

'কোথায় থাকে কালরাক্ষস?'—হাজার গলা গর্জে উঠল।

দুধপাহাড়ে দধিসায়র
তার মধ্যে কালরাক্ষসের গড়।

কিন্তু দধিসায়র তো যেমন তেমন নয়, নৌকো ভাসালে জলে গলে যায়, সাঁতরে পার হতে গেলে কালরাক্ষসের পোষা কুমিরে খায়, কালরাক্ষসের নাগাল পাওয়াই দায়।

pathagar.net

'আচ্ছা, কুছ্‌পরোয়া নেই!'—হাজার রাজপুত্তুর এক দঙ্গলে দধিসায়রের পাড়ে গিয়ে হাজির।

কিন্তু জলে যে নামে সে আর ওঠে না।

সকাল থেকে দুপুর গিয়ে সন্ধে হল। হাজার রাজপুত্রের কেউ তখন কুমিরের ভোজ, কেউ তখন ভয়ে নিখোঁজ।

সন্ধে গিয়ে রাত হল। ঘেয়ো কুকুর নিয়ে খুদকুমার দধিসায়রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। থকথক করছে দধিসায়র, তার মাঝে থমথম করছে চাঁদের আলোয় কালরাক্ষসের গড়।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির ছড়ার গুণে দরজা খুলেছে বিশাল পুরীর, কিন্তু দধিসায়র পার হবার হদিস মেলে কোথায়?

হঠাৎ খুদকুমার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, থাম থাম।'

আর থাম থাম!—বলা নেই কওয়া নেই। ঘেয়ো কুকুর হঠাৎ দধিসায়রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওদিকে কুমিরেরও টনক নড়েছে। হাঁ করে এল তেড়ে, কুকুর বেচারার দশা বুঝি দিল সেরে! এতদিনের পথের সঙ্গী, এই বিপদে কি ছাড়া যায়! খুদকুমার ফলা-ভাঙা ছুরি হাতেই দধিসায়রে পড়লেন লাফ দিয়ে।

কিন্তু বাঁচাতে গেছেন কাকে? কুকুর নয় তো, যেন জলের মাছ। কুমিরকে চরকিপাক খাইয়ে ঘেয়ো কুকুর যেন মজা দেখে। কুকুরের পেছনে কুমির ছোটে, আর খুদকুমার নির্ঝঞ্ঝাটে কালরাক্ষসের গড়ে গিয়ে ওঠেন। কুমিরকে কলা দেখিয়ে ঘেয়ো কুকুরও তাঁর পেছু পেছু গা ঝাড়া দিতে দিতে উঠে আসে।

কালরাক্ষসের গড়। তার কত গম্বুজ কত খিলেন কত সুড়ঙ্গ কত সিঁড়ি। কিন্তু কোথাও কারোর সাড়াশব্দ নেই কেন?

এ মহল থেকে ও মহল, একতলা থেকে দোতলা, তা থেকে তেতলার এক ঘর। ঢুকতে গিয়ে খুদকুমার থমকে দাঁড়ান।

তাঁরই মতো একটি ছেলে একটা ময়লা বিছানায় বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

আর কি বুঝতে বাকি থাকে? নির্ঘাত এ সেই কালরাক্ষসের কাজ। কোনো অচিন দেশের কুমার হবে নিশ্চয়। বেচারাকে ধরে এনে কয়েদ করে রেখেছে মনের সুখে মারবার জন্যে।

'কাঁদছ কেন ভাই? ভয় কী?' কাছে গিয়ে খুদকুমার মিষ্টি গলায় সাহস দেন।

অচিনকুমার চমকে উঠে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে তাকায়। তারপর তার কান্না আবার যেন উথলে ওঠে নতুন করে!

খুদকুমার পাশে বসে পিঠে হাত দেন এবার, 'ছিঃ, পুরুষমানুষ কি কাঁদে?'

'না কাঁদে না!' অচিনকুমারের গলায় এবার ঝাঁজ, 'আমার মতো হতে তো বুঝতে। আর এসেছ যখন, বুঝবে। কিন্তু তুমি কে? এখানে এলেই বা কী করে, আর কেনই বা এলে?'

খুদকুমার নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'এসেছি কালরাক্ষসের দাপট ভাঙতে।'

কান্না ভুলে তখন হেসে ওঠে অচিনকুমার, 'এখানে এসেছ কালরাক্ষস খুঁজতে!'

'এখানে আসব না তো আবার যাব কোথায়?' খুদকুমার তো অবাক।

'কালরাক্ষস কোথায় থাকে তাও জানো না?' অচিনকুমার আবার হেসে ওঠে।

খুদকুমার এবার গরম ; বলেন, 'থাকে তো এইখানেই।'

'না হে, না—এখানে তো থাকি আমি। জন্ম থেকেই আছি কালরাক্ষসের দাপটে কয়েদ হয়ে। তাই তো অমন করে কাঁদি।'

'তাহলে যে শুনলাম...!'—খুদকুমার শুধোন অবাক হয়ে।

pathagar.net

'যা শুনেছ তা ভুল, ওই তো দধিসায়রের পাড়ে চার দুয়ার বিশাল পুরী। ওই হল কালরাক্ষসের গড়।'

এবার খুদকুমারের হাসবার পালা। ঠাট্টা করে বলেন, 'তুমি তো তাহলে খুব জানো দেখছি।'

'তা আর জানি না।' অচিনকুমার একটু চটেই ওঠে, 'সাত পুরুষ ধরে গড়বন্দি হয়ে আছি, আমি জানব না তো জানবে কে? ওই কালরাক্ষসের জন্যেই তো নিঝুম-পুরীর এই হাল।'

খুদকুমারকে অনেক কষ্টে এবার সব বলতে বোঝাতে হয়। কিন্তু বোঝাবুঝির পর দুজনেই দুজনের দিকে অবাক হয়ে চায়।

'এখানে নয়, ওখানে নয়, তো কালরাক্ষস থাকে কোথায়?'

'কোথাও না।' বলে দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে। আর তক্ষুনি বুজরুকির ফাঁকি দু-ফাঁক হয়ে মিথ্যের মায়া-কুয়াশার মতো উড়ে যায়।

থমথমে নিঝুমপুরী গমগম করে ওঠে খুশির ঝলকে। থকথকে দধিসায়র গলে টলটলে জল হয়ে ঝকঝক করে ভোরের সোনালি আলোয়। কুমির হয়ে যায় কাঠের গুঁড়ি।

খুদকুমার আর অচিনকুমার হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে ঘেয়ো কুকুর।

ঘেয়ো কুকুরের ঘা কই? সব সেরে গিয়ে রেশমের মতো নরম লোমে গা গেছে ঢেকে।

ওপারের বিশাল পুরী চার দুয়ার খুলে যেন সবাইকে ডাকছে। কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুলই শুধু বাঁধেননি, যজ্ঞির রান্না রাঁধতে বসেছেন হাজার রাজপুত্রকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে।

কালরাক্ষস সত্যিই আজ ঘায়েল।

কোথাও সে নেই, আবার আছেও বটে।

আছে প্রাণের লুকোনো হিংসেয়, মনের মিথ্যা ভয়ে।

ঘর ছেড়ে বাইরে এসে আপনার মতো পরকে ভালোবেসে, তাই তাকে বারবার হারিয়ে শূন্য হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হয়।

মার শেখানো ছড়াটার মানে যেন কিছুটা বুঝতে পারেন খুদকুমার।

সানু ও দুধরাজকুমার

কাল গেছে সানুর জন্মদিন। সানু পেয়েছে অনেক কিছু। তার উপহারের বহর দেখে দাদু ঠাট্টা করে বলেছেন, 'আমার যে আবার ছেলেমানুষ হতে ইচ্ছে করছে রে।'

সানু কিন্তু একেবারে খুশি হতে পারেনি! হ্যাঁ, ক্যামেরা একটা সে পেয়েছে বটে, তার সঙ্গে একটা এয়ার-গান ও বইপত্র আর অন্যান্য অনেকরকম জিনিস, কিন্তু একটা যে মস্ত বড়ো খুঁত রয়ে গেল। সানুর সে দুঃখ যাবার নয়। আজ এক মাস ধরে সে দেখছে একটা মোটর সাইকেলের স্বপ্ন। বেণুদা যেরকম মোটর সাইকেলে চড়ে আসে সেইরকম একটা তার চাই-ই। কী তার আওয়াজ আর কী তার বেগ! একেবারে ঝড়ের মতো আসে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে, সকলকে জানিয়ে।

এক মাস ধরে সে অমনি একটা সাইকেলের বায়না ধরেছে। বাড়ির সবাই তখন তার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন, 'ছেলেমানুষ তুই কি এখন মোটর চালাতে পারিস?'

না-পারে না! কেন পারে না? মোটর সাইকেল চালানোটা যেন ভারী শক্ত ব্যাপার! সে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেণুদার চালানো দেখে সব শিখে নিয়েছে। পা দিয়ে একবার স্টার্ট দেওয়া, তারপর হ্যান্ডেল ধরে চালানো—এ যেন আর কেউ পারে না। বেশ তো, একটা মোটর সাইকেল তাকে কিনেই দেওয়া হোক না, সে দেখিয়ে দেবে তারপর চালাতে সে জানে কি না! সে বেণুদার চেয়েও জোরে চালিয়ে দেবে একেবারে ঝড়ের মতো! বাড়ির লোকেরই বা সুবিধা কত হবে বলো দেখি! এই সেদিন বায়োস্কোপে যাবার আগে হঠাৎ দিদির যে মাথার ফিতে হারিয়ে গেল—তারপর খুঁজতে খুঁজতে এমন দেরি হয়ে গেল যে বায়োস্কোপে পৌঁছে কতগুলো ছবি দেখাই হল না। তার একটা মোটর সাইকেল থাকলে কি আর এমন হত? 'দাঁড়াও দাঁড়াও তোমাদের ভাবতে হবে না' বলে সে একেবারে সাইকেলে গিয়ে উঠত, তারপর একেবারে নিউ মার্কেট, চক্ষের নিমেষে ফিরে এসে দিদির হাতে ফিতে দেওয়া। তখন অবাক হয়ে বলত সবাই কিনা—'কীরে এরি মধ্যে ফিরে এলি।'

নাঃ সাইকেল তার একটা চাই-ই। কিন্তু বাড়ির লোকেরা ভারী অবুঝ। সানুকে তাদের সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া করতে হয়েছে, শেষকালে অনেক কান্নাকাটির পর কাকা বলেছিলেন, 'আচ্ছা তোর জন্মদিন আসছে, তখন দেখা যাবে।'

সানু সেই ভরসাতেই ছিল। ক্লাসের ছেলেদের ইতিমধ্যে সে সুসংবাদটা জানিয়েও দিয়েছে, কিন্তু কাকা এমন মিথ্যুক কে জানত! জন্মদিনে তার সব হয়েছে, কিন্তু মোটর সাইকেল কই? কাকা তাকে ঠান্ডা করবার জন্যে বলেছেন যে সে ছোটো কিনা, তাই তার জন্যে মোটর সাইকেল ছোটো করে তৈরির বায়না দেওয়া হয়েছে—শিগগির আসবে।

আহা, সানু যেন বোকা, কিচ্ছুই বোঝে না! মোটর সাইকেল তো ছোটোই হয়। বেণুদা যে অত বড়ো, তার সাইকেল থেকেও তো সানুর পা মাটিতে পড়ে। না—সবাই তাকে বড্ড ছেলেমানুষ ভাবে!

সব জিনিসের ভেতর ক্যামেরা আর এয়ার-গানটি পাশে নিয়ে উপহারের একটা গল্পের বই খুলে সানু বিছানায় শুয়ে পড়ছিল—পড়ছিল আর মাঝে মাঝে ভাবছিল সাইকেলের কথা। এমনি করে কখন সে যে ঘুমিয়ে পড়ল তা জানে না। হঠাৎ ঘুম ভেঙেই দেখল সকাল হয়েছে! রাতটা যেন বড়ো শিগগির কেটে গেছে।

বিছানা থেকে ঘুম-চোখ নিয়ে সে উঠেই দেখে কাকা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাকা বললেন, 'তোর জন্যে কী এনেছি, বল দেখি!'

'কী কাকামণি?'

'আয় দেখবি আয়—' বলে কাকা তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

বাইরে বেরিয়ে সানু তো অবাক! নিজের চোখকেই আর বিশ্বাস হয় না। সত্যিকারের একটা মোটর সাইকেল একেবারে গেটের ধারে দাঁড় করানো। কাকা তো তাহলে মিথ্যে বলেনি। সত্যিই মোটর সাইকেলটা ছোটো—বেণুদার সাইকেলটার চেয়ে অনেক ছোটো আর কী সুন্দর। রুপোর মতো ঝকঝক করছে তার যন্ত্রপাতি। সানু আনন্দে চিৎকার করে উঠে একেবারে লাফিয়ে গিয়ে তাতে চড়ে বসল।

মোটর সাইকেলটাও কী অদ্ভুত! একবার পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে দে ছুট। সানু যেন হ্যান্ডেলটা বাগিয়ে ধরে রাখতেই পারে না। তার কানের পাশ দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু-হু করে, বাড়িঘর সব সরে যাচ্ছে বায়োস্কোপের ছবির চেয়েও তাড়াতাড়ি, আর রাস্তাটা? সেটা যেন হয়ে গেছে একটা দুরন্ত নদী—তরতর করে পায়ের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে।

আশ্চর্য! দেখতে দেখতে এ কোথায় এসে পড়ল সানু! কখন সে শহরের বাড়িঘর ছাড়িয়ে এসেছে বুঝতেও পারেনি। চারিধারে এবার ধু ধু করছে মাঠ! যত দূর দৃষ্টি যায় গাছপালা কোথাও কিচ্ছু নেই—খালি, থেকে থেকে ঘূর্ণি হাওয়ায় এখানে সেখানে উড়ছে শুকনো ধুলো আর বালি।

সানু হঠাৎ মোটর সাইকেল থামিয়ে ফেলল। সেই শূন্য দিগন্তজোড়া মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি ছেলে হেঁটে চলেছে। সানু তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে যেন চমকে উঠল। সানু জিজ্ঞেস করল, 'এ কোন জায়গা বলতে পার ভাই?'

ছেলেটি তার দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে বলল, 'এ হল, তেপান্তরের মাঠ।'

তেপান্তরের মাঠ! সানুর মনে হল জায়গাটার কথা সে যেন কোথায় শুনেছে! আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই তার চোখ পড়ল ছেলেটার পোশাকের ওপর। সত্যি, ছেলেটির পোশাক ভারী অদ্ভুত, মাথায় তার পালক ওড়ানো, জরির কাজ করা উষ্ণীষ, কাঁধ থেকে বুকের ওপর বাঁকা করে বাঁধা রঙিন উড়ানি। কোমরে বাঁধা একটা লম্বা তলোয়ার—তার কাপড় পরবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আলাদা।

সানু বলল, 'তোমার নাম কী ভাই?'

'আমার নাম দুধরাজপুত্র।'

দুধরাজপুত্র নামটাও সানুর একেবারে অচেনা মনে হল না। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'আমি যাব অনেক দূর। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির দেশে!'

সানু খানিক গম্ভীর হয়ে কী ভেবে নিয়ে বলল, 'এমন করে হেঁটে হেঁটে কদিনে পৌঁছোবে সেখানে?'

দুধরাজপুত্র বলল, 'ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, পায়ে ফোসকা, মাথায় ধুলো, যদি হাঁটতে পারি সাত দিন সাত রাত, তবে পৌঁছোব সেখানে।'

সানু হেসে বলল, 'দূর, তুমি যেমন বোকা! এসো দিকি আমার গাড়িতে, দেখতে দেখতে তোমায় সেখানে নিয়ে যাব।'

দুধরাজপুত্র কেমন একটু আড়ষ্টভাবে এসে মোটরের পেছনে চড়ে বসল। কিন্তু সানু যেই স্টার্ট দিয়েছে অমনি সে আঁতকে উঠে সানুকে ধরল জড়িয়ে। সানুর সাইকেল তখন ঝড়ের মতো তেপান্তরের মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে! দুধরাজপুত্র ভয়ে ভয়ে বলল, 'এ কী ভাই? পক্ষীরাজে চড়েছি। সে ওড়ে, কিন্তু এমন ছুটে তো চলে না, এমন আওয়াজও তো নেই!'

pathagar.net

'ভয় নেই, ভয় নেই—এ হল মোটর সাইকেল আড়াই হর্স পাওয়ার, নতুন মডেল! ঘণ্টায় একশো মাইল চলেছে কিনা এখন। তাই আওয়াজ একটু বেশি—'

দুধরাজপুত্র বলল, 'লাগামটা আর একটু টেনে ধরো না ভাই, আর একটু আস্তে চলুক।'

'আস্তে ! আস্তে কেন? আরও জোরে বলো! ফুল স্পিড দিইনি।'

সানু আরেকটু বেগ বাড়িয়ে বলল, 'কোথায় তুমি যাচ্ছ বললে,—কী কাঁকুড়ের দেশে না?'

'হ্যাঁ, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির দেশে।'

'তোমার বুঝি এগ্রিকাল্চারে ঝোঁক? আমার সেজদারও ভাই তাই—এবার সাবোরে যাবে পড়তে।'

দুধরাজপুত্র অবাক হয়ে চুপ করে রইল। সানু আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে সেখানে?'

'সেখানে আছে কুঁচবরণ রাজকন্যা মেঘবরণ চুল—দিনে একবার সে ছাদে চুল শুকোয়—আর তার ছায়া পড়ে—নিমেষের তরে নদীর জলে। সেই ছায়া দেখে আমায় আঁকতে হবে তার হুবহু ছবি। ভুল হবে না—চুক হবে না!'

সানু বলল, 'তারপর?'

'তারপর যেতে হবে সেই ঘুমন্তপুরীতে, যেখানে স্ফটিকস্তম্ভের ভেতর হিরের কৌটোয় আছে সাতশো রাক্ষসীর গোপন প্রাণ-ভোমরা! সেখানে সহস্রদল পদ্মের বিছানায় চোখ চেয়ে ঘুমিয়ে আছে আমার দাদা ফুলরাজকুমার। আমার ছবি যদি নিখুঁত হয় তবে তার দিকে চেয়ে সে উঠবে জেগে, এক চুল এদিক-ওদিক হলে চিরদিনের মতো তার চোখ যাবে বুজে।'

সানু হেসে বলল, 'এই!'

রাজকুমার পেছন থেকে চটে উঠে বলল, 'এই মানে? কাজটা তুমি ছেলেখেলা ভাবছ নাকি?'

'তা ছাড়া কী?'

রাজকুমার গুম হয়ে চুপ করে রইল। বোঝা গেল সে চটেছে। সানু আর খানিক মোটর সাইকেল চালিয়ে বলল, 'দেখো দিকি তোমার কাঁকুড়ের দেশে এলাম কি না! দূরে যেন কটা নার্সারির সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে।'

মোটর থামতেই দুধরাজকুমার অবাক হয়ে নেমে বলল, 'আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি পৌঁছোলাম কী করে?'

সানু গর্বভরে বলল, 'বললাম না তোমায় আড়াই হর্স পাওয়ার, নতুন মডেল গাড়ি আমার! আর একশো মাইল স্পিড ঘণ্টায় কম হল নাকি?'

হঠাৎ দুধরাজকুমারের মুখ গেল ম্লান হয়ে, বলল, 'কিন্তু এত আগে এসে কোনো লাভ হল না ভাই!'

'কেন?'

'সাত দিন সাত রাত্রে আমার আসবার কথা—আগে এলে চলবে কেন?'

সানু খানিক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি পাগল নাকি? সাত দিনের জায়গায় আমি যদি সাত মিনিটে আসি তাতে কার কী? তুমি চলো দেখি, দেখিয়ে দেবে কোথায় তোমার সেই কুঁচবরণ কন্যা চুল বাঁধে!'

দুধরাজপুত্র আর কী করে, একান্ত অনিচ্ছায় সে যেন চলল। যেতে যেতে বলল, 'এত আগে এলাম, রাজকন্যা চুল বাঁধতে এখন এলে হয়।'

'বাঃ! এই-না তুমি বললে রাজকন্যা রোজ চুল বাঁধে?'

'কিন্তু আমি সাত দিন সাত রাত হেঁটে এলে তবে তো!'

pathagar.net

সানু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কেমন করে এলে না এলে তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? তুমি আজই আসো আর সাত দিন বাদেই আসো, রাজকন্যা চুল তো বাঁধবে! তোমার ঘুম পায়নি বলে এদেশে রাত হবে না নাকি?'

'তা নাও হতে পারে। আমাদের এখানকার ব্যাপার তুমি বুঝবে না ভাই!'

সানু এবার একটু রেগেই চুপ করে রইল। দুজনে তখন নদীর ধারে শ্বেতপাথরের রাজপুরীর কাছে এসে পড়েছে দুধরাজপুত্র কাগজ তুলি রং বার করে ভয়ে ভয়ে বলল, 'যদি বা রাজকন্যা আসে, নদীর জলে আজ যা ঢেউ দিয়েছে ভাঙা ছায়া দেখে ঠিক আঁকতে পারব কি না কে জানে!'

সানু মোটর সাইকেল থেকে কী একটা জিনিস এনে হেসে বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা; সে ভাবনা তোমার নেই।'

তারপর দুজনে নদীর ধারে রইল বসে, রাজপুত্র চেয়ে আছে নদীর জলে—সানু ওপরের দিকে। খানিক বাদে দুধরাজপুত্র হঠাৎ কাতরভাবে বলে উঠল, 'ওই যাঃ—'

'কী হল কী?'

'রাজকন্যার ছায়া পড়ল, কিন্তু জলের ঢেউয়ে দেখতেই পেলাম না ভালো করে। এখন উপায়?'

সানু হেসে বলল, 'কিছু ভয় নেই, ঠিক স্ন্যাপ নিয়েছি। ইন্‌স্টান্‌টেনিয়াস এক্‌সপোজার!'

রাজপুত্র হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল।

সানু বলল, 'রাজপুরীর আস্তাবলটা বেশ অন্ধকার মনে হচ্ছে। চলো ওখান থেকে ডেভেলপ করে নিয়েই তোমার দাদার দেশে যাব।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখা গেল সানু আর দুধরাজপুত্র মোটর সাইকেলে চলেছে আরেক দিকে।

সানু বলল, 'বেশ আলো আছে; পথে যেতে যেতেই প্রিন্ট হয়ে যাবে। ঘুমন্তপুরীতে গিয়েই ফিক্‌স্‌ করে নেবখন।'

রাজপুত্র অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা বলেনি, এখনও সে চুপ করে রইল।

ঘুমন্তপুরী পৌঁছোতে বেশিক্ষণ লাগল ন। রাস্তায় ট্রাফিক নেই—ডাইনে-বাঁয়ের হাঙ্গামা নেই। একেবারে স্ফটিকপ্রাসাদের ভেতর গিয়ে সানু মোটর সাইকেল থামাল। তারপর তরতর করে দুজনে উঠল সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ি বড়ো কম নয়, শেষ আর হতে চায় না। সানু একটু রেগে বলল 'একটা লিফ্‌ট থাকা উচিত ছিল!'

যাই হোক সিঁড়ি শেষ হল। এবার মস্ত বড়ো একটা ঘর। ঘরের চারধারে বাতি জ্বলছে লাল নীল হলদে আর তার মাঝখানে সহস্রদল পদ্মের ওপরে শুয়ে আছে ফুলরাজকুমার।

সানু এবার বসল ছবি ফিক্‌স্‌ করতে আর দুধরাজকুমার জানালায় রইল পাহারায়—সাতশো রাক্ষুসী না এসে পড়ে!

ছবি ঠিক হতেই সানু দুধরাজকুমারকে ডেকে বলল, 'দেখো দিকি!'

দেখে দুধরাজকুমার তো অবাক। দুজনে মিলে এবার ছবি নিয়ে গিয়ে ধরল ফুলরাজকুমারের সামনে। যেমনি ধরা অমনি, ঘরের লাল-নীল বাতি গেল নিভে; সহস্রদল পাপড়ি গেল মুদে। ফুলরাজকুমার জেগে উঠে বলল, 'হাইপো একটু বেশি হয়ে গেছে।'

সানু কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'কী করব! যা তাড়াতাড়ি।'

ফুলরাজকুমার তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'তা হোক! তোমার বাহাদুরি আছে। কিন্তু এখন সাতশো রাক্ষুসীর প্রাণ-ভোমরা যে মারতে হবে।'

সবাই মিলে গেল স্ফটিকস্তম্ভের দিঘিতে। সানু এক ডুবে তুলল স্ফটিকস্তম্ভ। ফুলরাজকুমার

pathagar.net

এক আছাড়ে তা ভাঙল, কিন্তু কৌটো খুলে দুধরাজকুমার যেই তরোয়াল বার করে যাবে কাটতে, তার তরোয়াল গেল খাপে আটকে। ভোমরা কৌটো থেকে বেরিয়ে উড়ল।

দুধরাজকুমার আর ফুলরাজকুমার ভয়ে কেঁদে ফেলল। কিন্তু সানু নির্বিকার। এয়ার-গানটা ছিল সঙ্গে আর সাতশো রাক্ষুসীর প্রাণ-ভোমরা নেহাত ছোটোখাটো নয়—প্রায় একটা চড়ুইপাখির মতো। সানু বন্দুক উঠিয়ে এক ছর্‌রায় প্রাণ-ভোমরাকে দিল মেরে।

তারপর হাঁউ মাঁও খাঁউ। সাতশো রাক্ষুসী আসছে ছুটে বনবাদাড় মাঠঘাট পার হয়ে! কিন্তু একী! তারা মরে না কেন?

সাতশো রাক্ষুসী হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে ছুটে এসে বলল, 'আমরা কক্ষনো মরব না, কিছুতেই মরব না তো!'

'বাঃ মরবে না কীরকম? তোমাদের প্রাণ-ভোমরাকে তো মেরে ফেলেছি!'

'না ও মারা তো সই নয়। কথা ছিল এক কোপে কাটবে, এক ফোঁটা রক্ত পড়বে না ভুঁয়ে। এয়ার-গানে মারলে কেন?'

এইবার লাগল গণ্ডগোল। সাতশো রাক্ষুসী প্রাণপণে চ্যাঁচায় আর বলে, 'কক্ষনো মরব না! এয়ার-গান মারা সই নয়।'

আর এরা তিনজন বল, 'আলবত মরবে! তোমাদের প্রাণ-ভোমরা মেরে ফেলেছি!'

সোরগোল ক্রমেই বেড়ে উঠল। সাতশো রাক্ষুসীর চিৎকারে কান ঝালাপালা, তালা লাগবার জোগাড়!

সানু শব্দের চোটে অস্থির হয়ে হঠাৎ জেগে উঠল। ওমা একী, সত্যি যে সকাল হয়েছে! বাইরে বেণুদার মোটর সাইকেলটার আওয়াজ।

pathagar.net

ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা

মিনুর মামামণি আজ সন্ধেবেলা কোথা থেকে অনেকগুলো কেয়া ফুল কিনে এনেছেন। বায়না করে তার ভেতর থেকে একটা মিনু চেয়ে নিয়ে তার ঘরে এনে রেখেছে।

কাঁটা দেওয়া লম্বা লম্বা পাতার আড়ালে নরম সাদা ফুলটি যেন লাজুক একটি সুন্দরী মেয়ে! আর কী মিষ্টি তার গন্ধ! সমস্ত ঘর যেন ঢুলে পড়েছে সেই নেশায়।

বাইরে ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে! ঘরের বাতি নেভানো! একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিনুর কী ভালোই লাগছে। কেয়া ফুলের গন্ধ নয়, যেন ভারী মিষ্টি কার আদর। সমস্ত মন জুড়িয়ে যায়।

কেয়া ফুলটা পাশের টেবিলের ওপর ফুলদানিতে মিনু রেখেছে। ঘরের ভেতর বাতি নেভানো, কিন্তু জানালা-দরজা দিয়ে একটু-আধটু আলো চুইয়ে যে না এসেছে, তা নয়। অস্পষ্টভাবে ফুলদানিটা দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর ফুলটি যেন সাদার একটা আবছা ছোপ অন্ধকারে!

বাইরের রিমঝিম বৃষ্টির আওয়াজে, আর ঘরের ভেতর কেয়ার মিষ্টি গন্ধে মিনুর চোখ ঘুমে ক্রমশ জড়িয়ে আসছিল ; হঠাৎ ঠুক করে একটা আওয়াজে তার ঘোর কেটে গেল।

মিনু একটু অবাক হয়ে উঠে বসল ; বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও হচ্ছে একটু। দমকা হাওয়ায় জানালার একটা পাল্লা গেছে খুলে। হয়তো তারই শব্দ।

মিনু আবার চোখ বুজতে যাবে, হঠাৎ টেবিলের পাশে স্পষ্ট কার মিষ্টি গলা শোনা গেল। তাই তো! ভারী আশ্চর্য তো! কেয়া ফুলটির ভেতর থেকেই যেন কার কথা শোনা যাচ্ছে!

'শুনছ!'

মিনু প্রথমটা বিশ্বাস করতেই চাইল না। কেয়া ফুল আবার কথা কয় নাকি! কিন্তু আবার যখন মিঠে গলার মিনতি শোনা গেল, 'শুনছ!' তখন সে বলে ফেলল আপনা থেকেই, 'কী?'

'আমায় একটু জানালার ধারে রাখবে!'

'কেন বলো তো?' মিনু জিজ্ঞেস করলে অবাক হয়ে।

'এখান থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেখতে পাচ্ছ না! জানালার ধারে কী দেখবে?'

'বিদ্যুৎকুমারকে!'

মিনু একটু অবাক হল বই কী? বিদ্যুৎই তো সে জানে, বিদ্যুৎকুমার আবার কী! কে জানে, হয়তো ভুলই শুনেছে, কিংবা কেয়া ফুলেরা হয়তো বিদ্যুতের ওইরকমই বানান করে! কিন্তু কেয়া ফুলের অনুরোধটা তো রাখা দরকার।

মিনু ফুলদানিটা ধরে জানালার ধারে বসিয়ে দিল, তারপর বলল, 'পড়ে যাও যদি!'

'না পড়ব না। এই তলোয়ারের ফলাগুলো যদি একটু ফাঁক করে দাও, আমি বেরোতে পারি!'

নাঃ, ক্রমশ যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মিনু অবাক হয়ে বললে, 'তলোয়ার কোথায়? পাতা বলো।'

'না না, পাতা হবে কেন, তলোয়ার! একটা রাজপুত্রের, একটা মন্ত্রীপুত্রের, একটা কোটালপুত্রের, একটা সদাগরপুত্রের!'

'সে আবার কী!' জিজ্ঞেস করল মিনু, 'তলোয়ার কোথা থেকে এল?'

pathagar.net

'বা-রে, আমায় পাহারা দিতে তারা তলোয়ার পুঁতে রেখে গেছ, জান না!'

'না তো।'

'সে অনেক কথা!'

'বলো না লক্ষ্মীটি!' মিনু অনুরোধ জানায়।

'শুনবে তাহলে!'

মিনুকে কি আর দুবার বলতে হয়। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে কেয়া ফুলের পাতা, থুড়ি তলোয়ারগুলি সরিয়ে ধরল।

ওমা! সত্যিই যে পালকের চেয়ে হালকা, ধোঁয়ার মতো মিহি, রেশমের চেয়ে নরম, দুধের মতো সাদা ওড়নায় ঢাকা, জোছ্নার মতো সুন্দর একটি ছোট্টো মেয়ে বেরিয়ে এসে জানলার ধারে পা ঝুলিয়ে বসল।

মিনু অবাক হয়ে বলল, 'তুমিই ছিলে ওই কেয়া ফুলের ভেতরে?'

'হ্যাঁ, আমিই ছিলাম ওই কেয়া ফুল হয়ে, কত বছর—কত যুগ—তুমি ভাবতেই পার না।'

'কেন কেন?'

'সেই গল্পই তো তোমায় বলছি। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির দেশ জান?'

'জানি না,তবে রূপকথায় যেন পড়েছি'

'তোমরা আজকাল কী-ই বা জান!'

'বাঃ আমাদের ভূগোলে কত সব অদ্ভুত দেশের কথা আছে! বেচুয়ানাল্যান্ড, আলাস্কা, ক্যামাস্‌কাট্‌কা!'

'ওসব নয়, আমাদের ভূগোলে নেই!'

'তোমাদের ভূগোলে কিচ্ছু নেই।'

অন্যসময় হলে মিনু এত সহজে ভূগোলের অপমানটা হজম করত না, কিন্তু এখন তর্ক করলে গল্প শোনাটা যদি ফসকে যায়, এই ভয়ে সে চুপ করে রইল।

কেয়া ফুল বলল, 'সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির দেশের শেষে ঘুমন্তপুরী।'

'ঘুমন্তপুরী জানি! যেখানে সবাই ঘুমিয়ে আছে, রাস্তায় লোকজন, রাজবাড়ির দরজায় সেপাইসান্ত্রি, দরবারে পাত্রমিত্র, কোটাল-মন্ত্রী, রাজা ; আর জলের মতো পরিষ্কার স্ফটিকের ঘরে নরম বিছানার ওপর ঘুমিয়ে আছে আফোটা পদ্মের মতো অপরূপ রাজকুমারী! তার পাশে সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি পড়ে রয়েছে। রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় সে ঘুমিয়েছে, সোনারকাঠি ছোঁয়ালে সে জাগে ; কিন্তু কে ছোঁয়াবে সোনার কাঠি! ঘুমন্তপুরী পাহারা দেয় অগুনতি রাক্ষুসী, তারা দিনে চলে বেড়ায় দেশ-বিদেশে। সন্ধে হলেই কোথা থেকে দলে দলে এসে হয় হাজির। মানুষ তাদের চোখে দেখতে হয় না, নাকে শুঁকেই টের পায়।'

মিনু হাঁপিয়ে উঠে একটু থামল!

কেয়া ফুলের মেয়ে একটু ভারী গলায় বলল, 'তাহলে তো তুমিই সব জান, আমি আবার কী বলব।'

মিনু বুঝল, ভারী ভুল হয়ে গেছে, গল্প বলতে বলতে মাঝখানে ফোড়ন দিলে ঠাকুমাই তো চটে যায়! কেয়া ফুলের মেয়ে যে অভিমান করবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে!

সে খুব অপরাধীর মতো বলল, 'না ভাই, আমি আর কী জানি! তোমার কাছেই তো শুনতে চাইছি।'

কেয়া ফুলের মেয়ের মনটা হাজার হলেও নরম, এইটুকুতেই গলে গিয়ে সে বলল, 'না-না, তুমি তো অনেকটা ঠিকই বলেছ, তবে তোমরা তো সব জান না, আমাদের দেশের ভুল খবর তোমাদের দেশে কারা সব রটিয়েছে, কে জানে।'

pathagar.net

উৎসাহভরে মিনু সায় দিয়ে বলল, 'তা হতে পারে। বাবা বলেন, খবরের কাগজেই রোজ কত ভুল খবর বেরোয়, যদুর ধড়ে রামের মাথা বসিয়ে তারা রামযদু তৈরি করে।'

কেয়া বলল, 'তবে! তোমাদের নিজেদের খবরই যদি এত ভুল, তাহলে আমাদের কথা তোমরা আর ঠিক কী করে জানবে। ঘুমন্তপুরীতে কোথা থেকে এল এত ঘুম, তা জান?'

মিনু যা জানত, তা বললে হয়তো আবার কেয়া রাগ করবে! তাই সে সাবধান হয়ে বলল, 'কই না তো!'

'ঘুমন্তপুরীতে একলা কে জাগে, তাও জান না?'

মিনু অবাক হয়ে বলল, 'কই না তো!'

'একলা জাগে রাজকন্যা নিজে! পুরীর মানুষ ঘুমে অসাড়, পুরীর পাথর ঘুমে নিঝুম, শুধু ঘুম নেই রাজকন্যার একচোখে!'

'একচোখে! সে আবার কী?'

'সেই তো গল্প। একদিন রাজপুরী ছিল জমজমাট। পথে পথে হইহই রইরই ঘরে ঘরে লোক থইথই ; রাজপুরী গমগম করে রাতদিন। হঠাৎ একদিন রাজকন্যা বাগানে গিয়ে না-জানি ফুলের দো-দানি পাতা ছিঁড়ে বসল।

'তাতে কী?'

'বলছি তো, শোনোই না।'

'না-জানি ফুলের দো-আনি পাতা তো শুনিনি কখনো!' বলে ফেলেই মিনু বুঝল, কাজটা ভালো হয়নি। কেয়া-মেয়ের ঠোঁট তখনই ফুলেছে।

'অত খিচখিচ করলে গল্প বলা যায় না।'

মিনু তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'না-না, এইবারটি, মাপ করো, আর বলব না।'

কেয়া অবশ্য তক্ষুনি খুশি হয়ে বলল, 'পাতা তো নয়, জ্যোছ্নারাতের দুই পরি দিনের বেলা গলা জড়াজড়ি করে পাতা হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ছিঁড়ে তারা মাটিতে পড়ল, মাটিতে পড়ে শামুক হয়ে শাপ দিল—'

'শামুক হল কেন?'

'বাঃ, দিনের বেলায় কেউ ছুঁয়ে দিলেই ভাঙা চাঁদ পুরন্ত না হওয়া অবধি পরিদের যে শামুক হয়ে কাটাতে হয়। কোথায় চাঁদের আলোয় হালকা পাখায় উড়ে বেড়াবে মনের খুশিতে, না শামুক হয়ে মাটির ওপর গুটিগুটি নড়তে হবে। পরিদের রাগ তো হবেই।

'তারা শাপ দিল—

এক ছিলাম, দুই করলি,
দিনে ছুঁয়ে ঘুম ভাঙালি,
দু-চোখের পাতা তোর
এক হবে না!

'রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরল। শাপের কথা শুনে রানি কাঁদেন, রাজ্যসুদ্ধ লোক কাঁদে। রাজকন্যার চোখে আর ঘুম নেই।

'দিন যায়, হপ্তা যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, রাজকন্যা দু-চোখের পাতা আর এক করতে পারে না। রাজা বৈদ্য ডাকলেন, রোজা ডাকলেন, কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগযজ্ঞ করলেন— রাজকন্যার চোখে আর ঘুম নামে না।

'শেষে রাজা দেশ-বিদেশে ঢেঁড়া দিলেন, 'রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারলে মস্ত বকশিশ।' বকশিশের বহর বেড়ে চলল। মোহরের থলের বদলে মণিমুক্তো, মণিমুক্তোর জায়গায় হিরে-মাণিক, কিন্তু কেউ রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারল না।

pathagar.net

'কত গুণিন এল, ওঝা এল, নামের চেয়ে উপাধি-বড়ো বৈদ্য এল, রাজকন্যার হয়রানিই সার। কেউ সারা দিনরাত মন্ত্র পড়ে, কেউ হরেকরকম জড়িবুটি খাওয়ায়, রাজকন্যা তবু ঘুমের উপোসী। দিনেদিনে রাজকন্যা শুকিয়ে কাঠিটি হয়ে গেল।

'রানির চোখের জল আর শুকোয় না, রাজা ভেবে সারা। বলেন, অর্ধেক রাজত্ব দেব, মেয়ে যদি ঘুমোয়। এমন সময় রাজপুরীর টিকারায় ঘা।

'কে আসে? কে আসে? না—নিশুত-নগরের মস্ত গুণিন আসে ; কিন্তু বড়ো বেশি তার খাঁই। অর্ধেক রাজত্বে তার কাজ নেই, ঘুমি পাড়িয়ে স্বয়ং রাজকন্যাকে সে চায়। তাও বড়ো সহজ শর্তে নয়! নিশুতি রাতে একলা আসবে রাজকন্যার ঘরে, একলা জাগবে। চোখে যদি কেউ চেয়ে দেখে, তাহলে আজীবন তার অ-নিদ্ কাটবে, আর সমস্ত পুরীর ঘুম যুগ-যুগান্তরেও ভাঙবে না।

'রাজা অনেক ভাবলেন, অনেক চিন্তা করলেন ; কিন্তু উপায় তো আর নেই—রাজি তাঁকে হতেই হল।

'নিশুতি রাতে রাজপুরীতে টুঁ শব্দটিও নেই। সবাই আছে যে যার ঘরে চোখ বুজে। দেউড়িতে পায়ের আওয়াজ, পায়ের আওয়াজ স্ফটিকের সিঁড়িতে। রাজকন্যার বুক কাঁপছে পালঙ্কে শুয়ে। পায়ের আওয়াজ ঘরের কাছে! পালঙ্কের কাছে খসখস ফোঁসফোঁস—কার বুঝি ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে।

'রাজকন্যা, চোখ যেন খুলো না।

'না, রাজকন্যা চোখ কিছুতেই খুলবে না। ঘরে কীসের ঠান্ডা মিষ্টি গন্ধ, গন্ধ নয় বুঝি ঘুমেরই ঘোর, নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঝিমিয়ে আসে গা, ঘুমের সাগর উথলে উঠছে, ঢেউ ভেঙে পড়ে পায়ের কাছে, ঢেউ এল হাঁটুর ওপর, ঢেউ গেল কোমর ছাড়িয়ে, হিমের মতা ঠান্ডা ঢেউ গলার কাছে খেলা করে, রাজকন্যার সকল দেহ এলিয়ে পড়েছে! হিমেল ঘুমের ঢেউ এগিয়ে আসে।

'রাজকন্যা, চোখ খুলো না।

'কিন্তু রাজকন্যা আর কি পারে! দুটি চোখ ঘুমে এসেছে জড়িয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে, একবার না দেখে যে থাকা যায় না।

'রাজকন্যা একটি চোখ বুজে একটি চোখ খুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের রক্ত হিম! রাজকন্যা আঁতকে উঠে চিৎকার করল।

'আঁতকে উঠল কি সাধে! মেঝেয় কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাদ পর্যন্ত বিরাট ফণা তুলে অজগরের রাজা নাগেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে আছে!

'চোখাচোখি এক পলক শুধু, হঠাৎ ঘরের বাতি নিভল, জানালা-দরজা আছাড় খেল ঝড়ের দাপটে।

'অন্ধকারে শোনা গেল শুধু দারুণ স্বর—

যে চোখে দেখেছ, সে চোখে জাগবে,
নিঝুমপুরীর ঘুম না ভাঙবে।'

'রাজকন্যা কেঁদে ফেলে বলল, আর কি তবে উদ্ধার নেই?

'অট্টহাসির সঙ্গে শোনা গেল, আছে, যদি আমার রানি হও এখন!

'রাজকন্যা শিউরে উঠে বলল, না-না। সে হয় না!

'তবে যেমন আছ, তেমনি থাকো, যতদিন না—

জলের তলায় আগুন জ্বলে,
সেই আগুনে শিলা গলে।

'সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি শোনা গেল! সেই থেকে রাজকন্যা একচোখে জেগে কাটায় ; রাজপুরীরর ঘুম আর ভাঙে না।

pathagar.net

'রাজকন্যা জানে, উদ্ধার আর নেই. জলের তলায় আবার আগুন কেউ জ্বালতে পারে নাকি! আর পারলেও এ ঘুমন্তপুরীতে আসছে কে!'

মিনু এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে গল্প শুনেছে, এইবার উৎসুক হয়ে বলল, 'কেন, রাজপুত্র কোথায় গেল?'

কেয়া ফুল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কোথায় আর যাবে! রাজপুত্র সবে পথে বেরিয়েছে, দুয়োরানির ছেলে বলে সুয়োরানি রাতদিন দূর দূর করেন, রাজা চোখে দেখেও কিছু করতে পারেন না। মনের দুঃখে রাজপুত্র ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে নিশুতি রাতে যেদিকে দু-চক্ষু যায়, বেরিয়ে পড়েছে। দু-চক্ষু আর কোথায় যায়! পুরীর বাইরে মশান ; রাজপুত্র সেই দিকেই চলেছে। মশানের মাঝে পথ আগলে কোটালপুত্র দাঁড়িয়ে—

'কোথায় যাবে বন্ধু?

'যেদিকে দু-চক্ষু যায়।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

'রাজপুত্রের কোনো মানা না শুনে কোটালপুত্র সঙ্গে চলে। মশান ছাড়িয়ে শ্মশান, সেখানে আর দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে—মন্ত্রীপুত্র আর সদাগরপুত্র। কোনো মানা তারা শুনল না। রাজপুত্রের সঙ্গে তারা দেশান্তরি হবেই।

'শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিতার আগুন সাক্ষী করে চার বন্ধু প্রতিজ্ঞা করল,—জীবনে-মরণে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

'তারপর চার বন্ধু কত দেশ, কত বন, কত পাহাড় ডিঙিয়ে চলে, পিছন ফিরে আর তাকায় না। শেষে একদিন ঘুরতে ঘুরতে—'

মিনু বলে ফেলল, 'ঘুমন্তপুরী!'

কেয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'কী করে বুঝলে? আমি তো বলিনি!'

মিনু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওসব আমি বুঝতে পারি।'

কেয়া ফুল বোধ হয় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করল, 'ঘুমন্তপুরীর সে কী হাল! তার দেয়াল টলমল, পড়ে পড়ে ; তার ঘরদোর জঙ্গলঝোপে-ঝাড়ে।

'তবু রাজপুত্রের কেমন শখ—ভেতরে যাবে। বন্ধুরা মানা করে, রাজপুত্রের সেই এক গোঁ। কী আর করে, চার বন্ধু মিলে তলোয়ারে জঙ্গল সাফ করতে করতে ভেতরে ঢুকল। যেদিকে চায়, জানালা-দরজা খসে পড়েছে, দেয়াল ধসে পড়েছে। তারই ভেতর ঘরে ঘরে মরা মানুষ!

'কী আশ্চর্য! মরা তো নয়, জ্যান্ত মানুষ! মরা হলে কবে পচে খসে যেত। জ্যান্ত মানুষ ঘুমিয়ে আছে অঘোর ঘুমে!

'চার বন্ধু এক-এক করে সব ঘর-দালান ঘুরে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে! ঘরের পর ঘর ঘুরতে ঘুরতে—'

মিনু বলল, 'রাজকন্যার ঘরে—'

কেয়া বলল, 'তুমি তো ঠিক ধরতে পার! রাজকন্যা একচোখে ঘুমায় আর একচোখে জাগে ; ঘরের ভেতর চার বন্ধুকে দেখে অবাক! ঘুমের চোখে স্বপ্ন, না জাগার চোখে সত্যি দেখছে, ভেবে পায় না।

'চার বন্ধু তো অবাক। মণি-মাণিক্যের পালঙ্কে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা একচোখে চেয়ে আছে—এ আবার কে!

'রাজপুত্র এগিয়ে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল—'অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, এমন পুরী তো দেখিনি! কেন তোমাদের এমন দশা?'

pathagar.net

'ঘুমের চোখে স্বপ্ন নয়, জাগার চোখে সত্যি দেখা।

'রাজকন্যা চমকে উঠে বলল, সেকথা শুনে কাজ নেই, নাগেশ্বরের পুরী, অজগর পাহারা, এক্ষুনি পালাও, নইলে মারা পড়বে।

'চার বন্ধুর তবু জেদ, সব কথা না শুনে তারা যাবে না।

'কী আর করে, রাজকন্যা দু-চার কথায় সব বুঝিয়ে দিল। বলতে বলতে গাল বেয়ে একফোঁটা চোখের জল পড়ল।

'চার বন্ধু বলল, কেঁদো না রাজকন্যা! আমরা তোমায় উদ্ধার করব।

'রাজকন্যা দুঃখের হাসি হেসে বলল, আমার উদ্ধার হবে না। জলের তলায় আগুন জ্বলবে, সে আগুনে শিলা গলবে, তবে আমার উদ্ধার! সে তো হওয়ার নয়!

'রাজপুত্র খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভেবে নিয়ে হেসে বলল, এই কথা! এ আবার শক্ত কী! তোমার উদ্ধার হয়ে গেছে তাহলে।

'রাজকন্যা বড়ো দুঃখেও হেসে ফেলল রাজপুত্রের কথায়। রাজপুত্রের কাণ্ড দেখে আরও অবাক!

'ঘরে ছিল স্ফটিকের পাত্র। রাজপুত্র তাতে জল ভরল। কোটালপুত্রকে বলল, হাতে করে ধরে থাকো।' তারপর শুকনো ঘাস-পাতা কুড়িয়ে আনল মন্ত্রীপুত্র। সদাগরপুত্র চক্‌মকি ঠুকে স্ফটিক পাত্রের তলায় আগুন জ্বালল। ঘরে ছিল বাতিদানে মোমের বাতি, রাজপুত্র খুলে নিয়ে সে আগুনে গলিয়ে ফেলল।

'কাণ্ড দেখে রাজকন্যা হেসেই খুন। হাসতে হাসতে রাজকন্যা উঠে বসল। বসে বলল, এতে যদি শাপ কেটে যেত।

'কেটে যেত কী, গেছে তো!

'তাই তো! অবাক কাণ্ড! রাজকন্যা হাসতে হাসতে যে উঠে বসেছে!

শুধু কি রাজকন্যা! পুরীর লোকজন সবাই উঠে বসে অবাক!

'থমথম পুরী আবার গমগম করে উঠল। রাজকন্যা পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ রাজকন্যার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। পুরীর চারধারে হিসহিস, ফোঁসফোঁস শব্দ, হাওয়ায় ভেসে আসে হিমেল নিশ্বাস।

'নাগরাজ খেপে আসছে ছুটে, সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গ।

'পালাও বন্ধুরা, পালাও। রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল।

'যদি যেতে হয়, তোমায় সঙ্গে না নিয়ে যাব না!

'চার বন্ধু রাজকন্যার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। বাইরে চার বন্ধুর ঘোড়া বাঁধা। রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে উঠল নিজের ঘোড়ায়। পেছনে তিন বন্ধু।

'ঘোড়া ছুটছে হাওয়ার আগে। মাঠঘাট, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে চার বন্ধু চলেছে রাজকন্যাকে নিয়ে।

'কিন্তু কত দূর তার যাবে! নাগরাজের মায়ার তো শেষ নেই! তার হাত থেকে কি নিস্তার আছে! দেখতে দেখতে তেপান্তরের মাঝে অকূল নদী জেগে উঠল পথ রুখে।

'ফেরাও ঘোড়া, ফেরাও ঘোড়া! ফেরাবে কোথায়? পেছনে নাগরাজের চর-অনুচর নাগনাগিনী ছুটে আসছে, সামনে অকূল নদীতে দুরন্ত বান!

'কী হবে রাজপুত্র?

'চার বন্ধু রাজকন্যাকে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

'ভয় নেই রাজকন্যা, তোমায় আমরা রক্ষা করব।

'চার বন্ধু রাজকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মাটিতে গেঁথে রাজপুত্র

pathagar.net

বলল, এই রইল তোমার চিরদিনের পাহারা। মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্রও নিজের-নিজের তলোয়ার চারধারে পুঁতে দিল।

'নির্ভয়ে থাকো রাজকন্যা, এ তলোয়ারের বেড়া ডিঙোবার সাধ্য কারো নেই।

'রাজকন্যা কেঁদে উঠে বলল, কিন্তু তোমাদের কী হবে?

'আমাদের? চার বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মন্ত্রীপুত্র বলল, 'আমি পবন-মন্ত্র জানি, ঝড় হয়ে বইব। কোটালপুত্র বলল, আমি মেঘ-মন্ত্র জানি, মেঘ হয়ে আকাশ ছেয়ে দেব। সদাগরপুত্র বলল, আমি বরুণ-মন্ত্র জানি, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ব।

'আর রাজপুত্র!—

'রাজপুত্র বলল, আমি বিদ্যুৎ-মন্ত্র জানি, বজ্র হয়ে জ্বলে উঠব। শোনো রাজকন্যা, আমাদের একসঙ্গে দেখা না পেলে তুমি মুখ তুলো না।'

মিনু প্রায় চুপিচুপি বলল, 'তুমিই বুঝি সেই রাজকন্যা?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই রাজকন্যা ঘুমন্তপুরীর। নাগেরা আমায় ঘিরে থাকে, তবু তলোয়ারের বেড়া ডিঙোতে পারে না। চার বন্ধু যেদিন একসঙ্গে দেখা দেয়, সেদিন আমি মুখ তুলে চাই, গন্ধে জানাই মনের কথা।'

কড়্-কড়্-কড়্‌কড়্! হঠাৎ বাজের শব্দে মিনু চমকে জেগে উঠে বসল বিছানায়। ওমা! কোথায় গেল রাজকুমারী! কেউ যে কোথাও নেই!

কেয়া ফুলের গন্ধে ঘর শুধু আমোদ হয়ে গেছে।

pathagar.net

অপরূপ কথা

মস্ত বড়ো রাজা—

একালের নয়, সেকালের।—সুতরাং লোকলশকর, সৈন্যসামন্ত, হাতিঘোড়া বিস্তর—তার আর লেখাজোখা নেই।

রাজ্যের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত যেতে সারাদিন লেগে যায়। অবশ্য একটু বেলা করে বেরোতে হয়। মাঝে ঘণ্টা আষ্টেক জিরিয়েও নিতে হয় বই কী!

হাতিশালে হাতি...হাতি ছিল, আপাতত মরে গেছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া কিন্তু আছে! বুড়ো হয়ে বাতে আর চলতে পারে না, কিন্তু তা হোক, চিঁহি চিঁহি করে ডাকে—খাবার না পেলে।

লোকলশকর তো বলেছি লেখাজোখা নেই। হাঁক দিলে অমন পিলপিল করে চার-পাঁচজন বেরিয়ে পড়তে পারে—সব সময়ে অবশ্য বেরোয় না। মাস কয়েক মাইনে না পেয়ে একটু বেয়াড়া হয়ে পড়েছে।

সুতরাং মস্ত বড়ো রাজা।

রাজার জমকালো দরবার। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্রমিত্র, প্রহরী প্রভৃতি রাজাকে ঘিরে আসর জমিয়ে বসে থাকে। প্রভৃতি অবশ্য একজন ছোকরা চাকর। তাকে নিয়ে হল ছজন।

মন্ত্রী সব সময় থাকতে পারেন না, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে তাঁকে বাজার-টাজার করে আনতে হয়। কোটাল রান্না চড়িয়ে সময় পেলেই কিন্তু এসে বসেন। পাত্রমিত্র ঠায় বসে থাকেন। তাঁদের একজনের বাত আর একজনের হাঁপানি ; দরবারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করলে বাড়ে।

রাজসভায় রাজকার্য চলে সারাদিন।

গোমড়া মুখে সবাই বসে থাকেন! রাজা থেকে থেকে পিঠের জামা তুলে ডাকেন, 'মন্ত্রী—'

ব্যস, আর কিছু বলতে হয় না। মন্ত্রী বজ্রগম্ভীর হাঁক দিয়ে ডাকেন, 'প্রহরী!' প্রহরী এসে লম্বা কুরনিশ করে ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে দেয়।

মন্ত্রী রাজার পিঠ চুলকে দেন।

খানিক বাদে রাজা বলেন, 'হুঁ।'

মন্ত্রী চুলকোনো থামিয়ে প্রহরীর হাতে ঝিনুক ফিরিয়ে দেন। প্রহরী আবার কুরনিশ করে ঝিনুক ট্যাঁকে গুঁজে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

আবার সব চুপচাপ।

খানিক বাদে রাজা মন্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেন, 'মন্ত্রী!'

কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রী বলেন, 'হুঁজুর।'

'তোমার গর্দান যাবে, জান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন জান?'

'আজ্ঞে না।'

রাজা ধমক দিয়ে বলেন, 'কী! জান না?'

মন্ত্রী শশব্যস্ত হয়ে বলেন, 'আজ্ঞে জানি।'

'বলো, কেন?'

মন্ত্রী আমতা আমতা করেন।

pathagar.net

রাজা ধমক দিয়ে বলেন, 'অকর্মণ্য! এত বড়ো একটা রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কেন তোমার গর্দান যাবে, তা তুমি বলতে পার না?'

মন্ত্রীর হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়। বলেন, 'হুজুর, এত বড়ো রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে এই সামান্য কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব? এ হল কোটালের কাজ।'

রাজা বলেন, 'হুঁ, ঠিক বলেছ। বলো কোটাল।'

কোটাল কানে একটু খাটো। শুনতে পায় না। মাথা নিচু করে নিজের মনে বিড়বিড় করে।

রাজা আবার হাঁক দেন, 'কোটাল!'

এবার কোটাল শুনতে পায়, লাফ দিয়ে উঠে কুরনিশ করে বলে, 'হুজুর!'

'কেন মন্ত্রীর গর্দান যাবে?'

কিন্তু তাতে হয় না। অগত্যা কোটালের কানটা ধরে কাছে টেনে মন্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলতে হয়, 'কেন আমার গর্দান যাবে, রাজা জিজ্ঞাসা করছেন?'

একগাল হেসে এবার কোটাল বলে, 'আজ্ঞে, এর আগেই যাওয়া উচিত ছিল, ওর মুখখানা যা বিশ্রী!'

মন্ত্রীর চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

রাজা বলেন, 'চোপ, হল না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলে কোটাল থপ করে বসে পড়ে।

রাজা বলেন, 'যে বলতে পারবে, তার বকশিশ মিলবে, ভুল হলে গর্দান!'

সবাই সবার মুখের পানে চায়, কেউ রা কাড়ে না।

রাজা এক-এক করে জিজ্ঞাসা করেন। কেউ কথা কয় না। সব শেষে ডাক পড়ে ছোকরা চাকরের।

ছোকরা চাকর একা একাই মেঝেয় বসে তাস নিয়ে পেটাপিটি খেলে। রাজার ডাকে মুখ না তুলেই বলে, 'আজ্ঞে, চুলকোনো বেশি হয়েছে, আপনার পিঠ জ্বালা করছে।'

'ঠিক।'

সবাই মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক, হতভাগা আগে না বললে আমরাও বলতে যাচ্ছিলাম।'

রাজা বলেন, 'নাও বকশিশ।'

ছোকরা চাকর মাথা না তুলেই বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়। রাজা এ পকেট, ও পকেট খুঁজে শেষকালে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আস্ত টাকা বার করে দেন।

ছোকরা চাকর সেটা ঠং করে মাটিতে ঠুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা অচল।'

রাজা টাকাটি আবার পকেটে পুরে বলেন, 'আচ্ছা, কাল নিয়ো।'

তারপর আবার চুপচাপ।

রাজার স্মরণশক্তি অত্যন্ত বেশি। ঘণ্টা কয়েক বাদে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন, 'তোমার না গর্দান যাবে?'

'আজ্ঞে, যাবে বই কী! তবে আজকে তো আর হয় না, আজ কোথাও যাত্রা নাস্তি।'

'বেশ, কাল যেন মনে থাকে!'

খানিক বাদে রাজার হাই ওঠে। রাজা বলেন, 'ব্যস্, আজকের মতো সভা ভঙ্গ।'

এমনি করে রাজ্যশাসন চলে। রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। অবশ্য বাঘ জল ছাড়া আরও কিছু খায়। চোর-ডাকাত রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। তাদের মজুরি পোষায় না।

এহেন সুখের রাজ্যে একদিন এক বিপদ ঘটল।

pathagar.net

রাজা সভায় বসে আছেন। মন্ত্রী গেছেন বাজারে, কোটাল রান্নাঘরে। ছোকরা চাকর এসে পৌঁছোয়নি। এমন সময় প্রহরী কুরনিশ করে দাঁড়িয়ে বলল, 'হুজুর, দূত এসেছে।'

রাজার ঘুম এসেছিল। চোখ বুজে বললেন, 'গর্দান নাও।'

'হুজুর, দূত।'

রাজা বললেন, 'দুত্তোর'।

মন্ত্রী ততক্ষণে বাজার-টাজার সেরে পোঁটলা হাতে সভায় এসে পৌঁছেছেন। ব্যাপার বুঝে একটু গলা চড়িয়ে বললেন, 'হুজুর, দূত যে অবধ্য!'

'অবাধ্য হলে তো আর কথাই নেই, আগে মাথা নাও'—

রাজার বিদ্যের বহর স্মরণ করে মন্ত্রী বললেন, 'আজ্ঞে, দূতকে যে মারতে নেই, শাস্ত্রে বলে—আর তা ছাড়া ও যে রামনগরের দূত!'

রাজার ঘুম-টুম উবে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে সভয়ে বললেন, 'অ্যাঁ, রামনগরের দূত! কোথায়? শুনতে-টুনতে পায়নি তো! রামনগরের রাজাটা যা গোঁয়ার আর চোয়াড়, এক্ষুনি যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে—একটা ছুতো পেলে হয়!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ, শুনেছি তাঁর পুরোনো তরোয়ালটায় শান দেবার পর থেকে তিনি সেটার ধার পরীক্ষা করবার জন্যে উসখুস করছেন।'

'তাই নাকি, আর তোমরা তার দূতকে রেখেছ বসিয়ে ; দেখো আবার কী ফ্যাসাদ বাধিয়েছে!'

ছোকরা চাকর ততক্ষণে এসে পড়েছে। দূতকে ডেকে এনে সে-ই হাজির করে দিল।

দূত এসে কুরনিশ করে বলল, 'হে রাজন্!'

রাজা আঁতকে উঠে বলে ফেললেন, 'অ্যাঁঃ!'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্যে তাঁর কানে কানে বলে দিলেন, 'আজ্ঞে ভয় নেই, ওদের ওরকম বলাই দস্তুর।'

দূত তখন বলে চলেছে—'শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত পরম পরাক্রান্ত সসাগরাধরণীর অধিপতি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিলোকের পালক, চন্দ্রসূর্য যাঁহার মার্বেলগুলি, নক্ষত্রমণ্ডলী...'

রাজা ফ্যালফ্যাল করে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি কানে কানে বললেন, 'একটু সবুর করুন মহারাজ, আর একটুখানি বাকি।'

'...যাঁহার ঝাড়লণ্ঠন, হিমালয় যাঁহার ইটের পাঁজা, নদী সমুদ্র যাঁহার নালাডোবা, সেই মহামহিম অজর অমর অজেয় রামনগরের মহারাজের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই পত্র আপনাকে প্রদান করিলাম।'

দূত রাজার হাতে একটি চিঠি দিল।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল, বললেন, 'তাই বলো চিঠি এনেছে, আমি ভাবি কী না ব্যাপার।'

তারপরেই রাজা মুখ গম্ভীর করে এ পকেট, ও পকেট হাতড়ে বললেন, 'এই যাঃ, চশমাটা তো ফেলে এসেছি। নাও পড়ো তো হে মন্ত্রী।'

মন্ত্রী এর মধ্যে বাজারের পোঁটলা হাত-সাফাই করে সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে ফেলেছেন। চিঠি হাতে নিয়ে তিনিও একবার এ পকেট, ও পকেট হাতড়ে বললেন, 'আজ্ঞে আমিও দেখছি চশমাটা আনিনি। পড়ো হে কোটাল, তোমার তো খুব চোখের জোর।'

মন্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে কোটালকে বাধ্য হয়েই চিঠিটা নিতে হয়। তারপর উলটেপালটে একবার কাছে, একবার দূরে—নানারকমে ধরেও কোটালের চিঠি পড়া আর হয় না।

pathagar.net

রাজা ধমক দিয়ে বললেন, 'কই হে পড়ো না, ভারী তো একটা চিঠি, তাই পড়তে দিন কাটাবে নাকি! নেহাত চশমাটা ফেলে এসেছি, থাকলে দেখিয়ে দিতাম!'

কোটাল কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে পড়তে তো এক্ষুনি পারি, কিন্তু এর যে আগাগোড়া ব্যাকরণ ভুল। এমন অশুদ্ধ ভাষা কেমন করে মুখ দিয়ে বার করব!'

ছোকরা চাকর এতক্ষণ এধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান চিবোচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা টেনে নিয়ে বলল, 'থাক, কাউকে পড়তে হবে না।'

মন্ত্রী অমনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ো তো বাবা, এইতো তোমাদের পড়বার বয়স!'

কোটাল সায় দিয়ে বললেন, 'আর তোমাদের তো অত শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার নেই! পড়লেই হল।'

ছোকরা চাকর চিঠিটা মনে মনে পড়ে ফেলে বলল, 'রামনগরের মহারাজ আপনার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন। তিন দিনের ভেতর রাজপুত্র নিয়ে বিয়ের জন্য রওনা না হলে রামনগর থেকে সাত হাজার সেনা তাঁকে নিতে আসবে।'

এবার সভাশুদ্ধ সকলের মুখ শুকিয়ে গেল।

রাজা ঢোঁক গিলতে গিলতে বললেন, 'সাত হাজার! ঠিক পড়েছ তো হে, সাত হাজার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সাত হাজার পদাতিক আর তিন হাজার ঘোড়-সওয়ারের কথাও আছে!'

'আবার ঘোড়-সওয়ারও আছে!'—রাজার প্রায় ভিরমি যাবার অবস্থা।

ভিরমি যাওয়া আশ্চর্যও নয়। প্রথমত রাজার ছেলেই হয়নি তো রাজপুত্র পাঠাবেন কেমন করে। আবার না পাঠালে সাত হাজার সৈন্যের নিতে আসা মানে যে কী, তাও আর বোঝা শক্ত নয়। সেকালে যুদ্ধ-টুদ্ধ অমনি করেই হত কিনা!

রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকান, মন্ত্রী তাকান কোটালের দিকে। পাত্রমিত্র মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

এখন উপায়!

রাজা বার কয়েক ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললেন, 'ওহে দূত...ওর মানে কী! বুঝেছ কি না—অর্থাৎ...ওই যে কী বলে—বলো না হে মন্ত্রী!'

'এই যে বলি মহারাজ...' মন্ত্রী একবার বেশ করে গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে শুরু করলেন....'ওহে দূত, ওর মানে কী...বুঝেছ কি না...'

দূত এতক্ষণ পর্যন্ত কিঞ্চিৎ জলযোগের আশায় থেকে থেকে এইবার তার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে চটে গিয়েছিল—বলল, 'যা বলবার তাড়াতাড়ি সেরে নিন মশাই, আমার তো আর সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না—খাওয়াদাওয়া তো আছে!'

কিন্তু এত বড়ো ইশারাটাও মাঠে মারা গেল। রাজা বললেন, 'নিশ্চয়ই! বলো না হে মন্ত্রী যা বলবার।'

ছোকরা চাকর এবার এগিয়ে এসে হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বলল, 'ওহে বাপু দূত!'

দূত চটে উঠে বলল, 'ওহে বাপু কী হে!'

'আচ্ছা, না হয় ওহে বাছা দূত, তোমার রাজাকে গিয়ে বোলো যে রাজপুত্র গেছেন শিকারে, শিকার থেকে ফিরেই তিনি যাবেন বিয়ে করতে।'

সভাসুদ্ধ সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দূত রাগে গসগস করতে করতে বলে গেল, 'কিন্তু বেশি দেরি হলে আমরা নিতে আসব, মনে থাকে যেন।'

তারপর একমাস যায়, দু-মাস যায়।

রামনগর থেকে দূত এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কই, রাজপুত্র শিকার থেকে ফিরল?'

ছোকরা চাকরই জবাব দেয়, 'ফিরবে বই কী, এই ফিরল বলে!'

pathagar.net

কিন্তু এমন-করে আর কতদিন চলে। রাজপুত্র আর না পাঠালে নয়।

ছোকরা চাকর বলে, 'মহারাজ, রাজপুত্র খুঁজুন।'

রাজা বলেন, 'ঠিক বলেছ। প্রহরী, রাজপুত্র খুঁজে আনো!'

প্রহরী এসে কিন্তু মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়েও না চড়েও না।

মন্ত্রী বলেন, 'মহারাজ, রাজপুত্রের চেহারাটা কীরকম হবে একটুকু আঁচ না পেলে ও-ই বা খোঁজে কেমন করে!'

রাজা বলেন, 'কেন? এই আমার মতো চেহারা!'

মন্ত্রী রাজার চেহারার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে মাথা চুলকোতে থাকেন!

রাজা চটে উঠে বলেন, 'চুপ করে আছ যে বড়ো! আমার চেহারাটা বলতে চাও খারাপ!'

'আজ্ঞে মহারাজ, তা কী বলতে পারি। তবে কিনা আপনার মতো সুপুরুষ এ রাজ্যে আর কোথায় পাবে তাই ভাবছি!'

রাজা খুশি হয়ে দন্ত বিকশিত করে বলেন, 'তা বটে, তা বটে। তবে কী হবে?'

মন্ত্রী বলেন, 'এই ধরুন আমাদের—এই না হয় আমারই মতো!'

কোটাল কানে খাটো হলেও এ কথাটা শুনতে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে প্রতিবাদ করতে যায়। কিন্তু দরকার হয় না। রাজা তার আগেই হো হো করে হেসে উঠে বলেন, 'পাগল হয়েছ। রাজকন্যা ভয় পেয়ে মূর্ছা যাক আর কি!'

মন্ত্রী মুখ-চোখ লাল করে গম্ভীর হয়ে যান।

শেষ পর্যন্ত ঠিক রাজার মতো চেহারাই দরকার, তবে অতটা ভালো না পেলেও ক্ষতি নেই।

চেহারা মেলে কিন্তু রাজপুত্র হতে কেউ রাজি হয় না। রামনগরের মেয়েদের বড়ো বদনাম। তারা নাকি বড়ো বেশি লেখাপড়া জানে—ফট করে যদি কিছু শুধিয়েই বসে!

এদিকে রামনগরের আর তর সয় না। এবার রাজপুত্র না গেলে তারা নিতে আসবেই—দূত বলে গেল।

অগত্যা রাজাকে বরযাত্রী নিয়ে বেরোতেই হয়।

বরের পালকি খালিই চলে। রাজা বলেন, 'ওহে মন্ত্রী, চোখ দুটো একটু সজাগ রেখো। তেমন তেমন দেখলেই তুলে নেবে!'

কিন্তু তেমন তেমন আর মেলে না, বরযাত্রীর দল কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে রামনগর ঢোকে!

লোকজন ছুটে আসে, 'বর কই, বর কই' বলে।

রাজা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'মন্ত্রী এইবার যে গেলাম।'

ছোকরা চাকর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সকলকে হাঁকিয়ে দেয়, 'বিয়ের আগে আমাদের বর দেখাতে নেই!'

রাজা বলেন, 'ঠিক ঠিক, মনে ছিল না।'

মন্ত্রী বলেন, 'ঠিক বটে, মনে ছিল না।'

কিন্তু বিয়ের দিন তো আর চালাকি চলে না। রামনগরের লোক এসে বলে, 'বর কই?'

রাজা চান মন্ত্রীর মুখে। মন্ত্রী চান রাজার মুখে।

ছোকরা চাকর বলে, 'আমাদের বিয়ের নিয়ম আলাদা।'

'কী নিয়ম?'

'আমাদের বর সভায় বসে ছদ্মবেশে। রাজকন্যাকে খুঁজে বার করে মালা দিতে হয়।'

তারা বলে, 'আচ্ছা, তাই সই।'

মস্ত বড়ো বিয়ের সভা। লোকজন গিজগিজ করে। সভা জুড়ে বরযাত্রীর দল বসে থাকে।

pathagar.net

রাজকন্যা মালা হাতে করে সভায় ঢোকেন। এদিক ওদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মালা পরিয়ে দেন—ছোকরা চাকরের গলায়।

রাজা চমকে উঠে বলেন, 'অ্যাঁ! ও যে—'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁর গা টেপেন।

রামনগরের রাজা চোখ পাকিয়ে বলেন, 'ও যে মানে?'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, ও যে নয়, ও যে।'

তবু কটমট করে তাকিয়ে রামনগরের রাজা বলেন, 'ও-ই যে কী?'

'আজ্ঞে মহারাজ বলতে যাচ্ছিলেন ও-ই যে আমাদের রাজপুত্র!'

রামনগরের রাজা হেসে বলেন, 'তাই বলো। সে আর কে না জানে!'

* * *

রাজা বর-কনে নিয়ে ঘটা করে দেশে ফেরেন। রামনগরের রাজদরবারে হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। রামনগরের রাজা বলেন, 'আচ্ছা বোকা বানানো গেছে, কী বলো মন্ত্রী!'

রামনগরের মন্ত্রী বলেন, 'আজ্ঞে যা বলেছেন।'

রাজা বলেন, 'একেবারে বোকার দেশ কী বলো, রাজকন্যা আর মন্ত্রীকন্যার তফাত বুঝতে পারল না! ছ্যা ছ্যা!'

কথাটা মন্ত্রীর ভালো লাগে না। তবু রাজার সঙ্গে হাসতে হয়। হাসতে হাসতে বলেন, 'কিন্তু রাজপুত্রের চেহারাটা ভালো। রাজা হলে মানাবে।'

রামনগরের রাজা চট করে চটে উঠে বলেন, 'তার মানে?'

pathagar.net

নানারকম গল্প

pathagar.net

কালুসর্দার

তোমরা বোধ হয় জান, তিনশো বছর আগে এই বাংলাদেশ একেবারে অরাজক ছিল। তখন মুসলমান রাজত্ব যায় যায়, অথচ ব্রিটিশ রাজত্বের পত্তন হয়নি। তখন সত্যিই এদেশ হয়েছিল মগের মুল্লুক। 'জোর যার মুল্লুক তার'—কথাটা বোধ হয় তখন থেকেই উঠেছে।

সেই অরাজকতার সময় সমস্ত বাংলাদেশের নানাজায়গায় বড়ো বড়ো ডাকাতের দল গড়ে উঠেছিল। দেশের তারাই ছিল আসল রাজা। সাধারণ লোকে দিনরাত তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। সেই ডাকাতের দলের প্রতিপত্তি যে কীরকম ছিল, তা বোধ হয় এই কথা থেকেই বুঝতে পারবে যে, তখনকার ডাকাতেরা দস্তুরমতো খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত। ডাকাতি করতে আসছে, না নিমন্ত্রণ খেতে আসছে, তাদের ভাবগতিক দেখে তা বোঝা যেত না।

জমিদারমশাই হয়তো কাছারিতে বসে আছেন, এমন সময় বিশাল যমদূতের মতো চেহারা নিয়ে একজন সেখানে এসে হাজির! জমিদারের তো তাকে দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেছে! কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, 'কী চাই বাপু, তোমার?'

ভীমসেনের যমজ ভাই কায়দা-দুরস্তভাবে লম্বা কুরনিশ করে জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, 'সর্দার আপনাকে সেলাম দিয়েছেন হুজুর।' তারপর মালকোঁচা-মারা কাপড়ের ট্যাঁক থেকে এক চিঠি বেরোল।

জমিদারমশাই চিঠি নেবেন কী, হাতের তাঁর কাঁপুনি থামে না। অনেক কষ্টে চিঠি যদিই-বা নিলেন, তো পড়তে আর সাহস হয় না।

কিন্তু চিঠিতে তা বলে খুব ভয়ংকর রকমের ধমক-ধামক বা হুমকি ছিল বলে মনে কোরো না। সে চিঠি একেবারে মাখনের মতো মোলায়েম! চিঠি পড়ে মনে হয়, যিনি লিখেছেন, তিনি যেন পায়ে কাঁটা ফুটলে কাঁটার কাছেও হাতজোড় করে ক্ষমা চান। চিঠিতে জমিদারের শ্রীচরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে লেখা হয়েছে যে, অমুক দিনে অমুক সময়ে জমিদারমহাশয়ের একান্ত শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্য বাবলাডাঙার কালুসর্দার শ-খানেক বাছা বাছা লাঠিয়াল নিয়ে হুজুরকে সেলাম দিতে আসবে। হুজুর যেন তাদের বকশিশের বন্দোবস্ত করে রাখেন।

জমিদারমশাই চিঠি পড়ে পাখার হাওয়া খেতে খেতেও ঘেমে উঠলেন। বুড়ো নায়েবমশাই তো মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়!

ভীমসেনের যে যমজ ভাই চিঠি এনেছিল, এবার সে লম্বা আর একটা কুরনিশ করে—হঠাৎ পেছন ফিরে এক 'কুকি' দিল।

সে 'কুকি' তো নয়, একসঙ্গে সাতটা বাজ পড়লে বুঝি অত শব্দ হয় না।

মানুষের গলা থেকে যে অমন আওয়াজ বেরোতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস করবার জো নেই। জমিদারমশাইয়ের যেটুকু বাকি ছিল, এই 'কুকি' শুনেই তা শেষ হয়ে গেল।

তিনি কাছারি ঘরের ফরাসের ওপর আলবোলা-সমেত কাত হয়ে পড়লেন। আর একা জমিদারমশাইয়ের বা দোষ দিই কেন? কাছারিবাড়ির যে যেখানে ছিল, সবার অবস্থাই সমান! নায়েবমশাই ইতিমধ্যে কখন তক্তপোশের তলায় লুকিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁর গোঙানি শোনা গেল। অমন যে জমিদারমশাইয়ের লম্বা-চওড়া ভোজপুরি দরোয়ান, সে পর্যন্ত পেতল-বাঁধানো লাঠিটা ফেলে কোথায় যে গেল, তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। খানিক বাদে একটু সামলে উঠে জমিদারমশাই প্রথমেই ডাকলেন, 'নায়েবমশাই।'

তক্তপোশের তলা থেকে জবাব এল, 'আজ্ঞে।'

amarboi.com

নায়েবমশাইকে তক্তপোশের তলায় দেখে সবাই তো অবাক! মাকড়শার জাল-টাল মেখে তিনি বেরিয়ে আসতে জমিদারমশাই চটে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওখানে কী করছিলেন?'

নায়েবমশাইয়ের উপস্থিত বুদ্ধি কিন্তু খুব বেশি, অম্লান বদনে তিনি জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে, একটা দলিল পড়ে গেছ্‌ল, তাই খুঁজছিলাম।'

* * *

এইতো গেল সেকালের ডাকাতির দৌত্য পর্ব, তারপরের ব্যাপার আরও চমৎকার। জমিদারমশাইয়ের এতখানি পরিচয় হওয়ার পর আর বোধ হয় তাঁকে ছাড়া উচিত হবে না, সুতরাং তাঁর গল্পই বলা-যাক।

আমাদের জমিদারমশাই বড়ো কেওকেটা নন। একটা আস্ত পরগনা তাঁর দখলে, গড়ের মতো তাঁর বাড়ি, পাইক-বরকন্দাজ-লাঠিওয়াল তাঁরও বড়ো কম নয়! কিন্তু তবুও তাঁকে কালুসর্দারের ভয়ে অস্থির দেখে সেকালের ডাকাতদের প্রতাপ বোধ হয় কিছু বোঝা যায়।

নায়েবের পর জমিদার পরামর্শ করবার জন্যে ডাকতে পাঠালেন, তাঁর বড়ো ছেলে ধনঞ্জয়কে। অবশ্য ধনঞ্জয়ের মতামতের ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল, এমন নয়।

গোঁয়ার বলে তার আশা তিনি একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবু হাজার হোক, বড়ো ছেলে তো—একবার ডাকা উচিত বলেই তাঁর মনে হল।

কিন্তু পাইক খানিক খুঁজে এসে খবর দিল, 'তিনি নেই হুজুর!'

জমিদারমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'নেই কীরে? দেখগে যা—আখড়ায় গিয়ে হয়তো লাঠি চালাচ্ছে! ব্যাটার ওই তো কাজ, চাষা হয়ে কেন যে জন্মায়নি তাই ভাবি।'

'আজ্ঞে, তিনি সকালে বাহান্ন-গ্রাম গেছেন।'

জমিদারমশাই এবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। 'মারলে, এরা সবাই মিলে আমায় মারলে! জানি আমি, একদিন গোঁয়ার্তুমি করে প্রাণটা দেবে। এই সময়ে বাবালাডাঙা পেরিয়ে মাথা খারাপ না হলে কেউ যায়!'

হঠাৎ কী মনে করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে সঙ্গে কারা গেছে?'

'আজ্ঞে, সঙ্গে তিনি কাউকেও যেতে দেননি।'

এবার জমিদারমশাইয়ের মুখ দিয়ে আর কথাও বেরোল না। খানিক বাদে নায়েবমশাইকে শুধু তিনি হতাশভাবে বললেন, 'মঙ্গলবার সিংদরজা খোলাই থাকবে। তাদের যেন কেউ বাধা না দেয়।'

নায়েবমশাই মনে মনে একরকম খুশি হয়েই ঘাড় নাড়লেন। ভীতু মানুষ, ডাকাতদের সঙ্গে মারমারির ভাবনায় তাঁর পেটের ভাত এতক্ষণ চাল হয়ে যাচ্ছিল।

* * *

গভীর জঙ্গলের ভেতর ডাকাতদের আড্ডা! নামে বাবালাডাঙা হলেও বাবলা ছাড়া বোধ হয় সব গাছই সেখানে আছে এবং সেসব গাছের ঝোপ এত ঘন যে, দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার হয়ে থাকে।

তিন-চারজন লোক মিলে নতুন গোটাকতক 'রণপা' তৈরি করছে, কালুসর্দার বসে বসে তাই তদারক করছিল, এমন সময় কাছেই জঙ্গলের ভেতর ভয়ানক হট্টগোল শোনা গেল। হট্টগোল নয়, মনে হল, বেশ একটা যেন দাঙ্গা চলেছে!

কালুসর্দারের শাসন একেবারে বজ্রের মতো কঠোর। তার দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, এ তো সম্ভব নয়। হট্টগোল অত্যন্ত বেড়ে ওঠাতে কালুসর্দারকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার সন্ধান নিতে যেতেই হল।

pathagar.net

কিন্তু কয়েক-পা এগোতেই যে-দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তাতে কালুসর্দারকে পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

কুড়ি-একুশ বছরের একটি গৌরবর্ণ যুবক কালুসর্দারের দলের একজন সেরা লাঠিয়ালের সঙ্গে লড়ছে—না, শুধু লড়ছে বললে তার কিছুই বলা হয় না ; কায়দার পর কায়দায় বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে যেন ছেলেখেলা করছে!

কালুসর্দার মনে মনে এরকম ওস্তাদ খেলোয়াড়কে তারিফ না করে পারল না। দেখতে দেখতে ছেলেটির লাঠির একঘায়ে কালুসর্দারের দলের লাঠিয়ালের হাত থেকে লাঠি খসে পড়ল! তখন দলের অনেক লোক তাদের চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত লোকের সামনে অপমানে ও লজ্জায় লোকটা রাগে অন্ধ হয়ে পাশের একজনের হাত থেকে একটা বল্লম নিয়ে ছুঁড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কালুসর্দার সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'খবরদার!' তারপর লোকটার হাত থেকে বল্লমটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'লজ্জা করে না, ওইটুকু ছেলের কাছে লাঠি ধরতে না পেরে আবার বল্লম ছোঁড়া?' তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে সর্দার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী ভাই?'

কালুসর্দারের বিশাল সিংহের মতো বলিষ্ঠ চেহারার ওপর ছেলেটি দুবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'তাতে তোমার দরকার?'

দলের সবাই তো অবাক! কালুসর্দারের মুখের ওপর এরকম জবাব! কিন্তু কালুসর্দার একটু হেসে বলল, 'তা ঠিক বলেছ, তোমার নামে কোনো দরকার নেই, তোমার পরিচয় তোমার হাতের লাঠিই দিয়েছে, তুমি আমাদের দলে আসবে?'

খানিক চুপ করে থেকে একটু হেসে ছেলেটি বলল, 'যদি না আসি।'

কালুসর্দার তেমনি হেসে ধীরে ধীরে বলল, 'আমাদের গোপন আড্ডা দেখবার পর আমাদের দলের না হলে জ্যান্ত যে কেউ ফিরতে পারবে না ভাই। তুমি এপথে এসে ভালো করনি।'

ডাকাতের দলের সংখ্যা দেখে মনে মনে কী ভেবে ছেলেটি বলল, 'বহুত আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি মরবার সাধ আমার নেই, আজ থেকে আমি তোমাদের।'

কালুসর্দার এবার একটু হেসে বলল, 'তোমার নাম তো তুমি বললে না, কিন্তু তোমায় ডাকা হবে তাহলে কী বলে?'

ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, 'ধরো আমার নাম ফ্যালারাম।'

দু-দিনের মধ্যে ডাকাতের দলে ফ্যালারামের খাতির আর ধরে না। যে কাজে দাও, ফ্যালারামের জুড়ি মেলা ভার। লাঠি খেলতে, বল্লম ছুঁড়তে, 'রণপায়ে' দৌড়োতে, লাঠিতে ভর দিয়ে লাফ দিতে ফ্যালারামের সমান ডাকাতদের ভেতর খুব কমই আছে দেখা গেল। কালুসর্দার পর্যন্ত একদিন বলে ফেলল, 'একদিন তুমিই এদলের সর্দার হবে দেখছি!'

ফ্যালারাম একটু হেসে বলেছিল, 'আহা বাবা শুনলে কী খুশিই হতেন!' কালুসর্দার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি।

পরের দিন সকাল থেকে ডাকাতদের সাজগোজ দেখে ফ্যালারাম একটু অবাক হয়ে গেল। ব্যাপার কী? একজন ডাকাতকে ডেকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, 'বাঃ, আজ যে চৌধুরিবাড়ি লুট হবে জান না?'

ফ্যালারাম কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে বলল, 'ও, মনে ছিল না বটে।'

সমস্তদিন ধরে ডাকাতদের কালীপুজো চলল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির আয়োজন। দেখা গেল, ফ্যালারামের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। চরকির মতো সারাদিন তার ঘোরার বিরাম নেই—সব কাজেই সে আছে।

সন্ধে হতেই ডাকাতেরা সব তৈরি, এবার ঘড়া ঘড়া সিদ্ধি এল—ফ্যালারামের পরিবেশনের উৎসাহ দেখে কে?

pathagar.net

সর্দার বলল, 'সিদ্ধিটা আজ বড়ো ভালো হয়েছে মনে হচ্ছে! ঘুঁটেছে কে?'

ফ্যালারাম সলজ্জভাবে বলল, 'আমি।'

তারপর সেই বনের ভেতর অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠল। 'রণপা' পরে ভূতের মতো রং মেখে মশাল নিয়ে শ-খানেক ডাকাত যখন সেই বন থেকে একসঙ্গে 'কুকি' দিয়ে বেরোল, তখন মনে হল প্রলয়ের বুঝি আর দেরি নেই।

একপ্রহর রাতে ডাকাতদের আসবার কথা! জমিদার চৌধুরিমশাই প্রাণটি হাতে নিয়ে প্রাসাদের সিংদরজা খুলে বসে আছেন। ডাকাতেরা এলে বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের হাতে ধন-প্রাণ সঁপে দেবেন—তারপর তারা যা খুশি করুক।

হঠাৎ বাইরে ভীষণ শোরগোল শোনা গেল। আর দেরি নেই বুঝে জমিদারমশাই প্রস্তুত হয়ে বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! শোরগোল বেড়েই চলল, অথচ ডাকাতদের আসবার নাম নেই। শোরগোলটাও যেন একটু অদ্ভুত রকমের। এ তো ডাকাতদের আক্রমণের হুংকার নয়, এ যে রীতিমতো মারমারির শব্দ! তাঁর লোকজন তো সব গড়ের ভেতর, তবে মারামারি করছে কে?

আরও কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে জমিদারমশাই বাইরে লোক পাঠাতে যাচ্ছেন, এমন সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে যে এসে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে তো বাড়িসুদ্ধু লাঠিয়াল একেবারে স্তম্ভিত! সে আর কেউ নয়, ধনঞ্জয়—জমিদারের বড়ো ছেলে।

প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জমিদারমশাই কিছু বলবার আগেই ধনঞ্জয় বলল, 'দেরি করবার সময় নেই বাবা, শিগ্‌গির গোটাকতক মশাল আর কিছু দড়ি দিয়ে জনকয়েককে পাঠিয়ে দিন, আমি বাইরেই আছি।'

জমিদারমশাই আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে ধনঞ্জয় বেরিয়ে গেছে। রহস্য এর ভেতর যাই থাক, জমিদারমশাই ছেলের কথা এসময়ে অবহেলা করতে পারলেন না। জন-কতক বরকন্দাজ মশাল আর দড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে ডাকাতদের কী হয়েছে বলি। বন থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই তাদের মনে হল, সিদ্ধির নেশাটা যেন বড়ো বেশি হয়ে গেছে। সকলেরই কেমন যেন ঝিমুনির ভাব, পা চালাতে ইচ্ছে করে না। কালুসর্দারের নিজের অবস্থাও অনেকটা সেইরকম, তবুও সকলকে ধমকে দিয়ে সে একরকম তাড়িয়েই নিয়ে আসছিল। বিপদের ওপর বিপদ খানিকদূর যাওয়ার পর মশালগুলো আপনা থেকেই নিভে যেতে লাগল। কোনোরকমেই সেগুলোকে আর জ্বালিয়ে রাখা গেল না। মশালগুলোতে মশলাই কম দেওয়া হয়েছে। মশাল তৈরির ভার যাদের ওপর ছিল, তারা তো ভয়ে অস্থির! এখন কিছু না বললেও পরের দিন সর্দারের কাছে এর কৈফিয়ত দিতে তাদের কী অবস্থা হবে, তারা জানে।

মশালগুলো নিভে যাওয়ার পর অন্ধকারে তাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। কালুসর্দার হঠাৎ একসময়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্যালারাম কোথায়?'

কে একজন জানাল যে, ফ্যালারাম তাদের ছাড়িয়ে অনেক আগে চলে গেছে।

'চলে গেছে কী হে? পথ চিনতে পারবে না যে!'

'কী জানি সর্দার, তার যা উৎসাহ, ধরে রাখে কে?'

কিন্তু চৌধুরিবাড়ির কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ অন্ধকারে একটা লোক তাদেরই দিকে ছুটে আসছে মনে হল।

সর্দার হাঁকল 'কে?'

লোকটা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'আমি ফ্যালারাম। একটু এগিয়ে ওদের ব্যাপারখানা দেখতে গেছ্‌লাম সর্দার!'

pathagar.net

কালুসর্দার খুশি হয়ে বলল, 'বেশ বেশ, কী দেখলে?'

'লোকজন ওদের সব তৈরি হয়ে আছে, কিন্তু এক কাজ করলে ওদের ভারী জব্দ করা যায় সর্দার! আমরা দু-দলে ভাগ হয়ে যদি ওদের সামনে-পেছনে দু-দিক থেকে চেপে ধরি, তাহলে ওদের জারিজুরি সব একদণ্ডে ভেঙে যায়।

সর্দার খানিক ভেবে বলল, 'এ তো মন্দ যুক্তি নয়! কিন্তু ঠিক ওরা কোথায় আছে, জান তো?'

'গিয়ে দেখে এলাম, আর জানি না!'

কালুসর্দারের হুকুমে একদল এবার চৌধুরিবাড়ির সামনে দিয়ে অগ্রসর হল, আর একদলকে পেছন দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ফ্যালারাম।

অন্ধকার রাত, সঙ্গে মশাল নেই, তার ওপর নেশায় সবাই বুঁদ হয়ে আছে ; ফ্যালারাম খানিকদূর গিয়ে—'এই জমিদারের লাঠিয়াল'—বলে দেখিয়ে দিতেই ডাকাতেরা বেপরোয়া ভাবে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে শত্রু, কে মিত্র, বোঝবার তাদের তখন ক্ষমতা নেই।

কালুসর্দারও যে ব্যাপারটা প্রথমে বুঝেছিল, তা নয়। জমিদারের লোকের সঙ্গে যুঝছে ভেবে যে পরমানন্দে লাঠি চালাচ্ছিল। হঠাৎ চারধারের অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠল। ডাকাতেরা অধিকাংশই তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ও নেশার ঘোরে মাটিতে শয্যা নিয়েছে। কালুসর্দার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল—মাটিতে যারা পড়ে আছে, সবাই তারা তার দলের লোক। জমিদারের লোকেরা তখন তাদের মধ্যে যারা কম আহত হয়েছে, তাদের হাত-পা বাঁধতে শুরু করেছে। এরকম ভাবে প্রতারিত হয়ে রাগটা তার কীরকম হল, বুঝতেই পার, তার ওপর যখন সে দেখল, যে, ফ্যালারাম তার কাছেই দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে, তখন তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না।

'বুঝেছি, এসব তোরই কাজ। তোর শয়তানির আজ উচিত শাস্তি দেব।'—বলে উন্মাদের মতো সে ফ্যালারামে দিকে লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল। জমিদারের একজন বরকন্দাজ সেই মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করে একটা বল্লম ছুঁড়ে মারল, কিন্তু সে বল্লম সর্দারের গায়ে বেঁধবার আগেই ফ্যালারামের লাঠির ঘায়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কালুসর্দার এবার অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠিসুদ্ধ হাত তার আপনা থেকেই নেমে এল।

ফ্যালারাম একটু হেসে বললে, 'যাক শোধ-বোধ হয়ে গেল সর্দার! আমাকেও তুমি বল্লমের ঘা থেকে বাঁচিয়েছিলে! এখন ইচ্ছে হয়, লড়তে আসতে পার, আমি প্রস্তুত।'

কিন্তু সর্দারের তখন আর লড়বার ইচ্ছে নেই। মাথা নিচু করে লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। জমিদারের লোকজন তখন চারধার দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে একজন তাকে বাঁধতে যাচ্ছিল ফ্যালারাম হাত তুলে তাকে নিষেধ করে বলল, 'ডাকাতি করলেও তোমার সঙ্গে মিশে দেখেছি, মন তোমার উঁচু আছে সর্দার! তোমায় ছেড়ে দিলাম। যেখানে খুশি তুমি যেতে পার!'

কালুসর্দার তবুও নড়ল না, হাতের লাঠিটা ফেলে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'মা কালী আমার ওপর বিরূপ হয়েছেন, নইলে সিদ্ধি খেয়ে আমাদের এত নেশাই বা হবে কেন, আর মাঝপথে মশালই বা নিভে যাবে কেন? এখন আমার আড্ডা ভেঙে গেছে, দলের লোক সব বন্দি। কোথায় আর আমি যাব! আমাকেও বেঁধে নাও।'

ফ্যালারাম মাটি থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে সর্দারের হাতে আবার তুলে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তার বদলে যদি এবাড়ির লাঠিয়ালদের তোমায় সর্দার করে দেওয়া যায়?'

কালুসর্দার অবাক হয়ে বলল, 'আমায়? আমি তো ডাকাত!'

ফ্যালারাম হেসে বলল, 'তোমার মতো ডাকাতই আমার দরকার। বাজে লোকের সঙ্গে লাঠি খেলতে খেলতে সব প্যাঁচ প্রায় ভুলতে বসেছি।'

কালুসর্দার হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দরকার? তুমি কে তাহলে?'

ফ্যালারাম একটু হাসল। জমিদারের লাঠিয়ালেরা হেসে উঠে সর্দারকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'বোকারাম, জমিদারমশাইয়ের বড়ো ছেলেকে চেনো না?'

এবার কালুসর্দারের হাতের লাঠিঠা আবার পড়ে গেল।

তারপর কালুসর্দার সারাজীবন চৌধুরিবাড়িতে একান্ত বিশ্বাসী হয়ে চাকরি করেছিল শোনা যায়। কিন্তু সিদ্ধি খেয়ে কেন যে সেদিন তার অত নেশা হয়েছিল, আর মশালগুলোই বা কেন যে মাঝপথে নিভে গিয়েছিল, কোনোদিন সে তা বুঝে উঠতে পারেনি।

গোপন বাহিনী

পৃথিবীতে অনেকরকম যুদ্ধ হয়েছে। ছলে বলে কৌশলে নানাভাবে এক দেশ আর এক দেশকে জয় করেছে। কিন্তু সামান্য একটা রাজ্য ইকোয়েডর তার প্রবল পরাক্রান্ত উদ্ধত ও অত্যাচারী প্রতিবেশী পেরুকে যেভাবে জব্দ করেছিল তার তুলনা আর কোথাও মেলে না। আজ সেই যুদ্ধের গল্পই বলব।

দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত রাজ্যগুলির ভেতর সবচেয়ে গরিব বুঝি ইকোয়েডর। সামান্য কয়েকটা খনি, পাহাড়ের ধারে কিছু জঙ্গল ও পশ্চিমের সমুদ্রকূলে সামান্য গুয়ানো মানে পাখির তৈরি জমির সার ছাড়া তার আর কোনো আয়ের উপায় নেই। দক্ষিণ দিকে তার প্রতিবেশী রাজ্য হল পেরু। পেরুর অবস্থা ইকোয়েডরের চেয়ে অনেক ভালো। চাষবাস সেখানে তেমন প্রচুর হয় না বটে কিন্তু চাষের দামি সার হিসাবে গুয়ানো বিক্রি করে তার প্রচুর আয়। তা ছাড়া আয়তনে ইকোয়েডরের চেয়ে বড়ো বলে তার খনিজ সম্পদও অনেক বেশি।

দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি অনেকটা ঝগড়াটে অসভ্য মানুষের মতো। রাজ্যগুলি সর্বদাই এ-ওর পেছনে লেগে আছে। কেমন করে পরস্পরকে জব্দ করবে সেই ফন্দিই তারা আঁটছে সর্বদা। একজনের যদি একটু অবস্থা ফিরেছে তাহলে তো আর কথা নেই, আশপাশের প্রতিবেশীরা তার দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে।

পৃথিবীতে চাষের সারের জন্যে ফসফেট অত্যন্ত দরকারি। এই ফসফেট সম্পদ পেরুর মতো পৃথিবীর আর কোনো রাজ্যের নেই। তার পশ্চিম সমুদ্র-উপকূলে অসংখ্য গুয়ানো পাখি অফুরন্ত ভাবে এই ফসফেট সার তৈরি করে চলেছে। সেই ফসফেট পৃথিবীর বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে পেরু কয়েক বছর হল বেশ ফেঁপে উঠেছিল। তারপর আর কী! পেরু রাজ্যের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না বললেই হয়। তার দাপটে প্রতিবেশী ছোটো ইকোয়েডরের প্রাণান্ত হবার উপক্রম।

একে ইকোয়েডর গরিব। না আছে তার অর্থবল না আছে লোকবল, তার ওপর গত দু-বছর কটোপ্যাক্সি ও শিম্বোরাজো নামক দুটি আগ্নেয়গিরির উৎপাতে সে বেশ কাবু হয়ে আছে। এমন সময় নতুন পয়সার গরমে পেরু তার ওপর জুলুম শুরু করল। পেরু ও ইকোয়েডরের মাঝখানের সীমান্তরেখা স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ কোনো নদী বা পর্বতশ্রেণি ধরে এই দুটি রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়নি। কাল্পনিক একটা রেখা দুটি রাজ্যকে ভাগ করে রেখেছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, পেরু রাজ্যের কল্পনা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। ইকোয়েডরের সীমা পেরিয়ে তার একদল সৈন্য হঠাৎ একদিন ছাউনি পেতে বসল। ইকোয়েডর মৃদু একটু আপত্তি জানাল। কিন্তু কে কথা শোনে! পেরুর সৈন্যেরা উত্তরে বরং আর একটু এগিয়ে গিয়ে ছাউনি গাড়লে। ইকোয়েডর এবার পেরুর কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠাল একটু কড়াভাবেই, কিন্তু এতে হল হিতে বিপরীত। পেরু রেগে আগুন হয়ে উঠল। এত বড়ো আস্পর্ধা ইকোয়েডরের মতো একটা ছোটো রাজ্যের যে, সে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠায়! পেরুর সৈন্য যেখানে ছাউনি গেড়েছে সেটাই যে পেরুর সীমান্তরেখা নয় তা কে বললে? পেরু ইকোয়েডরের প্রতিনিধিদের রীতিমতো ধমকে বিদায় করে দিল।

অবস্থা খারাপ হলে প্রবলের হাতে মানুষকে অনেক সহ্য করতে হয়। ইকোয়েডর এ অপমানের বিরুদ্ধেও বিশেষ কিছু করত না। কিন্তু হঠাৎ আরেক গোলমাল বেধে গেল।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। পেরুর সৈন্যদলের প্রত্যেকটি লোক এক-একটি নবাব। তা ছাড়া ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতে তারা কখনো ভোলে না।

ইকোয়েডরের রাজ্যে গিয়ে ছাউনি গেড়ে তারা তাদের নবাবি মেজাজের ভালো করেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করল। যেখানে সৈন্যেরা আড্ডা গেড়েছে, সেখানে ইকোয়েডরের চাষি ও পশুপালকদের বাস। সেই পশুপালকেরা সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সৈন্যেরা খেয়ালমতো চাষিদের বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়, জোরজবরদস্তি করে তাদের কাছে খাবার আদায় করে, ইচ্ছেমতো তাদের পালিত পশু ধরে নিয়ে এসে ভোজের আয়োজন করে।

মানুষের দেহে আর কত সয়! ছাউনির কাছাকাছি চাষি ও পশুপালকেরা অনেক সহ্য করে একদিন মরিয়া হয়ে খেপে উঠল। তার আগের দিন এক চাষি সৈন্যদলের আবদার মেটাতে একটু আপত্তি করেছিল বলে তারা মজা করে তার গোলাবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। সৈন্যদলের এই মজা করাটা চাষি ও পশুপালকেরা কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে দেখেছিল। অত্যাচার তাদের সহ্যশক্তি তখন ছাড়িয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে তারা প্রতিশোধের জন্য তখন প্রস্তুত হচ্ছে।

সেদিন সৈন্যদের একটা দল বেড়াতে বেড়াতে সেখানকার এক অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পশুপালকের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। উঠেই তাদের হরেকরকম বায়না—ভালো মাংস রেঁধে নিয়ে এসো, ভাঁড়ারে খাবারদাবার কী আছে আগে বার করো, সবচেয়ে ভালো ঘরটায় আজ আমরা থাকব—তার ব্যবস্থা করো, ইত্যাদি। পশুপালকের লোকজন চাকরবাকর অনেক। সাধারণ মারামারি হলে তারা ওকটা সৈনিককে মাটিতে ধুলো করে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু সৈন্যদের পিছনে আছে সমস্ত বাহিনী। তাদের অস্ত্রশস্ত্র সব আছে। সেই ভয়েই বোধ হয় সেনর গোভানি ও তাঁর লোকজন মনের রাগ মনেই রেখে নীরবে সৈনিকদের সমস্ত অন্যায় আবদার সহ্য করছিলেন। কিন্তু সৈনিকেরা ক্রমশই মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

সৈনিকেরা খেতে বসেছে। সেনর গোভানিকে বাধ্য হয়ে তাদের খাওয়াদাওয়া তদারক করতে হচ্ছে, এমন সময় নিজের প্লেট থেকে প্রকাণ্ড এক মাংসের চাঁই তুলে এক সৈনিক ডাকল, 'গোভানি!'

সেনর গোভানি শান্তভাবে বললেন, 'কী?

সৈনিক উদ্ধতভাবে বলল, 'এইরকম বিশ্রী রান্না মাংস কী বলে তুমি আমাদের খেতে দিয়েছে?'

সেনর গোভানি এ ঔদ্ধত্যেও বিচলিত না হয়ে সংযত ভাবে বললেন, 'কী করব! আমাদের এখানে ওর চেয়ে ভালো রান্না হয় না।'

'হয় না! বটে! তবে এ মাংস তুমিই খাও।' বলে সৈনিক সেই মাংস সেনর গোভানির মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। মাংসের ডেলা সেনর গোভানির মুখে গিয়ে সজোরে লাগল। মুখ থেকে তাঁর জামায় পর্যন্ত মাংসের কাই মাখামাখি হয়ে গেল।

সৈনিকেরা সে দৃশ্য দেখে উচ্চস্বরে সবাই হেসে উঠল। অপমানে, ক্ষোভে সেনর গোভানি তখন কাঁপছেন।

এ অপমান অসহ্য! সেনর গোভানির লোকজন এবার আর স্থির থাকতে পারল না। যে সৈনিক মাংসের ডেলা ছুঁড়েছিল, একজন এসে এক প্রচণ্ড ঘুসিতে তাকে চেয়ার থেকে উলটে মাটিতে চিৎপাত করে দিল। তারপরেই শুরু হল মারামারি।

চাষিরা তখন রীতিমতো খেপে গেছে, পরিণামের ভয় আর নেই। সৈনিকদল তাদের কাছে মার খেয়ে একরকম ছাতু হয়ে গেল বললেই হয়। বেদম প্রহারের ফলে তাদের একজন মারাও গেল পরদিন।

পেরু বুঝি এমনি একটি ছিদ্রই খুঁজছিল। সমস্ত রাজ্যে তাদের রটে গেল যে, ইকোয়েডরের লোকেরা পেরুর নিরীহ সৈনিকদের অসহায় অবস্থায় পেয়ে মেরে ফেলেছে। এর প্রতিকার চাই।

ইকোয়ডরের শাসনকর্তারা হঠাৎ পেরুর এক কড়া চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। পেরু

Pathagar.net

রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের মেরে ফেলার দরুণ ইকোয়েডরের কাছে পেরু শুধু কৈফিয়ত চেয়ে পাঠায়নি, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আরও কিছু চেয়ে পাঠিয়েছে। খেসারত স্বরূপ ইকোয়েডরকে তার গুয়াকুইল বন্দরটি পেরুকে দিতে হবে।

এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শোনেনি। পেরুর দম্ভ অত্যন্ত বেড়েছে, কিন্তু সামান্য একটা মারামারির ফলে যা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পেরু যে এই বন্দরটা চেয়ে বসতে পারে এতটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। পেরুর নিজের কোনো ভালো বন্দর নেই। গুয়াকুইল বন্দরের জন্যে সে যে বহুদিন ধরে ইকোয়েডরকে ঈর্ষা করে এটাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে এই অর্থহীন ছুতোয় সে যে সেটা দাবি করতে পারে একথা ভাবা যায় না!

পেরুর আবদার যত অসম্ভবই হোক, তাকে একটা উত্তর তো দিতে হবে। ইকোয়েডর জানাল যে, সীমান্তের কাছে সৈন্যদের সঙ্গে ইকোয়েডরের পশুপালকদের যে মারামারি হয়েছে তার জন্যে সত্যি কথা বলতে গেলে পেরুই দায়ী। তারাই সীমান্তরেখা অন্যায়ভাবে অতিক্রম করেছে। যাই হোক, মারামারির কারণ ও বিবরণ জানাবার জন্যে রাজধানী থেকে রাজপ্রতিনিধি কয়েকজন যাচ্ছেন। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল জানা গেলে যা উচিত ইকোয়েডর তাই করবে।

ইকোয়েডরের কথা যে যুক্তিযুক্ত, তা সবাই স্বীকার করবে। কিন্তু পেরু এ উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, ভীষণ রেগে গিয়ে একেবারে চরম পত্র দিয়ে বসল। তিনদিনের মধ্যে ইকোয়েডরের লোক যেন গুয়াকুইল বন্দর ছেড়ে চলে যায়—না গেলে তাদের বিপদ আছে।

এ তো একেবারে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা! বোঝা গেল পেরু বহুদিন ধরে যেকোনো ফিকিরে এমনই যুদ্ধ বাধাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের সাজসরঞ্জামও বোধ হয় সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইকোয়েডর যে মোটেই তৈরি নেই! ইকোয়েডরের শাসনকর্তারা রীতিমতো ভড়কে গেলেন। ইকোয়েডরের উত্তরে কলম্বিয়া। পেরুর উৎপীড়ন ও অন্যায় আবদারের কথা জানিয়ে শাসনকর্তারা কলম্বিয়ার কাছে সাহায্য চাইলেন। দূরে হলেও ব্রেজিল সরকারের কাছেও লোক পাঠানো হল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। চোরে চোরে সবাই মাসতুতো ভাই। পরের বিপদে সাহায্য করা দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির স্বভাব নয়। ফাঁপরে পড়ে একরকম নতজানু হয়েই ইকোয়েডরের কর্তারা পেরুকে ন্যায়ের দোহাই দিয়ে তার অন্যায় দাবির কথাটা ভেবে দেখতে বললেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। পেরু জানাল, গুয়াকুইল বন্দর তার চাই।

নিরুপায় হয়ে শাসনকর্তারা যুদ্ধের জন্যে এবার প্রস্তুত হবার চেষ্টা করলেন। বন্দরটা তো আর অমনি দিয়ে দেওয়া যায় না! গুয়াকুইল বন্দর গেলে আর ইকোয়েডরের রইল কী?

কিন্তু মুখের কথা বার করলেই তো আর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যায় না! পেরু বড়োলোক হওয়ার পর যুদ্ধের বিস্তর সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ফেলেছে। তার এরোপ্লেন আছে, তার নতুন ধরনের কামান আছে, তার গোলাগুলি অঢেল, লোকজনও তার ঢের বেশি। ইকোয়েডরের শুধু যে লোকজন নেই তা নয়, এরোপ্লেন বা নতুন ধরনের কামান-বন্দুকও তার কম। তবু তাকে সাজতে হল।

পেরু যে তিন দিন ইকোয়েডরকে সময় দিয়েছিল, সে-তিন দিন শেষ হওয়ামাত্র তাদের বাহিনী ওপর ও নীচ থেকে গুয়াকুইল আক্রমণ করল। বন্দরের লোকেরা নীচেকার সৈন্যবাহিনীকে যদি বা ঠেকাল ওপরের এরোপ্লেনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না। ওপর থেকে বোমা ফেলে পেরুর লোকেরা বন্দরের অধিবাসীদের একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। একদিন, দু-দিন কোনোরকমে কাটল, কিন্তু তৃতীয় দিন বন্দর রাখা দায় হয়ে উঠল। পেরু সেইসঙ্গে জানাল যে ইকোয়েডর এখন যদি সহজে গুয়াকুইল বন্দর ছেড়ে না দেয়, তাহলে শুধু তো গুয়াকুইল বন্দর নিয়ে পেরু রাজ্য সন্তুষ্ট থাকবে না, যুদ্ধে তাদের যে অর্থব্যয় হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সমুদ্রের তীরের যে গুয়ানো সারের দ্বীপগুলো ইকোয়েডরে আছে, তাও কেড়ে নেবে।

ভীত হয়ে ইকোয়েডরের শাসনকর্তারা এক সভা আহ্বান করলেন সেইদিনই। গুয়াকুইল বন্দর তো রাখা যাবেই না, তার ওপর গুয়ানো সারের দ্বীপও যদি দিতে হয়, তাহলে তো সর্বনাশ! অনেক মন্ত্রীই তাই ভেতরে ভেতরে গুয়াকুইল বন্দর পেরুকে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী। সভায় তাঁরা সেই প্রস্তাবই করবার মতলব করছেন।

বিকেলে সভা বসবে। রাষ্ট্রপতি দু-ধারে রক্ষীপ্রহরী নিয়ে সভায় চলেছেন গাড়ি চড়ে। হঠাৎ গাড়ির সামনে একটা গোলমাল হল। কে একটা পাগলাগোছের লোক তাঁর গাড়ির পথ রুখেছে। সে নাকি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে চায়। প্রহরীরা তাকে ঘাড় ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু লোকটা তবু নাছোড়বান্দা। পাগলের মতো ছুটে এসে গাড়ির দরজা ধরে সে বলল, 'দোহাই আপনার রাষ্ট্রপতি, আমায় দুটো কথা বলবার অনুমতি দিন।'

রাষ্ট্রপতি অবাক হয়ে দেখলেন, পাগলাগোছের লোকটার বয়স অত্যন্ত অল্প। তার ব্যগ্রতা দেখে তাঁর কেমন একটু কৌতূহল হল। প্রহরীরা আবার এসে যুবকটিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। তাদের বাধা দিয়ে রাষ্ট্রপতি যুবককে তাঁর গাড়ির ভেতর এসে বসতে বললেন। তারপর আবার গাড়ি চালাতে হুকুম দিয়ে তিনি যুবকটির দিকে চাইলেন। মাথার উসকোখুসকো চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে যুবকটি এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'আমার নাম আলেপ্পো গোভানি। ইকোয়েডরের সীমান্তে যে সেনর গোভানির লোকের সঙ্গে সৈনিকদের মারামারি হয়, আমি তাঁরই ছেলে। যখন মরামারি হয় তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আমার একটা নেশা। কটোপ্যাক্সির ধারে আন্ডিজ পাহাড়ের জঙ্গলে তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

রাষ্ট্রপতির এবার সত্যি সন্দেহ হল যুবকটি পাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু আমায় এসব শোনানো কেন?'

'বলছি, রাষ্ট্রপতি। বেড়ানো শেষ করে আমি কদিন আগে বাড়িতে ফিরেছিলাম। ফিরে কী দেখলাম জানেন? আমাদের কাছে মার খেয়ে সেই আক্রোশে পেরুর সৈন্যরা আমাদের সমস্ত বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার বাবা নিহত। আমার ভাইবোনেরা কোথায় গেছে কোনো পাত্তা নেই।'

রাষ্ট্রপতি বলতে যাচ্ছিলেন, 'আমি তার প্রতিকার কী—'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোভানি বলল, 'প্রতিকার আপনাকে করতে হবে না। আমি তার উপায় জানি। সেই কথাই আপনাকে বলতে এসেছি।'

রাষ্ট্রপতি পাগলের কথায় একটু হেসে বললেন, 'তুমি কী প্রতিকার করবে! কাল তো যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে?' গোভানির চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছিল! 'এই অপমান লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়ে কাপুরুষের মতো আপনারা যুদ্ধ বন্ধ করবেন? গুয়াকুইল বন্দর রক্ষা করবেন না?'

'কী করে আর করব!' বলে রাষ্ট্রপতি হতাশভাবে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর যেন নিজের মনে বললেন, 'আমাদের অস্ত্র নেই, সৈন্য নেই। যুদ্ধ আমরা কী নিয়ে করব?'

গোভানি উত্তেজিত স্বরে বলল, 'যুদ্ধ করব সৈন্য নিয়ে। আমাদের কোটি কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে, সমস্ত পেরু আমরা শ্মশান করে দিতে পারি!'

দুঃখের ভেতরেও পাগলের কথায় একটু হেসে রাষ্ট্রপতি বললেন, 'তাই নাকি?'

'আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না? তা না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগে আমার কথা শুনুন।' গোভানি রাষ্ট্রপতির আরও কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ ধরে কী বলল। শুনতে শুনতে দেখা গেল রাষ্ট্রপতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমস্ত কথা শুনে সোজা হয়ে বসে

pathagar.net

গোভানির পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, 'এ যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমস্ত ইকোয়েডর তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে চিরকাল।'

'এ সম্ভব যে হবেই!' বলে এতক্ষণে গোভানি একটু হাসলে।

রাষ্ট্রপতি তবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কিন্তু মন্ত্রীসভা যদি আমার কথায় কান না দেয়! তারা ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। যেকোনো শর্তে সন্ধি করতে পারলে বাঁচে।'

গোভানি বললে, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি যে, যুদ্ধের সময় বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা আপনি মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিতে পারেন।'

সেদিন সভায় যা হল তা আর বলে কাজ নেই। অধিকাংশ মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীরা পেরুর সঙ্গে সন্ধি করার পক্ষপাতী। গুয়াকুইল বন্দর দিলে যদি তারা সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাই দেওয়া হোক। দেশের নইলে আরও বেশি ক্ষতি হবে। একা রাষ্ট্রপতি তাদের অনেক বোঝালেন। এভাবে হার স্বীকার করলে পেরুর আস্পর্ধা ক্রমশই বেড়ে যাবে—আজ গুয়াকুইল বন্দর যারা চেয়েছে কাল তারা সমস্ত রাজত্বই যে চাইবে না তা কে বলতে পারে? তা ছাড়া এ অন্যায় সহ্য করার চেয়ে প্রাণ দেওয়া ভালো! কিন্তু মন্ত্রীসভার অধিকাংশই তাঁর বিরুদ্ধে। কিছুতেই যখন তাদের বোঝানো গেল না, তখন হঠাৎ রাষ্ট্রপতি সকলকে ঘোষণার দ্বারা চমকে দিলেন। মন্ত্রীরা যদি তাঁর কথায় না সায় দেন তাহলে তিনি সমস্ত সভা ভেঙে দেবেন। যুদ্ধের সময় এরকম ভাঙবার ক্ষমতা তাঁর আছে। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ, স্তম্ভিত। একজন অনেকক্ষণ বাদে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তাহলে এখন কী করতে বলেন? আর সৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত কর আদায়?'

'আমি সেসব কিছুই বলি না। শুধু গুয়াকুইল বন্দর ছাড়তে অস্বীকার করে আমরা কটোপ্যাক্সির আশেপাশের পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন লাগাব।'

'পাহাড়ে আগুন লাগাবেন?' খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে হঠাৎ সমস্ত সভার লোক হেসে উঠল। রাষ্ট্রপতির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। একজন বলল, 'আপনি বলছেন কী?'

'আমি ঠিকই বলছি! আমাদের শুধু আত্মরক্ষা নয়, পেরুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার একমাত্র উপায় পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন লাগানো। আজ এই মুহূর্তেই আমার বন্ধু এই আলেপ্পো গোভানির নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনীকে পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন লাগাবার জন্যে পাঠানো হবে।'

সভাসদেরা একথার পর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে বিদায় নিলেন। রাষ্ট্রপতির যে মাথা খারাপ হয়েছে এবং তাঁকে যে পদ থেকে সরানো দরকার, এবিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে তো আর মুখের কথায় পাগল বলে দূর করে দেওয়া যায় না, তার জন্যে আয়োজন চাই। তাঁরা সেই আয়োজনই করবার সংকল্প করলেন।

তারপর একদিন গেল, দু-দিন গেল। ইকোয়েডরে ভয়ানক অশান্তি। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মন্ত্রীরা দেশের লোককে এত উসকে দিয়েছেন যে একটা অন্তর্বিপ্লব যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। এদিকে গুয়াকুইল বন্দর যায় যায়। পেরুর আকাশ-বাহিনী অবিরাম বোমা বর্ষণ করে বন্দর প্রায় গুঁড়িয়ে ফেলেছে। ওদিকে ইকোয়েডরের সেনারা গোভানির নেতৃত্বে পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন দিচ্ছে।

তৃতীয় দিন অধিকাংশ মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। তাঁরা রাজ্যে নতুন নির্বাচনের পক্ষপাতী। কুইটো নগরের অবস্থা ঠিক ঝড়ের আগের আকাশের মতো। বিপ্লব আসন্ন। বিকেলবেলা সশস্ত্র একদল নাগরিক চলল রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের দিকে। তাঁকে হয় পদত্যাগ করতে হবে নয় বন্দি হতে হবে।

নাগরিকেরা প্রাসাদের দরজায় গিয়ে হানা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি দেখা করবার জন্যে আসছেন শোনা গেছে। এমন সময় এ কী ব্যাপার! হঠাৎ নির্মেঘ আকাশে অকাল-সন্ধ্যা হল কেমন করে?

Pathagar.Net

নাগরিকদের একজন নেতা জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'হঠাৎ অন্ধকার হল কেন বুঝতে পারছি না তো!'

সেই মুহূর্তে সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে রাষ্ট্রপতি বললেন, 'ও সাধারণ অন্ধকার নয়, সেনর। আকাশ অন্ধকার করে আমাদেরই গোপন বাহিনী চলেছে পেরুকে শিক্ষা দিতে।'

সবিস্ময়ে সবাই বলল, 'তার মানে?'

'তার মানে বাইরে গিয়ে দেখবেন চলুন।' বলে রাষ্ট্রপতি পথ দেখিয়ে সবাইকে বাইরে নিয়ে গেলেন। তখন পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে সমস্ত নাগরিক একেবারে অবাক! সূর্যকে একেবারে আড়াল করে কালো ঝড়ের মেঘের মতো চলেছে পঙ্গপালের বাহিনী দক্ষিণ দিকে। তাদের সম্মিলিত পাখার শব্দে সমস্ত আকাশ গমগম করছে।

সেই দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রপতি বললেন, 'সৈন্য দিয়ে আর আমাদের যুদ্ধ করতে হবে না। ওরাই আমাদের হয়ে সমস্ত পেরু সাতদিনে শ্মশান করে দেবে।'

* * *

রাষ্ট্রপতির কথা যে মিথ্যা নয়, ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য আছে। পঙ্গপাল বাহিনী পেরুর ওপর দিয়ে ঠিক প্রলয়ের ঝড়ের মতোই সেবার বয়ে গিয়েছিল। ধাতু আর পাথর ছাড়া কিছুই তারা নষ্ট করতে বাকি রাখেনি বললেই হয়। প্রথম কয়েক দিন পঙ্গপালের উৎপাত সত্ত্বেও পেরু যুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্রমেই তা অসম্ভব হয়ে উঠল। পঙ্গপালের রাশের ভেতর পড়ে শুধু যে এরোপ্লেন অচল হল তা নয়, ধীরে ধীরে যুদ্ধের রসদ গেল উবে! শেষকালে সমস্ত দেশে খাদ্যের টান পড়ল। তারপরেই দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। গুয়াকুইল নেবে কী, নিজের দেশ সামলাতেই তখন পেরুর প্রাণান্ত। দশ বছরে পেরু এ ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উপায়ে যুদ্ধজয় আর কোনো দেশ করেনি। এবং এ উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যাকুল এক যুবকের মাথায়। আলেগ্রো গোভানি আন্ডিজের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে পঙ্গপালের এক বিরাট উপনিবেশ দেখতে পায়। সে-উপনিবেশে তখন শিশু পঙ্গপালেরা সবে লাফিয়ে বেড়াবার মতো বড়ো হয়েছে। এই উপনিবেশ পরে দেশের এমন কাজে লাগবে, তখন অবশ্য সে তা ভাবেনি। কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধের উপায় ভাবতে ভাবতে এই পঙ্গপাল বাহিনীকে কাজে লাগাবার কথা তার মনে আসে। উপনিবেশের উত্তরের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পঙ্গপালকে দক্ষিণদিকে চালিয়ে দেবার কৌশলও তার উদ্ভাবন।

পতিতপাবনের প্রতিভা

সম্প্রতি আমাদের কত বড়ো যে একটা ক্ষতি হয়ে গেছে, তা তোমরা বোধ হয় কল্পনাই করতে পারবে না। বাংলাদেশ—না বাংলাদেশ কেন, ভারতবর্ষ,—ভারতবর্ষই বা বলার দরকার কী, সমস্ত পৃথিবী যা হারিয়েছে তার তুলনা হয় না। হারিয়েছে কথাটা ব্যবহার করা বোধ হয় ঠিক হল না, বলা উচিত—বঞ্চিত হয়েছে। হ্যাঁ, সমগ্র পৃথিবী পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে সৌভাগ্য যে কী, তা আমরা কেমন করে বলব—জানবই বা কেমন করে! সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হলে আজ হয়তো মঙ্গল গ্রহের ১৮ আপ্ গ্রহ এক্সপ্রেসে বসে তোমরা পৃথিবীকে দূর আকাশে ছোটো থেকে আরও ছোটো সবুজ একটা তারা হয়ে যেতে দেখতে। কিংবা রিফ্রিজারেটারের মতো একটা যন্ত্রের বাক্সে এক ধারে একতাল মাটি ভরে দিয়ে আরেক ধার থেকে একেবারে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সবকিছু বার করে নিতে পারতে, কিংবা...কিন্তু সেসব কথা যত ভাববে আফশোস তত বাড়বে। আসল কথা আমাদের দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে, কারণ—

কারণ পতিতপাবনের বাবা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার মূল্যবান খাতাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে সজোরে তার কান মলে দিয়েছেন। ভাবছ একটা খাতা ছেঁড়া গেলে কী আর এমন হয়! কিছুই তাহলে জান না। পতিতপাবনের খাতা ছিঁড়ে দেওয়া মানে আমাদের সব আশা নির্মূল করে দেওয়া, পতিতপাবনের কান মলে দেওয়া মানে পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিককে মুকুলে বিনষ্ট করা।

পতিতপাবন অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক যে হবে এই আশাই আমরা করেছিলাম, আমরা কেন তার বাবাও করেছিলেন। তিনি শুধু আশা করবেন কেন, নিশ্চিত জানতেন যে, পতিতপাবন নিউটন, আইনস্টাইন, মেঘনাদ সাহার নাম ডুবিয়ে দেবে।

কেমন করে তিনি জানলেন? জানা আর আশ্চর্য কী? সূর্য উঠলে কি জানতে বাকি থাকে যে, দিন হয়েছে?

পতিতপাবন হামাগুড়ি দিতে শিখেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। হামাগুড়ি দিতে দিতে সে একদিন কঠিন এক সমস্যার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। সমস্যাটা কালির একটা দোয়াত।

আর কোনো ছেলে হলে কী করত এ সমস্যার সামনে এসে? আমরা জানি কিছুই তারা করত না। কারণ তাদের কৌতূহল নেই, বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উন্মেষ তাদের ভেতর হবার নয়। তারা কালির দোয়াতকে উপেক্ষা করেই হামাগুড়ি দিয়ে চলে যেত। কিন্তু পতিতপাবন তো আর সাধারণ ছেলে নয়। সে প্রথমে দোয়াতটির সামনে থমকে বসে পড়ল, তারপর সেটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে হাত বাড়িয়ে সেটা ধরবার চেষ্টা করল। হাত ও দোয়াতের সংযোগ হতে একটু বিলম্ব হল অবশ্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা আঙুল দোয়াতের মধ্যে গলে গেল। পতিতপাবন তারপর সে আঙুল তুলে নিয়ে একটু ইতস্তত করে নিজের পেটে একটু বুলিয়ে দেখল এবং ফল দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সর্বাঙ্গে সে কালি লেপন করে শেষ পর্যন্ত আঙুলটি মুখে পুরে দিল। তারপর কালির দোয়াতটি উলটে ফেলে সে কীর্তি শেষ করেছে এমন সময়ে পতিতপাবনের মা দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে তাকে তুলে ধরে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কীরকম আক্কেল তোমার বলো তো, ছেলেটা কালি মেখে ভূত হচ্ছে আর তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছ!'

আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, পতিতপাবনের বাবা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নিদর্শন লক্ষ করছিলেন। লক্ষ করা পতিতপাবনদের বংশের ধারা। তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'দেখব না! তোমার ছেলের কী অসাধারণ প্রতিভা হবে, তা জান?'

মা পতিতপাবনকে কোলে তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে বিরক্ত মুখে বললেন, 'বালাই ষাট, ওসব শত্তুরের যেন হয়! যত সব অলুক্ষণে কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায়!'

কিন্তু পতিতপাবনের সত্যিই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ দেখা যেতে লাগল। হামাগুড়ি ছেড়ে সে হাঁটতে শিখল এবং হাঁটতে হাঁটতে সে একদিন অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। কাণ্ডটা আর কিছু নয়, একটি শব্দ।

পতিতপাবনের বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'শুনলে? কী বলল শুনলে!'

স্ত্রী রাগের স্বরে বললেন, 'আহা, এর আবার আদিখ্যেতা কীসের! কথা ফুটলে অমন কত আবোল-তাবোল বলে!'

পতিতপাবনের বাবা এবার চটে উঠলেন, 'স্পষ্ট বলল, বাবা, আর তুমি বলছ আবোল-তাবোল!'

মা বললে, 'তা যদি বলেই থাকে তো কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে! এই বয়সে এমন স্পষ্ট করে বাবা বলতে শুনেছ কাউকে?'

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আহা, কত ছেলে যে এ বয়সে গালাগাল শেখে!' এবার পতিতপাবনের বাবা হতাশভাবে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে ঘর ছেড়ে যে বেরিয়ে গেলেন তা বোধ হয় বুঝতেই পারছ।

পতিতপাবন আরও বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে আরও কত যে সব অদ্ভুত কীর্তি করতে শুরু করল তার বিবরণ সামান্য এ গল্পে দেওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে দু-বছর বয়সে সে গাড়িকে বলল 'গগ' এবং মুড়িকে বললে 'হুড়ুম'। 'গগ' বলতে পতিতপাবন যে গম ধাতুই ব্যবহার করছে তা আবিষ্কার করলেও তার বাবা 'হুড়ুম' যে ঠিক কী ধাতু থেকে উৎপন্ন তা খুঁজে পেয়েছিলেন কি না এখনও জানা যায়নি।

পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি হবার পর পতিতপাবনের প্রতিভাকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। মাত্র পাঁচখানা প্রথম ভাগ ছিঁড়ে ছ-বারের বার শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবিটুকু উড়িয়ে দিয়েই সে 'ক্ষ' ছাড়া স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্তই আয়ত্ত করে ফেলল। 'ক্ষ'-টি নিয়ে গোলযোগ হবার কারণ অবশ্য তার বাবা ও মায়ের মধ্যে মতভেদ। মা শেখালেন তাকে 'খীয়' বলতে, বাবা শেখালেন শুদ্ধ উচ্চারণ 'ক্‌ষ'। এ দুইয়ের মাঝখানে 'ক্ষ' ও পতিতপাবন উভয়ের অবস্থাই একটু কাহিল অবশ্য হয়েছিল।

কিন্তু তা হলেও আকাশের শশিকলা ও গাছের কাঁদির কলার মতো পতিতপাবনের বুদ্ধি দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তার বাবা বিখ্যাত সমস্ত প্রতিভাবান লোকের ছেলেবেলার গল্প খুঁজে খুঁজে পড়ে দেখলেন পতিতপাবনের সঙ্গে তাঁদের আশ্চর্য মিল আছে। পতিতপাবন একটু পেটুক, সে যা পায় তাই খায়, যা পায় না তাও সুবিধে পেলেই চুরি করে খায়। নিউটনের বাল্যজীবনে খাদ্য সম্বন্ধে এই উদারতা যে ছিল না এমন কথা তাঁর জীবনীতে লেখা নেই। সুতরাং এইখানেই নিউটনের সঙ্গে পতিতপাবনের মিল। পতিতপাবন রেগে গেলে হাত-পা ছোঁড়ে ও দাঁত দিয়ে কাপড় ছেঁড়ে। গ্যালিলিওর ছেলেবেলাতেও ঠিক এই রোগ ছিল। তাঁর ছেলেবেলার কোনো জীবনী নেই বলেই সেকথা সাধারণ লোকে জানে না। পতিতপাবন কাতুকুতু দিলেও হাসে না, শেক্সপিয়ার কিন্তু হাসতেন। শেক্সপিয়ার তো বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। না, যেদিক দিয়েই দেখা যায় পতিতপাবনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অস্বীকার করা অসম্ভব।

তার বাবার যেটুকু খুঁত মনে ছিল, তাও একদিন অসাধারণ এক ঘটনায় দূর হয়ে গেল। পতিতপাবনের অসামান্যতার নির্ভুল প্রমাণ তিনি সেইদিনই পেলেন।

প্রতিদিন সকালে তিনি নিয়মিতভাবে একটু করে ব্যায়াম ও একটু করে পড়াশোনা করেন।

দৈনিক খবরের কাগজ দিয়েই তাঁর এ দুটি কাজ অবশ্য এক সঙ্গে সারা হয়ে যায়। খবরের কাগজ বাগিয়ে ভাঁজ করে ধরতে এবং এক পৃষ্ঠা শেষ করে আর এক পৃষ্ঠা উলটে গুছিয়ে নিতে রীতিমতো 'মুলার্স' একসারসাইজের কাজ যে হয়ে যায় একথা আর কে না জানে? সেদিন তিনি সবেমাত্র অনেক চেষ্টার পর খবরের কাগজটি বাগিয়ে ধরেছেন এমন সময়ে ভাঁড়ারঘরে শোনা গেল গোলমাল। পতিতপাবনের মা উচ্চস্বরে তাকে শাসাচ্ছেন।

'হতভাগা ছেলে! এই গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে আবার চিনি চুরি করতে এসেছ!'

পতিতপাবনের বাবাকে এবার উঠে দেখতেই হল ব্যাপারখানা কী। তিনি ভাঁড়ারঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর স্ত্রী গলার স্বর আরও চড়িয়ে দিলেন, 'আশকারা দিয়ে ছেলেটির মাথা যে খেলে! দেখো দিকি কাণ্ডখানা, কোথায় কুলুঙ্গির ভেতর চিনির শিশি লুকিয়ে রেখেছি...'

স্ত্রীর অভিযোগটা এবার পতিতপাবনের বাবার অসহ্য হল। এগিয়ে গিয়ে তিনি পতিতের কান ধরে বললেন, 'কী করছিলি হতভাগা!'

পতিতপাবনের প্রতিভার সত্যকার পরিচয় এবার পাওয়া গেল, অনুনাসিক স্বরে সে বলল, 'আমি তো পিঁপড়ে দেখছিলাম।'

'পিঁপড়ে!' আঁতকে উঠে বাবা তার কান ছেড়ে দিলেন।

কার কানে তিনি হাত দিয়েছিলেন! ভবিষ্যতের কোনো আইনস্টাইন বা মেঘনাদ সাহার জীবনীতে শেষে লেখা থাকবে যে তার বাবা তার প্রথম বৈজ্ঞানিক উৎসাহ এমনি করে নিভিয়ে দিয়েছেন!

পতিতপাবনের মা অবশ্য একবার ধমকে উঠলেন, 'পাজি! তুমি পিঁপড়ে দেখছিলে তো তোমার মুখে কেন চিনি লেগে?'

কিন্তু বাবা সে কথা কানে না তুলেই উৎসাহভরে বললেন, 'কোথায় পিঁপড়ে? কীরকম পিঁপড়ে? কী দেখছিলি?'

মুক্তকর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পতিতপাবন একটু ভয়ে ভয়েই বলল, 'ওই যে চিনি চুরি করে পালাচ্ছে!'

দেওয়াল বেয়ে এক সার পিঁপড়ে যে পতিতপাবনের মতোই চিনির শিশির সন্ধানে এসেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাবার চোখমুখ রীতিমতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'দেখলে? কী বলেছিলাম আমি!'

'বলবে আবার কী, আমি অনেকদিন থেকেই জানি! তোমার ছেলে আর কী হবে!' বলে মা রাগ করে বেরিয়ে গেলেন। সপ্রশংসভাবে বাবা পতিতপাবনের দিকে ও পতিতপাবন সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পিঁপড়েদের দিকে চেয়ে রইল।

পিপীলিকা-দর্শন থেকেই পতিতপাবনের সত্যিকার বৈজ্ঞানিক জীবন শুরু হল। তার বাবা একেবারে গোড়া থেকেই তাকে শক্ত করে গড়ে তুলতে চান। তার পর্যবেক্ষণ শক্তি এখন থেকেই বাড়িয়ে তোলা দরকার ; যখন-তখন পতিতপাবনের তাই ডাক পড়ে। গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়—যা কিছু সুবিধেমতো সামনে পড়ে পতিতপাবনকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, তন্নতন্ন করে দেখে খুঁটিয়ে সব বিবরণ ও মন্তব্য এখন থেকে লিখে রাখাও দরকার। বাবা তাই পতিতপাবনকে একটা খাতা কিনে দিয়েছেন। এই খাতাতেই পতিতপাবনের বৈজ্ঞানিক দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত।

* * *

একটা মাস কোনোরকমে কাটিয়ে আমরা একেবারে খাতা পরীক্ষার দিন গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ দেখবার সাধ কার না হয়? পতিতপাবনের বাবা তাই সেদিন আগ্রহভরে পতিতের খাতাটা খুঁজে বার করেছেন। প্রথম পাতাতেই বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—'কাক'।

সঙ্গে কাকের একটা ছবিও আছে, তবে সেটা গাড়ু বা হুঁকোরও হতে পারে।

পতিতপাবনের বাবা পড়তে আরম্ভ করলেন—'কাক হিন্দুস্থানি পাখি। বাড়িতে মাছ কোটা হইলেই সে কি কি বলিয়া খোঁজ লইতে আসে, এবং বাংলা জানে না বলিয়া কা কা বলে। মা হিন্দুস্থানি জানেন না বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। তাহাকে তাড়ানো উচিত নয়। কারণ রং খুব কালো হইলেও তাহারও দুইটা পা আছে। মেজমামার, তো রং কালো এবং দুইটা পা আছে। মা মেজমামা আসিলে তাড়াইয়া দেন না।'

স্ত্রীর এই ভ্রাতাটির প্রতি বাবার বিশেষ অনুরাগ নেই। খুশি হয়েই তিনি পাতা উলটে গেলেন। এবার—গ্যাসপোস্ট। পতিতপাবন লিখেছে—'গ্যাসপোস্ট সকল গাছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গায়ে পাতা গজায় না বলিয়া তাহাকে গাছ বলিয়া সকলে চিনিতে পারে না। মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে জামা না থাকিলে যেমন পাহারাওয়ালাকে চেনা যায় না। জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের অসুবিধা হইবে বলিয়া গ্যাসপোস্ট শুধু শহরেই জন্মায়...'

বাবা আবার পাতা উলটে গেলেন '...ছারপোকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব। ছাগল ঘাস খায়, ঘাস অপেক্ষা ছাগলের বুদ্ধি বেশি। মানুষ ছাগল খায়, ছাগলের তুলনায় অধিকাংশ মানুষের বুদ্ধি বেশি। ছারপোকা মানুষ খায় অর্থাৎ তার রক্ত খায়। সেইজন্য তার বুদ্ধি সব থেকে বেশি। তাহাদের ধরা শক্ত, ধরিলেও মারা শক্ত, কারণ তারা এমন দুর্গন্ধ ছাড়ে!'

তারপর আরশুলা...'আরশুলার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ দেশে আরশুলা না থাকিলে জুতা এত সস্তা হইত না। চীন দেশে আরশুলা নাই, চীনারা সব খাইয়া ফেলিয়াছে। আরশুলার খোঁজে এ দেশে আসিয়া চীনারা জুতা তৈরি করে এবং আমরা পাঁচ টাকার জিনিস পাঁচ সিকায় পাই।'

পতিতপাবনের বাবার মাথা একটু ঘুরছিল, এত বড়ো প্রতিভার পরিচয়ের সামনে ঘোরা একটু স্বাভাবিক। হঠাৎ পাতা উলটে তাঁর চক্ষু একেবারে স্থির হয়ে গেল। পাতার ওপরে লেখা...'বাবা'।

'বাবাকে কোন প্রকার জীব বলা উচিত আমি ঠিক জানি না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো তিনি লজ্জা পাইবেন। তিনি বোধ হয় ঠিক জানেন না, মাও জানেন না। মা তো তাই বলেন, তুমি কী বলো তো! দুনিয়ায় যদি তোমার জোড়া থাকে! মা কিন্তু আমাদের জলওয়ালা রামভকতকে দেখেন নাই। তার গোঁফ বাবার মতো। তবে গায়ে জামা নাই আর মাথায় টাক আছে। তাই তার বুদ্ধিও বাবার চেয়ে বেশি। মা বলেন, বাবাকে সব দোকানদারেরা ঠকায়। রামভকত কিন্তু আমাদের ঠকায়, দুই পয়সার লজঞ্চুষ আনিতে বলিলে দেড় পয়সার আনে। বাবার মাথায় টাক না পড়িলে আর বুদ্ধি হইবে না।'

পতিতপাবনের বাবা আর পড়তে পারলেন না। খাতাটা দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলে একেবারে আগুন হয়ে ডাকলেন, 'পতিত!'

এরপর কী হল তা তোমরা অনুমান করতেই পার। বাংলা দেশ কেন, ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকপ্রতিভা এমনি করেই মুকুলে বিনষ্ট হয়ে গেল।

pathagar.net

বন্ধু

প্রথম দিন থেকেই রমেশের ওপর আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। না পারার কারণ ছিল। আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়। মাস্টারেরা যথেষ্ট স্নেহ করেন। ছেলেরা ভয় ভক্তি দুই-ই করে। ক্লাসে আমার অগাধ প্রতিপত্তি। অবাধে ছেলেদের ওপর মাতব্বরি করি। আমার কথার ওপর ফিরে কথা বলে এমন দুঃসাহসী কেউ ছিল না।

আমার এই একচ্ছত্র রাজত্বে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল এসে রমেশ। সুতরাং তার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। অথচ প্রথম যেদিন ক্লাসের সেকেন্ড 'আওয়ারে' হেডমাস্টারমশায় একটি রোগাটে লম্বামতো ছেলেকে নিয়ে এসে ক্লাসের একধারে বসিয়ে দিয়ে গেলেন, সেদিন তার পাড়াগেঁয়ে চেহারা নিয়ে কী হাসাহাসিই করেছিলাম!'

লম্বা উসকোখুসকো চুল—তাতে বোধ হয় মাসখানেকের ভেতর তেল-জল পড়েনি। গায়ে একটা ছেঁড়া কালির দাগওয়ালা চাদর। পরনের ছোটো কাপড়টি—হাঁটুর ওপরে গিয়ে উঠেছে। পায়ে জুতো নেই।

নিতান্ত গোবেচারির মতো ছেলেটি লাস্ট বেঞ্চের একপাশে এসে বসল। হেডমাস্টারমশাই চলে যাবার পর আমাদের ক্লাস-টিচার বিপিনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নামটি কী বাপু?'

ছেলেটি বলল, 'রমেশচন্দ্র খাস্তগীর।'

বিপিনবাবুর মতো আমুদে মাস্টার দেখা যায় না। তাঁর ঠাট্টায় ছেলেদের তিনি এক-একসময় নাকাল করে ছাড়তেন। বললেন, 'কী বললে? মস্তবীর? কিন্তু মস্ত বীর হলেও এখানে সে কথার উত্তর দিতে একটু কষ্ট করে গাত্র উত্তোলন করতে হবে বাপু!'

খাস্তগীর নাম শুনে আর তাকে কথার উত্তর দিতে না দাঁড়াতে দেখে আমরা তো হেসেই খুন! ছেলেটি লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিপিনবাবু বললেন, 'বেশ বেশ,—হয়েছে। আর কিছু বলে কাজ নেই। কী বলো মস্তবীর?'

আবার হাসির রোল উঠল এবং ছেলেটি মুখ লাল করে বসে পড়ল। সেই মুহূর্তেই অবশ্য ক্লাসে তার নামকরণ হয়ে গেল মস্তবীর, এবং সত্য কথা বলতে কী, এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটির ওপর মনে মনে একটু অবজ্ঞাই হয়ে গেল।

কিন্তু কে জানত সেই দিনই তার হাতে আমার প্রথম দর্প চূর্ণ হবে?

বিপিনবাবু খানিকটা ইংরেজি অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন। অনুবাদ করে সকলে তাঁর টেবিলের ওপর খাতা রেখে এল। বিপিনবাবু খাতাগুলি দেখে নম্বর দিলেন। এবার ওঠা-উঠির পালা।

কোনোদিন অন্তত ইংরেজি অনুবাদে আমার এই প্রথম স্থানটি কেউ নড়াতে পারেনি। আজও ফুলমার্ক কুড়ির ভেতর সতেরো পেয়ে আমি অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। হঠাৎ বিপিনবাবু হাঁকলেন, 'আঠারো ; আঠারো ফার্স্ট প্লেসে যাও।'

আঠারো! আমি তো অবাক। বেহায়ার মতো বলে ফেললাম, 'না স্যার, আমি সতেরো পেয়েছি।'

বিপিনবাবু ব্যঙ্গ করে বললেন, 'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো তা অস্বীকার করিনি বাপু, আমি শুধু আঠারোকে ফার্স্ট প্লেসে যেতে বলেছি—অন্যায় হয়েছে?'

আমি তো মুখ চুন করে বসে পড়লাম। বসেই হঠাৎ দেখি, লাস্ট বেঞ্চের লাস্ট প্লেস থেকে মস্তবীর সোজা আমার জায়গায় উঠে আসছে।

pathagar.net

সত্যি, লজ্জায় আমার মাথাটা কাটা গেল!

তারপর অঙ্কের আওয়ার! মনে মনে বললাম, এইবার দেখা যাবে। কিন্তু সে আশাও বৃথা। অঙ্কের আওয়ার দূরের কথা, সারাদিনের ভেতর সেখান থেকে নড়াবার মতো কোনো সুযোগ সে আমায় দিল না। সারাদিন এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটির নীচে মনে মনে গোমরাতে গোমরাতে মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। সেই দিন থেকেই তার সঙ্গে আমার রেষারেষির সূত্রপাত। অতি কষ্টে যদি কোনো সময়ে তার ওপর উঠি, পরের ঘণ্টায় আবার তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। ছেলেদের ভেতর আমার যে পসার-প্রতিপত্তি ছিল, তাতেও সে ক্রমশ ভাগ বসাল। মাস তিনেকের ভেতর ছেলেদের ভেতর দুটো বিরুদ্ধ দল গড়ে উঠল। এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটার নেতৃত্ব কী করে কেউ স্বীকার করতে পারে, আমি তো ভেবেই পেলাম না। কিন্তু দেখা গেল, ধীরে ধীরে তার দল বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমাদের দুজনের মধ্যে কথা নেই। কিন্তু আমাদের অনুচরেরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সব সময়েই হাতাহাতি করতে পর্যন্ত প্রস্তুত।

আমার দলের প্রধান পাণ্ডা ভুলু। ছেলেটাকে আমার কোনো দিন ভালো লাগত না। তার ভেতর কেমন একটা নীচতার আভাস পেয়ে বরাবর তাকে এড়িয়ে চলতাম, কিন্তু এ সময়ে তার সব দোষ ভুলতে বাধ্য হলাম।

ভুলু বিপক্ষ দল ও তাদের নেতাকে খাটো করবার নানারকম ফন্দি বাতলায়! ফন্দিগুলো বিশেষ ভালো নয় বলে অবশ্য গ্রহণ করি না, কিন্তু ভুলুকে একেবারে চটাতেও মন সরে না। ভুলুর কাছেই রমেশের সমস্ত খবর পাই। পাড়াগাঁয়েই তাদের বাড়ি। এতদিন সে বাড়ি থেকেই পড়াশুনা করেছে, কখনো স্কুলে পড়েনি। এখন কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে পড়ে। তার মামা নাকি ভারী কড়া লোক এবং অত্যন্ত কৃপণ। রমেশের সাজপোশাকের দুরবস্থার অর্থ এতদিনে বুঝতে পারলাম।

একদিন সকাল হতে না হতে ভুলু আমাদের বাড়ি এসে হাজির। এসেই আপন মনে হাসতে শুরু করলে। আমি তো অবাক। অনেকক্ষণ বাদে ভুলু জানাল যে, গতকাল রমেশকে সে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে। স্কুলের ছুটির পর রমেশ যে পথে বাড়ি যায়, সেও সেই পথ দিয়ে রমেশের সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করে। কিছু দূর গিয়ে রমেশই নিজে থেকে প্রথম তার সঙ্গে কথা বলে। ভুলু কয়েক মিনিটের ভেতরেই তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তোলে। ভুলু এমন ভাব দেখায় যেন সে আমার ওপর অত্যন্ত চটে গিয়েছে! এই অভিনয়ে কিছু ফল হল কি না বলা যায় না। রমেশ কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তার সব কথা ভুলুকে বলতে শুরু করে—তার পাড়াগাঁয়ের বাড়ির কথা, তার যে বাপ নেই সে কথা, সেখানে তার কে কে আছে—সেখানে তার পোষা কুকুরটি কীরকম নানারকম কসরত করতে পারে! আসবার দিন কুকুরটা কীরকম তার পেছু পেছু স্টেশনে এসেছিল! তাকে মেরে ধমকে কিছুতেই কেমন করে তাড়ানো যায়নি! স্টেশনে গাড়িতে ওঠবার সময় কী করে কুকুরটাকে জোর করে ধরে রাখতে হয়েছিল। গাড়ি ছাড়বামাত্র কুকুরটা কীরকম করে তার কাছে যাবার জন্যে সকলের হাত ছাড়িয়ে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োতে আরম্ভ করেছিল। ট্রেনের পাশে পাশে বহু দূরে দৌড়ে কুকুরটা শেষে হয়রান হয়ে বসে পড়ে। কীরকম করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।...

এই পর্যন্ত বলে ভুলু বলল, 'কী পাড়াগেঁয়ে ভূতটাই রমেশটা, কুকুরটার কথা বলতে বলতে মেয়েদের মতো কেঁদে ফেলল!'

কী জানি কেন, ভুলুর সঙ্গে রমেশের এই দুর্বলতাকে ভালো করে উপহাস করতে পারলাম না।

ভুলু বলল, 'তারপর ওকে কী করে জব্দ করলাম শোন। আমারও যেন ভয়ানক দুঃখু

হয়েছে এই ভেবে ওকে বললাম, আমারও ভাই একটা টিয়াপাখি ছিল, তারপর সেটাকে একদিন একটা বেড়াল মেরে ফেলাতে কীরকম কেঁদেছিলাম—ইত্যাদি বানিয়ে বানিয়ে বলে দিলাম। বলে কিন্তু এমন বিপদে পড়লাম বলতে পারি না। দেখলাম আমার চেয়ে দরদ টিয়াপাখির ওপর ওরই বেশি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল যে, আমি ধরা পড়ি আর কি! শেষে ওকে বললাম—এসো না ভাই, এই চায়ের দোকানে কিছু খেয়ে যাই। ও তো কিছুতেই রাজি নয়। বলল—না ভাই, দেরি হলে মামা বকবে। তা ছাড়া আমার কাছে পয়সাও নেই! বললাম দেরি মোটেই হবে না, আর পয়সা আমিই দেব! ও তাতেও রাজি নয় দেখে বললাম—তুমি তাহলে ভাই সত্যি বন্ধু বলে আমায় মনে করো না। নইলে বন্ধুকে এমন করে অপমান করতে না। ও শেষে রাজি হল। দোকানদারকে আগেই শেখানো ছিল। গিয়ে তো বেশ ভালো করে টাকা খানেকের খেলাম। তারপর পকেট হাতড়ে হঠাৎ মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, কী হবে ভাই, আমার পকেট থেকে টাকাটা কে তুলে নিয়েছে। ওর মুখ তো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল! দোকানদার তখন আগেকার কথামতো চোখ রাঙিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—কী এইটুকু ছেলে, এর মধ্যে জুয়াচুরি শিখেছ! বদমায়েসির আর জায়গা পাওনি? তোমাদের পুলিশে দিতে পারি জান? ওর মুখের অবস্থা দেখে অতি কষ্টে তো হাসি চেপে রইলাম। দোকানদারকে শেষে অনেক মিনতি করবার ভাণ করে আমাদের বাড়ি থেকে টাকাটা চেয়ে নিতে রাজি করলাম। দোকানদার আমাদের দুজনের নাম ঠিকানা লিখে নিল। আজই ওর মামার কাছে টাকার তাগাদায় যেতে শিখিয়ে দিয়েছি। ওর মামা কী কৃপণ জানিস তো? যা মজাটাই হবে!'

সত্যি এবার ভুলুর ওপর অত্যন্ত রাগ হল! তাকে তো প্রথমে যা তা বললাম! কিন্তু গাল দিয়ে বুঝিয়ে কিছুতেই একাজটা যে অত্যন্ত গর্হিত একথা তাকে স্বীকার করাতে পারলাম না।

সংকল্পও করেছিলাম যে রমেশকে সমস্ত কথা জানিয়ে দেব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেবারে অহংকার বিসর্জন দিতে পারলাম না। আমাদের ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চলল।

তারপর বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এবার রমেশকে হারাবই। পড়াশুনা প্রাণপণে করেও কিন্তু মনের মধ্যে একটু ভয় ছিল। ভেতরে ভেতরে রমেশের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর একটু শ্রদ্ধাই জন্মে গিয়েছিল।

এক-এক করে সব পরীক্ষাই হয়ে গেল, শুধু অঙ্কটা বাকি। সমস্ত পরীক্ষার ফল যা জানতে পেরেছিলাম, তাতে রমেশের নম্বরই আমার চেয়ে কিছু বেশি হয়। অঙ্কে তার চেয়ে বেশি নম্বর না পেলে কিছুতেই তাকে হারানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ অঙ্কে আমার কাছে হারবার তার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

বিমর্ষ মনেই অঙ্কের পরীক্ষা দিতে এলাম। নিজের সিটে বসতে যাচ্ছি হঠাৎ ভুলু এসে কানে কানে বলে গেল, 'কিছু ভয় নেই, তুই পরীক্ষায় ফার্স্ট হবি দেখিস—রমেশ আজ অঙ্ক কষতেই পারবে না।' ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না, কিন্তু ভুলু আবার নতুন কী বদমায়েসি করবে ভেবে ভীত হয়ে পড়লাম।

রমেশের সিট আমার ঘরেই পড়েছিল। যেরকম সোৎসাহে সে খাতা লিখে যাচ্ছিল, তাতে তাকে হারানো দূরের কথা, তার নাগাল ধরতে পারব কি না তাই সন্দেহ হচ্ছিল। এমনি করে এক ঘণ্টা কেটে গেল। আমাদের ঘরের গার্ড ছিলেন সেকেন্ড মাস্টারমশাই। সেকেন্ড বেল পড়ে পড়ে এমন সময় তিনি এসে বললেন, 'রমেশচন্দ্র খাস্তগীর কার নাম?' আমরা কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইলাম। রমেশ উঠে দাঁড়াল। সেকেন্ড মাস্টারমশাই বললেন, 'তোমার নামে চিঠি আছে।' রমেশ হাত বাড়িয়ে চিঠি নিয়ে আবার সিটে বসে চিঠিটা খুলে ফেলল। আমি তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম, দেখলাম চিঠির কয়েক লাইন পড়েই তার মুখ হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। তারপর খানিক সে চুপ করে বসে থেকে গার্ডের কাছে ছুটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আধ ঘণ্টাটাক

pathagar.net

বাদে আবার সে ফিরে এসে সিটে বসল, কিন্তু তখন দেখলাম অঙ্ক করবার কোনো উৎসাহই তার আর নেই।

ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভুলু পরীক্ষা দিয়েই দেশে চলে গিয়েছিল। যখন ফিরে এল তখন পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। আর আর সমস্ত বিষয়ে বেশি নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও অঙ্কে কম নম্বর পাওয়ায় রমেশকে আমি ছাড়িয়ে গিয়ে ফার্স্ট হয়েছি।

ভুলু এসেই বলল, 'কীরকম, ফার্স্ট হলি কি না, এখন আমায় কী খাওয়াবি বল।'

মনে মনে একটা বিশ্রী সন্দেহ ছিল। খুব আনন্দ দেখাতে পারলাম না। বললাম, 'কী করেছিলি, বল তো?'

বলল, 'আমি আবার কী করব? রমেশের পোষা কুকুরটাই যা করবার করেছে।'

মনে মনে চটে যাচ্ছিলাম, বললাম, 'হেঁয়ালি করতে হবে না, সব কথা খুলে বল।'

ভুলু হেসে বলল, 'খুলে আবার কী বলব? রমেশের মা ওকে লিখেছিলেন—তোর পোষা কুকুরটা হঠাৎ অসুখ হয়ে মরে গেছে। তাতে যদি ও অঙ্ক কষতে না পারে তো আমি কী করব!'

ব্যাপারটা এইবার জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। তবু মনে হল তার মায়ের লেখা কি রমেশ চেনে না যে অমন ভুল করবে?

আমার মনের কথা যেন বুঝতে পেরেই ভুলু বলল, 'ওর মা যে লিখতে জানেন না, সেকথা ওর মুখেই শুনেছিলাম। আর সে সময় ওর যদি সে বুদ্ধিই থাকবে তাহলে চিঠিটা ও আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট আফিস থেকে পোস্ট হয়েছে, এটুকুও কি ও দেখতে পেত না?'

ভুলুকে আর কোনোমতেই সহ্য করতে পারলাম না। এই নীচ ঘৃণ্য চাতুরীর দ্বারা রমেশকে হারাবার চেষ্টায় অজান্তে আমিও সাহায্য করেছি ভেবে নিজের ওপর ঘৃণা হল। ভুলুর সঙ্গে সেদিন সত্যকার ঝগড়া হয়ে গেল। সংকল্প করলাম, রমেশকে ডেকে নিজে থেকে আজ ক্ষমা চাইব। বলব, 'ভাই, আমায় ক্ষমা করো। তোমার মতো বন্ধু পেলে আমি ধন্য হব।'

স্কুলের পর সেই উদ্দেশ্যেই তার পিছু পিছু গেলাম। সকলের সামনে ক্ষমা চাইতে তখনও একটু লজ্জা ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা নির্জন গলির ভেতরে এসে পিছন থেকে ডাকলাম, 'রমেশ, শোনো।'

রমেশ ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ঘৃণাভরে বলল, 'তোমার মতো কাপুরুষের সঙ্গে আমি কথা কই না'—বলে আবার হনহন করে চলে গেল।

আমি ভাব করতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু তার ওপর দ্বিগুণ বিদ্বেষ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। মনে মনে সংকল্প করলাম, ওর দর্প যে করেই হোক চূর্ণ করতে হবে!

অবসরও মিলে গেল। শীতের শেষাশেষি আমাদের এদিকে কয়েকটি স্কুলের বার্ষিক খেলাধূলা ব্যায়াম-প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। এবারে আমাদের স্কুলেরই তাতে জেতবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। মনে করলাম, শুধু পড়াশুনা করলেই তো হয় না, এইবার স্পোর্টসে ওর দেমাক আমি চূর্ণ করব।

স্পোর্টসের দিন ঘনিয়ে এল। আমাদের স্কুলের দলের আমিই নেতা এবং আমিই আশা-ভরসা। একশো, দুশো কুড়ি, চারশো চল্লিশ গজ দৌড়, সাইকেল রেস ও হার্ডল রেস দিয়েই প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ণয় হয়। আমাদের স্কুলের ভয় শুধু ও পাড়ার কিং জর্জ এম. ই. স্কুল থেকে। স্পোর্টসের সব আয়োজন শেষ। রমেশ আমাদের ধারেও ঘেঁষে না। বইয়ের পোকা বলে গোপনে আমরা তাকে ঠাট্টা করি।

স্পোর্টসের দিন স্কুলের মাঠে অগুনতি ছেলের ভিড়। চারটে স্কুলের সব ছেলে ভেঙে এসেছে। হেডমাস্টারমশাই নিজে চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে সকলকে উৎসাহ দিচ্ছেন। আজ তাঁকে

pathagar.net

হেডমাস্টার বলেই মনে হয় না। রমেশও স্পোর্টস দেখতে এসেছে দেখলাম। হেডমাস্টারমশাই একসময় আমার পিঠ চাপড়ে বলে গেলেন, 'বেস্ট স্কুল্‌স্‌ ট্রফিটা জিতে আনতে পারা চাই কিন্তু।'

রমেশ সামনেই ছিল। আমার এই গৌরবের মুহূর্তে তার মুখের ভাবটা দেখে নেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

অন্যান্য নানা প্রতিযোগিতার সঙ্গে একশো গজ দৌড় হয়ে গেল। আমি প্রথম হলাম। তারপর দুশো কুড়ি গজ দৌড়। এবার কিন্তু কিং জর্জ স্কুলের কাছে আমাদের প্রতিনিধি পরাস্ত হল। কিন্তু তবু আমরা নিশ্চিন্ত। সাইকেল রেস ও চারশো চল্লিশ গজ দৌড়ে আমরা তাদের অনায়াসে হারাব—এ বিশ্বাস আমার তখনও দৃঢ়। চারশো চল্লিশ গজ দৌড়ে আমাদের স্কুলের প্রতিনিধিকে হারানো অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়ে গেল। কিং জর্জ স্কুলের একটি ছেলের কাছে এবারেও আমাদের পরাজয় হল। সত্যি এবার আমাদের ভয় হল! এইবার হার্ডল্‌স্‌। হার্ডল্‌সে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে কে জানত? সমস্ত বেড়া ডিঙিয়ে এসে শেষ বেড়ায় আমার পা ঠেকে গেল। বেড়া পড়ল না, কোনোরকমে আমি প্রথমে এসেও পৌঁছোলাম। কিন্তু তখন দেখা গেল, হাঁটুর নীচে প্রায় ছ-ইঞ্চি আমার কেটে গর্ত হয়ে গেছে। শেষ বেড়ার গায়ে কোথায় একটা পেরেক ছিল, তাতে লেগেই এই কাণ্ড। রক্তে মাটি ভেসে গেল, এবং অনেক কষ্টে ব্যান্ডেজ করে রক্ত যখন বন্ধ হল তখন ডাক্তার বললেন, 'এ পা নিয়ে সাইকেল চালানো কিছুতেই যেতে পারে না।' কিন্তু না গেলে উপায় কী! আমি ছাড়া কিং জর্জ স্কুলকে পরাস্ত করবার যে কেউ নেই। আর সাইকেল রেসে না জিতলে তাদের হাতেই যে ট্রফি চলে যাবে। হেডমাস্টার পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ছেলে কোথায়? সাইকেল রেসের ঘণ্টা বাজল, হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'দাও যাকে হোক পাঠিয়ে—আর কী করবে!' এমন সময় রমেশ এসে মাথা নিচু করে বলল, 'আমায় একবার চেষ্টা করতে দেবেন কি?'

হেডমাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে ছিলেন। ধমকে উঠে বললেন, 'একবার চেষ্টার কথা তো নয় বাপু, একবারই শেষ বার। তুমি কখনো সাইকেল চড়েছ?'

রমেশের মুখ লাল হয়ে উঠল—বিনীতভাবে বলল, 'হ্যাঁ—বোধ হয় পারব।'

হেডমাস্টারমশাই রাজি হচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি বলেকয়ে রাজি করালাম। কোনো সাধু উদ্দেশ্যে নয়, স্পোর্টসে মাথা গলাতে আসার ধৃষ্টতার জন্যে রমেশকে একটু শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই রাজি হলাম। মনে হল—তার একটু অপদস্থ হওয়া দরকার।

প্রকাণ্ড মাঠের চারিধারে আট বার সাইকেলে চক্র দিতে হবে। প্রথম চক্র শেষ হল। রমেশ দেখলাম সাইকেল চালাতে জানে না এমন নয়, কিন্তু সে যেভাবে সকলের পেছু পেছু চলেছে তাতে ফার্স্ট হওয়া দূরের কথা, সব কটা চক্র শেষ করতে পারবে কি না সন্দেহ! সে অপদস্থ হবে জেনেও এখন কিন্তু খুশি হতে পারছিলাম না। স্কুলের এত বড়ো পরাজয় মনে বড়ো বাজছিল। পঞ্চম চক্র থেকে কিন্তু পরিবর্তন দেখা গেল। এক-এক করে সকলকে ছাড়িয়ে রমেশ সকলের আগে চলে গেল এবং ক্রমশ পেছনের দল থেকে তার ব্যবধান বাড়তেই লাগল। তার বিরুদ্ধে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে স্কুলের জয়ের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ষষ্ঠ চক্রের শেষে দেখা গেল রমেশ এতদূর এগিয়ে গেছে যে, অন্য সকলের পক্ষে তাকে ধরা অসম্ভব। সপ্তম চক্রে ব্যবধান বাড়ল না বটে কিন্তু তাকে ধরতেও কেউ পারল না। তারপর অষ্টম চক্রে। রমেশ এখনও এগিয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে কিং জর্জ স্কুলের ছেলেটি ব্যবধান কমিয়ে আনছে দেখা গেল। দুই স্কুলের ছেলেরা চিৎকার করে দুজনকে উৎসাহ দিতে লাগল। চিৎকার করে বললাম, 'রমেশ আর একটু!' কিন্তু হল না ; উইনিং পোস্ট থেকে মাত্র ৩০ গজ দূরে এসে হঠাৎ রমেশের সাইকেল টাল খেয়ে একেবারে কোর্সের ধারে ছেলেদের ভিড়ের ভেতর এসে পড়ল। কিং জর্জের ছেলেটি তাকে পার

হয়ে উইনিং পোস্টে প্রথম গিয়ে পৌঁছোল। রমেশ সাইকেল থেকে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে ধরে দেখি, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মুখে জলটল দিয়ে কিছুক্ষণ বাদে তার জ্ঞান ফিরে এল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'ভালো না জেনে কেন সাইকেল চালাতে গেলে বাপু? সবাই কি স্পোর্টস্ম্যান হতে পারে!'

হঠাৎ রমেশের চোখ ছলছল করে উঠল, ধরা গলায় বলল, 'আমি স্পোর্টস্ম্যান নয় জানি স্যার, কিন্তু শুধু স্কুলের মানরক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম।'

আমি তার কানে কানে বললাম, 'তুমি আমাদের ভেতর সত্যকার স্পোর্টস্ম্যান।'

* * *

সেবার আমাদের স্কুল ট্রফি পায়নি, কিন্তু তবু আমি দুঃখিত নই। সেই থেকে রমেশ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

pathagar.net

ভূতুড়ে জাহাজ

আবার সেই মেয়েটিকে দেখলাম।

রাত তখন ঠিক বারোটাই হবে।

ওপরের ডেকে এতক্ষণ রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ভারত মহাসাগরের নৈশ শোভা দেখছিলাম।

মিড্‌ল ওয়াচ অর্থাৎ জাহাজের মালের পাহারা শুরু হয় ঠিক রাত বারোটায়।

মিড্‌ল ওয়াচের ঘণ্টা তখন বাজেনি। তবু বারোটা বাজতে বড়োজোর আর যে মিনিট খানেক আছে সেকেন্ড মেট অগডেনকে ডেকের ওপর আসতে দেখেই নির্ভুলভাবে তা বুঝতে পেরেছি।

সেকেন্ড মেট হিসেবে অগডেনের ওপরই মিড্‌ল ওয়াচের ভার। লোকটি মানুষ নয় যেন যন্ত্র। ঘড়ির কাঁটার মতো তার সবকিছু নড়াচড়া। শুধু নড়াচড়াই ঘড়ির কাঁটার মতো নয়, জাহাজের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি একেবারে জীবন্ত বিশ্বকোষ আর গণিতশাস্ত্র বললেই হয়। সমুদ্র যখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা, আকাশে একটি তারাও দেখা যায় না, তখন তিনি জাহাজের গতি অবস্থান ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড ধরে একেবারে নির্ভুল বলে দিতে পারেন। ভারত মহাসাগরে জাহাজে ভাসতে ভাসতেই সুদুর চীনের সাংহাইতে কখন চাঁদ উঠছে আর উত্তর মেরু অঞ্চলের স্পিটবার্জেনের সমুদ্র কখন থেকে জমে যায় তিনি বলে দেবেন। এমনিতে অগডেন একেবারে মাটির মানুষ, শুধু একটি ব্যাপারে তাঁর ক্ষিপ্ত রুদ্র মূর্তি কখনো-সখনো নাকি দেখা যায়। জাহাজের কম্পাসের ধারে কাছে নাবিকদের কেউ ভুলে ছুরি কাঁচি গোছের লোহার কিছু যদি ফেলে যায়, তাহলে তার রক্ষা নেই। অগডেনের সেই আগুনের মতো জ্বলে ওঠা চেহারা দেখার সঙ্গে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের সমাধান জানবার ভাগ্য এ যাত্রায় আমার হবে ভাবতেও পারিনি।

অগডেন আমায় গুড্‌নাইট জানিয়ে সামনে চলে যাবার পর কেবিনে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

ওপরের ডেক থেকে কেবিনে যাবার সিঁড়ির কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। সিঁড়িটা নীচের ডেকের করিডরে নেমেছে। সেই করিডরের পাশেই আমাদের কেবিন। করিডরটা তখন প্রায় অন্ধকার। সেই আবছা আলোতেই মেয়েটিকে দ্রুতপদে করিডরের অন্য প্রান্তে চলে যেতে দেখলাম।

থমকে দাঁড়িয়েছিলাম মুহূর্তের জন্যে, তারপরই পড়ি কি মরি অবস্থায় নীচে নেমে গেলাম!

কিন্তু কোথায় সে নারীমূর্তি! সমস্ত করিডরটা একবার ঘুরে এলাম। এ ডেকে দুটি মাত্র প্রথম শ্রেণির কেবিন। তার একটিতে আমরা আর একটিতে স্বয়ং ক্যাপটেন থাকেন। করিডরটা শেষ হয়েছে গিয়ে নীচে জাহাজের খোলে যাবার সিঁড়িতে। সেখানেই মালপত্র বোঝাইয়ের গুদাম থেকে ইঞ্জিনঘর ও নাবিকদের থাকবার জায়গা। কোনো মহিলার সেখানে লুকিয়ে থাকা তো অসম্ভব!

অথচ লুকিয়ে না থাকলে এ নারীমূর্তি এ জাহাজে উপস্থিত থাকে কী করে! দু-দিন আগে বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বার পরই সেদিন এমনি গভীর রাত্রে মেয়েটিকে প্রথম ওই নীচের করিডরেই দেখতে পাই। সেদিন ওপরের ডেক থেকে নীচে নামছিলাম না, রাত্রে ঘুম না আসায় ওপরে ডেকে যাবার জন্যে কেবিন থেকে বার হচ্ছিলাম। দরজা খুলতেই করিডোরের অন্য প্রান্তে মেয়েটিকে দেখতে পাই। আমায় দেখতে পেয়েই মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নীচের খোলে নেমে যায়।

pathagar.net

এ জাহাজে তখন প্রথম উঠেছি। যাত্রী আর কে কে আছে না আছে, তা জানি না! তাই সেরকম কিছু বিচলিত না হলেও একটু অবাক বোধ হয় হয়েছিলাম। জাহাজটা নেহাতই মাল বওয়া ট্র্যাম্প স্টিমার। যাত্রী সাধারণত এ জাহাজে থাকে না বললেই হয়! বন্দর থেকে জাহাজে ওঠবার সময় কোনো মহিলা যাত্রীকে অন্তত দেখিনি।

পরে দুপুরে খাবার টেবিলে বসেই কথাটা তুলেছিলাম। প্রথম শ্রেণির যাত্রী বলে ক্যাপটেনের সঙ্গে এক টেবিলে আমাদের খেতে বসবার ব্যবস্থা। যাঁকে দেখেছি তিনি আমাদের মতো যাত্রী হলে তাঁরও জায়গা এই টেবিলে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এপর্যন্ত তাঁকে খাবার টেবিলে তো নয়ই, স্টিমারেও কোথাও দেখিনি।

সেই কথাটা পাড়বার জন্যেই ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ জাহাজে আর কোনো যাত্রী আছেন কি না।

'আর কোনো যাত্রী!'—ক্যাপটেন ডিগবি অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'আর কোনো যাত্রী কোথা থেকে আসবে! এ জাহাজে যাত্রী-কেবিন তো মাত্র একটি, যাতে আপনারা আছেন।'

'না,' একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিলাম, 'এই ফার্স্টক্লাস ছাড়া আর অন্য ক্লাসের যাত্রী তো থাকতে পারেন!'

'না, মশাই না!' ডিগবি বলেছিলেন, 'ফার্স্ট সেকেন্ড কোনো ক্লাসের কোনো কেবিন আর নেই। আমাদের এ জাহাজে যাত্রীই নেওয়া হয় না। বড়ো লাইনের ভালো জাহাজ থাকতে এ রদ্দি জাহাজে যাত্রী হতেই বা চাইবে কে! নেহাত আপনাদের তাজ্জুব সখ আর এ জাহাজের মালিক আফ্রিকা টেডার্স-এর সঙ্গে মগনলাল ব্রাদার্সের কাজ কারবার আছে বলে তাদের সুপারিশের চিঠিতে আপনাদের জন্য এই কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নইলে এ কেবিন বেশিরভাগ খালিই থাকে, কখনো-সখনো কোম্পানির কর্তাদের কেউ ইন্‌স্পেকশনে এলে ও কেবিনে থাকেন।

ক্যাপটেনের কথা শেষ হবার পর নিজের সংশয়টা ব্যক্ত না করে পারিনি। বলেছি, 'তাহলে বুঝতে হবে আমরা আর আপনার জাহাজের ক্রু ছাড়া আর কেউ এ জাহাজে নেই। কিন্তু আমি যে কাল রাত্রে একজন মহিলাকে আমার কেবিনের বাইরে করিডরে দেখেছি!'

'একজন মহিলাকে!'

'রাত্রে করিডরে!'

ক্যাপটেন ও মামাবাবু দুজেনই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন। তারপর মামাবাবুর মুখেই একটু টেপা হাসি দেখা দিয়েছিল। বলেছিলেন, 'ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখিসনি তো!'

'স্বপ্ন!' আমি জ্বলে উঠেছি মামাবাবুর ওপর, 'কাল রাত্রে পর্যন্ত আমার ঘুমই আসেনি। তুমি অবশ্য তখন নাক ডাকাচ্ছ কুম্ভকর্ণের মতো। ওপরের ডেকে যাবার জন্য দরাজা খুলতেই ওই মহিলাকে করিডরে অন্য প্রান্তে দেখতে পাই। আমায় দেখেই সিঁড়ি দিয়ে তিনি নীচে নেমে যান।'

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব মি. সেন!' ডিগবির গলায় কিন্তু কৌতুকের বদলে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য—প্রধানত এ জাহাজে কোনো মহিলা থাকতেই পারেন না, সিড়ি দিয়ে নীচে তিনি যাবেনই বা কোথায়? নীচে কী আছে আপনাদের তো কাল দেখিয়েই এনেছি। সেখানে একজন মহিলার থাকবার জায়গা কোথায়?'

একটু চুপ করে থেকে ডিগবি আবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'আচ্ছা মহিলার চেহারাটা কীরকম বলবেন?'

একটু বিব্রত বোধ করে বলেছি, 'চেহারা ওই আবছা অন্ধকারে দূর থেকে কি ভালো দেখতে পেয়েছি! তবে পাতলা লম্বা কমবয়সি কেউ বলেই মনে হয়েছে. জ্যাকেট আর স্কার্ট পরা। মাথায় তার সঙ্গে একটা বেরে ছিল এ বিষয়ে ভুল নেই। প্রথমটা হঠাৎ তাই যেন মেয়ে অফিসার-টফিসার বলে ধারণা হয়েছিল।'

pathagar.net

মাথায় বেরে পরা মেয়ে অফিসার!'—বলে এবার ক্যাপটেন হেসে ফেলেছেন, 'না মশাই, আমাদের ট্র্যাম্প জাহাজে এখনও মেয়ে অফিসার নেওয়ার রেওয়াজটা চালু হয়নি। কালে কালে হয়তো সবই হবে। তবে তার আগেই আমার জাহাজ ছেড়ে অবসর নেবার সময় হয়ে যাবে এই বাঁচোয়া।'

হাসি ঠাট্টায় ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া আমার মনঃপুত হয়নি। একটা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছি, 'জেগে স্বপ্ন দেখার রোগ কিন্তু আমার নেই, মি. ডিগবি। এ রহস্যের একটা কিছু মানে নিশ্চয় আছে। একজন অল্পবয়স্কা ইয়োরোপিয়ন মহিলাকে কাল যে আমি করিডরে দেখেছি, তা আমি আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারি।'

'সত্যিই ব্যাপারটা তো তাহলে অদ্ভুত।' মামাবাবু আমায় একটু যেন সমর্থন করেছেন, 'আচ্ছা, জাহাজে অনেক সময়ে বিনা খরচে লুকিয়ে যাবার চেষ্টা তো কেউ কেউ করে। সেইরকম কোনো স্টোঅ্যাওয়ে, নয় তো!'

ক্যাপটেন এ কথায় সামান্য যেন চিন্তিত হয়েছেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ সুপের প্লেটটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছেন, 'স্টোঅ্যাওয়ে আমার এই মাল জাহাজে! তাও আবার মেয়ে!'

মামাবাবুর দিকে সোজা এবার মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বাস করতে মন চায় না, মি. রায়। এই স্টিমারে স্টোঅ্যাওয়ে কী সুখে থাকতে চাইবে! আর মি. সেন যা বর্ণনা দিচ্ছেন সেরকম যুবতী একটি মেয়ে লুকিয়ে থাকবে কোথায়! এ তো আর সমুদ্রের প্রাসাদের মতো বিরাট প্যাসেঞ্জার জাহাজ নয়, যার নানা কোণ কানাচ আছে লুকিয়ে থাকবার। তবু সন্দেহ যখন জেগেছে, তখন ভালো করে একবার তল্লাস করে দেখব।'

প্রসঙ্গটা ওইখানেই শেষ হয়েছিল! রাত্রের ডিনারের সময় ক্যাপটেন আমাদের জানিয়েছেন যে, স্টিমারটি যতদূর সাধ্য তিনি প্রায় তন্নতন্ন করেই খুঁজিয়েছেন, কোথাও কোনো স্টোঅ্যাওয়ে তো পাওয়া যায়নি।

কথাটা মি. ডিগবি এমন সুরে বলেছিলেন যে, মামাবাবু ও আমি দুজনেই একটু সন্দিগ্ধভাবে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলাম।

মামাবাবুই বলেছিলেন, 'আপনার নিজের মনে যেন একটু সন্দেহ জেগেছে, ক্যাপটেন! কিছু যেন চেপে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে।'

'না চেপে যাইনি!' ডিগবি একটু ইতস্তত করে বলেছেন, 'যে সামান্য ব্যাপারে আমার একটু ধোঁকা লাগছে, সেটা আপনাদের বলব কি না তাই ভাবছিলাম। ব্যাপারটা সত্যিই হয়তো কিছু নয়।'

'কিছু যদি না হয় তাহলেও বলতে দোষ কী।' আমি কথাটা বার করতে চেয়েছি।

দু-এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ডিগবি বলেছেন, 'খোঁজ করে স্টোঅ্যাওয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি, শুধু আমাদের একজন এ. বি. দু-নম্বর হোল্ডে একটা বেরে টুপি পেয়েছে। বেরে টুপিতে কিছুই অবশ্য প্রমাণ হয় না। ও টুপি সাধারণত পুরুষরাই পরে। আমাদের জাহাজে কাজ করে ত্রিশ জন। তাদের কারোরই ওটা হওয়া সম্ভব।'

শেষের কথাগুলো ডিগবি যেন নিজেকে স্তোক দেবার জন্যেই বলেছেন। তেমন জোর দিয়ে বলতে পারেননি।

মামাবাবু তাই বোধ হয় বলেছেন, 'টুপিটা কার তা কিন্তু জানা যায়নি কেমন?'

'না, সেইটেই মজা!' ক্যাপটেন স্বীকার করে নিজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'খোঁজাখুঁজি দেখে, যার টুপি সে বোধ হয় ভড়কেই মালিকানাটা চেপে গেছে!'

ক্যাপটেনের এ কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মামাবাবু বলেছেন, 'আচ্ছা টুপিটা কে পেয়েছে বললেন?'

'বিল মার্ফি। একজন এ. বি.।'—বলেছেন ক্যাপটেন।

'এ. বি. মানে এব্‌ল্ সিম্যান তো!'—মামাবাবু নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, 'তার মানে ও. এস. অর্থাৎ অর্ডিনারি সিম্যান হয়ে অন্তত তিন বছর কাজ করেছে, কেমন?'

'ঠিক ধরেছেন,' হেসে বলেছেন ডিগবি, 'আপনি তো জাহাজের খুঁটিনাটি জানেন দেখছি।'

'জানি আর কতটুকু।'—মামাবাবু বিনয় করেছেন, 'এই জাহাজে উঠেই কিছু কিছু শিখেছি। সেকথা থাক। এই বিল মার্ফি দু-নম্বর হোল্ডের কোথায় টুপিটা কীভাবে পেয়েছে জিজ্ঞেস করেছেন?'

'করেছি বই কী!'—ডিগবি বলেছেন, 'দু-নম্বর হোল্ডে এখন বলতে গেলে কিছুই নেই। একধারে গাদা-করা কিছু চটের থলে পড়ে আছে। সেই চটের থলের মধ্যে কারুর লুকিয়ে থাকবার জায়গা নেই। সেখান খোঁজ করবারও কথা নয়। তবুও নিজে থেকে সে থলেগুলো নাড়তে গিয়ে ওই বেরেটা পায়।'

'মার্ফিকে তাহলে খুব উৎসাহী বলতে হবে,' বলেছেন মামাবাবু।

'হ্যাঁ, তা একটু উৎসাহী!'—স্বীকার করেছেন ক্যাপটেন। 'কিন্তু একটু বেয়াড়াও বটে। ফার্স্ট মেট পার্কার তো ওকে ওই থলেগুলো ঘাঁটতে দেখে চটেই গিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি।' মামাবাবু একটু হেসেছেন, 'তাহলে মার্ফি বেয়াড়া না হলে ও বেরেটাও তো পাওয়া যেত না। যদিও বেরের কিছু মানে আছে কি না, সেইটেই বলা শক্ত।'

'হ্যাঁ,' ডিগবি আমার দিকে একটু যেন অপ্রসন্ন ভাবেই চেয়ে বলেছেন, 'মি. সেন এমন একটা ফ্যাকড়া তুলেছেন যা বিশ্বাসও করতে পারছি না, আবার উড়িয়ে দিতেও পারছি না।'

এবিষয়ে আর কিছু কথা তখন হয়নি।

তারপর এখন আবার সেই মূর্তিকে ক্ষণেকের জন্যে দেখে নীচের সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাকে খোঁজবার চেষ্টা আর করলাম না। করিডর থেকে সোজা নিজেদের কেবিনে ঢুকলাম।

মামাবাবু অবশ্য তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এই পরম বিলাসের ঘুম ভাঙালে তাঁর মেজাজ কী হবে জানলেও আজ আর দ্বিধা করলাম না। দু-চারবার মুখে ডেকে সাড়া না পেয়ে কাঁধ সজোরে নাড়া দিলাম।

মামাবাবুর ঘুম কি তাতেই ভাঙবার! আরও দুবার নাড়া দিয়ে ডাকবার পর অতিকষ্টে চোখ মেলে বিরক্তি জড়ানো স্বরে বললেন, 'কেন জ্বালাতন করছিস! রাত তো মোটে নটা!'

'নটা নয় বারোটা,' আমি রেগে বললাম, 'কিন্তু সে কথা নয়। এইমাত্র সেই মেয়েটিকে আবার.দেখেছি।'

'আবার!' মামাবাবু এবার ধড়মড় করেই বিছানায় উঠে বসলেন, 'কোথায়?'

বিবরণটা দিলাম। মামাবাবু তাতে অত উত্তেজিত হবেন আমিও সত্যি ভাবিনি। বিছানা থেকে উঠে পড়ে স্লিপিং সুট পরা অবস্থাতেই ক্যাপটেনের কেবিনে গিয়ে ধাক্কা দেওয়ায় আমি তখন একটু অপ্রস্তুত।

ক্যাপটেন এমনিতে ভালো মানুষ, কিন্তু এরকম আচমকা মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙালে কী মেজাজ নিয়ে বার হবেন কে জানে! আমি তাই পরের দিন সকালেই ব্যাপারটা জানাতে চেয়েছিলাম।

আমাদের ভাগ্য ভালো। ক্যাপটেন তখনও ঘুমোননি। ঘুমোবার আগে একটু মৌতাত করছিলেন। ভুরু কুঁচকে বেরিয়ে এলেও আমাদের দেখে জ্বলে উঠলেন না।

ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শোনবার পর তাঁর মুখও রীতিমতো গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'না, আর হেলাফেলা করার ব্যাপার এ নয়। এখুনি নীচে গিয়ে ভালো করে খোঁজ নেওয়া দরকার।'

pathagar.net

একজন ও. এস. কে ডেকে আমাদের কেবিনের কাছে পাহারায় দাঁড় করিয়ে আমরা সবাই নীচে গেলাম। খোঁজাখুঁজি কিন্তু সবই বৃথা! ইঞ্জিনঘর থেকে নাবিকদের কেবিন আর সমস্ত হোল্ড যথাসম্ভব সন্ধান করে কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। নিজের দেখাই অভ্রান্ত কি না সে বিষয়ে আমার তখন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। নাবিকদের ভাবভঙ্গি তো আমাদের ওপর বেশ অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের। ক্যাপটেন স্বয়ং এবার উৎসাহী না হলে তাদের খোঁজাখুঁজি করানোই যেত না বোধ হয়।

ফার্স্ট মেট তো স্পষ্টভাবে নিজের বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেললেন। ফার্স্ট মেট ও বেরে যে পেয়েছে সেই বিল মার্ফির সঙ্গে মামাবাবু একটু আলাদা আলাপ করতে চেয়েছিলেন। ক্যাপটেন হুকুম দিয়েছিলেন সেইমতো।

প্রথম ফার্স্ট মেটের কেবিনেই গেলাম। আমাদের বসতে পর্যন্ত না বলে তিনি একটা পাইপ ধরাতে ধরাতে গোমড়া মুখে যা বললেন তা অপমানেরই সামিল।

'আপনারা কোথাকার পুলিশ জানতে পারি? এরকম চেহারায় পুলিশ আগে কখনো দেখিনি কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

মামাবাবুর এক মুহূর্তে আরেক মূর্তি। সমান মেজাজে কড়া গলায় বললেন, 'আমরা প্রশ্ন করতে এসেছি। শুনতে নয়। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি না বলুন?'

ফার্স্ট মেটের চেহারা তখন দেখবার মতো। রাঙা মুখ তখন আরও লাল হয়ে উঠেছে রাগে। যণ্ডাগণ্ডা দৈত্যের মতো দেহখানা। একটা ঘুসি চালালেই আমরা আর নেই।

ফার্স্ট মেট কিন্তু আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল। পাইপটা মুখে দিয়ে চাপা দাঁতের জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী আপনাদের প্রশ্ন?'

'প্রশ্ন শুধু একটা,' মামাবাবুর গলা এখনও রুক্ষ, 'এই মারমেড জাহাজে কতদিন কাজ করছেন?'

কী একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও ফার্স্ট মেট যে থেমে গেল তা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। একটু চুপ করে থেকে মুখ থেকে পাইপটা বার করে বলল, 'একমাস মাত্র।'

'হুঁ, তাই ভেবেছিলাম, ধন্যবাদ।'—বলে মামাবাবু পেছন ফিরে আমাকে নিয়ে সোজা ওপরে আমাদের কেবিনে।

মামাবাবুর এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিনি। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই, দরজার বাইরে টোকার সঙ্গে ভারী গলার আওয়াজ পেলাম, 'আসতে পারি।'

'আসুন।'—বললেন মামাবাবু।

ভেতরে যে ঢুকল, ভারী গলার আওয়াজের সঙ্গে চেহারায় তার মিল নেই। রোগাটে পাতলা কমবয়সি ছোকরা। পরিচয় সে নিজেই দিল, 'আমার নাম বিল মার্ফি। ক্যাপটেন পাঠিয়েছেন। আপনারা কী জানতে চান সেই জন্যে।'

রোগা পাতলা ছোকরা হলেও মার্ফির মেজাজটা ফার্স্ট মেটের চেয়ে বিশেষ মোলায়েম নয়। কথাগুলো কাটা-কাটাই লাগল। তার কারণটা অবশ্য আলাদা, একটু পরে বুঝলাম।

মামাবাবু মার্ফিকে বসতে বললেন, কিন্তু জাহাজের আদব-কায়দার দরুনই বোধ হয় সে বসল না।

মামাবাবু মার্ফির বেলায় কিন্তু ভোল পালটে মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'তুমিই তো বেরে টুপিটা পেয়েছ? কেমন?'

মামাবাবুর মিষ্টি হাসি আর গলাতেই অতটা কাজ হবে ভাবিনি। মার্ফি প্রায় কাঁদুনে গলায় মামাবাবুর কাছেই তার ক্ষোভ জানালেন, 'পাওয়াটাই যেন আমার অপরাধ হয়েছে, জানেন! বারণ করা সত্ত্বেও থলেগুলো ঘেঁটেছি বলে আমার ওপর কীসব তম্বি।

pathagar.net

'কে তম্বি করল কে।' মামাবাবু হেসে সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই ফার্স্ট মেট?'

'ফার্স্ট মেট মুখে করেছেন।' মার্ফি বলল, 'মনে মনে আর অনেকেই খাপ্পা।'

'আর অনেক কারা! ক্যাপটেনও?'—আমিই জিজ্ঞেস করলাম।

'না, না।' মার্ফি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানাল, 'উনি অত্যন্ত ভালো। কিন্তু ওঁর নাকের তলা দিয়ে কী হয়ে যায় সে উনি জানবেন কী করে?'

'যেমন এ জাহাজে মেয়ে লুকিয়ে থাকা?'—মামাবাবু মার্ফিকে উসকানি দিলেন।

'তা মেয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব কি! এই আমিই তো—'

সরলভাবে অতখানি বলে ফেলে মার্ফি যেন ভয় পেয়েই থেমে গেল।

'তোমার কিছু ভয় নেই।'—মামাবাবু তাকে সাহস দিলেন, 'ক্যাপটেন তোমার সহায় তা তো জান। মোম্বাসা থেকে জাহাজ ছাড়বার পর তুমি নিজে এরকম কিছু দেখেছ?'

'আমি...আমি—'একটু থতমত খেয়ে মার্ফি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে ফেলল, 'আমিও এই পরশু রাত্রে ওপরে ফোকাস্‌ল-এর কাছে ওইরকম একটা মূর্তি যেন দেখেছিলাম। সেটা আলো-ছায়ায় আমার মনের ভুলই বলে ধরে নিয়েছিলাম অবশ্য।'

'তাই কাউকে আর সেকথা জানাওনি, কেমন?'

ক্যাপটেন কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ করিনি। তিনি এবার ভেতরে এসে মার্ফিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। মার্ফি সেলাম জানিয়ে চলে যাবার পর চিন্তিত মুখে বললেন, 'ব্যাপারটা তাহলে ভৌতিক বলেই ধরে নেব, মি. রায়? ওরকম একটা বদনাম অবশ্য আছে আমাদের মারমেড-এর।'

'সে বদনাম কাটানো এবার দরকার নয় কি?' মামাবাবু বললেন।

'যদি পারেন তো আপনার কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ থাকব।' ক্যাপটেন উৎসুকভাবে মামাবাবুর দিকে তাকালেন, 'মেয়েটি যেই হোক, সত্যি যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারেন।'

'তাকে খোঁজার চেয়ে, কেন সে দেখা দেয় সেইটে বোঝাই বেশি দরকার নয় কি?'

ক্যাপটেন ও আমি দুজনেই একটু অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকালাম।

আরম্ভটা যেন ভৌতিক কাহিনির ভূমিকা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। সেরকম কিছু লিখতে কিন্তু বসিনি। এধরনের অলৌকিক গোছের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ব, তা জানতাম না। মামাবাবু তা নিশ্চয় ভাবতে পারেননি। সুযোগ পেয়ে নেহাত খেয়ালের মাথায় এই সুদূর সমুদ্রের রাজ্যে তাঁর বেড়াতে আসা। সেই সঙ্গে প্রলোভন দেখিয়ে আমাকেও টেনে এনেছেন।

সুযোগটা হয়েছিল মগনলাল ব্রাদার্সের এক অংশীদার সুন্দর দাস মগনলালের মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসা থেকে। মগনলাল ব্রাদার্স আমদানি-রপ্তানির কারবারি। বোম্বাই করাচি ও কলকাতা থেকে তখনকার দিনে তাঁরা বিদেশে ম্যাঙ্গানিজ ও ইলমেনাইট চালান দেন। সমুদ্র পার থেকে যা আমদানি করেন, তার একটা হল গুয়ানো, অর্থাৎ পাখিদের যুগ-যুগান্তরের জমানো মল, সার হিসেবে যার জায়গায় আজকাল কৃত্রিম ফার্টিলাইজার চলছে।

এই গুয়ানো তাঁরা আনেন আফ্রিকার পূর্বদিকের ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের উত্তরে অ্যাসটোভ নামে এক ছোট্ট দ্বীপ থেকে। তাঁরা যেসব ছোটো মাল-জাহাজ ভাড়া করে ভারত থেকে ম্যাঙ্গানিজ ও ইলমেনাইট বিদেশে পাঠান, তারই দু-একটি ফেরবার পথে অ্যাসটোভ দ্বীপ হয়ে এই গুয়ানো নিয়ে আসে। শুধু অ্যাসটোভ দ্বীপের গুয়ানো নয়, একদিক দিয়ে তার চেয়ে অমূল্য পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এক সাতরাজার ধনও তারা আনে আরও উত্তরের সেসেল্‌জ্‌ দ্বীপপুঞ্জের প্রাসলিন বলে একটি ছোট্ট দ্বীপ থেকে।

মামাবাবু আমায় সেই সাতরাজার ধনের প্রলোভনই দেখিয়েছিলেন।

pathagar.net

মগনলাল ব্রাদার্সের অংশীদার সুন্দরদাস ঠিক কী জন্যে মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জানি না। সেদিন আমি বিকেলে যখন মামাবাবুর বাসায় গিয়ে পৌঁছেছি, তখন তিনি বিদায় নিচ্ছেন। তাঁর শেষের আলাপটুকু শুধু শুনে সামান্য যা বুঝেছিলাম। তিনি তখন বলছিলেন—

'তাই বলছি, আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন, রায় সাহেব। সারা দুনিয়ায় এ জিনিস আর কোথাও নেই। দুশো বছর আগে এ জিনিসের জন্যে রাজারা অর্ধেক রাজত্ব দিতে পেছপাও হত না। আপনি নিজের চোখে ও জিনিস দেখেও আসুন আর আমাদের সমস্যাটারও মূল কী, তা ধরবার চেষ্টা করুন।'

'আপনাদের সমস্যা তো আসলে মারমেড নিয়ে,' বলেছিলেন মামাবাবু। 'অন্য জাহাজের তুলনায় মারমেড অনেক কম ভাড়ায় আপনাদের মাল বয়ে আনে। কিন্তু গত কয়েকবার কিছুতেই সময় মতো বোম্বাই করাচিতে পৌঁছোতে পারছে না। তার জন্যে লোকসান কিছু আপনাদের বইতে না হলেও ব্যাপারটার মানে আপনারা বুঝতে চান। এই তো?'

'হ্যাঁ, বুঝতে চাইছি একদিক দিয়ে মারমেড-এর মালিকের খাতিরেই। মালিক স্টিম ট্রাস্ট বলে ছোটো একটা বিলাতি কোম্পানি। কোম্পানি অত্যন্ত ভালো। শুধু যে অনেক অল্প ভাড়ায় আমাদের কাজ করে, তা নয়। পৌঁছোতে দেরি হবার জন্যে যে গুনাগার লাগে, তা নিজেরাই দ্বিরুক্তি না করে নিজেদের পাওনা থেকে কাটতে দেয়। তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে খোঁজ খবর অবশ্য নিচ্ছে। আমরা তাদের হিতৈষী হিসাবে কিছু করতে চাই। তবে সেটা গোপনে করা উচিত বলেই আপনাকে যেতে বলছি। আপনি যেন ওই পথে বেড়াতে চান। বন্ধু ও অতিথি হিসেবে আপনাকে আমরা সেই সুযোগ দিচ্ছি।'

'খোঁজ খবরে এ পর্যন্ত তো বিশেষ কিছুই জানতে পারেননি।'—বলেছেন মামাবাবু, 'শুধু একবার সেসেল্‌জের রাজধানী মাহে দ্বীপের ভিক্টোরিয়াতে জাহাজটাকে সরকারি নৌ-পুলিশ খানাতল্লাসির জন্যে দু-দিন আটক রেখেছিল এটুকু জানেন।'

'হ্যাঁ, সে খানাতল্লাসিও নেহাত অকারণ অন্যায়।' বলেছেন সুন্দর দাস। 'সরকারি দপ্তরের কোনো ভুল নির্দেশেই সেটা হয়েছিল বোধ হয়। খানাতল্লাসিতে কিছুই পাওয়া যায়নি। যাবেই বা কী? অতি সাধারণ একটা মালের ট্র্যাম্প জাহাজ। ম্যাঙ্গানিজ ইলমেনাইট আর গুয়ানো বওয়াই তার কাজ। নৌ-পুলিশ ক্ষমা চেয়ে সমম্মানে তাই মারমেডকে ছাড়পত্র দিয়েছিল। মারমেড-এ খানাতল্লাসি সেই একটিবারই হয়েছিল, কিন্তু তারপরও জাহাজ কয়েকবার ধরে ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারছে না। এ ব্যাপারে রহস্য যদি কিছু থাকে তা আলাদা ধরনের বলেই তাই সন্দেহ হয়।'

'মারমেড-এর নাবিকদের মধ্যে একটা কী কুসংস্কারের ধারণার কথা বলেছিলেন না?'—বলেছেন মামাবাবু।

'হ্যাঁ। আজগুবি ধারণা।'—হেসে বলেছেন সুন্দরদাস। 'মারমেড-এর ওপর কোনো সমুদ্রের অপদেবতার ভর হয়েছে, এই গুজব তাদের মধ্যে রটেছে! সেই অপদেবতাই নাকি জাহাজকে বেপথে চালিয়ে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। ট্র্যাম্প জাহাজের প্রায় মুখ্যু-সুখ্যু নাবিকদের মধ্যে ওরকম কুসংস্কার থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং ওসবে আপনাকে কান দিতে বলছি না। আপনি নিজের চোখ-কান খোলা রেখে হয়তো কিছু ধরতে পারবেন, এই আমাদের আশা।'

সুন্দরদাস তারপর নমস্কার জানিয়ে চলে গেছেন। মামাবাবু বর্মায় যখন ছিলেন, তখন থেকেই মগনলাল ব্রাদার্সের সঙ্গে যে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সেকথা এবার অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়েছে। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁর কাছে ওই কোম্পানির পরামর্শ-চাওয়া চিঠিও দু-একটা মাঝে মাঝে দেখেছি।

সুন্দরদাস চলে যাওয়ার পর মামাবাবু আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে বলেছেন, 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, কোকো দ্য মের তাহলে আমরা দেখতে যাচ্ছি।'

'আমরা যাচ্ছি মানে! আমি হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছি, 'আর অষ্টম আশ্চর্য কোকো দ্য মের, সে-ই বা কী বস্তু?'

'আমরা যাচ্ছি মানে—মামাবাবু যেন প্রথমভাগ পড়াবার গলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'তুই আর আমি কাল বুধবার বিকেলে বোম্বে মেলে রওনা হচ্ছি, আর শুক্রবার বোম্বে পৌঁছে সেই দিনই সন্ধ্যায় বি. আই. এস. এন.-এর এক প্যাসেঞ্জার জাহাজে বোম্বে থেকে আফ্রিকার কিনিয়ায় মোম্বাসা বন্দরে পাড়ি দিচ্ছি। মোম্বাসায় দু-দিন থাকবার পর মারমেড নামে এক ছোটো জাহাজে আমরা যাচ্ছি আশ্চর্য রূপকথার সাতরাজার ধন, অতল সাগরের অমৃত ফল কোকো দ্য মের স্বচক্ষে দেখতে আর নিজেদের মুখে চাখতে।'

আমার হাঁ-করা মুখ দিয়ে আর কথা বার হয়নি। মামাবাবুই আবার বলেছেন, 'কোকো দ্য মের কী বস্তু বুঝতে পারিসনি তো? না পারবারই কথা। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের আগে এ বস্তু যে কী ও কোথাকার কেউই জানত না। মধ্যযুগে এ বস্তু অতি বিরল ছিল। কখনো কখনো সিংহল আর ভারতবর্ষের উপকূলে অদ্ভুত এক ফলের মতো জিনিস সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসত। সে ফলের শাঁস অমৃত বলে লোকে বিশ্বাস করত। হেন রোগ নেই যা নাকি তা খেলে সারে না। যেকোনো বিষ তা কাটিয়ে দেয়, এই ছিল তখনকার ধারণা। গভীর সমুদ্রের তলায় একটি মাত্র নাকি গাছ আছে, যাতে এই আশ্চর্য ফল ফলে। পৃথিবীর সব সমুদ্রের স্রোত সেই অতলে গিয়ে মিশেছে, সেখানকার ঘূর্ণিতে কোনো জাহাজ আর ফেরে না। সেই আজব গাছের অবাক ফল কালেভদ্রে নাকি খসে পড়ে, সমুদ্রের স্রোতের বিরুদ্ধে ভেসে গিয়ে দূর কোনো উপকূলে পৌঁছে নিজে নিজেই হেঁটে ডাঙায় ওঠে। এ ফল সম্বন্ধে এরকম আজগুবি কিংবদন্তি ছড়ানো খুব অস্বাভাবিক নয়। একটি ফলের ওজন আধ মণের ওপর পর্যন্ত হয়। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে সেসেল্জ্ দ্বীপপুঞ্জের প্রাস্লিন দ্বীপটি আবিষ্কারের পর এ ফলের রহস্যের মীমাংসা হয়। কোকো দ্য মের মানে সমুদ্রের নারকেল, পৃথিবীর এই একটি মাত্র দ্বীপেই জন্মায়। জন্মভূমি জানা গেলেও কোকো দ্য মের এখনও অবাক করা ফল। এ ফল একশো ফুট লম্বা গাছে ফলে। তাও গাছের বয়স পঁচিশ বছর হবার আগে নয়। গাছগুলো কতদিন বাঁচে এখন সঠিক জানা যায়নি। ১৭৬৮ সালে দেখা কয়েকটা গাছ অন্তত এখনও বেঁচে আছে। এ ফল গাছে ঝুনো হতেই লাগে নিদেন পক্ষে সাত বছর। সুতরাং এ ফল দেখবার এমন সুযোগ কি ছাড়ে!'

সত্যি সত্যিই তারপর মামাবাবুর সঙ্গে একদিন মোম্বাসা পাড়ি দিয়েছি।

এখনকার পাসপোর্ট, ভিসা, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স, পি ফর্মের দিন হলে অবশ্য সম্ভব হত না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও বছর দশেক আগের কথা, পৃথিবীতে ওসব বেড়া তখনও দুর্লঙ্ঘ হয়নি।

মোম্বাসায় দু-দিন থেকে মারমেড জাহাজে চড়ে প্রাসলিন দ্বীপে পৌঁছেছি। মুগ্ধ হয়েছি সেখানকার কোকো দ্য মের বা দানব নারকেলের অরণ্য দেখে। এবার জাহাজ চলেছে অ্যাসটোভ দ্বীপে গুয়ানো বোঝাই করতে। ইতিমধ্যে ওই আধাভৌতিক রহস্যময় নারীমূর্তির আবির্ভাবে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে সমস্ত জাহাজে।

পরের দিন সকালেই সে উত্তেজনা এমন তীব্র হয়ে উঠবে, কে জানত!

সমুদ্রের হালচাল বোঝা এখনও বুঝি মানুষের অসাধ্য। কদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার পেয়েছি। শান্ত সমুদ্রে মৃদুমন্দ হাওয়ার ঢেউ। হঠাৎ কাল সন্ধ্যা থেকেই গাঢ় কুয়াশায় দিগ্বিদিক ঢেকে গেছে। রাত্রে একটা তারার কণা কোথাও দেখা যায়নি। ওপরের ডেকে উঠে মনে হয়েছে সমুদ্রের নয়, যেন মেঘলোকের ভেতরেই আছি। ডেক থেকে সকাল সকালই নেমে এসে

pathagar.net

কেবিনে শুয়ে পড়েছি। কেবিনে মামাবাবুকে না দেখে একটু অবশ্য অবাক হয়েছিলাম। রাত্রে ডিনার শেষ করে বিছানায় গড়াবার জন্যে মুখটা দেখাবার পর্যন্ত যাঁর প্রায় তর সয় না, তিনি আজ এই বিদঘুটে কুয়াশার রাত্রে বিছানা ছেড়ে গেলেন কোথায়! মামাবাবুর অবশ্য সবকিছুই অদ্ভুত। কাল বিকেলেই যেমন তাঁর হাতে একটা পুরোনো পত্রিকা দেখেছি। পত্রিকাটা আবার পোর্তুগিজ ভাষার সাপ্তাহিক। আমায় কৌতূহল ভরে সেটা লক্ষ করতে দেখে বলেছেন, পোর্তুগিজ শেখবার চেষ্টা করছিলেন। সে পত্রিকা নিয়ে যেমন, তাঁর রাত্রে ঘরে না থাকা নিয়েও বেশিক্ষণ অবশ্য মাথা ঘামাইনি। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে জেগেছি একেবারে ভোরবেলায়।

ঘুম ভাঙবার পরই একটা কীরকম অস্পষ্ট অস্বস্তি টের পেয়েছি। কী যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটার আভাস। দু-এক মিনিট বাদে এ অস্বস্তির কারণটা যেন অনুমান করতে পেরেছি। জাহাজটা চলছে না। থেমে থাকার এই স্তব্ধতাটাই নিজের অজান্তে অস্বস্তি জাগিয়েছে। কিন্তু জাহাজ এখন থেমেছে কেন? অ্যাসটোভ দ্বীপে এত তাড়াতাড়ি তো পৌঁছোনোর কথা নয়। সেকেন্ড মেটের সঙ্গে আলোচনায় জেনেছি, আজ বিকেলের আগে সেখানে পৌঁছোনো হবে না। তাহলে জাহাজ কোথায় কী কারণে থামল? মামাবাবুই বা এই সাতসকালে গেলেন কোথায়? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পরে বাইরে গিয়ে যা শুনেছি, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। রাত্রের কুয়াশার মধ্যে দিক ভুল করে বিপথে গিয়ে জাহাজ সম্পূর্ণ অন্য একটি দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। সেকেন্ড মেটই ছিলেন জাহাজ চালাবার কাজে। কুয়াশার মধ্যে যথানিয়ম কম্পাসের নির্দেশেই তিনি জাহাজ চালিয়েছেন। কিন্তু ভোরে কুয়াশা কেটে যাবার পর অবাক হয়ে দেখেছেন কম্পাসের কাঁটাই তাঁকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে অ্যাসটোভের বদলে অ্যালডাব্রা নামে অন্য একটি দ্বীপে নিয়ে এসেছে। প্রথমটা হতভম্ব হলেও সেকেন্ড মেট অগডেন রাগে তারপর ফেটে পড়েছেন।

অগডেনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বার হবে। উত্তেজিত ভাবে ক্যাপ্টেনকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে, এ ব্যাপারে জাহাজের কোনো বদমায়েসের কারসাজি নিশ্চয় আছে। কম্পাসের কাছে কেউ কোনো চুম্বক বা লোহার কিছু অন্তত লুকিয়ে রেখেছে। নইলে কম্পাসের এ ভুল হওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেনকে তাই তিনি জাহাজের সবাইকে ডাকিয়ে জেরা করতে অনুরোধ করছেন।

ক্যাপটেন অত্যন্ত চিন্তিত মুখে ধৈর্য ধরে সব শুনে বললেন, 'কিন্তু চুম্বক বা লোহার কিছু লুকিয়ে যে কেউ রেখেছে তার প্রমাণ কী? আমি তো আপনার সঙ্গেই সব খুঁজে দেখলাম। কোথাও সেরকম কিছু তো নেই।'

সেকেন্ড মেটকে এবার অনিচ্ছার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করতে হল।

আমি এসে তাঁর সেই রুদ্র মূর্তিই দেখলাম। সেখানে তখন ক্যাপটেন ডিগবি আর মামাবাবু ছাড়া কেউ নেই। মামাবাবু এই ভোরে যে এখানে হাজির থাকবেন ভাবতেই পারিনি।

'তাহলে—'ক্যাপটেন ডিগবি নিজেই বেশ ফাঁপরে পড়েছেন মনে হল। বললেন, 'ওধরনের কিছু থাকলে তো কম্পাসের কাছাকাছি থাকবে। কম্পাসের এরকম বিগড়ে যাওয়ার মানেই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

'মানেটা যদি ভৌতিক হয়?' মামাবাবুর কথায় সবাই আমরা তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

'ভৌতিক?' সেকেন্ড মেট বিমূঢ় ভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ,' মামাবাবুর গলায় কৌতুকের একটু যেন আভাস! 'এ জাহাজের সেরকম একটা দুর্নাম তো শুনেছি। জাহাজের ওপর কোনো এক অপদেবতার নাকি কুদৃষ্টি আছে। সে-ই জাহাজকে ভুল রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যায় বলে গুজব।'

pathagar.net

'এ হাসি-তামাশার সময় নয়, মি. রায়।' ক্যাপটেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন।

'ব্যাপারটা তাহলে গুরুতর কিছু বলছেন!'—মামাবাবুর গলা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর শোনাল, 'বেশ, কম্পাসের ভুলে জাহাজ তাহলে কোথায় এসে থেমেছে জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'এটা অ্যালডাবরা দ্বীপ।' বললেন ক্যাপটেন, 'যেখানে আমাদের যাবার কথা সেই অ্যাসটোভ দ্বীপের উত্তর পশ্চিমে।'

'হুঁ, আগেই জানতাম। টেস্টুডো এলিফ্যান্টিনার দেশ।' মামাবাবু আমাদের সকলকেই বোধ হয় থ করে দিলেন।

'কীসের দেশ?' ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করলেন ভ্রূকুটি করে।

'টেস্টুডো এলিফ্যান্টিনা।' মামাবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সাতমণি কচ্ছপ এই অ্যালডাবরা দ্বীপেই পাওয়া যায়।'

'কিন্তু এখানেই জাহাজ থামবে আপনি আগে জানলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন সেকেন্ড মেট।

'জেনেছি এর আগেও বার কয়েক পথ ভুলে জাহাজ এখানেই থেমেছে বলে।' মামাবাবু ক্যাপটেনের দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসুভাবে, 'কেমন তাই না?'

'কোথায় থেমেছে না থেমেছে আপনি জানলেন কী করে?' ক্যাপটেন এবার বেশ গরম।

'জেনেছি. আপনাদের লগবুক দেখে,' মামাবাবুর মুখে গা জ্বালানো হাসি।

'লগবুক দেখে! লুকিয়ে আমাদের লগবুক দেখেছেন আপনি!' ক্যাপটেন জ্বলে উঠলেন।

'লুকিয়েই দেখেছি সত্যি। কিন্তু প্রকাশ্যে দেখবার অধিকারও আমার আছে।'—মামাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ক্যাপটেনের সামনে খুলে ধরে বললেন, 'এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন স্টিম ট্রাস্ট আর মগনলাল ব্রাদার্স দু-তরফ থেকেই আমায় ঢালাও অধিকার দিয়েছে মারমেড জাহাজের ব্যাপারে যা আমার দরকার মনে হয় সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখবার।'

'আপনি! আপনি তাহলে আমাদের মধ্যে গুপ্তচর হয়ে এসেছেন?' ক্যাপটেন ঘৃণার সঙ্গে বললেন।

'হ্যাঁ, সেরকম গালাগালও দিতে পারেন।' মামাবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, 'তবে শুধু আমাকে নয়, আপনার ফার্স্ট মেট এই মি. স্টিলকেও।'

ফার্স্ট মেট মি. স্টিল কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, লক্ষ করিনি। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

মামাবাবু তখন বলে যাচ্ছেন, 'মি. স্টিলকেও জাহাজের রহস্য সন্ধানের জন্যেই ব্রিটেনের নৌ-পুলিশ বিভাগ থেকে ফার্স্ট মেট সাজিয়ে পাঠানো হয়েছে।

ক্যাপটেন একবার মামাবাবু আর একবার মি. স্টিলের দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে এবার কেমন একটু যেন থতমত খেয়ে অসহায়ভাবে বললেন, 'আমার ওপর তাহলে স্টিম ট্রাস্টের বিশ্বাস নেই বুঝতে হবে। কিন্তু আমি কি নিজেই এ রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা করছি না? ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছে থাকলে লগবুকের বিবরণ কি বদলে লেখাতে পারতাম না! এখুনি সব জানাজানি হলে এ জাহাজের অফিসার থেকে সাধারণ নাবিকের মধ্যে নিরীহ নির্দোষ অনেকের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে বলেই আমি নিঃশব্দে রহস্যটার মীমাংসা করতে চেয়েছি।'

'কিন্তু ওই মায়াদয়া করতে গিয়েই রহস্যের খেই আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, মি. ডিগবি।' বললেন ফার্স্ট মেটরূপী মি. স্টিল।

'হাঁ, তা না হলে বারবার জাহাজ এই অ্যালডাবরা দ্বীপেই কেন পথ ভুলে এসে থামে তা অন্তত বোঝবার চেষ্টা করতেন।' মামাবাবুও যোগ দিলেন।

'তা বোঝবার চেষ্টা করিনি মনে করছেন?' ক্যাপটেন বেশ ক্ষুণ্ণ, 'কাল রাত্রে আমি নিজে

কতবার এসে মি. অগডেনের সঙ্গে কম্পাস তদারক করে গেছি জানেন? কম্পাস এরকমভাবে বিকল হবার কোনো কারণই তো খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কারণ তো মি. অগডেনই আগে বলে দিয়েছেন।' মামাবাবু হাসলেন, 'কম্পাসের কাছে কোনো চুম্বকজাতীয় জিনিস থাকাই হল আসল কারণ।'

'কিন্তু মি. অগডেনের সঙ্গে আমি নিজে ভালো করে এ কামরা খুঁজে দেখেছি।' ক্যাপটেন এবার উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ম্যাগনেটজাতীয় কোনো কিছুই পাইনি। আপনারাও খুঁজে দেখুন না।'

'তা তো দেখতেই হবে।' মামাবাবুর গলার সুরটা কেমন অদ্ভুত।

সেকেন্ড মেট অগডেন নীরবে অপ্রসন্ন মুখে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'আমি তাহলে এখন যাচ্ছি! সারারাত জেগে কাটিয়েছি, এখন বিশ্রাম দরকার।'

মি. অগডেন পা বাড়াতেই কিন্তু মামাবাবু বাধা দিলেন।

'দাঁড়ান, যাবেন না, মি. অগডেন। আর যদি যেতে চান তো আপনার ওভারকোটটা খুলে রেখে যান।'

'ওভারকোট খুলে রেখে যাব!' অগডেন গরম মেজাজে ফিরে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ, ওই ওভারকোটেই এ জাহাজের রহস্যের চাবিকাঠি আছে কিনা।'

মামাবাবু ও মি. স্টিল দুজনেই তখন দু-দিক থেকে অগডেনকে গিয়ে ধরেছেন।

আমি ও ক্যাপটেন হতভম্ব হয়ে তাঁদের দিকে তাকাতে মামাবাবু হেসে আবার বললেন, 'খুব অবাক হচ্ছেন, মি. ডিগবি? কিন্তু ওভারকোটের এই বোতামগুলো দেখেছেন। একটু বেখাপ্পা গোছের গড়ন নয়?

বলতে বলতে ওভারকোট থেকে সজোরে একটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়ে মামাবাবু আবার বললেন, 'এই বোতামের ভেতরেই লুকোনো ম্যাগনেট। ওই দিয়েই জাহাজের কম্পাস নিজের দরকারমতো বেঠিক করে অপদেবতার কোপের গুজব তৈরির চেষ্টা হয়েছে।'

'কিন্তু বোতামের মধ্যে লুকোনো ম্যাগনেটের কথা আমার মাথায় আসেনি মি. রায়।'—শ্রদ্ধা বিস্ময়ের স্বরে বললেন মি. স্টিল, 'আপনি বুঝলেন কী করে?'

'বুঝলাম কাল রাত্রে প্রথম মি. অগডেনকে এই ওভারকোট পরে কনট্রোলে আসতে দেখে। এখন বেশ গরমের দিন যাচ্ছে। ওভারকোট চাপাবার কোনো প্রয়োজনই হয় না। কাউকে না বুঝতে দিয়ে কম্পাস বিকল করবার একমাত্র উপায় হল ম্যাগনেটজাতীয় কিছু। সে ম্যাগনেট সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কীভাবে রাখা সম্ভব, ভাবতে গিয়েই ওভারকোটের বোতামের কথা আমার মাথায় আসে। আচ্ছা, মি. অগডেনকে এখন নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখুন, মি. স্টিল। আমি ক্যাপটেনের সঙ্গে কাজের কথাগুলো সেরেই যাচ্ছি। আশা করি মি. অগডেন গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না।

'না তা, করব না।' ধরা পড়েও ভেঙে না পড়ে অবজ্ঞা ভরে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল অগডেন—'আমায় বন্দি করে আপনারাই বা করবেন কী? বিলেতে বিচার হয়ে বড়োজোর আমার চাকরিটা যাবে। তার চেয়ে বেশি কিছু যদি হয় তাহলে কিছু দিনের জেল। আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু এ জাহাজের রহস্য তাতেই বুঝে ফেলবেন মনে করেছেন?'

নেহাত চাপা রাগে ও আক্রোশেই বোধ হয় অগডেনের মুখ আলগা হয়ে শেষ আস্ফালনটা বেরিয়ে পড়েছিল। মামাবাবু তার উত্তর না দিয়ে একটু শুধু হাসলেন।

মি. স্টিল অগডেনকে নিয়ে চলে যাবার পর ক্যাপটেনই আবার সে কথা তুলে তাঁর সংশয় ও উদ্বেগটা প্রকাশ করে ফেললেন।

pathagar.net

'অগডেন তো সত্যি কথাই বলে গেল, মি. রায়। ম্যাগনেটের সাহায্যে কম্পাস বিগড়ে দিয়ে জাহাজ ভুল পথে চালাবার জন্য অগডেনের হয়তো ভালোরকম সাজাই হবে। কিন্তু মারমেড-এর রহস্য তাতেই তো সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে না।'

'রহস্য সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে মি. ডিগবি।' মামাবাবু আশ্বাস দিলেন, 'জাহাজে ভৌতিক মহিলা আমদানি করে আমাদের আসল রহস্য থেকে নজর সরিয়ে দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও ওদের সব ফন্দি ফিকিরই ধরে ফেলেছি। আপনি এখন অ্যাসটোভ-এর বদলে ম্যাডাগাস্কারের উত্তর পশ্চিমের নোজি বে বন্দরে জাহাজ চালাবার হুকুম দিন দেখি।'

'নোজি বে বন্দরে!' ক্যাপটেনের মুখ একটু গম্ভীর হল, 'তা তো আমি পারি না, মি. রায়। কোম্পানির যে নির্দেশ নিয়ে আমি জাহাজ মোম্বাসা থেকে ছেড়েছি তা লঙ্ঘন করতে আমি পারি না।'

'লঙ্ঘন তো এর মধ্যেই করেছেন!' মামাবাবু হাসলেন, 'তবে তা অবশ্য নিজের অজান্তে ও অনিচ্ছায়। যাই হোক, কোম্পানির নির্দেশ অমান্য করতে আপনাকে হবে না। স্টিম ট্রাস্টের লন্ডন অফিস থেকে এতক্ষণে নোজি বে-তে জাহাজ নিয়ে যাবার নির্দেশ এসে গেছে বলেই মনে করি। আপনি স্পার্কস অর্থাৎ ওয়্যারলেস অফিসারের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন। জাহাজ কিন্তু এখুনি ছাড়তে হবে, মি. ডিগবি।'

'নির্দেশ এসে থাকলেও এখুনি কী করে জাহাজ ছাড়ব, মি. রায়?'—ক্যাপটেন এবার একটু বিব্রত ভাবে জানালেন—জাহাজ এখানে থামবার পর আমাদের দুজন নাবিক যে বড়ো কচ্ছপ দেখবার জন্যে একটা বোট নিয়ে দ্বীপে গেছে। দুজনেই বলতে গেলে ছেলেমানুষ। তাই আমি অনুমতি না দিয়ে পারিনি।'

'তাদের একজন বিল মার্ফি, কেমন?' জিজ্ঞেস করেছেন মামাবাবু।

'হ্যাঁ, বিল মার্ফি আর ডিক রবার্টস বলে একজন ও. এস.।' বললেন ক্যাপটেন, 'তারা ঘণ্টা দুয়েক বাদেই ফিরবে।'

'তাদের ফিরতে দেওয়া আর হবে না মি. ডিগবি,' মামাবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'ওই দ্বীপেই হাতে হাতে যাতে তারা ধরা পড়ে, তার ব্যবস্থাই করতে হবে এখন। ধরা অবশ্য শুধু বিল মার্ফিই পড়বে। ডিক রবার্টস না জেনে তার সঙ্গী হয়েছে মাত্র। সুতরাং প্রথমে ধরলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

'এসব আপনি কী বলছেন, মি. রায়!'—ক্যাপটেন একটু বিরক্ত ও সন্দিগ্ধভাবেই মামাবাবুর দিকে তাকালেন। মনে হল মামাবাবু আবোল-তাবোল বকছেন বলেই তাঁর ধারণা।

'আজগুবি কিছু বলছি না, মি. ডিগবি! বিল মার্ফি হাতে হাতে কীভাবে ধরা পড়বে জানেন! ধরা পড়বে ওই দ্বীপের টেস্টুডো এলিফ্যান্টিনা মানে হাতি-কচ্ছপের পিঠের খোলার পেছনের খাঁজে চোরাই হিরে সিমেন্ট পুডিং দিয়ে আটকে রাখবার চেষ্টায়। আফ্রিকা থেকে চোরাই হিরের কারবারিরা এই অদ্ভুত ফিকির কিছুকাল ধরে চালাচ্ছে। এই ফিকির এমন যে, কারুর সন্দেহ হবার কোনো উপায়ই নেই। চোরাই হিরে যারা পাচার করে, তারা আপনাদের মারমেড-এর মতো কোনো কোনো জাহাজের দু-চার জন অফিসারকে টাকা দিয়ে হাত করে নানা ছুতো এ দ্বীপে জাহাজ লাগাবার ব্যবস্থা করে। তারপর ওই হাত-করা দলের কেউ অতিকায় কচ্ছপ দেখার ছুতোয় দ্বীপে গিয়ে কচ্ছপদের গায়ে হিরে আটকে দিয়ে আসে। অতিকায় কচ্ছপ সংখ্যায় খুব বেশি নয়। দ্বীপের একটি অংশেই তাদের পাওয়া যায়। সুতরাং কাজটার খুব অসুবিধে নেই। এরপর আসল ব্যাপারিদের দলের আর কেউ একসময়ে অন্য জাহাজে বা সুলুপে এসে সেখানে এসব হিরে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এসব দ্বীপে সখের টহলদারের অভাব নেই। তারা আসে, ঘুরে-ফিরে চলে যায়। তাদের কেউ যে চোরাই হিরে সংগ্রহ করতে আসে, এ সন্দেহ কে করবে?

অ্যালডাবরা দ্বীপে কচ্ছপের গায়ে চোরাই হিরে থাকার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। নানা দেশের পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও চোরাই হিরে চালানের এই একটা অদ্ভুত ঘাঁটির কথা তাই এতদিন কল্পনাও করতে পারেনি। মারমেড-এর বিপথে ঘোরার রহস্যভেদের চেষ্টায় আসবার সময় মাহে দ্বীপে একবার মারমেড খানাতল্লাসি করা হয় জেনেই আমার মনে সন্দেহ জাগে। মোম্বাসায় খোঁজ নিয়ে চোরাই হিরের ব্যাপারেই এ খানাতল্লাসি হয় জেনে সন্দেহটা দৃঢ় হয়।

'মারমেড তল্লাস করে তখন কিছু পাওয়া যায়নি। যাবে কী করে? অ্যালডাবরায় চোরাই হিরে তার আগেই চালান হয়ে গেছে। অ্যালডাবরা দ্বীপেই কয়েকবার মারমেড পথ ভুলে এসে পড়েছে জেনে হিরে চালানের পদ্ধতিটা আমি অনুমান করবার চেষ্টা করি। ভূতুড়ে মহিলার খোঁজে সাধারণ ও. এস. নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ নিয়ে আমি জানতে পারি যে, জাহাজ এখানে থামলে প্রতিবারই বিল মার্ফি কখনো একলা কখনো আর কারুর সঙ্গে কচ্ছপ দেখবার ছুতোয় এ দ্বীপে নেমেছে। কচ্ছপ যেখানে পাওয়া যায় সে-জায়গার বাইরেও সে কোথাও যায়নি। কচ্ছপদের সাহায্যেই যে চোরাই হিরে লুকোনো হচ্ছে, এ বিষয়ে তখন আর আমার সন্দেহ থাকে না। আমার অনুমান যে ঠিক, তার প্রমাণ মি. স্টিলই আমায় দেখান। নৌ-পুলিশ বিভাগ থেকে কাউকে যে এ জাহাজে পাঠানো হয়েছে, তা আমি জানতাম। স্টিলই যে সেই লোক তা শুধু আগে বুঝতে পারিনি। বেরে পাওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি উনি মাত্র একমাস এ জাহাজে যোগ দিয়েছেন। তাইতেই ওঁকে আসল লোক অনুমান করে পরে গোপনে আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করি ও দুই কোম্পানি আমায় যে চিঠি দিয়েছি তা ওঁকে দেখাই। উনিও তখন বোলেটিন দা মোজাম্বিক অর্থাৎ মোজাম্বিক থেকে বার-করা সাপ্তাহিক বুলেটিনের একটা পুরোনো সংখ্যা আমায় দেখান। অতি সাধারণ কাগজ, তাও পোর্তুগিজে লেখা বলে সে সংখ্যার একটা ছোটো ভ্রমণ বিবরণ মোজাম্বিকের বাইরে কারুর চোখে পড়েনি। মি. স্টিল সে ভ্রমণ বিবরণের একটি জায়গা অনুবাদ করে আমায় পড়ে শোনান। একজন পোর্তুগিজ তাতে লিখেছেন যে, ম্যাডাগাস্কারের উত্তরে ছোটো ছোটো দ্বীপে একটি সুলুপ নিয়ে বেড়াতে গিয়ে অ্যালডাবরা দ্বীপে তিনি অতিকায় কচ্ছপ দেখতে পান। একটি কচ্ছপের মাপজোক নিতে গিয়ে তিনি তার পেছনে একটা ছোটো আধময়লা কাঁচের টুকরোর মতো পাথর আঁটা আছে দেখেন। পাথরটা খুলে নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবার পর সেটা হিরে বলেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে। তাই সেটা তিনি পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছেন। বিবরণে সে পরীক্ষার ফল না জানানো থাকলেও হিরের চোরাই কারবারিদের কৌশল আমাদের কাছে এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্ফি এই দলেরই একজন। তাকে হাতেনাতে তাই ধরবার ব্যবস্থা করেছি। এখন অ্যালডাবরায় রেসিডেন্ট গভর্নরের কাছে আপনাকে শুধু একটু বেতার-খবর পাঠাতে হবে।'

'তা পাঠাচ্ছি।' মামাবাবুর দীর্ঘ বিবরণে যেন ঘোর-লাগা অবস্থায় ক্যাপটেন বললেন, 'কিন্তু জাহাজের সব রহস্যের মীমাংসা এখনও হল না।'

'হ্যাঁ'—এতক্ষণে আমিও মি. ডিগবিকে সমর্থন করে বললাম, 'আসল রহস্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যেই জাহাজে ভূতুড়ে মহিলার আমদানি করা হয় তুমি বলছ। কিন্তু সে মহিলা তাহলে গেলেন কোথায়?'

'তিনি ওই অ্যালডাবরা দ্বীপেই গেছেন।' হাসলেন মামাবাবু, 'ওই বিল মার্ফিই মহিলা সেজে আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। রোগা পাতলা চেহারার মেয়ে সাজতে ওর কোনো অসুবিধেই হয়নি। বেরেটা খুঁজে পাওয়ার ভান করে বেশি চালাকি করতে যাওয়াই অবশ্য ওর মারাত্মক ভুল। স্টিল ও আমি তাইতেই ওর বিষয়ে সন্দিগ্ধ হই।'

আতঙ্ক আদিম

রাহুলের ব্যবহারে বেশ একটু অবাকই হচ্ছি। এই মাস পাঁচেক আগেও কী উৎসাহ আর আন্তরিকতা ভরা তার চিঠি পেয়েছি। প্রত্যেক চিঠিতেই সেই উৎসুক নিমন্ত্রণ—চলে এসো। আর দেরি কোরো না। শীত যায় যায় হয়েছে। এই সময়টা এখানে অপূর্ব। পাহাড় নদী আর অরণ্য নিয়ে এরকম একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারণ কোনো শিল্পীর কল্পনায় ছাড়া খুঁজে পাবে না।

পরের চিঠিতে আবার শুরু হয়—সময় থাকতে চলে এসো। ছোটো পাহাড়ের মাথায় আমার বাংলো বাড়িটিতে একবার এসে উঠলে আর যেতে চাইবে না। যে আদিম অকৃত্রিম প্রাকৃতিক শোভা এখানে এখন পাবে, আমি যে কাজ করছি তা সফল হলে তা লোপ পেতে আর দেরি হবে না। সুতরাং জলদি।

এরকম শুধু চিঠি নয়, চিঠির সঙ্গে তার নিজের হাতে তোলা সব ছবি। সেসব ছবি দেখলে জায়গাটায় কদিন কাটিয়ে আসবার সত্যিই লোভ হয়।

অন্যদিকের ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা সব করে মাসখানেকের জন্যে তার কাছে গিয়ে থাকব বলেই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললাম। চিঠিতেও জানিয়ে দিলাম সেকথা। কিন্তু সে চিঠির পর কী যে হল কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমত বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সে-চিঠির কোনো জবাব নেই। অনেক পরে জবাব যা এল, তাও আমার উৎসাহে ঠান্ডা জল ঢালার মতো।

এমনিতেই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত যেন দায়সারা চিঠি। তা ছাড়া আমি যে যাবার কথা জানিয়েছি সে বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই নেই। আমার চিঠিটা যে ডাকে মার যায়নি, সে যে যথাসময়ে সেটা পেয়েছে তার চিঠির তারিখ আর ভাষাতেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু আমাকে অত সাদর নিমন্ত্রণ জানাবার পর হঠাৎ তার এই বিপরীত ব্যবহারের কারণটা কী? তার কাছে আমার যাওয়া যে, সে আর একেবারেই চায় না তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন চায় না, আমার এরকমভাবে হঠাৎ অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠার মূলে কী ঘটনা থাকতে পারে?

যাই থাকুক, আমি এ ব্যাপার সম্বন্ধে নির্বিকার থাকতে পারব না। আমার সম্বন্ধে তার মনোভাবের এ পরিবর্তনের কারণ আমায় জানতেই হবে। বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত যাই হই—তার কাছে নিজের গরজেই একবার যাব বলে তাই ঠিক করলাম।

প্রথমে খবরাখবর কিছু না দিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম। সেরকমভাবে যেতে পারলে তাকে শুধু চমকেই যে দেওয়া যেত তা নয়, তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে ব্যাপারটা সোজাসুজি বোঝবারও হয়তো সুবিধে হত।

কিন্তু রাহুল যেখানে আছে, কোনো কিছু আগে থাকতে না জানিয়ে নিজের খুশি মতো সেখানে যাওয়াই সম্ভব কি না বলা শক্ত। সম্ভব যদি বা হয় তাহলেও নিজে থেকে খুঁজে সেই প্রায় অজানা পাহাড়-জঙ্গলের রাজ্যে রাহুলের আস্তানার হদিস পেতেই চুলে পাক ধরে যাবে। আমার কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে পৌঁছে সরেজমিনে রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করা দরকার।

একটা চিঠিই তাই লিখে পাঠালাম। রাহুল চৌহানের জংলা আস্তানায় চিঠি পৌঁছোতেই কম পক্ষে একটি হপ্তা লাগে তা জানি। আমার সঙ্গে তার চিঠি চালাচালি সেই হপ্তার ফাঁক ধরেই হয়। তার কাছে আমার চিঠি পৌঁছোবার তারিখটা সেই হিসেব থেকে আন্দাজ করে নিয়ে

pathagar.net

কটা দিন তার সঙ্গে আরও যোগ করে আমার রওনা হবার দিনটা তাকে সে চিঠিতে জানিয়ে দিলাম।

দিনটা জানালে ক্ষণ জানবার আর দরকার নেই। কারণ যেখান থেকে যেভাবেই রওনা হই না কেন মাঝপথে শেষ পর্যন্ত একটি ট্রেনই ধরতে হবে। সে ট্রেন সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটি বারই উত্তর থেকে দক্ষিণে যায়। দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসতেও একটি বার। টিকি টিকি সে ট্রেনে যেখানে নামতে হবে সেটি স্টেশন কি না সে বিষয়েই সন্দেহ হবে নামবার পর। ট্রেনটা যেন ভুল করে সেখানে একটু থেমে পড়েছে। করোগেটের চালের একটা কামরা আর সামান্য লাল কাঁকর-বিছানো খানিকটা জায়গা। লাল কাঁকর-বিছানো জায়গাটাকে প্ল্যাটফর্ম বলে মনে করলে করোগেটে-ছাওয়া কামরাটাকে স্টেশনের অফিস বলে ধরতে হয়। অনুমানটা যে একেবারে ভুল নয় সে কামরা থেকে বার হয়ে আসা মানুষটির মাথার টুপিটা দেখেই শুধু বোঝা যায়। গায়ে তার ফতুয়া, পরনে হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি, পায়ে রবার টায়ারের চপ্পল, কিন্তু মাথার টুপিতে রেল কোম্পানির ছাপ মারা। একটু সভ্যভব্য পোশাক চেহারার কাউকে এ স্টেশনে নামতে দেখলে তার পক্ষে রীতিমতো অবাক হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অবাক তখন আমিও। শুধু অবাক নয়, রীতিমতো উদ্বিগ্নও। এই তো স্টেশনের ছিরি। স্টেসনের একপাশ থেকে যে মেঠো রাস্তাটা গেছে সেটাও খানিকদূর গিয়ে কটা টিলার পেছনের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে বলেই মনে হয়। এদিকে-ওদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ছোটো-বড়ো একরকম সব টিলা আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

এমন জায়গায় যার ভরসায় এসে নামা, সেই রাহুল চৌহানের কোনো চিহ্নই কোথাও নেই। তাকে সময় হিসেব করে পর পর যে দুটো চিঠি দিয়েছি তাতে তার তো জিপ নিয়ে এখানে অতি অবশ্য হাজির থাকার কথা। তাহলে চিঠি সে কি পায়নি? কিন্তু পাছে এরকম কিছু গোলমাল হয় বলে একটা নয় পর পর দু-দুটো চিঠি তাকে লিখেছি। সে দুটোর একটাও তার না পাওয়া খুবই অস্বাভাবিক বলতে হবে। অন্য কোথাও যাই হোক না কেন, রাহুলের সঙ্গে আমার এতদিনের চিঠি চালাচালিতে এরকম কখনো হয়নি।

রাহুল তাহলে কি আমার চিঠি পেয়েও ইচ্ছে করে আমায় নিতে আসেনি? আমার এখানে আসা যে বর্তমানে সে চায় না, তার চিঠির ধরনে সেটা ভালো করে বোঝবার পরও আমি জেদ করে আসতে চাওয়ায় বিরক্ত হয়েই সে কি আমায় বিফল করবার এই ব্যবস্থা করেছে!

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। এতটা যখন এসেছি তখন যেমন করে হোক যত দিনে হোক রাহুলের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবই।

টুপি সম্বল স্টেশনমাস্টার আমার দিকেই আসছেন। আমার মতো যাত্রীর এরকম একটা স্টেশনে নামা সম্বন্ধে তার কৌতূহল স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কৌতূহলটুকু মিটিয়ে তাঁর কাছেই রাহুল চৌহানের জংলা ঘাঁটির সন্ধান নেব বলে ঠিক করে রেখেছি তখন। কিন্তু তার আর দরকার হল না।

বিস্ময় বা কৌতূহল কিছুই প্রকাশ না করে স্টেশনমাস্টার আমার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন এমনি হাসি মুখেআমায় অভ্যর্থনা জানালেন, আমার নামটা পর্যন্ত সঠিক উচ্চারণ করে।

তার সেই টিনের চালের স্টেশনঘরটিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলা, হিন্দিতে যা আমায় জানালেন তার মর্ম হল এই যে, রাহুল চৌহানের জন্যে আমায় ঘণ্টা দুয়েক অন্তত অপেক্ষা করতে হবে। তাকে কী বিশেষ কাজে কাছাকাছির মধ্যে একটু বড়ো বসতির আধাশহর বালাঞ্জিরে যেতে হয়েছে। আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বসিয়ে রাখবার জন্যে সে স্টেশনমাস্টারকে অনুরোধ করে গেছে।

ব্যবস্থাটা ভালো লাগল না। কিন্তু তখন তো অসহায় নিরুপায়। রাগ করে চলে যেতে চাইলেও পরের দিন সকাল দশটার আগে কোনো ট্রেন পাব না।

হাত-পা যখন এমনিভাবে বাঁধা তখন টুপি সম্বল স্টেশনমাস্টারের কাছে রাহুল চৌহান ও তার ওখানকার আস্তানা সম্বন্ধে যতটা সম্ভব খবর সংগ্রহ করে সময়টা কাজে লাগাব ঠিক করলাম।

কিন্তু সে উদ্দেশ্যও বুঝি সফল হবার নয়। স্টেশনমাস্টারমশাই এখানে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। এই স্টেশনেই মাঝে মাঝে ছোটোখাটো কাজে আসে বলে রাহুল চৌহানের সঙ্গে তার নেহাত মুখের চেনা মাত্র হয়েছে। রাহুল বহুদূরের যে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে ডেরা বেঁধেছে সে জায়গা সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানেন না। কোনোদিন তার ধারে-কাছে কোথাও তিনি জাননি। যাবার কোনোরকম বাসানাও নেই, কারণ...

কারণ...বলে স্টেশনমাস্টারমশাই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে অবাক হয়ে বললাম, 'কারণ বলে থামলেন কেন? রাহুল চৌহানের যেখানে ডেরা সেখানে আপনার যেতে না চাওয়ার কারণটা কী? কী বলতে গিয়ে হঠাৎ অমন করে থামলেন?'

স্টেশনমাস্টারমশাই ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সাবধান হয়ে গেছেন। কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'না—না—বলতে গিয়ে থামব কেন ; আসল কথা হল কারণটা বলার মতো কিছু নয়। আমি শহুরে মানুষ, নেহাত চাকরির দায়ে এই নির্বাসনে পড়ে আছি। অজানা পাহাড়-জঙ্গলে ঘোরার আমার কোনো সখ নেই, সেই কথাই বলছিলাম।'

এতক্ষণে মনে হল রাহুলের জন্যে বাধ্য হয়ে এই হতভাগা স্টেশনে অপেক্ষা করাটা পুরোপুরি লোকসান বোধ হয় নয়। স্টেশনমাস্টারমশাইকে চেপে ধরে আমি বললাম, 'না না মিছিমিছি কথা চাপবার চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনি যা বলতে যাচ্ছিলেন সেটা অন্য কিছু। সেটা আমার কাছে বলতে আপত্তি করছেন কেন? বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা যখন আমার বন্ধুর সঙ্গে জড়ানো তখন আমার তা জানা উচিত নয় কি?'

স্টেশনমাস্টারমশাই খানিকক্ষণ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইলেন, তারপর মুখখানা বেশ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'দেখুন সত্যি আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা আমার শোনা কথা মাত্র। ওরকম শোনা কথা আমার বলা উচিত নয় বলেই বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম।'

'শোনা কথাটা তবু বলুনই না'— 'আমি এবার নাছোড়বান্দা। স্টেশনমাস্টারকে শোনা কথাটা এবার বলতেই হল। সত্যি বলতে গেলে স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের শোনা কথাগুলো এমন কিছু অদ্ভুত আজগুবি নয়। দূর দুর্গম কোনো কোনো জায়গা সম্বন্ধে ওরকম গুজব শোনাই যায়। রাহুল চৌহানের যেখানে আস্তানা সে অঞ্চলটা নাকি প্রায় অজানা এক জংলি আদিবাসীদের রাজত্ব। বিশেষ কিছু তাদের সম্বন্ধে জানা না গেলেও এদিকের সাধারণ গাঁয়ের লোকের কাছে সেই জংলীদের একটা দারুণ বদনাম আছে। নিজেদের জাতের লোক ছাড়া বাইরের কেউ সেখানে গেলে তারা প্রাণে মারে না। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর ক্ষতি করে। তারা তাদের গুনিন ওঝাদের মন্তরে, কি কোনোরকম গাছগাছড়ার রস খাইয়ে বাইরের লোকের স্মৃতি নষ্ট করে, সে কে, কোথাকার কী বৃত্তান্ত সব একেবারে ভুলিয়ে দেয়। ও অঞ্চলে গিয়ে কিছুদিন থাকবার পর কেউ তাই আর কখনো ফেরে না। শুধু এদেশি মানুষ নয় ; ওখানে যারা গেছে তাদের মধ্যে সাহেব-সুবোদেরও নাকি ওই পরিণাম হয়েছে। কিছুদিন বাদে তাদের আর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। তারা যেন নিঃশব্দে কোথায় হারিয়ে গেছে।

স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের মুখে তার শোনা কিংবদন্তি শুনতে শুনতে মনে মনে হেসেছি বললে মিথ্যে বলা হবে। যত আজগুবিই হোক, এসব গুজবের মূল কী, তাই বোঝবার চেষ্টা করেছি একটু।

রাহুল তার ডেরা এখন যেখানে পেতেছে চোখে এখনও না দেখলেও সে জায়গাটার কিছু বৃত্তান্ত আমি জানি। ওখানে কাজ নিয়ে যাবায় সময় নিজেই আমায় জানিয়েছিল।

যেকোনো রকমের লোকালয় থেকে বহুদূর দুর্গম এই পাহাড়-জঙ্গলের এলোকাটা ভালো করে জরিপই এ পর্যন্ত হয়নি। জায়গাটা তাই বেশিরভাগই অজানা। সেখানে যে জংলি আদিবাসীরা থাকে তাদের সম্বন্ধেও উড়ো কিছু খবর ছাড়া সঠিক কোনো বিবরণও সভ্যজগতের কারো জানা নেই। উড়ো খবরগুলোর মধ্যেও কোনো মিল নেই। একটা কিংবদন্তি এই যে, জংলি হলেও তারা একেবারে অসভ্য বর্বর নয়। তাদের নিজেদের একধরনের সমাজ, ধর্ম-টর্ম আছে। তারা শুধু বাইরের মানুষজনকে কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না, নিজেদের এলাকায় একেবারে আলাদা থাকতে চায়। সেই জন্যেই দু-একজন যে সাহসী ও উৎসাহী টহলদার ও অঞ্চলে গেছেন তারা তাদের কোনো সঠিক খোঁজখবর পাননি।

তাদের সম্বন্ধে অন্য গুজবটা হল এই যে, তাদের এমনিতে সরল নিরীহ জংলি মনে হলেও তারা নাকি আসলে দারুন কপট শয়তান। বাইরের কেউ ও অঞ্চলে গেলে সামনাসামনি কোনো শত্রুতা না করে চুরিচামারি থেকে হরেক শয়তানির প্যাঁচে জীবন অতিষ্ঠ করে তাকে মুল্লুক ছাড়া করে।

এ দুটো কিংবদন্তির মধ্যে প্রথমটার মধ্যেই কিছু সত্য আছে মনে হয়। তা না হলে রাহুল এতদিন সেখানে গিয়ে আছে কী করে? শুধু তাই নয় এই সেদিন পর্যন্ত সে জায়গাটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে এতটুকু বেয়াড়া কিছুর আভাস তো দেয়নি।

রাহুলকে অবশ্য বেশ সাহস করেই ওখানে যেতে হয়েছে। তার আগে দু-একজন সাহেব নিজেদের জেদে ওই অজানা প্রায় অনধিগম্য পাহাড়-জঙ্গলে বিরল ও দামি খনিজের খোঁজে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ওখানে কিছু একটার সন্ধান পেয়ে ওখানে স্থায়ীভাবে কাজ করবার জন্যে একটা ছোটোখাটো পাকা আস্তানাও বানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কী কারণে বলা যায় না কাজ করা তাঁর আর হয়নি। নিজের আবিষ্কারটার ওপর বড়ো একটা পরিকল্পনাকে রূপ দেবার মূলধন জোগাড় করতেই বোধ হয় তিনি নিজের দেশ, পোল্যান্ডে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই সময়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগে বলেই হয়তো তিনি ভারতে আর ফিরে আসেননি।

লোকটা জাতে পোলিশ ছিলেন। পোল্যান্ডে থাকার সময় সেখানকার একটি প্রায় অজানা পুরোনো কাগজে সেই পোলিশ লোকটির লেখা একটি বিবরণ দৈবাৎ রাহুলের চোখে পড়ে।

সেটি পড়েই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে দেশে ফিরে রাহুল চৌহান ওই গহন দুর্গম অঞ্চলে অজানা খনির সন্ধানে যায়। সেই সময়েই সেই পোলিশ ভদ্রলোকের বেওয়ারিশ ডেরাটিই সে দখল করে নিজের ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু সেখানে এতদিন পরমানন্দে কাজ করবার পর হঠাৎ তার এরকম অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন কেন?

কেন তা না বুঝলেও পরিবর্তন যে কতখানি হয়েছে রাহুল চৌহান তার জিপ নিয়ে ঘণ্টা চারেক বাদে আমায় তুলতে আসার পর ভালো করে স্বচক্ষে দেখলাম।

জোয়ান, সুঠাম লম্বা-চওড়া চোহারাটা শুধু রোগা হয়ে শুকিয়েই যায়নি, কেমন যেন কুঁকড়ে গেছে।

আমায় দেখে একটু অভ্যর্থনার যে হাসিটুকু মুখে ফোটাবার চেষ্টা করল তাও যেন রুগ্ন ফ্যাকাশে।

জিপ চালাচ্ছে সে নিজেই। আমার সামান্য লাগেজ জিপের পেছনের দিকে তুলে তার পাশে এসে বসলাম। মাল তোলবার সময় সেখানে কটা জিনিস দেখে একটু অদ্ভুত লাগল। একটা তামার পাত্রে জবা ফুল বেলপাতা ইত্যাদি একটি সিঁদুর-মাখানো কলার পাতা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। কলাপাতার ওপর কালো পাথরের একটা খুদে মূর্তি চাপানো। মূর্তিটি কীসের অবশ্য

pathagar.net

বুঝতে পারিনি, কিন্তু রাহুলের জিপে এসব জিনিস দেখেই অবাক হয়েছি। রাহুল কি এই পুজো-টুজো দিতেই আমায় এই স্টেশনে অপেক্ষা করিয়ে রেখে কাছের বালাঙ্গিরে গিয়েছিল। এ কী এমন দরকারি পুজো? তার যে পুজোই হোক, এসব দিকে কোনো উৎসাহ তো কোনোদিন রাহুলের ছিল না! আস্ফালন করা নাস্তিকতা তার মধ্যে কখনো দেখিনি, কিন্তু আনুষ্ঠানিক পুজো-আচ্চার প্রতি তাকে বরাবর একটু বিরূপ বলেই মনে হয়েছে। এই বিদেশ বিভুঁয়ে এসে সে হঠাৎ এমন বদলে গেল কী করে, সত্যি বুঝে উঠতে পারলাম না।

বুঝে উঠতে তখন আরও কিছু পারছি না। জিপে উঠে বসবার পর কিছুটা ভালো রাস্তা দিয়ে আমরা তখন প্রায় এক ঘণ্টার পথ এসেছি। আগেকার দিন হলে রাহুলের এতক্ষণ নিজের কথা বলে আর আমার কথা জিজ্ঞেস করে এক মুহূর্ত মুখের কামাই যেত না, কিন্তু এবার এতখানি পথের মধ্যে গোনাগুনতি কটি কথা বলা ছাড়া সে মুখই খোলেনি বলা যায়।

জিপে তার পাসে গিয়ে বসবার পর স্টার্ট দিয়ে কিছুদূর গাড়ি চালাবার পর একবার বলেছিল বেশ সংকুচিতভাবে, 'তোমার খুব কষ্ট হবে আমার ওখানে।'

'কেন কষ্ট কীসের?'—আমায় গোড়ায় অত উৎসাহ করে ডাকাডাকির পর এ ধরনের কথায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই আমি বলেছিলাম—'তুমি নিজেই যেখানে আছ আমি থাকতে পারি না!'

'না, না আমার কথা আলাদা—' রাহুল কৈফিয়ত দিতে গিয়ে একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছিল। আমার মানে...আমার এখানে কাজের জন্যে থাকতে হয় আর তোমার...' এই পর্যন্ত বলে যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে রাহুল। পথের ওপর একটা ঝড়ে পড়ে যাওয়া বড়ো গাছের গুঁড়ির পাশ কাটাতে হঠাৎ তাকে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে যে কসরত করতে হয়েছে তাইতেই কথাটা ওখানেই কেটে দিতে পেরে সে যেন বেঁচেছে।

অনেক কথাই তখন বলতে পারতাম। মনে করিয়ে দিতে পারতাম যে, আমি একেবারে জোর করে নিজের খেয়ালে তার অতিথি হতে আসিনি। নিজের ডেরা সম্বন্ধে তার উচ্ছ্বাস আর বার বার সেখানে যাবার সাদর নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছি মাত্র। সেসব কিছু বলে তাকে লজ্জায় না ফেলে শুধু তখন বলেছিলাম, 'এসেই যখন পড়েছি তখন যা কষ্ট করবার করব। জায়গাটা তবু দেখা হবে।'

এর উত্তরে তখন রাহুল কিছুই আর বলেনি। তারপর আরও ঘণ্টাখানেক বাদে খোলা মাঠ আর পাথুরে টিবির প্রান্তর পেছনে ফেলে বিস্তীর্ণ ও ঘন এক শালবনে ঢোকবার সময় সে হঠাৎ যেন অপরাধ স্বীকারের মতো বলেছিল, 'তোমায় আগে থাকতে একটা কথা বলা উচিত মনে হচ্ছে। আমার অন্যান্য লোকজন সব আমায় ছেড়ে গেছে।'

'লোকজন সব ছেড়ে গেছে!' এবার আমি সত্যিই বিচলিত বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম, 'তুমি সেখানে একলা আছ এখন?'

'হলফ করে বলতে গেলে একেবারে একলা নয়। বলতে হয়—' রাহুল যেন নিজের মনে চাপা বিষণ্ণ গলায় বলে গেছে—'কারণ লোকজনদের মধ্যে অতিবৃদ্ধ একজন তখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকলের সঙ্গে চলে যেতে পারেনি। এখন আমার ওখানেই শয্যাশায়ী হয়ে আছে। আর আছে ওখানকার জংলিরা যারা কোথায় কখন আছে কখন নেই তার উদ্দেশ করেও পাবার নয়।'

এসব কথা শুনতে শুনতে এতক্ষণে সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। রাহুলের লোকজন হঠাৎ চলে যাওয়ার ঘটনাটা একটা গুরুতর কিছুর স্পষ্ট আভাস দিচ্ছে। সেটা কী হতে পারে?

রাহুলকে সোজাসুজি সেভাবেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমার লোকজনের হঠাৎ এমন ছেড়ে চলে যাবার কারণটা কী?'

pathagar.net

'—কারণটা কী?' অন্যমনস্কভাবে আমার প্রশ্নটাই আবার আউড়ে রাহুল অনেকক্ষণ নীরবে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে বলেছিল '—কারণটা নিজেই তুমি গিয়ে দেখে শুনে বুঝবে, চলো। আমার দিক থেকে যা জানাবার সবই ওখানে জানাব।'

মাঝপথে একটা ছোটো পাহাড়ি নদীর পাড়ে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন রাহুল চৌহানের ডেরায় যখন পৌঁছোলাম তখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলেছে।

জায়গাটা কিন্তু যা দেখলাম সত্যিই গদগদ হয়ে উচ্ছ্বাস করবার মতো। ঘন জঙ্গল ছাড়িয়ে এসে সেটা অনেক খোলামেলা ছোটো ছোটো টিলা পাহাড়ের এলাকা। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিচু যে টিলাটি তার ওপর রাহুলের ডেরা, টিলাটিকে পাক-দেওয়া একটি পাহাড়ি নদী, এখানে-সেখানে ছড়ানো কিছু শাল-শিমুলের বন আর জমকালো চেহারার উঁচু পাহাড়ের ওপরে একেবারে দিগন্ত বিস্তৃত দুর্ভেদ্য বন নিয়ে জায়গাটা যেন কোনো অসামান্য শিল্পীর ছবি থেকে কেটে এনে ওখানে বসানো হয়েছে।

জিপ থেকে নামতে নামতে চারিদিকে চেয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বললাম, 'এমন জায়গা কেউ সাধ করে ছেড়ে যায়? তোমার লোকজনেরা কি অন্ধ, না তুমি তাদের মাইনে না দিয়ে না খাইয়ে রাখতে?'

রাহুল বিষণ্নভাবে একটু হেসে জিপের পেছন থেকে আমার সুটকেস আর হোল্ডঅলটা নামাতে যাবার সময় মৃদুস্বরে বলল, 'এখানে আমি যা খাই তারাও তাই খেত। আর এতদূর জঙ্গলের দেশে এসে থাকার জন্যে মাইনে যা পেত তা ওদের ন্যায্য মজুরির অন্তত তিনগুণ।'

'তাহলে—!' বলে অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম।

রাহুল কোনো জবাব এবার দিল না, সে সুটকেসটা নামিয়ে হোল্ডঅলটা তুলছে। তার হাত থেকে হোল্ডঅলটা টেনে নিতে গিয়ে ভেতরের আমার পাত্রে কলাপাতা মোড়া পুজোর ফুল বিল্বপত্রের তোড়াটা চোখে পড়ল। বিশেষ করে কলাপাতার মোড়কের ওপর চাপানো সেই খেলনার মতো পাথরে খুদে মূর্তিটা।

আমার দৃষ্টিটা কোনদিকে তা লক্ষ করে রাহুল বলল, 'ওই খোদাই করা নুড়িটা দেখছ, এ অঞ্চলে ওরকম খেলনার নুড়ি অনেক মন্দির-টন্দিরের কাছে বিক্রি হয়।'

হাত বাড়িয়ে নুড়িটা তুলে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেখে আরও অবাক হলাম।

আনাড়ি হাতের ধাবড়া খোদাইয়ে নুড়িটায় স্পষ্ট কোনো রূপ ফুটে ওঠেনি। কিন্তু যেটুকু তাতে দেখা যাচ্ছে তাই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। খানিকটা যেন পেটমোটা একটা গিরগিটির চেহারা। মুণ্ডুটা কিন্তু গোল আর ঠেলা ঠেলা দু-চোখের আভাস নিয়ে মানুষের মতো ভাবা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য এ খেলনার মূর্তির পেছনের শিরদাঁড়া থেকে ওঠা একটা যেন খাঁজ কাটা ডানার মতো কুঁজ।

'এ তো বড়ো অদ্ভুত নুড়ি,' রাহুলের দিকে ফিরে বললাম—'এরকম খেলনার নুড়ি তো আর কোথাও দেখিনি। এখানকার খেলনার কারিগরদের মাথায় এরকম মূর্তি বানাবার কল্পনা আসাই তো আশ্চর্য ব্যাপার।'

'খেলনার নুড়িগুলো এ অঞ্চলে সাধারণ দেশি কারিগরদের তৈরি নয়।'—পুজোর নৈবেদ্যটার সঙ্গে আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে তার বাংলোর দিকে আমায় এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আগের মতোই বিষণ্নস্বরে রাহুল বলল, 'এখানকার ঘোর অরণ্যের প্রায় অজানা জংলিরা মাঝে মাঝে কাঠের বোঝা, বুনো গাছের রঞ্জনের মতো জমাট আঠা, জংলি মধু, হরিনের শিং আর কিছু জন্তু-জানোয়ারের ছালের সঙ্গে খেলনার নুড়ি এ দেশিদের গাঁয়ের হাটে টাটে বিক্রি করে যায়। নুড়িগুলো তারপর এদিকে-ওদিকে চালু হয় সেখান থেকেই।

pathagar.net

'তা না হয় বুঝলাম,' আমি আমার মূল জিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে বললাম, 'কিন্তু জংলিদের পক্ষেও এরকম নুড়ি খোদাই তো খুবই অদ্ভুত।'

'তা বলতে পার—' শুধু বিষণ্ণ নয়, সেই সঙ্গে কেন যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় রাহুল বলল, 'তবে জংলিদের এরকম কল্পনার মূল কোথায় কালই তোমায় দেখাতে নিয়ে যাব, যদি...'

রাহুল হঠাৎ অমন করে থেমে যাওয়ায় বেশ উদ্বিগ্ন অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি কী?'

'যদি কাল যাবার মতো অবস্থা আমাদের থাকে।' কথাগুলো বলার সময় রাহুলের গলা কি একটু কাঁপল, না সেটা আমার শোনার ভুল!

শুধু তার বক্তব্যটাই অবশ্য একেবারে রহস্যময় দুর্বোধ্য।

সেইটেই স্পষ্ট করবার জন্যে তাই বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'একথার মানে! আমাদের কোথাও যাবার অবস্থাই থাকবে না, এমন কী সম্ভাবনার কথা ভেবে তুমি ভয় পাচ্ছ?' তখনকার মতো কোনো জবাব কিন্তু রাহুলের কাছে পাওয়া গেল না।

'এখন থাক। এ বেলার মতো একটু বিশ্রাম করে নাও। এসেছ যখন, তখন সবই পরপর বলব—' বলে রাহুল তার সহায়হীন আস্তানায় আমার জন্যে যতটুকু সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে গেল। কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কী হবে? খোদ ইন্দ্রপুরীর বিলাসেও তখন আর আমার রুচি নেই। কী অশুভ রহস্য রাহুলের জীবনে হঠাৎ এমন কালো ছায়া ফেলেছে তা বোঝবার চেষ্টায় রাহুলের বাংলোবাড়ি আর তার ছবির মতো পরিবেশ আমার কাছে তখন বিষ হয়ে গিয়েছে।

রাহুল রাতে আমায় যা কিছু জানাবার জানাবে বলেছিল। অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আমায় হল না। তার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে রহস্যের কিছুটা অন্তত আভাস আমি পেয়ে গেলাম।

চাকরবাকর সহায়-টহায় কেউ নেই। আমার খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রামে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে রাহুল তখন তার নিজস্ব অন্য ধান্দায় কিছুক্ষণের জন্যে বাংলোবাড়ির বাইরে কোথায় গেছে।

রাহুলের কামরাতেই আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিছানায় শুয়েও কিন্তু আমি বিশ্রাম করতে পারিনি। খানিক বাদেই উঠে পড়ে একা একাই বাংলোবাড়ি আর তার আশপাশটা একটু ঘুরে দেখতে বেরিয়েছি। একটা দূরবিন কলকাতা থেকেই সঙ্গে করে এনেছিলাম। বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে সেটা চোখে দিয়ে নীচের পাহাড়ি নদীটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রথমেই অবাক হতে হয়েছে। রাহুল একা একা সে নদী পার হয়ে কোথায় যাচ্ছে? দূরের ওই বড়ো একটা পাহাড়ের দিকেই তো যাচ্ছে মনে হচ্ছে। কেন?

তাকে ওদিকে যেতে দেখার চেয়ে দূরবিনে তার হাতের জিনিসটা দেখে বেশি অবাক হয়েছি। এ তো তামার পাত্রে রাখা সেই পুজোর ফুলপাতার মোড়ক ; এ জিনিস নিয়ে ওদিকে যাবার মানে কী?

দূরবিনেও দেখতে ভুল হয়েছে কি না জানবার জন্যে কিচেন আর ভাঁড়ারের দিকের যে অংশে একটি তাকের ওপর পুজোর নৈবেদ্যগুলো রাখা ছিল সে জায়গাটা একবার পরীক্ষা করে নেবার জন্যে বাংলোর ভিতরে গেলাম।

ভেতরে পা দেবার পরই হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। রান্না আর ভাঁড়ারের দিকের করিডরেই কাকে যেন যেতে দেখলাম। বাইরের দরজা থেকে ওদিকের যতটুকু চোখে পড়ে তাতে কাউকে এক মুহূর্তে বেশি অবশ্য দেখিনি। তবে যেটুকু দেখেছি তাতে কেউ যে ওখান দিয়ে গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

pathagar.net

কিন্তু তা তো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! এ বাংলোর তিনজন বাসিন্দার মধ্যে রাহুল দূরে নদীর ওপারে। বাংলোতে আমি ছাড়া আর যে আছে সে তো রাহুলের গুরুতরভাবে অসুস্থ চাকর গৌরা। সে তো তার বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। তাহলে এ বাড়ি অরক্ষিত জেনে আর কে এখানে এসে ঢুকেছে? কী তার মতলব?'

পায়ের জুতোজোড়া খুলে ফেলে খুব সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে কিচেনের দিকের করিডর পর্যন্ত যাবার পরই লোকটাকে দেখতে পেলাম। রান্নাঘরের নিজস্ব ছোটো দরজা খুলে সে সেখানে দাঁড়িয়ে অতি নিবিষ্ট মনে বাইরে কী যেন দেখছে।

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমার অনিচ্ছাকৃত সামান্য একটু নড়াচড়ার শব্দে সজাগ হয়ে পেছনে ফিরতেই তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একী! এ তো রাহুলের শয্যাশায়ী চাকর গৌরা! আমি তাকে দেখে যতটা অবাক গৌরা আমায় দেখে তার চেয়ে অনেক বেশি চমকিত আর ভীত।

দু-এক সেকেন্ড দ্বিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সে হঠাৎ আমার পায়ের কাছে হাত জোড় করে বসে পড়ে তার অদ্ভুত ভাঙা হিন্দিতে মিনতি জানাল, 'দোহাই হুজুর, আপনার পা ধরছি। আমার সাহেবকে একথা কিছু জানাবেন না।'

'কেন জানাব না,' আমি তখন বেশ সন্দিগ্ধ আর গরম হয়ে উঠেছি—তোমার নাকি এমন অবস্থা যে বিছানা ছেড়ে তুমি উঠতে পারনা।—অসুখে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছ বলে তোমার দলের লোকের সঙ্গে তুমি চলে যেতে পারনি। সেসব তাহলে এখানে থেকে যাবার মিথ্যে ছুতো? কী জন্যে তুমি এখানে আছ? কী দেখছিলে এখন দরজায় দাঁড়িয়ে?'

'সাহেবকে দেখছিলাম হুজুর—' অপরাধীর মতো বলল গৌরা।

'সাহেবকে দেখছিলে!' তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে বললাম, 'সাহেবকে দেখার অত গরজ কেন? তিনি কতদূর গেছেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এ বাংলোবাড়ি সাফ করে পালাবার জন্যে?'

'না হুজুর—' এবার গৌরার গলাটা আর অপরাধীর মতো সংকুচিত নয়, 'চুরি করতে চাইলে অনেক আগেই তা করতে পারতাম। এই যে সাহেব আপনাকে আনতে আর পুজো দিতে বালাঞ্জির গিয়েছিলেন তখন কদিন তো সমস্ত বাংলোয় আমি একাই ছিলাম।'

গৌরার যুক্তিটা বেঠিক নয়। তবু মেজাজটা কড়া রেখেই জানতে চাইলাম, 'তাহলে অসুখে পঙ্গু সেজে তোমার সাহেবকে ঠকাচ্ছ কেন? এখনই বা কী দেখছিলে সাহেবের?'

'কোনো কুমতলবে আমার সাহেবকে ঠকাইনি হুজুর।' গৌরা এবার শান্ত স্বরে বলল, 'তাঁকে বাঁচাবার জন্যেই নিজে ইচ্ছে করে এখানে থেকে গেছি আর সেই থাকার উদ্দেশ্যটা প্রথমে উনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না বলেই মিছিমিছি পঙ্গু সেজে তাঁর কাছে এখানে থেকে যাওয়ার অজুহাত বানাতে হয়েছে।'

গৌরার গলার সরলতার সুরটা তখন আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। তবু সমস্ত ব্যাপারটার রহস্য কিছুটা বোঝবার আশায় তাকে কঠিন স্বরেই বলেছি, 'সাহেবকে কী থেকে বাঁচাবার জন্যে এখানে মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পড়ে আছ?'

দ্বিধাভরে চুপ করে থাকার পর গৌরা ধীরে ধীরে বলল, 'সাহেবকে দেবতার কোপ থেকে বাঁচাবার জন্যেই এখানে এমন মিথ্যে ছুতোয় থেকে গেছি হুজুর।'

'দেবতার কোপ—?' আমি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বিদ্রূপের স্বরে বললাম, 'দেবতাটি কে? আর তার অত নেক নজরে পড়বার মতো রাহুল করেছে কী?'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গৌরা কাতর মুখে জানাল, 'এ বড়ো ভয়ংকর দেবতা হুজুর। এই পাহাড়-জঙ্গল আকাশ-বাতাস সব কিছু সেই বানিয়েছে। আমাদের সাহেব এই দেবতার বড়ো অপমান করেছে। দেবতা তাই জেগে উঠেছে শাস্তি দেবার জন্যে। এখন একটু রাগ দেখিয়ে

শাসাচ্ছে মাত্র। কিন্তু দেবতাকে তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট না করতে পারলে সব একেবারে ছারখার করে দেবে। এমন দিয়েছেও অনেকবার।'

গৌরার কথা শুনতে শুনতে দেবতা সম্বন্ধে তার কুসংস্কার কীরকম বদ্ধমূল তা বুঝতে পারছিলাম। তার মধ্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার কথাতে একটা ব্যাপার মনে পড়ায় গৌরাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার কথা কী বলছ? কেমন করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করবে? কাল তোমার সাহেব আমায় নিয়ে আসবার সময় যে পুজোর নৈবিদ্যি সঙ্গে এনেছিল সে কি এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার পুজোয়?'

'হ্যাঁ হুজুর',—গৌরা জানাল, 'আমিই সাহেবকে বালাজ্ঞির থেকে পুজো দিয়ে এই নৈবিদ্যি আনতে বলেছিলাম। আজ উনি সেই পুজোর নৈবিদ্যি দেবতার কাছে দিতে গেছেন বলে এখন দরজা থেকে ওঁকে লক্ষ করছিলাম।'

'দেবতাকে তুষ্ট করতে তুমি পুজো দিতে বলেছ, আর তোমার সাহেব তাতে রাজি হয়ে সে পুজো দিয়ে এসে তার নৈবিদ্যি দেবতার কাছে পৌঁছে দিতে গেছে! এসব ব্যাপারে যে একেবারে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ছিল সেই রাহুলের এ পরিবর্তনে বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বিধান দেওয়া এ পুজোয় দেবতা সন্তুষ্ট হবেন?'

'জানি না হুজুর,' গৌরা স্বীকার করল, 'তবে পাপ যা হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে এ ছাড়া আর কী এখন করবার কথা ভাবতে পারি।'

'পাপ!' একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললাম, 'পাপ মানে তো দেবতার অপমান—তা সে অপমানটা কী করে তোমার সাহেব করল বলো তো?'

'সে আপনি সাহেবের কাছে তাঁর নিজের মুখেই শুনবেন হুজুর—' বলে অনুরোধ করে সেই সঙ্গে গৌরা আর একবার তার কাতর মিনতি জানাল, 'আমার কথা সাহেবকে কিছু বলবেন না হুজুর। আমি যে অসুখের ছলে এখানে পড়ে আছি তাও যেন তিনি জানতে না পারেন।'

'বেশ তাঁকে এসব কিছু জানাব না,' গৌরাকে আশ্বাস দিয়েও একটু কঠিন স্বরে তারপর জানতে চাইলাম... 'কিন্তু তুমিও ভাড়া করে আনা বাইরের লোক। এখানকার এ দেবতার কথা এত জানলে কী করে? আর তোমার সাহেবকে বাঁচাবার জন্য এত আগ্রহ আর প্রভুভক্তি কোথা থেকে হল?'

'তাহলে আসল কথাটাই বলছি হুজুর শুনুন,' গৌরা অকপটে এবার জানাল, 'সাহেবের ওপর আমার ভক্তি সত্যিই যথেষ্ট আছে, কিন্তু শুধু তাঁকে বাঁচবার জন্যেই আমি এত ব্যস্ত হইনি। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই সমস্ত মুল্লুকটারও দারুণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে বলে আমার ধারণা। খাঁড়া কুঁজের দেবতাকে—'

'কী দেবতা,' গৌরাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'খাঁড়া কুঁজের দেবতা বললে না?'

'হ্যাঁ হুজুর,' গৌরা ব্যাখ্যা করল, 'এ দেবতার মূর্তি বড়ো অদ্ভুত ভয়ংকর। পিঠের শিরদাঁড়ার ওপর অনেকটা খাঁড়ার মতো শক্ত হাড়ের একটা কুঁজ বসানো। দেখতে যেমন ভীষণ-স্বভাবেও তেমনি নিষ্ঠুর নির্মম। অপরাধ যা হয়েছে যেমন করে হোক তার ক্ষমা যদি না পাওয়া যায় তাহলে এর আগেও যেমন হয়েছে এ ভয়ংকর দেবতার কোপে, তেমনি শুধু আমাদের সাহেবের নয়, এই মাঠ, জঙ্গল-পাহাড় আর পাহাড়ি জংলিদের নিয়ে আর সবাই শেষ হয়ে যাবে, আমি জানি। একথা আমি জানি এই জন্যে যে, আমি ভাড়া করে আনা বাইরের লোক নই। এখানকার অজানা জংলিদের ঘরেই আমার জন্ম। ছেলেবেলাতেই আমার মা মারা যায়, তারপর আমার বাবা কী অন্যায় করার দরুন নিজের জংলি দলেরই কোপে পড়ে শাস্তি এড়াবার জন্যে আমায় নিয়ে দেশিদের মুল্লুকেই পালিয়ে যায়। জঙ্গল ছেড়ে এসে বাবা কিন্তু বেশিদিন বাঁচেনি। মরবার আগে আমায় শুধু জংলিদের সব বৃত্তান্ত সে শুনিয়ে শিখিয়ে গিয়েছিল। বিভুঁয়ে দেশিদের কাছে মানুষ

pathagar.net

হয়েও আমি তাই এই জংলা মুলুকের কথা ভুলতে পারিনি। তারই টানে এখানে ফিরে এসে এখন আরও আটকে গেছি এখানকার দেবতার কোপে কী সর্বনাশ যে হতে পারে সেকথা ভেবে।'

গৌরাকে অবিশ্বাস না করলেও ভ্রান্ত সব কুসংস্কারে ভরা তার ধারণা আর কাহিনি থেকে আসল রহস্যটা যে কী তার হদিশ পেলাম না সেই রাত্রে রাহুলের সঙ্গে আলোচনা করেও। রাহুল সেদিন বিকেল হবার পরই ফিরে এসেছিল। অত্যন্ত গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে। ইচ্ছে করেই তখন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। অপেক্ষা করেছিলাম রাত্রে তাকে আর একটু স্বচ্ছন্দ অবস্থায় পাব এই আশায়। স্বচ্ছন্দ অবস্থায় তাকে অবশ্য পাইনি। সন্ধে হতে না হতেই বাংলোবাড়ির জানলা এমনকী নালা-নর্দমার ফোকর পর্যন্ত সম্পূর্ণ এঁটে বন্ধ করে বাড়িটাকে যেন নিরেট একটা কৌটো বানাবার চেষ্টা দেখলাম রাহুলের। সারাদিন সব কিছু খোলা থাকার পর রাত্রে এই সাবধানতার বাড়াবাড়িতে রীতিমতো অবাকই হলাম।

কারণটা জিজ্ঞাসা করতে হল না। রাহুল নিজে থেকেই বলল, 'দিনের বেলা কিছু হয় না, যা কিছু আক্রোশ দেখা যায় সব রাত্রে। ভয় সব চেয়ে বেশি মাঝরাত্রের দিকে। আক্রোশটার প্রকাশ কীরকম তা মাঝরাত্রের দিকে নিজেই টের পেলাম। তার আগে একটু সুযোগ পেয়ে রাহুলকে কোন দেবতাকে কী অপমান করে সে পাপী হয়েছে তা জিজ্ঞেস করে খুব লাভ হয়নি।

'কাল সকাল হলে তোমায় নিয়ে সামনাসামনি সব দেখাবার আর বোঝাবার চেষ্টা করব,' রাহুল যেন অবসন্ন ভাবে বলেছে, 'অবশ্য সকাল যদি আমাদের হয়।'

এ নিয়ে আর কিছু বলিনি, কিন্তু মনে মনে তাকে এরকম যুক্তিহীন কুসংস্কারের শিকার হতে দেখে দুঃখ আর লজ্জা দুই বোধ করেছি তার জন্যে। যতটুকু এ পর্যন্ত জেনেছি তাতে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে দেবতার কোপের প্রকাশটা কীরকম তা বোঝা আমার পক্ষে খুবই শক্ত হয়েছে।

দেবতার কোপ কি শুধু রাত্তির বেলাই প্রকাশ পায়? আর সে কোপ দরজা-জানলা বন্ধ করে ঠেকাবার চেষ্টা করতে হয় কেন?

কোপের প্রকাশটা যে সত্যিই লোমহর্ষক, মাঝরাত্রের পর তা অবশ্য কম্পিত বুকে নিজের কাছে স্বীকার করতে হয়েছে।

পোলিশ যে খনিজ সন্ধানী এই ডেরাটা বানিয়েছিলেন তাঁর সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য ছিল বাড়িটিকে ক্ষুদ্র দুর্গের মতো মজবুত, আর দুর্ভেদ্য করতে। দেওয়াল ছাদ ইত্যাদির পাথরের গাঁথনি, যতখানি শক্ত করা সম্ভব তা তো করেছিলেনই—বাছাই করা মোটা সেগুনের তক্তার জানলা-দরজাও যা লাগিয়েছিলেন তা লোহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

মাঝরাত্রে চারিধার যখন একেবারে নিশুতি তখন একবার এদিকে একবার ওদিকে এইসব দরজা এমন ধাক্কা আর ঠেলায় কেঁপে উঠেছে যে মনে হয়েছে দেশলাই-এর খোলের মতো তা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই।

দরজা শেষ পর্যন্ত ভাঙেনি। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টাটাক সময় নিদারুণ আতঙ্কের কী অসাড় আচ্ছন্নতার মধ্যে যে আমাদের কেটেছে তা বলতে পারব না।

অবিশ্বাস্য ঠেলা আর ধাক্কা তো শুধু এক দরজায় নয়, কখনো এদিকে কখনো ওদিকে কখনো আবার একসঙ্গে দু-দিকেই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

এই কি দেবতার কোপ? যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে সে ধারণা উড়িয়ে দিতে চাইলেও ব্যাখ্যা কি কিছু পাচ্ছি? এমন প্রচণ্ড ঠেলা কীসে দিতে পারে? এরকম শক্তি একমাত্র হাতি আর গণ্ডারের থাকা সম্ভব। এ জঙ্গলে হাতি বা গণ্ডার আছে কি না জানি না। কিন্তু থাকলেও হাতি বা গণ্ডার কি কখনো জোট বেঁধে গভীর রাত্রে মানুষের বসতির পাকাবাড়ির দরজা ভাঙতে আসে!

আশ্চর্যের কথা এই যে আধঘণ্টাটাক এই নিদারুণ উদ্বেগের পর আবার সব একেবারে শান্ত।

pathagar.net

দরজা না হলেও একটা-দুটো জানলা খুলে আমি টর্চ দিয়ে বাইরেটা একটু দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু রাহুল কিছুতেই তাতে মত দিল না।

পরের দিন সকাল হবার পর আবার চারিধারে সেই ছবির মতো মনোরম দৃশ্য। চুরমার করে ভাঙা আর ওলটানো কটা পামজাতীয় গাছের কাঠের টব ছাড়া কালকের রাতের দুঃস্বপ্নের আর কোনো চিহ্নই নেই।

একটু বেলা হতেই রাহুলের সঙ্গে তার অপমানিত দেবতা আর তার পাপের প্রমাণ দেখতে গেলাম। টিলা থেকে নেমে ছোটো পাহাড়ি নদী পেরিয়ে ঝোপজঙ্গলের পথে কিছুদূর যাবার পর বড়ো জঙ্গল যেখানে শুরু হয়েছে সেইখানেই খাড়া একটা পাহাড়ের গায়েই সেই অদ্ভুত দেবস্থান। দেবস্থান বলতে মন্দির-টন্দির কিছু নয়, খাড়া পাহাড়ের একটা লম্বা এবড়ো-খেবড়ো ফাটলের একদিকে অদ্ভুত একটা খোদাই-করা মূর্তি। খোদাইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম নিপুণতার কোনো পরিচয় নেই, বেশ একটু স্থূলভাবেই কাজ করে একটা মূর্তির আদল আনা হয়েছে, কিন্তু আভাস তাতে যা ফুটে উঠেছে তা একেবারে অদ্ভুত আজগুবি কোনো কিছুর। অনেকটা কুমিরের মতো দেহের ওপর ভাঁটার মতো ঠেলে-ওঠা চোখের একটা যেন দানবের মুণ্ড। আর সব চেয়ে অদ্ভুত এই মূর্তির পিঠের মাঝখানে খাঁজ-কাটা গোল খাঁড়ার মতো একটা বিদঘুটে কুঁজ।

সবসুদ্ধু মিলিয়ে গোটা মূর্তিটাই যেমন ভয়ংকর তেমনি কুৎসিত। কবে কারা যে এ মূর্তি খোদাই করেছিল তা সঠিকভাবে বলতে গেলে 'কার্বন ডেটিং' করেও সম্পূর্ণ হদিশ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। কারণ কবে এ পাথর খোদাই হয়েছিল জানা সম্ভব হলেও কারা এ কাজ করেছিল তা বোঝবার কোনো উপায়ই নেই। সে জাত হয়তো সম্পূর্ণ লুপ্তই হয়ে গেছে। আর তা যদি নাও হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের সব ক্ষমতা হারিয়ে ও ইতিহাস ভুলে সুদূর অতীতের এক জনগোষ্ঠীর ভগ্নাংশ হিসাবে কাদের মধ্যে কোথায় তারা মিশে আছে তারা নিজেরাই জানে না। লুপ্ত বা আত্মবিস্মৃতভাবে কোথাও এখনও অবশিষ্ট যাদেরই আদি পুরুষেরা এ মূর্তি খোদাই করে থাক, তাদের সৃষ্টিছাড়া কল্পনার দৌড় দেখে হতভম্ব হতে হয়। রাহুলকে সেই কথাই বলতে বলতে খোদাই মূর্তিটার নীচের সামান্য একটু খাঁজে শুকনো কটা ফুল আর পাতা দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তাহলে পুজোর এই নৈবেদ্য দিতেই কাল এখানে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ—' হতাশ সুরে বলল রাহুল, 'এই পুজোতেই হয়তো দেবতার কোপও শান্ত হবে ভেবে গৌরার কথায় সেই বালাজ্জিরের এক মন্দির থেকে এ পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে আসি। কাজ যে কী হয়েছে তা তো কাল রাতেই দেখেছ।'

'হ্যাঁ কাজ কিছু হয়নি—কিন্তু যার জন্যে এসব প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা, তোমার সে পাপটা কী? দেবতার কী অপমান তুমি করেছ?'

অপমানটা কী করেছে রাহুল এবার তা আমায় একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখাল। পাহাড়ের ফাটলটা চওড়া থেকে একটু সরু হয়ে পেছনে কতদূর পর্যন্ত চলে গেছে তা বলা শক্ত। সে ফাটল পরে একটা গুহা কি সুড়ঙ্গের মতোই চেহারা হয়তো নিয়েছে। পেছনের গুহা বা সুড়ঙ্গের মুখটা বড়ো বড়ো পাথরের চাঁইয়ে এতকাল আটকানো ছিল। হয়তো এ অদ্ভুত দেবতার আদি সেবকরা সেখানে সেকালের ধনরত্ন কিছু লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে মনে করে রাহুল তার লোকজনদের দিয়ে পাথরের চাঁইগুলো কিছুটা সরাবার ব্যবস্থা করেছিল একদিন। ধনরত্ন কিছু পায়নি কিন্তু সেই দেবতার কোপ তার ওপর পড়ার প্রমাণ সে পেতে শুরু করেছে।

তার লোকজনদের মধ্যে গৌরা আর জংলি আদিবাসীদের একজন ওঝা হঠাৎ সেদিন তার কাছে দেখা দিয়ে রাহুলকে এভাবে দেবতার অপমান করতে মানা করেছিল। কিন্তু রাহুল তার যুক্তিবাদী মন নিয়ে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল সে কথা।

সে তাচ্ছিল্যের ফল সে হাতে হাতে পেতে শুরু করেছে সেই রাত থেকেই। এ অজানা

Pathagar.net

অদ্ভুত দেবতার কোপ যে জংলিদের মিথ্যে কল্পনা নয় আমিও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাল পেয়েছি।

রাহুলের আক্ষেপ শুনতে শুনতেই আমার পরিকল্পনা আমি ঠিক করে ফেলেছি। সে চুপ করার পরই দৃঢ়স্বরে তাকে আশ্বাস দিয়েছি, 'এবার তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। তোমার দেবতার কোপ কাটাবার ব্যবস্থা আজই হবে।'

পরিকল্পনা যা করেছিলাম তাতে খুঁত ছিল না। সব রহস্যের মীমাংসা যা ভেবেছিলাম তাও সঠিক। কিন্তু সঠিক শুধু রহস্যের অর্ধেকটার বেলা। বাকি অর্ধেকটার অবিশ্বাস্য ভয়ংকর ব্যাখ্যা আমার কেন, বর্তমান কালের মানুষেরই বুঝি কল্পনার বাইরে। রাহুলের একান্ত অনুরোধ এমনকী জোর জবরদস্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি করে তার দোনলা বন্দুকটা সেদিনকার রাত্রের মতো ধার নিয়ে সন্ধে হবার পরই বাংলোবাড়ি থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা ছোটো পাথুরে টিবির পাশে ঘাঁটি গেড়েছিলাম। বন্দুকটা ছাড়া সঙ্গে ছিল একটা জোরালো টর্চ। রাতদুপুর পর্যন্ত বেশ ধৈর্য ধরে ওত পেতে থাকতে হয়েছিল। তারপর ঠিক যা অনুমান করেছিলাম তাই ঘটেছে। অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত। তার মধ্যে জনা আষ্টেক কালো কালো ছায়ামূর্তিকে দুটো বড়ো বড়ো লম্বা কাঠের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে বাংলোবাড়ির দিকে যথাসম্ভব নিঃশব্দে যেতে দেখেছি।

তারা যে জংলি আদিবাসীদের দলের লোক, তাদের ওঝা পুরুতের নির্দেশে তারা যে এইভাবে বাংলোবাড়ির দরজা ভাঙা কসরত করে রাহুলকে ভয় দেখিয়ে এ মুল্লুক ছাড়া করতে চেষ্টা করছে তা জেনে তাদের বাংলোর দরজায় গিয়ে পৌঁছোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করিনি। তার আগেই তাদের মাথার ওপর একটা ফাঁকা আওয়াজ করেছি বন্দুকের। তাতে ফল যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে। ভয়ে চিৎকার করে তাদের কাঠের গুঁড়ি-ফুঁড়ি ফেলে তারা যে যেদিকে পারে পালাবার জন্যে ছুট লাগিয়েছে। কিন্তু তারপরই একী লোমহর্ষক চিৎকার! আমি তো শুধু ফাঁকা আওয়াজ করেছি বন্দুকের। তাতে যদি ভুলক্রমে গুলি একটা থাকত আর মাথার ওপরে বন্দুক ছোঁড়া সত্ত্বেও গুলি যদি কারোর গায়ে লাগতও, তাহলেও এতক্ষণ বাদে এমন শিরদাঁড়া শিউরে তোলা চিৎকার উঠবে কেন? এসব কথা ভাববার আগেই টর্চটা তুলে চিৎকারটা যেখান থেকে উঠেছে সেখানে ফেলেছি।

আর তারপর আতঙ্কে বিস্ময়ে হাত-পা প্রায় অবশ হয়ে এলেও বন্দুকটা তুলে সেই লক্ষ্যে সত্যিকার গুলি ছুঁড়েছি। গুলিটা অবশ্য ব্যর্থই হয়েছে নিশ্চয়, কারণ টর্চের আলোয় যা আমি দেখেছি তাতে শুধু লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়, আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাবার কথা।

পাহাড়ের ফাটলের খোদাই করা সেই মূর্তির আদলেরই একটি বিকট প্রাণী একজন জংলিকে তার বীভৎস দাঁতালো মুখের মধ্যে ধরে নাড়া দিচ্ছে, এই আমি দেখেছি।

আমার টর্চ ফেলা আর তারপর বন্দুক তুলে গুলি করার মধ্যে প্রাণীটা অনেকখানি সরে যেতে পেরেছে। আমার গুলি যখন ছুটেছে তখন তার পিঠের খাঁজ-কাটা খাঁড়ার মতো কুঁজটাই একটু দেখা যাচ্ছে।

গুলি যদি কোনোরকমে লেগে থাকে তাহলে সেইখানেই লেগেছে জেনে প্রথম অবশ বিহ্বলতাটা একটু কাটিয়ে উঠেই টর্চ আর বন্দুক হাতে সেদিকে ছুটে গেলাম।

কিন্তু কোথায় সেই বিকট খোদাই মূর্তির আদলের প্রাণী? যা দেখেছি তা কি আমার ওই অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে আতঙ্কের জল্পনা থেকে কয়েক মুহূর্তের জাগ্রত স্বপ্ন?

না তা নয়, আমার বন্দুকের আওয়াজ আর জংলি আদিবাসীর সেই আর্ত চিৎকারে বাংলো থেকে রাহুল শুধু নয়, তার পেছনে সব মিথ্যে ছল ত্যাগ করে গৌরাও বেরিয়ে এসেছে। তাদের দুজনের হাতেই দুটো টর্চ।

pathagar.net

আমাদের তিনজনের টর্চের আলোয় প্রাণীটা না হলেও ক-ফোঁটা রক্তের একটু দাগ কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ল। প্রাণীটা তাহলে একেবারে অক্ষত অবস্থায় পালাতে পারেনি।

এখানে-ওখানে এইরকম রক্তের ফোঁটা অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছোব আমি জানতাম। রক্তের দাগ সেই পাহাড়ের চাঁই-সরানো গুহা বা সুড়ঙ্গমুখেই গিয়ে শেষ হয়েছে।

সেখানে যখন পৌঁছোলাম তখন প্রায় ভোর। গুহামুখটাকে দেখিয়ে রাহুলকে জোর দিয়েই এবার বলতে পারলাম, 'পাপ, যা করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত এখানেই করতে হবে। পাথরে চাঁই যা সরিয়েছিল, তা আবার লাগিয়ে এই মুখটা গেঁথে বন্ধ করাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত।'

'তার মানে?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছিল রাহুল।

মানেটা তাকে যথাসাধ্য পরে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম—আমার ব্যাখ্যাটা হয়তো অনেকখানিই আজগুবি। বৈজ্ঞানিক সমাজকে এ ব্যাখ্যা মানতে রাজি করা বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। তবু যা আমি দেখেছি বুঝেছি তাতে এই একটি ব্যাখ্যাই এ রহস্যের বেলা খাটে।

এখানে পাথরের ফাটলে যারা এক অদ্ভুত দেবতার মূর্তি খোদাই করেছিল তারা নিছক কল্পনার ওপর নির্ভর করেনি। তারা চাক্ষুষ যা দেখেছিল তাই ফোটাতে চেয়েছিল তাদের পাথরে খোদাইয়ে। এই পাহাড়ের ফাটলটা খানিক পরে একটা সুড়ঙ্গপথ হয়েই বহুদূরে পাহাড়ের গভীরে নেমে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। যেখানে সে পথ শেষ হয়েছে সেখানে একটা পাতাল হ্রদ নিশ্চয়ই আছে বলে আমার অনুমান। আদি পৃথিবীর কুমিরজাতীয় কোনো সরীসৃপ বংশের প্রাণী পাহাড়ের নীচে পৃথিবীর পাতাল গহ্বরের সেই অন্ধকার হ্রদে আটকা পড়ে বংশানুক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে অন্ধ হয়ে গেছে। তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। পৃথিবীতে অনেক অন্ধকার ভূগর্ভের হ্রদ আর পাতাল-নদীর প্রাণী এমনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও বংশ পরম্পরায় বেঁচে বর্তে আছে বলে জানা যায়। এই পাহাড়ের ফাটলের আদি কুমিরজাতীয় প্রাণীও তাই করেছে। তার পিঠের ওই খাঁড়ার মতো কুঁজটাও হয়তো আদিম কোনো প্রাণীর ধারা থেকে পাওয়া। কয়েক কোটি বছর আগে এডাফোসরস নামে এরকম একটি প্রাণী ছিল বলে প্রমাণ আছে।

যুগযুগান্তে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুড়ঙ্গমুখ খোলা পেয়ে এ প্রাণীর দু-একটা হয়তো ছিটকে বাইরের জগতে বেরিয়ে এসেছে। আদিম প্রাগৈতিহাসিক কোনো নরগোষ্ঠী হয়তো তা দেখে ওই মূর্তি খোদাইয়ের আদল পেয়েছে। প্রাণীটি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কিংবদন্তিও তাই থেকে এসে উঠেছে।

রাহুল ধনরত্নের আশায় পাথরের চাঁই সরিয়ে গুহামুখ পরিষ্কার করার পর এ প্রাণী তার অন্ধকার পাতাল থেকে বাইরে আসবার পথ পায়। একেবারে চক্ষুহীন বলে দিনের আলোর বদলে রাত্রেই তারা বেরিয়ে আসে।

এদের কথা কিছু না জেনে জংলি আদিবাসীরা রাহুলকে ভয় দেখাবার যে ব্যবস্থা করে, আসল রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তা অমন জটিল দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে।

আশা করা যায় সে রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান না হলেও তা আর কখনো বিভীষিকা সৃষ্টি করবে না।

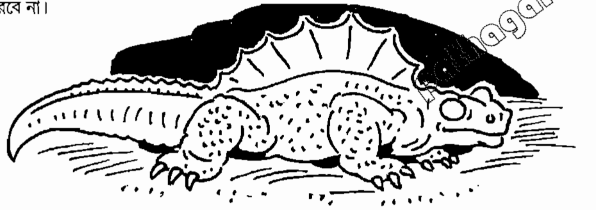

হার্মাদ

আজকের কথা নয়, ইংরেজের রাজত্ব তখনও শুরু হয়নি। মুসলমানদের রাজপ্রতাপ অস্ত যায় যায় হয়েছে। দেশময় গোল। যে যার পারে লুট করে খায়—দেশে না আছে শাসন, না আছে শান্তি৷ তখনকার কথা বলছি।

কর্ণফুলি নদীর ধারে মাঝারি একটি গ্রাম ; নাম রঙ্গনা।

রঙ্গনার লোক সবাই সেদিন নদীর ধারে ভেঙে পড়েছে। রঙ্গনার সবচেয়ে ধনী সদাগর উজ্জ্বল সাধু, তিন ছেলে নিয়ে বাণিজ্যে যাবেন। সাত সাতটা ডিঙা নদীর ধারে সেজেছে। তার কোনোটা ময়ূরপঙ্খী, কোনোটা মকরমুখী, কোনোটার মাথায় পরির মূর্তি, কোনোটার বা রাজহাঁসের।

বাণিজ্যে যাওয়া তখন সোজা নয়। জলপথে একবার গেলে ফেরবার আশা কম। জল-ঝড় তো আছেই তার ওপর জলদস্যুর উৎপাত। উজ্জ্বল সাধুকে গাঁয়ের লোকে অনেক নিষেধ করেছে কিন্তু উজ্জ্বল সাধু চিরদিন একরোখা—ভয়-ডর বলে কিছু জানেন না। তিনি কারুর কথা শোনেননি। তিনি বলেছেন—সদাগরের বংশ আমরা, সাত সমুদ্দুর চযে বেড়ানোই আমাদের জাত-ব্যবসা, আমাদের কি ভয়-ডর করলে চলে?

ডিঙা প্রস্তুত, সাজগোজ সব শেষ। বাড়ির মেয়েদের পান-সুপারি দূর্বা-চন্দন দিয়ে নৌকো বরণ করা হয়ে গেছে। মাঝিরা দাঁড়ে বসেছে।

উজ্জ্বল সাধু ময়ূরপঙ্খীতে উঠে নোঙর তোলবার আদেশ দিতে যাবেন, এমন সময় তাঁর মনে হল—ছোটো ছেলে বসন্তকে তো দেখা যায়নি অনেকক্ষণ।

উজ্জ্বল সদাগরের তিন ছেলে। রূপকুমার, কাঞ্চনকুমার আর বসন্তকুমার।

লোকে বলত—তিনটি ছেলে রূপে-গুণে যেন তিনটি রত্ন। কিন্তু উজ্জ্বল সাধু ভুরু কুঁচকে বলতেন, 'উঁহু, বসন্তটা ষাঁড়ের গোবর।'

বসন্তকে পছন্দ না করবার তাঁর কারণ ছিল। রূপকুমার, কাঞ্চনকুমার বাপের মতো, যেমন জোয়ান, তেমনি সাহসী। কোন দেশে গিয়ে কেমন করে বাণিজ্য করবে, এই হল তাদের সারাক্ষণের চিন্তা, আর বসন্ত এসবের বিপরীত—সদাগরের ছেলে হয়ে সে কিন্তু রাতদিন পুথিপত্র নিয়েই ব্যস্ত। দেখতে নেহাত দুর্বল রোগা সে নয় বটে, কিন্তু দাদাদের মতো লম্বা-চওড়া চেহারাও তার নয়। মাথাটি তার বামুন পণ্ডিতের মতো মুড়োনো, তার মাঝখানে মস্ত বড়ো এক টিকি।

উজ্জ্বল সাধু রাগ করে বলতেন, 'তালপাতার পুথি পড়ে পড়ে ওই টিকি একদিন তালগাছ হবে, দেখিস!

ভায়েরাও বাবার দেখাদেখি তাকে ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। ছোটো ভাইকে তারা বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু বসন্তর তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

বরাবর রূপ আর কাঞ্চনই বাপের সঙ্গে বিদেশে যায়। এবার উজ্জ্বল সাধু জোর করে বসন্তকে নিয়ে চলেছেন—বিদেশে-টিদেশে ঘুরে যদি তার মনের পরিবর্তন ঘটে ও পুথিপড়ার ব্যারাম সারানো যায়, সেই আশায়।

ছোটো ছেলেকে এখন না দেখতে পেয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেল বসন্ত?'

কেউ তা জানে না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। কিন্তু বসন্তকে পাওয়া গেল না। কোনো ডিঙাতেই সে ওঠেনি।

pathagar.net

নৌকো ছাড়তে দেরি হয়ে যাচ্ছে, উজ্জ্বল সাধু রেগেই খুন। বললেন, 'সে নিশ্চয়ই বিদেশে যাবার ভয়ে কোথাও পালিয়েছে।' লোকজনকে ডেকে বললেন, 'যেখানে আছে, যেমন করে পার খুঁজে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এসো। আমার ছেলে এমন ভীতু—ছি, ছি, আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করছে যে।'

কিন্তু বসন্ত পালায়নি! লোকজন নৌকো থেকে নেমে খুঁজতে যাবে, এমন সময় দেখা গেল, দু-বগলে দুটি পুঁটলি নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে সে আসছে।

উজ্জ্বল সাধু চমক গিয়ে বললেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

বসন্ত মাথা নিচু করে বলল; 'আজ্ঞে, একটা পুথি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

'পুথি? বাণিজ্যে যাবি, তা তোর পুথির কী দরকার?'

রূপকুমার, কাঞ্চনকুমার ও নৌকোর সব লোক হেসে উঠল। বসন্তের মুখে আর কথা নেই।

উজ্জ্বল সাধু বললেন, 'কী আছে তোর পুঁটলিতে? খোল, দেখি।'

কী আর করে! বসন্ত ধীরে ধীরে পুঁটলি দুটি খুলল। পুঁটলির ভেতর একরাশ পুথি।

উজ্জ্বল সাধুর আর সহ্য হল না।— 'দাঁড়া, তোর পুথি পড়া আমি বার করছি।' বলে দুটি পুঁটলি তিনি ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়ে হাঁকলেন, 'তোলো নোঙর।'

বসন্ত চমকে চিৎকার করে উঠে হতভম্ব হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। নৌকোর লোক সবাই হেসে উঠল।

হালকা তালাপাতার পুথি, জলে পড়েও তা ডোবেনি। বসন্তের মনে হল, এখনও জলে নেমে সেগুলো তুলে আনা যায়। কিন্তু উপায় নেই, নোঙর তুলে ডিঙার সার তখন এগোতে শুরু করেছে।

নানা দেশ নানা বন্দর হয়ে ডিঙা যায়। কিন্তু বসন্তের মনে সুখ নেই। শুধু পুথির শোকেই সে যে বিষণ্ণ তা নয়, নৌকোর কেউ তাকে আমল দেয় না, দাদারা সব সময়ে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, এও তার বড়ো দুঃখ।

বসন্ত নৌকোর হালের কাছে গিয়ে বসে হয়তো বলে, 'দাও না, শ্রীধর, আমি একটু হাল ধরি।'

শ্রীধর মাঝি একটু হেসে বলে, 'এ কি আপনার কাজ, ছোটো কর্তা!'

বসন্ত তবু জেদ করে বলে. 'না না, আমি তোমার দেখে দেখে শিখেছি যে!'

শ্রীধর গম্ভীর হয়ে বলে, 'না না, ছোটো কর্তা, নদীর অতলজলে ঢেউয়ের দাপটে শেষকালে নৌকো সামলানো দায় হবে।'

রূপা আর কাঞ্চন তো সুবিধে পেলে বসন্তকে অপ্রস্তুত করতে ছাড়েই না।

মাঝরাতে বসন্ত ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ দু-ভাই শশব্যস্তে এসে তাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলে, 'ওঠ ওঠ শিগ্গির, ডিঙায় হার্মাদ আসছে।'

হার্মাদের নাম শুনে বসন্ত ঘড়মড় করে উঠে বসে। হার্মাদ সে চোখে কখনো দেখেনি, কিন্তু মাঝিমাল্লা সকলের কাছে এই বিদেশি জলদস্যুদের নির্মমতার কাহিনি শুনে শুনে তাদের সম্বন্ধে তার ধারণা আর অস্পষ্ট নেই। বাঘের চেয়ে হিংস্র, সাপের চেয়েও খল এই মানুষের চেহারার পিশাচেরা। যেখানে নামে, সেখানে কী সর্বনাশই যে করে, তা স্মরণ করে শিউরে উঠে বসন্ত বলে, 'কী করব দাদা?'

রূপ আর কাঞ্চন তার হাতে একটা বল্লম গুঁজে দিয়ে বলে, 'তুই চুপিচুপি ওপরে উঠে গিয়ে মাঝিদের সব জাগিয়ে দিগে যা, আমরা নীচে থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছি। যা, তাড়াতাড়ি যা, হার্মাদদের সুলুপ এসে পড়ল বলে, আমরা দূর থেকে আলো দেখে নেমে এসেছি।'

pathagar.net

ব্যস্তসমস্ত হয়ে বসন্ত বল্লম হাতে নৌকোর খোল থেকে ওপরে উঠে যায়। অন্ধকার রাত। নদীতে নোঙর ফেলে পাটাতনের ওপর যে যার জায়গায় মাঝিরা ঘুমোচ্ছে, শুধু হালের কাছে একজন প্রহরী পাহারায় দাঁড়িয়ে।

বসন্ত সামনে যাকে পায় প্রাণপণে ঠেলা দিয়ে বলে, 'ওঠো ওঠো, হার্মাদ আসছে।'

হার্মাদের নাম শুনে সে এবং আরও দু-একজন ধড়মড় করে উঠে পড়ে। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে একজন হেসে উঠে বলে, 'কে, ছোটো কর্তা নাকি? তাই তো ভাবি এত রাত্রে হার্মাদ এল কোথা থেকে? তা আসুক না হার্মাদ! আপনার ভয় নেই, আমরা আছি। আপনি ঘুমোন গে যান।'

বসন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে, 'কী বাজে বকছ! হার্মাদদের সুলুপের আলো দেখা গেছে, শিগ্‌গির ওঠো সব।'

মাঝিরা সবাই হেসে ওঠে।

একজন বলে, 'হার্মাদরা আপনার বল্লম দেখে পালিয়েছে কর্তা, এ রাত্রে আর আসবে না।'

বসন্ত আর কিছু হয়তো বলত, কিন্তু পেছনে হাসির শব্দ শুনে দেখে, রূপ ও কাঞ্চন হাসির চোটে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে।

এইবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বসন্ত মাথা নিচু করে নীচে নেমে যায়।

একদিন কিন্তু রূপ ও কাঞ্চনের ঠাট্টা সত্যি হয়ে উঠবে, কে জানত। সদাগরে বাণিজ্য শেষ হয়েছে। সাতটি ডিঙা নানা বন্দর নানা দেশ ঘুরে দেশের মুখে চলেছে। দিন দশেক বাদেই দেশে ফিরতে পাবে জেনে মাঝিদের আর আনন্দের সীমা নেই। কর্ণফুলির মুখে হার্মাদদের ভয়—সে উজানটাকে নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসে তাদের আশা ও সাহস বেড়ে গেছে। সকলেরই ধারণা এ দফায় আর বিপদ ঘটবে না।

এমন সময় একদিন দুপুরবেলা বিনা মেঘে বজ্রপাত হল!

বিস্তীর্ণ নদীর এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। তারই মাঝখান দিয়ে সদাগরের সাত ডিঙা চলেছে। হঠাৎ সামনের মকরমুখো ডিঙার দাঁড় টানা বন্ধ হয়ে গেল। মকরমুখো থেকে কে হেঁকে বলল, 'খবরদার, সামনে লুঠ হচ্ছে।' সব নৌকোর মাঝিমাল্লা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে এল! দেখা গেল, সামনে কোনো হতভাগ্য সদাগরের তিনটি নৌকোয় আগুন ধরেছে। নদীর মাঝখানের সেই তিনটি জ্বলন্ত নৌকো থেকে অসহায় মাঝিমাল্লা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিন্তু জলে পড়েও তাদের নিস্তার নেই। পাঁচ-পাঁচটি জলদস্যুদের সুলুপ থেকে জলের লোকদের ওপর নির্মমভাবে হার্মাদরা তির ছুঁড়ছে।

উজ্জ্বল সাধুর সাত ডিঙায় সোরগোল পড়ে গেল। উজ্জ্বল সাধু পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে করতে মাঝিদের নৌকোর মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে যাবার ব্যবস্থা বলে দিতে লাগলেন। নৌকোর খোল থেকে অস্ত্রশস্ত্র সব ওপরে এনে মাঝিদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হল। তারপর নৌকোর মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে সবাই দাঁড় টানতে লেগে গেল। হার্মাদরা অনুসরণ শুরু করবার আগে কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারলে হয়তো এ-যাত্রা রক্ষা পাওয়াও যেতে পারে।

কিন্তু তা হবার নয়। হঠাৎ সমস্ত নদী কাঁপিয়ে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। হার্মাদরা এ ডিঙা আক্রমণ করার আয়োজন করছে। উজ্জ্বল সদাগর চিৎকার করে বললেন, 'প্রাণপণে দাঁড় টানো মাঝিরা সব, এ-যাত্রা বাঁচলে সবাই ডবল মাহিনা পাবে।'

কিন্তু মাঝিদের কোনো পুরস্কারের লোভ দেখাবার দরকার ছিল না। তারা প্রাণের দায়ে তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টানছে। হার্মাদদের সুলুপগুলি তখন একসার হয়ে অনুসরণ আরম্ভ করেছে। বহুদূর পর্যন্ত এইভাবে অনুসরণ চলল। হার্মামদের নৌকোগুলি তখনও সমানে পেছনে

আছে কিন্তু মাঝিরা কতক্ষণ এক নাগাড়ে প্রাণপণে টানতে পারে? হার্মাদদের নৌকোয় লোকবল অনেক বেশি। দেখা গেল, তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি আর তাদের এড়ানো গেল না। তারা প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে তখন এসে পড়েছে। সদাগরের সাত ডিঙার ওপর তারা সেকালের গাদা বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করল। সদাগরের ডিঙায় মাত্র একটি বন্দুক। উজ্জ্বল সাধু নিজে সেই বন্দুক ছুঁড়ে তাদের গুলির জবাব দিলেন। কিন্তু এমন করে আর কতক্ষণ চালানো যায়? দেখতে দেখতে বড়ো বড়ো মশাল জ্বেলে হার্মাদরা তাদের সুলুপগুলি একেবারে সদাগরের সাত ডিঙার মাঝখানে নিয়ে এসে ফেলল এবং বড়ো বড়ো কাছি দিয়ে সদাগরের ডিঙাগুলির সঙ্গে তাদের সুলুপ শক্ত করে বেঁধে তলোয়ার ও বন্দুক নিয়ে নৌকোর ওপর লাফিয়ে পড়ল।

এইবার যে ব্যাপার শুরু হল, তার আর বর্ণনা হয় না। তখনও ভালো করে সন্ধ্যা হয়নি। আকাশের আবছা আলোয় কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু হার্মাদদের মশালের আলোয় চোখে এমন ধাঁধাঁ লাগে যে, অন্ধকার আরও গাঢ় মনে হয়। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে মশালের লাল আলোয় বিস্তীর্ণ নদীর ওপরে অসংখ্য মানুষের চিৎকার, তলোয়ারের সঙ্গে তলোয়ারের ঝঞ্ঝনা, বন্দুকের আওয়াজ মিলে এক ভয়ংকর জগৎ সৃষ্টি করে বসল। হার্মাদদের বিশাল যমদূতের মতো চেহারা, গায়ে তাদের লাল কোর্তা, মাথায় কারো কালো টুপি, কারো কাপড় দিয়ে আঁট করে চুল পেছনে টেনে বাঁধা, পরনে তাদের রক্তাক্ত পেন্টুলুন। সংখ্যায় তারা যেমন বেশি, অস্ত্রশস্ত্রও তাদের তেমনি জবর—তাদের অধিকাংশের কাছেই বন্দুক ও পিস্তল। হাতাহাতি লড়াইয়ের আপাতত সে বারুদ গাদা পিস্তল ছোঁড়ার বিশেষ সুবিধা না হলেও সদাগরের ডিঙার লোকেরা তাদের হিংস্র আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারছিল না। দলে দলে ডিঙার লোক মারা পড়ছিল। দেখতে দেখতে সদাগরের মকরমুখো ডিঙায় হার্মাদরা আগুন ধরিয়ে দিল। নদীর জল সে আলোয় লাল হয়ে উঠল। উজ্জ্বল সাধু এবার বন্দুক ফেলে উন্মত্ত হয়ে তলোয়ার নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন। কিন্তু শ্রীধর মাঝি, রূপ ও কাঞ্চন মিলে তাঁকে জোর করে ধরে রাখল। শ্রীধর বলল, 'আর যুদ্ধ করে লাভ কী, বলুন? এবার আত্মসমর্পণ না করে আর উপায় নেই।'

কিন্তু উজ্জ্বল সাধু আত্মসমর্পণ করতে কিছুতেই রাজি নন—হার্মাদদের বন্দি হয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে মরাই ভালো বলে, তিনি তাদের হাত ছেড়ে দিতে বললেন। শ্রীধর তবু বুঝিয়ে তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল এমন সময় দুজন হার্মাদ হঠাৎ সেদিকে এগিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করল। রূপ বন্দুকটা তুলতে গিয়ে দেখে বন্দুক নেই, কখন কে সরিয়ে নিয়েছে, কেউ দেখেনি। শ্রীধরকে অস্ত্রচ্যুত করে উজ্জ্বল সাধুর মাথার ওপর একজন হার্মাদ তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল। হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ। হার্মাদের হাতের তলোয়ার হাত রয়ে গেল, সে ডিঙার ওপর পড়ে গেল। আরেকজন হার্মাদ তখন মাটি থেকে একটা বল্লম তুলে নিয়ে উজ্জ্বল সাধুর বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়বার উদ্যোগ করছে। কিন্তু তারও হাতের বল্লম হাত থেকে আর ছুটল না—আবার এক বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সে লুটিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বল সাধু অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—কোথা থেকে কে ছুড়ছে, কিছুই দেখা যায় না। বেশিক্ষণ অবশ্য খোঁজবার সময়ও তাঁর রইল না। হার্মাদরা এইবার চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল। সদাগর মরিয়া হয়ে লড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় শ্রীধর জোর করে একটা সাদা নিশান তুলে দোলাতে লাগল।

সাদা নিশান মানে সন্ধি, কিন্তু হার্মাদের কাছে সাদা নিশান মানে আত্মসমর্পণ। সাদা নিশান দেখবামাত্র অন্য সমস্ত ডিঙাতেও যুদ্ধ থেমে গেল। হার্মাদরা এইবার এগিয়ে এসে দড়ি দিয়ে শক্ত করে সকলকে বেঁধে ফেলতে লাগল।

উপায়হীন হয়ে উজ্জ্বল সাধু হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু যে হার্মাদ তাঁকে বাঁধতে এসেছিল হঠাৎ আর এক বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে গেল।

সাদা নিশান দেখবার পরও বন্দুক ছোঁড়ে কে?

সবাই কৌতূহলী হয়ে চারিদিকে চেয়ে হঠাৎ দেখতে পেল, নৌকোর মাস্তুলের একেবারে আগায় পা ঝুলিয়ে একজন বন্দুক নিয়ে বসে আছে। একজন হার্মাদ তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতেই মাস্তুল থেকে আবার এক আওয়াজ হল। হার্মাদের বন্দুক ছোঁড়া জীবনের মতো শেষ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সাদা নিশান দেখবার পরও এরকম বন্দুক ছোঁড়ায় হার্মাদরা একেবারে খেপে উঠল। তারা সবাই সেইদিকে বন্দুক উঁচিয়ে তাকে গুলি করবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে হার্মাদদের সর্দার গঞ্জালেস এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বললেন, থামো, গুলি করে মারলে এর অপরাধের উচিত শাস্তি হবে না, ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব। ওকে জীবন্ত নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তিন-তিনজন হার্মাদ তৎক্ষণাৎ মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে গেল, কিন্তু বেশিদূর তাদের উঠতে হল না। এক-এক করে তিনজনেরই মৃতদেহ মাস্তুলের তলায় লুটিয়ে পড়ল। আরও তিনজন তারপর মাস্তুলে উঠতে গিয়ে সেই দশাই প্রাপ্ত হল। গঞ্জালেস উন্মত্ত হয়ে বললেন, মাস্তুলটা কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেলো! মাস্তুলের তলায় তৎক্ষণাৎ হার্মাদরা কুড়ুল নিয়ে এসে কোপ দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে মড়মড় করে মাস্তুল ভেঙে ঝুলে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুলের বন্দুকবাজও জলে ছিটকে গেল। কজন হার্মাদ এবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরবার জন্যে সাঁতরে গেল। তিনজনের হাত থেকে সাঁতরে পালানো সহজ নয়। বন্দুকবাজ ধরা পড়ল। হার্মাদরা তাকে সেই জলে ভেজা অবস্থায় পিছমোড়া করে ওপরে তুলে নিয়ে এল। লোকটা এতক্ষণ মাথা নিচু করেছিল—হঠাৎ ওপরে এসে মুখ তুলতেই উজ্জ্বল সাধু, রূপ, কাঞ্চন, শ্রীধর সবাই একসঙ্গে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন, 'একী, এ যে বসন্ত!'

গঞ্জালেস বসন্তর মাথার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, 'তোমার হাতের ভারী তাগ, না ছোকরা? আচ্ছা আগুনে একবার সেঁকে নিয়ে তারপর দেখা যাবে, কত তুমি তাগ করতে পার।'

উজ্জ্বল সাধু হাত বাড়িয়ে কী বলতে গেলেন, কিন্তু একজন হার্মাদ তাঁর মাথায় এক আঘাত করে তাঁকে নীরব করিয়ে দিল। হার্মাদরা বসন্তকে বেঁধে নিয়ে গেল।

গভীর রাত। নৌকার খোলের ভেতর একজায়গায় বসন্তকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। হার্মাদরা জানিয়ে গেছে, কাল সকালে তাকে পুড়িয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।

লুঠ সফল হওয়ার আনন্দে ওপরে হার্মাদরা হল্লা করে স্ফূর্তি করছে। তারই আওয়াজ অস্পষ্টভাবে নীচে এসে পৌঁছোচ্ছিল, আর বসন্ত ক্ষোভে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে গুমরে উঠেছিল। সে সকালে মারা যাবে তার জন্যে তার দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু এই জন্যে যে, এই নরপিশাচদের উপযুক্ত শাস্তি সে দিতে পারল না! আরও কটাকে মেরে মরতে পারলে তার মনে শান্তি হত। কিন্তু তার উপায় নেই।

হঠাৎ তার মনে হল, উপায় কি সত্যিই নেই? হার্মাদরা সব স্ফূর্তিতে মেতেছে, তার কাছে কেউ নেই ; কোনোরকমে হাতের বাঁধন যদি সে খুলতে পারে, তাহলে নৌকোর জানলা দিয়ে বাইরে যাওয়া শক্ত নয়। একবার বাইরে বেরোতে পারলে হার্মাদদের আরও গোটাকতককে সাবাড় করবার সুবিধা মিলবেই, কিন্তু হাতের বাঁধন, পায়ের বাঁধন খোলা যায় কী করে? যে কোনো একটা ধারালো জিনিস থাকলে কোনোরকমে তাতে ঘষে বাঁধন কাটা যেত। নৌকার খোলে একটি তেলের বাতি মিটমিট করে জ্বলছে, তার আলোয় চারিদিকে চেয়ে তেমন কিছুই সে দেখতে পেল না!

নাঃ, উপায় নেই! প্রতিশোধ ভালো করে না নিয়েই তাকে পুড়ে মরতে হবে। এই কথা

মনে হতেই হঠাৎ পিছমোড়া করে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও বসন্ত উঠে বসল। উপায় তো আছে! পুড়ে মরার কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, বাতির আলোতে বাঁধন সে পুড়িয়ে ফেলতে তো পারে! এখন কেউ না দেখতে পেলে হয়। কোনোরকমে ঘষড়ে ঘষড়ে কী কষ্টে যে সে বাতির কাছে পৌঁছোল তা বলা যায় না। কিন্তু এখন আর এক অসুবিধা! কোনোরকমে উঠে দাঁড়াতে হয়তো সে পারে, কিন্তু পেছন দিকে ভালো করে দেখা তো যায় না। হাতের বাঁধন পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত হাতও পুড়ে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার সময় আর নেই। ক্ষিপ্র হাতে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে বসন্ত খোলে জানলা দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এসে জলে নেমে পড়ল। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের যন্ত্রণায় প্রথমে মনে হল, সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কয়েক মিনিটে সে-যন্ত্রণা একটু সামলে নিয়ে নৌকোর ধার দিয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে যেতে যেতে সে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল। সমস্ত হার্মাদ খাস-নৌকোর ওপর উৎসবে মত্ত। একজন শুধু হাল ধরে নদীর স্রোতে ধীরে ধীরে নৌকো চালিয়ে নিয়ে চলেছে। অপর নৌকোগুলিতেও দুটি-একটির বেশি মাঝি নেই। অন্ধকার রাত্রি, নদীর ওপর একহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। আস্তে আস্তে সাঁতরে গিয়ে হালের কাছে বসন্ত আবার নৌকো ধরল, তারপর ধীরে ধীরে নৌকোর গা বেয়ে ওপরে উঠে গেল। হালে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে একজন মাত্র হার্মাদ নৌকো চালাচ্ছে। কাছে কেউ কোথাও নেই। এই একজনকে কাবু করতে পারলেই হয়, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব! গায়ে তার অত জোর নেই যে, এই যমদূতের মতো চেহারাকে শুধুহাতে মেরে ফেলতে পারে। অস্ত্রশস্ত্রও তার সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কোনোরকমে হার্মাদ মাঝির কোমরবন্ধ থেকে তার তলোয়ারটা খুলে নেওয়া যায়! মাঝির পেছনে গুড়ি মেরে বসে বসন্ত নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দেখল, সে তলোয়ার নেওয়া শক্ত। লোকটা ঝিমোচ্ছে কিন্তু একেবারে ঘুমোয়নি। বসন্ত বসে বসে উপায় ভাবতে লাগল।

হঠাৎ বিধাতাই সুযোগ করে দিলেন। লোকটা ঝিমোতে ঝিমোতে একবার ঘুমের ঘোরে সামনে টলে পড়ল। সেই মুহূর্তে তার কোমর থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে বসন্ত উঠে দাঁড়াল। কোমরে টান পড়ায় হার্মাদও সজাগ হয়ে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু তখন তার সময় ফুরিয়েছে। এক কোপে তার ছিন্ন মুণ্ড ঘাড় থেকে পেছনে ঝুলে পড়ল। লাশটা থেকে তার জামাকাপড় খুলে নিয়ে বসন্ত লাশটা একধারে চাপা দিয়ে রেখে দিল। জামা পেন্টুলুন সে পরল বটে, কিন্তু তার গায়ে সেগুলি ঢলঢল করতে লাগল, তা হোক, তবু দূর থেকে দেখে চিনতে পারা যাবে না। এবার কী করবে, সেই হল সমস্যা। কোনোরকমে নৌকাটাকে তীরের কাছে নিয়ে কোনো চড়ায় ঠেকিয়ে দিতে পারলে কাজ হয়। তির কতদূর না জেনেও সে ধীরে-ধীরে নৌকোর হাল ঘুরিয়ে দিল। অধিকাংশ হার্মাদ স্ফূর্তি করবার জন্যে সদাগরের বড়ো ময়ূরপঙ্খীতে এসে জড়ো হয়েছে। এই নৌকোতেই সদাগরের সমস্ত মাঝিমাল্লা লোকলশকর বেঁধে রাখা হয়েছে। অন্য নৌকোগুলিতে শুধু দরকারমতো দু-একজন ছাড়া আর কেউ নেই। নৌকো চড়াতে লাগলে হার্মাদরা কয়েকজন নীচে নামবেই—নৌকো ঠেলে জলে ভাসাতে। সেই সময় কিছু না কিছু করা যাবে।

চর সত্যই বেশি দূর ছিল না। হঠাৎ সশব্দে নৌকো চরে ঠেকে থেমে গেল। নৌকো অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। হার্মাদরা ভিড় করে নৌকোর পাটাতনের ওপরে এসে দাঁড়াল। গঞ্জালেস ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কুকুর সিবাস্টিয়ান? নৌকো চরে ঠেকল কেন?'

মুখে কাপড় পুরে যথাসম্ভব ভারী গলায় হার্মাদদের স্বর অনুকরণ করে বসন্ত বলল, 'কসুর হয়ে গেছে সর্দার—টের পাইনি।'

অন্য সময় হলে কী হত বলা যায় না, কিন্তু এসময় গঞ্জালেসের মেজাজ ভালো ছিল। আর কিছু না বলে তিনি আদেশ দিলেন, 'শিগ্‌গির নেমে গিয়ে নৌকো ঠেলে জলে ভাসাও।'

হার্মাদেরা সবাই মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়েছিল। আদেশ পাওয়ামাত্র হুড়মুড় করে নীচে নেমে গেল! এতটা বসন্ত আশা করেনি—এইবার সুযোগ।

গঞ্জালেস নৌকোর ধারে গিয়ে মাথা নিচু করে হার্মাদদের কী করতে হবে, চিৎকার করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মৃত সিবাস্টিয়ানের কোমরের ছোরাটা খুলে নিয়ে বসন্ত নিঃশব্দে গঞ্জালেসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর প্রাণপণে জোর সংগ্রহ করে পিঠে ছুরি বসিয়ে দিল। গঞ্জালেস কথাটি পর্যন্ত না বলে তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়লেন। নীচে হার্মাদরা নৌকো ঠেলায় ব্যস্ত, তারা কিছুই জানতে পারল না। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে বসন্ত নীচে নৌকোর খোলে যেখানে তার বাবা, ভাই এবং মাঝিমাল্লারা বন্দি হয়েছিল—সেখানে নেমে গিয়ে একে একে সকলের বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, 'যা পার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিগ্‌গির নৌকোর ধারে এসো।'

হার্মাদরা তখন নৌকো ঠেলে প্রায় জলে নামিয়ে এনেছে। জলে ভাসবামাত্র যেই হার্মাদরা ওপরে উঠতে যাবে, অমনি তাদের সংহার করতে বলে বসন্ত আবার গিয়ে হাল ধরল।

কিছুক্ষণ বাদেই হার্মাদদের ঠেলায় নৌকো জলে ভাসল। তৎক্ষণাৎ হাল ঘুরিয়ে বসন্ত নৌকোর মুখ তীর থেকে ফিরিয়ে দিল। হার্মাদরা প্রথমটা থতমত খেয়ে তারপর নৌকোয় ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, সেখানে সদাগরের সমস্ত মাঝিমাল্লা তলোয়ার-বল্লম-বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে কজন এ সত্ত্বেও ওঠবার চেষ্টা করল তাদের পরিণাম দেখে অন্যান্য দস্যুরা আর সে চেষ্টা করতে সাহস করল না। নৌকোর মুখ ফিরিয়ে বসন্ত কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে হার্মাদের নাগালের বাইরে এনে ফেলল।

হার্মাদদের অন্যান্য নৌকো অন্ধকারে এসব কিছুই জানতে না পেরে অন্যদিকে চলে গেছে। সামনে আর কোনো বিপদ নেই। ধনরত্ন ও কটা নৌকো গেছে যাক, প্রাণ বাঁচাতে পেরে মাঝিমাল্লাদের তখন আর আনন্দের সীমা নেই। তারা বসন্তকে নিয়ে কী যে করবে যেন ভেবে পায় না।

রূপ আর কাঞ্চন শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর বন্দুকের অত তাগ হল কবে রে—তুই শিখলি কোথায়?'

বসন্ত হেসে বলল, 'বন্দরে নেমে বেসাতি করতে যাবার সময় আমাকে তো সঙ্গে নিতে না, আমি তখন কোনো কাজ না পেয়ে বাবার বন্দুক নিয়ে ছোঁড়া অভ্যাস করতাম!'

উজ্জ্বল সাধু ছেলের কাছে এসে তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বললেন, 'তুই যা করেছিস তার পুরস্কার দেওয়া যায় না, তবু তুই যা চাস আমি দেব। বল, কী চাস।'

মাথা নিচু করে নৌকোর ওপর পা ঘষতে ঘষতে বসন্ত অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমার সেই পুথিগুলো যদি...'

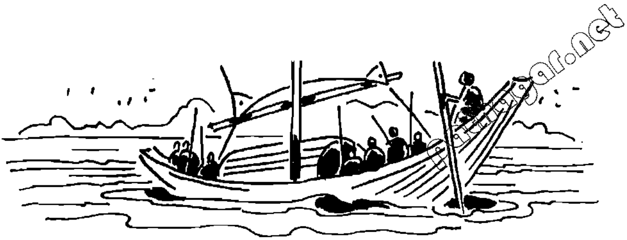

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাপারটা যতই ভেবে দেখছিলাম ততই আরও অদ্ভুত লাগছিল! বাস্তব ঘটনা অবশ্য অনেক সময়েই কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর হয় জানি, তবু যেন এই ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

দু-দিন আগেই বিমলের সঙ্গে আমার মেসের ঘরে প্রায় একটা পর্যন্ত জেগে তুমুল তর্ক করেছি। শেষ পর্যন্ত এ বয়সের তর্কাতর্কির যা পরিণাম হয় তাও আমাদের বচসায় হয়েছে। দুজনেরই জেদ ও রাগ বেড়ে গেছে এবং পরস্পরকে যা-তা বলে যুক্তির অভাব পূরণ করেছি।

আমি বলেছি, 'যেমন ছাতুখোরের দেশে জঙ্গলের মাঝে থাকিস, তেমনি জংলি বুদ্ধিও হয়েছে।'

বিমল বলেছে, 'শহরের মাঝখানে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় বসে বারফট্টাই মারতে সবাই পারে। এক-রাত ভেরেন্ডির জঙ্গলের ধারে মাহুরি কুঠিতে কাটাতে পারলে বুঝতাম।'

হেসে উঠে বলেছিলাম, 'কাটাবার কী দরকার! তোর ভূত, শহর আর ইলেকট্রিক লাইটকেই বা ডরায় কেন? বেছে বেছে যত পোড়ো বাড়ি আর জঙ্গলে না থেকে সে-ই তো এখানে এলে পারে!'

বিমল চটে উঠে জবাব দিয়েছে, 'তার দায় পড়েছে! তোর কাছে ভূত আছে একথা প্রমাণ করার জন্যে তার তো কোনো মাথাব্যথা নেই!'

বিমলকে আরও রাগিয়ে দিয়ে বলেছি, 'তার না হোক, তোর তো আছে। তুই নিজে কি কোনোদিন মাহুরি কুঠিতে থেকে দেখেছিস।'

বিমল বলেছে, 'এখনও রাত কাটাইনি তবে বাইরে থেকে যা দেখেছি তাই যথেষ্ট!'

আমি একথার উত্তরে এমনভাবে বিদ্রূপের স্বরে 'ওঃ!' বলেছি যে, বিমল মর্মাহত হয়ে চুপ করে গেছে।

খানিক বাদে গম্ভীর মুখে শুধু বলেছে, 'সাহস থাকে তো সেখানে যাস।'

আমি ব্যঙ্গ করে বলেছি, 'গেলে, অন্তত মাহুরি কুঠির বাইরে থাকব না।'

পরের দিন সকালে অবশ্য আমাদের এই তর্ক নিয়ে মন কষাকষির কোনো চিহ্ন আর ছিল না। বিমল সকালের ট্রেনেই তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। আমি স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। আগের রাতের তর্কের কথা দুজনে একবার ভুলেও উত্থাপন করিনি।

কিন্তু কে জানত সে তর্কের জের অমন করে মেটাবার নয়। দু-দিন বাদেই আমাকে সত্যিসত্যিই ভেরেন্ডির জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়তে হবে তাই বা কে ভেবেছিল।

বিমল চলে যাবার পর একটা রাত পার হতেই দুপুরবেলা হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বিমল মরণাপন্ন, এখুনি আমার যাওয়া দরকার।—টেলিগ্রামের মর্ম এই।

যাওয়া যে দরকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছোটোনাগপুরের একটা নগণ্য স্টেশনে নেমে মাইল দশ-বারো গেলে ভেরেন্ডির জঙ্গল পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরোনো তামার খনিকে নতুন করে আবিষ্কার করে আজ দু-বছর বিমল কাজ করছে। সে নির্বান্ধব পুরীতে যে-সমস্ত কুলি-মজুর নিয়ে দিন কাটায়, সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা যে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না এটা ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম।

টেলিগ্রাম পাবার পরই বিকেলে রওনা হয়ে পড়েছি। ভেরেন্ডির জঙ্গলে বিমলের নিমন্ত্রণ এভাবে রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে ভেবে সত্যিই অদ্ভুত লাগছিল আর বিরক্তি লাগছিল যেতে এমন

দেরি হওয়ায়। যে স্টেশনে নেমে ভেরেন্ডির জঙ্গলে যেতে হয়, অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর সব গাড়ির কাছে সে অস্পৃশ্য। তাই বাধ্য হয়ে প্যাসেঞ্জারেই চাপলেও তার শামুকের মতো গতি ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে কী যে বিপদ সেখানে হচ্ছে কে জানে! বিমল অত্যন্ত শক্ত ধাতের ছেলে। সহজে সে কাতর কিছুতেই হয় না। সেই সুদূর জঙ্গলে একলা আজ সে দু-বছর যেভাবে বাস করে আসছে, তা থেকে তার কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়! সুতরাং অত্যন্ত বিপদে না পড়লে সে যে আমায় তার করত না, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম গদাইলশকরি চালের গাড়িতে আমি সেখানে পৌঁছোবই বা কখন! তাকে সাহায্যই বা করব কী!

বিকেলবেলা যে গাড়ি রওনা হয়েছিল, সমস্ত রাত গুটিগুটি করে চলে ভোর প্রায় পাঁচটার সময় টিনের চাল-দেওয়া নিতান্ত আখ্‌খুটে চেহারার একটি স্টেশনে সে-গাড়ি আমায় নামিয়ে দিল। প্ল্যাটফর্ম বলতে কাঁকর-ফেলা খানিকটা জায়গা, ট্রেনের সব কটা পা-দানি বেয়ে সেখানে নামতে হয়।

স্টেশন নয়, মনে হল যেন কোনো প্রান্তরে নেমেছি, শীতের রাত্রে ভোর পাঁচটার সময় বেশ অন্ধকার থাকে। তার ওপর গাঢ় কুয়াশায় স্টেশনের একটি মিটিমিটে তেলের বাতি প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানব কেউ আছে বলে মনে হল না। মিনিট খানেক থেমে গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে চলে যেতেই তার নির্জনতা আরও যেন ভয়াবহ হয়ে উঠল। ট্রেনের আলোয় আর আওয়াজে নিজের নিঃসঙ্গতা এতক্ষণ এমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এ স্টেশন থেকে তো বেরোতে হবে। ভেরেন্ডির জঙ্গলের রাস্তা এখান থেকে দশ-বারো মাইল দূর—এইটুকু মাত্র জানি—কোনদিকে যেতে হবে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। জিজ্ঞেসই বা কাকে করি! টিকিট চাইতেও তো কেউ আসে না দেখছি।!

স্টেশনের অস্পষ্ট বাতিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। স্টেশন ঘরে কোনো না কোনো লোক নিশ্চয় আছে।

'ঠরিয়ে!'

সত্যিই একেবারে আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মানুষ নয় যেন বাঘের গলার আওয়াজ! পেছন ফিরে কুয়াশায় ঘোলাটে একটা নীল আলো ছাড়া কিন্তু কিছুই প্রথমটা দেখতে পেলাম না। নীল আলোটা আরেকটু কাছে এগিয়ে আসার পর বিশাল একটা বস্তার মতো জিনিস অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। জিনিসটা বস্তা নয়, মানুষের মাথা। প্রকাণ্ড কম্ফর্টার ও তার ওপর কম্বল জড়িয়ে অতবড়ো হয়েছে। সেই কম্বল ও কম্ফর্টারের সামান্য একটু ফাঁকের মধ্যে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ ও দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল। শরীরের অন্যান্য অংশ অন্ধকারে অস্পষ্ট!

সত্যিই প্রথম কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। সেই কম্বল-জড়ানো মুখ থেকে, গম্ভীর বাজখাই গলায়, 'টিকিস' শুনেও যেন প্রথমে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারিনি।

আবার আওয়াজ এল, 'টিকিস কাঁহা?'

এবার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পকেট থেকে টিকিট বার করলাম এবং পরমুহূর্তে ভাল্লুকের মতো একটা মোটা লোমওয়ালা হাত হঠাৎ অন্ধকার থেকে যেন বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিল, মনে হল।

সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভেরেন্ডির জঙ্গলের রাস্তাটা কোন দিকে বলতে পারেন?'

নীল আলোটা দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে। সেটা থামল এবং কুয়াশার ভেতর থেকে শোনা গেল—সবিস্ময় প্রশ্ন, 'কাঁহা?'

'ভেরেন্ডির জঙ্গল, যেখানে তামার খনি আছে!'

pathagar.net

নীল আলোটা আমার কাছে সরে এল। কম্ফর্টার ও কম্বলের বস্তার তলা থেকে দুটি চোখ আমায় তীক্ষ্ণ সবিস্ময় দৃষ্টিতে লক্ষ করছে, বুঝতে পারলাম। ব্যাপারটা কী!

হঠাৎ 'উধর মত যানা' শুনে চমকে উঠলাম। এবং কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বিমূঢ় হয়ে দেখলাম লোকটা চলে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে নীল আলোটাই হঠাৎ বোধ হয় নিবে গেল, অন্ধকারে অন্তত আর কিছু দেখা গেল না।

কিন্তু আমার এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। স্টেশনের সেই আলোটি লক্ষ করে আবার এগিয়ে গেলাম। সেই আলোর কাছেই বাইরে বেরোবার গেটটা পেয়ে তবু আশ্বস্ত হওয়া গেল। পাশেই স্টেশনের একটিমাত্র ঘর। ভেতর থেকে টরেটক্কা টেলিগ্রাফের আওয়াজ আসছে. গেট দিয়ে বেরোতে বেরোতে কৌতূহলভরে একবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে সত্যি বিস্মিত হলাম। একটা কুলি বা চাপরাশিরও সেখানে দেখা নেই।

বাইরেও কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার, শুধু একটা অস্পষ্ট পায়ের ধূসর ধোঁয়াটে রেখা কোনোরকমে চেনা যাচ্ছে। আপাতত আর কোনো পথ না দেখতে পেয়ে সেইটিকে অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হল। খানিকবাদেই অন্ধকার কেটে গেলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না। তখন কাউকে জিজ্ঞেস করলেই চলবে।

কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জিজ্ঞেস করবার সুবিধে কিছু হল না। এরকম নির্জন পথ কোথাও আছে বলে জানতাম না। চারধারে বিশাল ঘন জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষ দূরের কথা, এই ভোরের বেলা একটা পাখির আওয়াজও সেখানে শোনা যায় না। সৌভাগ্যের কথা, জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলার দু-একটা রেখা ছাড়া এপথ কোথাও দু-ভাগ হয়ে যায়নি।

ঘণ্টা চারেক চলবার পর পথ ক্রমশ ওপরে উঠেছে বুঝতে পারলাম। জঙ্গলও সেখানে আরও নিবিড়। একটা চড়া পার হয়েই দূরে একটা পাথুরে টিবির ধারে ছোটো একটা বস্তির মতো দেখতে পাওয়া গেল। সে বস্তির পেছনে একটা বিশাল ভাঙা পোড়ো বাড়ি পাথুরে টিবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলের ওপরে মাথা তুলেছে।

কাছে গিয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চিহ্ন পেয়ে বুঝলাম, সেইটেই খনি। কিন্তু এখানেও যে জনমানব নেই! খোলার চালের ঘরগুলো অধিকাংশই সকালবেলাও বন্ধ। টালিতে ছাওয়া বাংলো প্যাটার্নের একটি বাড়ি তার মধ্যে দেখতে পেয়ে সেইটেই বিমলের থাকবার জায়গা হবে মনে করে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় মৃদু একটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। সামনেই বসবার ঘর, কয়েকটা বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল পাতা। পেছনে ভেতরের দিকের দরজায় পরদা ঝুলছে।

এ ঘরেও কেউ নেই।

পরদাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পদশব্দ শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। চমকে উঠবার কথা বটে। প্রায় ছ-ফুট লম্বা অত্যন্ত রোগা ও সরু যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গচিত্রে ছাড়া অমন চেহারা কোথাও চোখে পড়েনি আমার।

জিজ্ঞেস করলাম, 'বিমলবাবু কোথায় আছেন বলতে পার!'

'কৌন বাবু?'

'বিমলবাবু। আমি তাঁর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি! কেমন আছেন এখন!'

'নিঞ্জিনিয়ার বাবুকো মাংতা!' বলে লোকটা হাতের ও মুখের অপরূপ একটা ভঙ্গি করল!

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম,'নিঞ্জিনিয়ার বাবুই হল, কিন্তু তিনি কোথায়?'

লোকটা আমার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে যা বলল, তার মর্ম বুঝতে আমার মিনিট-দুয়েক লাগল এবং তারপর স্তম্ভিত হয়ে আমি ঘরের একটি চেয়ারে বসে পড়লাম!

pathagar.net

তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা শুনলাম। আমি টেলিগ্রাম পেয়ে যখন ট্রেনে রওনা হয়ে পড়েছি তখন বিমল এ জগৎ থেকেই রওনা হয়ে গেছে। সব চেয়ে আঘাত পেলাম যেভাবে সে মারা গিয়েছে তার বিবরণ শুনে। এক হিসেবে আমিই তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। কারণ, কোনো অসুখে বিমল মারা যায়নি, তার মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যজনক।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে বিমল বোধ হয় আমার বিদ্রূপ স্মরণ করেই জেদের বশে মাহুরি কুঠিতে সমস্ত রাত একলা কাটায়। তার সঙ্গে যারা কাজ করে তারা সকলেই মানা করেছিল কিন্তু সে শোনেনি।

শেষরাত্রে একটা অদ্ভুত গোঙানি শুনে তার বেয়ারা রামদিন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের মাঠে বিমলকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। ধরাধরি করে তাকে ভেতরে তুলে আনার পর দেখা যায়, তার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন, গায়েও নানা জায়গায় দাগ আছে। সে নিজেই পড়ে যাক বা কেউ তাকে ফেলে দিয়ে থাকুক, কোনো উঁচু জায়গা থেকে পড়ার দরুন যে তার মাথায় দারুণ চোট লেগেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর সকালের দিকে আধঘণ্টাটাক তার জ্ঞান হয়েছিল, সেই সময়েই সে আমায় টেলিগ্রাম করতে বলে। কিন্তু তারপর উন্নতির বদলে ক্রমশ তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিকেল চারটের সময় সে মারা যায়।

এদেশের লোকের, বিশেষত অশিক্ষিত কুলি-মজুরদের কুসংস্কার অত্যন্ত বেশি। তাদের ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে ভূতেই যে ফেলে দিয়েছে এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই, সেইজন্যে বিমলের মৃত্যুর পর তার সৎকার করেই তারা সদলবলে খনির বস্তি থেকে চম্পট দেয়।

আমি সেইজন্যেই সকালে এসে কাউকে কোথাও দেখতে পাইনি। বেচারা রামদিনও পালিয়েছিল। যাবার সময় তবু বুদ্ধি করে সে স্টেশনে আমার ঠিকানায় আর একটা তার করে দেয়। আগেই রওনা হবার দরুন আমি সে 'তার' পাইনি। যে স্টেশনমাস্টার সে 'তার' নিজের হাতে পাঠিয়েছিল তার অদ্ভুত আচরণের ও কথাবার্তার মানে এবার যেন একটু বোঝা গেল!

যার কাছে সমস্ত খবর পেলাম, ব্যঙ্গচিত্রের মতো চেহারার অদ্ভুত সেই লোকটিই রামদিন। আজ সকালবেলা সে সাহস করে বাবুর জিনিসপত্রের তদারক করতে কিংবা চুরির মতলবে, যে কারণেই হোক 'নিঞ্জিনিয়ার' বাবুর কুঠিতে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপার শোনার পর আমার মনের অবস্থা যা হল তা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিমলের এ পরিণামের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু এ ব্যাপারের পর চুপ করে চলে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ভূতই হোক আর যাই হোক, এ ব্যাপারে রহস্যভেদ আমায় করতেই হবে। আমার সংকল্প আমি তখনই ঠিক করে ফেলেছি।

ভেরেন্ডির জঙ্গল থেকে নিকটস্থ থানা প্রায় এক বেলার পথ। দুপুরে রামদিনকে দিয়ে সেখানে খবর পাঠিয়ে আমি রাত্রের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আর কিছুর জন্যে না হোক অন্তত বিমলের কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যেই মাহুরি কুঠিতে এক রাত আমায় কাটাতে হবে। তার জন্যে আয়োজন অবশ্য বেশি কিছু করবার নেই। শুধু একটা জোরালো বৈদ্যুতিক টর্চ ও একটা ছোটো লোহার রডই আমি সঙ্গে নেব ঠিক করলাম।

সন্ধের আগে রামদিনের ফিরে আসবার কথা, কিন্তু রাত প্রায় সাতটা হয়ে গেলেও তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। মুখে আমায় কথা দিলেও ভূতের ভয়ে সে শেষ পর্যন্ত সরে পড়েছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু পুলিশের লোকেরও দেখা নেই কেন! রামদিন কি থানায় খবরও তাহলে দেয়নি?

জঙ্গলের মাঝে পরিত্যক্ত খনির বস্তিতে আমি সম্পূর্ণ একা। রাত নটা বাজবার পর আর

অপেক্ষা করতে পারলাম না। পুলিশের লোক আসুক বা না আসুক মাহুরি কুঠি বেশি দূর নয়। দিনের বেলা বাড়িটিকে ভালো করে লক্ষ করে দেখেছি। প্রকাণ্ড দোতলা দু-মহলা কুঠি, কী খেয়ালে যে এখানে এত বড়ো বাড়ি কেউ নির্মাণ করেছিল বোঝা কঠিন। বাড়িটির অবশ্য অত্যন্ত ভগ্নদশা। বড়ো বড়ো গাছ তার দেওয়াল ভেদ করে বেড়ে উঠেছে। বাইরের দিকের ঘরগুলোর জানলা দরজার চিহ্ন আর নেই। এই শুকনো দেশেও ভেতরের ঘরগুলোতে শ্যাওলা ও আগাছা জন্মেছে প্রচুর। ভাঙা দেউড়ি দিয়ে বাইরের মহল পার হয়ে গেলে ভেতরের বিশাল যে সমস্ত গোলকধাঁধার মতো অসংখ্য ঘর পাওয়া যায়, দিনের বেলাতেও সেগুলো অন্ধকার। দরজা জানলা অধিকাংশেরই নেই, যেগুলোর আছে সেগুলোও কবজা থেকে খুলে পড়েছে। আসবাবপত্র অনেক ঘরে এখনও অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে শুধু। বোধ হয় ভূতের ভয়ে চোরও সেখান প্রবেশ করেনি বলে।

অমূলক ভয় আমার নেই। তবু টর্চ হাতে দেউড়ি দিয়ে মাহুরি কুঠিতে প্রবেশ করবার সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা ছমছম করে যে উঠেছিল তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। এমন গাঢ় জমাট অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় আমার সত্যি কখনো হয়নি, টর্চের আলোতে যেন সবলে তাকে কেটে বেরোতে হচ্ছে। বাইরের মহলের পর নীচের সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখে ভেতরের মহলে ঢুকলাম। নীচের ঘরগুলোর দুর্দশা অত্যন্ত বেশি। আগাছায় মেঝে প্রায় ছেয়ে গেছে। ইট সুরকি পাথর জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে। ঘরগুলোতে ঢোকাও বিপজ্জনক। সে সমস্ত ঘর ছেড়ে এবার ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার ঘরগুলো এখনও অনেকটা ভালো অবস্থায় আছে। একটার পর একটা টর্চের আলোয় ভালো করে পরীক্ষা করে যেতে যেতে কিন্তু অস্বাভাবিক কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। বিমলের মৃত্যুর রহস্য এ বাড়ির সঙ্গে জড়িত না থাকলে অনায়াসে মনে করা যেত যে, নেহাত কুসংস্কারে দরুন এখানকার লোক এই বাড়িটিকে এমন বিভীষিকাময় করে তুলেছে।

বাড়িটির একটি বিশেষত্ব অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। ঘরগুলো এমন বিশৃঙ্খলভাবে সাজানো, সেখানে দরজা ঘুলঘুলি এমনভাবে ছড়ানো যে, সবসুদ্ধ একটা বিরাট গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে যেতে পথ গুলিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা এখানে অত্যন্ত বেশি।

সত্যি সত্যিই গুলিয়ে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছিল। খানিক আগে যে ঘর ছেড়ে গেছি সেই ঘরেই আবার ঘুরে এসে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওপরে ওঠবার সিঁড়িটাও যে ঠিক কোনদিকে হবে বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা ঠিক করে নিয়ে আবার এগোতে যাব এমন সময় পায়ে যেন একটা কী ঠেকল। টর্চের আলো সেখানে ফেলে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিনিসটা আর কিছু নয়। একটা চামড়ার ব্যাগ, কিন্তু এ ব্যাগটির সঙ্গে আমি পরিচিত। কলকাতায় বিমলের কাছে আমি এটা দেখেছি এবং তার সুন্দর চামড়ার কাজের প্রশংসাও করেছি।

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতর এক খোপে সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া কড়কড়ে নতুন দশ টাকার নোট। আরেকটা খোপে খুচরো কয়েকটা টাকা-পয়সা ও একটা ছোটো কাগজের টুকরো। এ কাগজের টুকরোটা দেখেই আমি চিনলাম, নিজের হাতে বিমলকে এই কাগজে আমার ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম।

বিমল তার মৃত্যুর আগের রাত্রে এই ঘরে যে ঢুকেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাগ তার পকেট থেকে পড়লই বা কী করে! এবং কোনো শত্রুর হাতে যদি তার প্রাণ গিয়ে থাকে তাহলে তারা এ ব্যাগ ছোঁয়নিই বা কেন!

টর্চের আলোয় ঘরটা এবার আমি খুব ভালো করে তন্নতন্ন করে দেখলাম। ঘরটি আকারে

pathagar.net

বেশ বড়ো, অন্যান্য ঘরের চেয়ে আসবাবপত্রও একটু বেশি—দুটি ভাঙা তক্তপোশ, একটা ভাঙা টেবিল। দেওয়ালে লাগানো একটা কাঠের উইয়ে-খাওয়া বড়ো আলমারি ছাড়া খুচরো আরও অনেক জিনিস ঘরময় ছড়ানো ; কিন্তু বিমলের আর কোনো চিহ্ন সেখানে পেলাম না। এমনকী কাল যে সে এখানে ছিল তার কোনো পরিচয়ও নয়।

তবু এ ঘরেই রাতটা কাটাবার সংকল্প আমি তখন করে ফেলেছি। রাত কাটাবার ব্যবস্থা আমরা করাই ছিল, পকেট থেকে মোমবাতি বার করে ভাঙা একটা তক্তপোশের ওপর রেখে জ্বেলে ফেললাম। টর্চের আলো তো সারা রাত জ্বালানো যায় না।

বাতিটা জ্বেলে তক্তপোশের ওপর বসতে গিয়ে কিন্তু উঠে পড়তে হল। পাশের ঘরে হঠাৎ হুড়মুড় করে কী একটা ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দ। এতক্ষণ এই পোড়ো বাড়িতে এ ধরনের কোনো শব্দ কিন্তু শুনিনি।

টর্চটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কিন্তু প্রথম একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম, হুড়মুড় করে পড়বার মতো কোনো জিনিস সেখানে নেই। অথচ আমি স্পষ্ট সে শব্দ শুনেছি। হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আগের ঘরে ফিরলাম। বাতিটা কেমন করে ইতিমধ্যে নিভে গেছে কে জানে! দেশলাই বার করে আবার সেটা জ্বালতে গিয়ে জ্বালা আর হল না।

বাইরের বারান্দায় চটি পায়ে দিয়ে ছটফট করে চলার স্পষ্ট শব্দ। ঝড়ের মতো এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ ফেলবার আগেই কিন্তু শব্দটা থেমে গেছে। টর্চ ফেলে অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি দুটো মান্ধাতার আমলের শুকনো চিমড়ে ছেঁড়া বেহারি চটি সেখানে পড়ে রয়েছে।

না, ভয় তখনও আমি পাইনি, বরং কোনো দুষ্ট লোকের কারসাজি যে এর ভেতর আছে সেই সন্দেহই আমার তখন দৃঢ় হয়েছে। সে কারসাজির সমুচিত শাস্তি দিতে হবে!

চটি দুটো হাতে করে তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরলাম এবং বাতি জ্বেলে গ্যাঁট হয়ে ভাঙা তক্তপোশের ওপর বসলাম—ঘটনার পরিণতি দেখবার জন্যে। ভূতুড়ে চটি যদি হয় তো আমার চোখের সামনেই চলুক দেখি! মিনিট-দশেক কোনো কিছুই হল না। ভুতুড়ে চটির ক্ষমতার বহর দেখে নিজের মনেই হাসছি, এমন সময় সত্যিই সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

চুপিচুপি আমার পেছনে কে যেন স্পষ্ট আমার নাম ধরে ডাকল একবার!

মোমের বাতিতে ঘরে তেমন আলো না হলেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেছনে কেউ কোথাও নেই। তবে এ শব্দ কোথা থেকে এল!

আমার মনের ভুল? কিন্তু মনের এরকম ভুল হওয়াও তো ভালো লক্ষণ নয়। ভয় পেয়ে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় তারাই চোখে নানারকম ভুল দেখে, কানে নানারকম আওয়াজ শোনে বলে তো জানি।

না, আরও সতর্ক ও সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবার। নিজের মনের ভুলে ভয় পাওয়ার মতো লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। এতক্ষণ শুধু ঘরগুলো ঘোরাফেরা করতেই কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। শীতকালের ভোর হতে এখনও প্রায় ঘণ্টা-ছয়েক বাকি। এই ছ-ঘণ্টায় শুধু ঘুমে চোখ না জড়িয়ে আসে এইটুকু দেখতে হবে। বসে থাকলে ঘুম আসে বলে পায়চারি করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু আশ্চর্য! আমার প্রত্যেক পা ফেলার শব্দের সঙ্গে বাইরে আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে. সে যদি কারোর পায়ের শব্দ হয় তাহলে তার চেহারাখানা কীরকম তা কল্পনা করাও কঠিন। বারান্দায় একটা হাতি হাঁটলেও বোধ হয় অমন শব্দ হত না।

পায়চারি করতে করতে ইচ্ছে করে একবার থমকে দাঁড়ালাম। বাইরের শব্দও গেল থেমে। আবার চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সে শব্দ শোনা গেল।

pathagar.net

আবার বাইরে ব্যাপারটা দেখতেই যেতে হল। টর্চ নিয়ে সমস্ত পথটা কিন্তু তন্নতন্ন করে বৃথাই খুঁজে দেখলাম।

ফিরে এসে দেখি আবার আলো গেছে নিভে। না, ব্যাপারটা ক্রমশই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশলাইটা বার করেছি এমন সময়—

'আলো জ্বেলো না, ভূপেন!'

মিথ্যে বলে লাভ নেই, সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ গলানো জলের স্রোত নেমে গিয়ে সমস্ত শরীর অবশ করে দিল। এ স্পষ্ট বিমলের গলা!

খানিকক্ষণ শুকনো গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোল না, তারপর জড়িতস্বরে কোনো রকমে বললাম, 'কে তুমি?'

'আমি! আমি বিমল! দোহাই তোমার, আলো জ্বেলো না।'

'কেন?'

'তাহলে আমার এখানে থাকা হবে না। তোমাকে দুটো কথা বলে যেতে চাই, তাও বলতে পারব না। তুমি ভয় পেয়েছ, ভূপেন?'

ধরা গলায় ঢোক গিলে বললাম, 'না।'

'তাহলে বসো, টর্চ না জ্বেলে এগিয়ে এসে তক্তপোশটায় বসো।'

আমি হাতড়ে হাতড়ে তক্তপোশটায় এসে বসলাম।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল, 'তুমি আসাতে কী খুশি যে হয়েছি বলতে পারি না!'

কথাটা শুনে নিজে যথেষ্ট খুশি না হলেও বললাম, 'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, তুমি না এলে আমায় এইখানে কতকাল বন্দি হয়ে থাকতে হত কে জানে!'

'কেন?'

'দুটো দরকারি কথা না বলে আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছিলাম না।'

'পৃথিবী ছেড়ে কোথায়?'

খানিকক্ষণ কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় বললে না?'

'সেকথা জানতে চেয়ো না, তোমাদের জানবার অধিকার নেই।'

'ও, কিন্তু তুমি কি বরাবর এখানে আছ?'

'বরাবর। যতক্ষণ তুমি এসেছ তোমার পাশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন একটু তোমার পাশে বসব?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, কী দরকার! কিন্তু ওসব শব্দ-টব্দ কী করছিলে?'

'আমি! না না, আমি নয়, ও ওরা সব করেছে।'

সভয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা!'

'হ্যাঁ ওরাও আছে, ওরা ওইরকম করতে ভালোবাসে, আমার কিন্তু ভালো লাগে না। তবে—'

'থামলে কেন? কী তবে?'

'তবে অনেকদিন পৃথিবীতে থাকতে হলে বিরক্তি আসে, তখন ওইসব বদ খেয়াল হয়!'

'ওরা কি অনেকদিন আছে?'

'অনেকদিন! যোধমল তো মানসিংহের সঙ্গে মনসবদার হয়ে এসেছিল, আর দেবদত্ত অশোকের সময়ের!'

'এতদিন ওরা কেন এখানে আছে?'

'কী করবে মায়ার বন্ধন! যোধমল এখানকার এক রাজকোষ লুট করবার সময় দামি একটা

pathagar.net

মোতির মালা পেয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। কাউকে সে লুকোন জায়গা জানাবার আগেই তরোয়ালের খোঁচায় মারা যায় বলে বেচারার আজও মুক্তি হল না।'

একটু উৎসুকভাবে বললাম, 'কাউকে জানালেই তো পারে।'

'উঁহুঃ, যাকে তাকে জানালে হবে না, ওর বংশধর, আত্মীয় স্বজন, অন্তত দেশের লোক না হলে জানাবার উপায় নেই'

'অর্থাৎ মারোয়াড়ি চাই?'

'হুঁ—মারোয়াড়িরা আবার এধার মাড়ায় না।'

যোধমল সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে বললাম, 'আর দেবদত্ত?'

'দেবদত্ত? দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে দেখি!'

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ ; তারপর শোনা গেল, 'দেবদত্তর উদ্ধার হওয়া আরও শক্ত।'

'কেন?'

'অশোকের সময় ও মঞ্জুশ্রী না ধ্যানশ্রীর কী একটা মূর্তি গড়েছিল।'

'সেটা এখনও আবিষ্কার হয়নি বুঝি? কোথায় সেটা? আমি না হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে...'

'না, না, আবিষ্কার হয়েছে বই কী! কিন্তু পণ্ডিতরা তর্কাতর্কি করে তার নাম নিয়ে বাধালে গোল, কেউ বলছে সেটা মূর্তিই নয়, কেউ বলছে—কী বলে—প্রজ্ঞাপারমিতা!'

'তাতে কী!'

'চুপ চুপ। দেবদত্ত একেবারে ক্ষেপে উঠবে এক্ষুনি! তাতেই তো সব। নাম ঠিক হওয়া না দেখে ও কিছুতেই যেতে পারছে না এখান থেকে!'

'আমি না এলে তুমিও যেতে পারতে না!'

'বোধ হয় না।'

'ওইসব বদ খেয়াল!'

'তাও হয়তো হত এক্ষুণি! মাঝে মাঝ কীরকম নিশপিশ করে...'

'কী নিশপিশ করে? হাত!'

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল, 'হাত তাকে বলে না! তবে...'

গলার স্বরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বললাম, 'যাকগে ভাই, তোমার কী কথা ছিল না, যা বললেই তোমার ছুটি?'

'হ্যাঁ, ছুটি—একেবারে ছুটি।'

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলা হলেই তুমি চলে যাবে?'

'তৎক্ষণাৎ!'

'কিন্তু তুমি চলে গেলে এই...এই যোধমল আর দেবদত্ত...'

'না, না তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না, আমার বারণ আছে।'

'তবে বলো এবার!'

'এই বলছি...কুঁক্!'

'ও আবার কী?'

'ও কিছু না।'

'কিন্তু হেঁচকির মতো শোনাল যেন!'

'পাগল! হেঁচকি কোথায়—কুঁক্।'

'কিন্তু আমরা তো ওকেই হেঁচকি বলি।'

'আমরা বলি না!

'তবে কী ওটা?'

pathagar.net

'ও আমাদের ভৌতিক দেহের বুৎকার।'

'বুৎকার কী?'

'ও-কথার মানে তোমরা বুঝবে না! ওটা ও-জগতের কথা!'

'ও-জগতের কথা আলাদা নাকি! এতক্ষণ তো বেশ বাংলা বলছিলে!'

'অনেক কষ্টে অনুবাদ করে বলতে হচ্ছিল। কিন্তু বুৎকারের অনুবাদ হয় না—কুঁক্।'

'নাঃ ভাই, এটা হেঁচকি!'

'উঁহুঃ, বুৎকার।'

'আমি তাহলে আলোটা জ্বালছি!'

'দোহাই তোমার! এখনও আমার কথা বলা হয়নি...কুঁক্।'

'কথা তুমি পরে বোলোখন। এখন একটু জলের চেষ্টা দেখি।'

'আমাদের জল লাগে না, আলো জ্বাললেই আমায় চলে যেতে হবে।—কুঁক্।'

'তা না হয় খানিক চলে গিয়ে তোমার 'বুৎকারটা' থামিয়ে এসো।' বলে সত্যি দেশলাই বার করে মোমবাতিটা জ্বেলে ফেললাম।

কিন্তু একী! সত্যিই ঘরে যে কেউ নেই! এ কী ব্যাপার!

'...কুঁক্...'

'বিমল, তুমি আছ এখানে?'

বিমলের কোনো উত্তরের বদলে শোনা গেল, 'কুঁক্!'

কয়েক সেকেন্ড মাত্র বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমার মনে কোনো সংশয় আর রইল না। এগিয়ে গিয়ে কড়া দুটো ধরে সজোরে কাঠের আলমারির পাল্লা দুটো আমি খুলে ফেললাম।

'একী বিমল, তুমি!—সশরীরে?'

বিমলের গলা থেকে বেরোল—'কুঁক্।'

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোধ হয় অনেকখানিই বোঝা গেছে। হেঁচকিটুকু উঠে সব না খেচড়ে দিলে বিমলের ফন্দিকে সার্থক বলা চলত। তার টেলিগ্রাম আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং আগের দিন মাইল দশেক দূরের এক মস্ত মেলার জন্যে খনির লোকজনকে ছুটি দেওয়ায় তার অন্যদিকে সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। শুধু রামদিনকে এর মধ্যে তাকে টানতে হয়েছিল। পোড়ো বাড়িতে তার দুরমুশ ফেলা ও পেটানোর আওয়াজের যে নমুনা সে দেখিয়েছে তাতে তারিফ তাকে অবশ্যই করতে হয়। অবশ্য স্টেশনমাস্টারের অদ্ভুত মূর্তি ও আচরণ বিমলের ফন্দিকে সাহায্য করবে একথা সেও ভাবেনি।

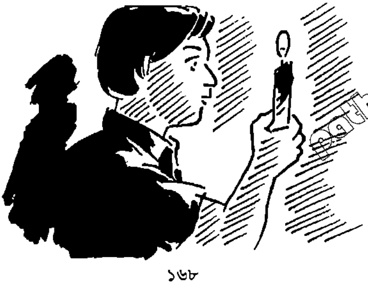

pathagar.net

নিশুতিপুর

নিশুতিপু—র! নি-শু-তি-পুর।

রানু ধড়মড়িয়ে বাঙ্কের উপর উঠে বসল। এইখানেই নাববার কথা না? সঙ্গে মালপত্র তো কিছু নেই। সুতরাং নেমে পড়লেই তো হয়। যেমনি মনে হওয়া, তেমনি বাঙ্ক থেকে কামরার মেঝেতে, আর কামরার মেঝে থেকে একেবারে প্লাটফর্মে।

কী ঘুটঘুট্টে অন্ধকার রে বাবা! এমন অখদ্দে স্টেশন তো কখনো দেখেনি! ব্ল্যাকাউট তো উঠে গেছে। স্টেশনে এখনও একটা আলো দিতে পারে না? দূরে যদি-বা একটা মিটমিটে আলো দেখা গেল, সেটা জ্বলে উঠেই আবার গেল নিভে।

এখন কী করা যায়? ট্রেনটাও ঠিক স্টেশনের মতোই অন্ধকার, দেখতে দেখতে সেটাও যেন অন্ধকার কুয়াশার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

কার সঙ্গে যেন রানুর দেখা করবার কথা। কে যেন তাকে নিয়ে যেতে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় কে!

দূরে ওখানে কটা টিমটিমে আলোর জটলা দেখা যাচ্ছে না? ওদিকে এগিয়ে খবর নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী! রানু সেদিকেই পা বাড়াল দোমনা হয়ে।

'এই যে!'

রানু থমকে দাঁড়াল। গলাটা সে যেন চেনে।

'তোমাকেই খুঁজতে এসেছিলাম।'

রানু অন্ধকারে একটা ঝাপসা চেহারা দেখতে পেয়ে বলল, 'কিন্তু, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'দাঁড়াও, আলোটা একটু জ্বালছি।'

মিটমিটে একটা ছোট্ট কুপির মতো আলো এবার জ্বলে উঠতে রানু ছেলেটিকে দেখতে পেল। তার বয়সিই হবে। ছেলেটি লাজুকের মতো একটু হেসে বলল, 'আমি তামসকুমার।'

'তামসকুমার!'

রানুর মনে হল, তামসকুমারেরই যেন তার জন্যে স্টেশনে আসবার কথা।

তামসকুমারের সঙ্গে পরিচয়ও যেন তার অনেকদিনের। শুধু এখন সব কথা মনে পড়ছে না।

আলোটা কিন্তু ইতিমধ্যে আবার নিভে গিয়েছে। আবার সেই গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। এ অন্ধকারে কতক্ষণ এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, কোথাও যাবার উপায় নেই। পথই তো চেনা যাবে না।—

'তোমার আলোটা আবার নিভে গেল নাকি?'—রানু এবার জিজ্ঞেস করল।

'না, নিভিয়ে দিলাম।'—বলল তামসকুমার।

'নিভিয়ে দিলে! এ আবার কী অদ্ভুত কথা! শখ করে কেউ এই অন্ধকারে থাকে নাকি!' রানু একটু বিমূঢ় হয়েই বলল, 'কেন তেল নেই নাকি বাতিতে!'

'তেল? না, তেল একেবারে নেই এমন নয়। তবে...' তামসকুমারের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব।

'তবে কী?'

'কী তা তো তুমিও জান ভাই।' তামসকুমার একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল—

pathagar.net

বলে কী তামসকুমার! রানু তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।—অথচ—অথচ তার যেন বোঝা উচিত, মনের ভেতর এরকম একটা সন্দেহও হচ্ছে।—

যাই হোক, বোকা বলে ধরা দিতে রানু সহজে রাজি নয়। একটু ভারিক্কিভাবেই বলল, 'তা কি আর জানি না, তবে একটু জ্বাললে দোষ কী? কেউ তো আর ধরে নিয়ে যাবে না!'

'ধরে নিয়ে যাবে না! বল কী! আর তাহলে ধরবে কীসে?'—তামসকুমার সবিস্ময়ে বলে উঠল।

না মাথাটা একেবারে গুলিয়ে দিয়ে ছাড়ল! আলো জ্বাললে ধরে নিয়ে যায়—এ আবার কোন মগের মুল্লুক?

মনে যাই হোক, বাইরে নিজের চাল বজায় রাখবার জন্যে রানু গম্ভীরভাবে বলল, 'আহা, ঠাট্টা করছিলাম, বুঝতে পারছ না? তবে যদি আলোটা একটু জ্বালতে ভাই, একটু খুঁজে নিতাম!'

'কিছু হারিয়েছে নাকি! কী খুঁজতে চাও?' তামস উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তেমন কিছু নয়, নিজের হাত-পাগুলো আছে কি না একটু খুঁজে দেখতাম।'

তামস একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ তখন একটুখানি না হয় জ্বালছি। তবে বুঝতেই তো পারছ, যতখানি পারা যায়, তেল আজ বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সেই মুহূর্তটির জন্যে যার যত আলো সব দরকার।'

ও বাবা! ধাঁধা যে ক্রমশ আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে।—এ আবার কোন মুহূর্তের কথা বলে! যাই হোক, আলোটা তো জ্বলুক। অন্ধকারে বুদ্ধিটাও যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে।—

কিন্তু আলো জ্বালা আর হয়ে উঠল না। তামসকুমার দেশলাই না চকমকি-পাথর কী একটা ঠোকবামাত্র অদূরেই লোহা-বাঁধানো জুতোর আওয়াজের সঙ্গে বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা গেল, 'কৌন হ্যায়। বত্তি জ্বালাতা কৌন?'

চোখের পলক পড়তে না পড়তে তামসকুমর সেই হাঁক শুনেই রানুকে এক হেঁচকা টান দিয়ে টেনে দৌড়।

হোঁচট খেয়ে হাত-পা ছড়ে অনেকদূর গিয়ে যখন সে থামল তখন দুজনেই বেশ হাঁফাচ্ছে।

'আর একটু হলেই ধরে ফেলেছিল আর কি।' তামস বলল।

চালাক সেজে থাকা বুঝি আর চলে না। তবু কায়দা করে ব্যাপারটা জানবার ফিকিরে রানু একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলল, 'ধরে ফেলত। ধরে আর করত কী?'

'ধরে আর কী করত।' তামসকুমার সত্যি যেন স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তুমি কি সব ভুলে গেছ নাকি? ধরলে জেলে পুরে দিত না। আমার কি আলোর লাইসেন্স আছে?'

'আলোর লাইসেন্স?'—রানুর মুখ দিয়ে আপনা থেকেই কথাটা বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আলোর লাইসেন্স নেবার মতো টাকা আমার কোথায়। এ তো আমার চোরাই আলো।'

রানুর মুখ দিয়ে এবার আর কোনো কথা বেরোল না—সে সত্যি তাজ্জব বনে গেছে।—

তামসকুমারই আবার বলল, 'শুধু আজকের জন্যে, কত কষ্টে যে এই চোরাই আলো যোগাড় করেছি, কী বলব।'

'কিন্তু আজকে...' রানু কথাটা ইচ্ছা করেই শেষ করল না।

এখনও সে একেবারে ধরা দিতে প্রস্তুত নয়।

'বাঃ, আজকেই তো শ্রাবণের অমাবস্যা—মহামহিমের অভিষেক তিথি তো আজই'

'ওঃ, তাও তো বটে। ভুলেই গেছিলাম।' নিজের মর্যাদা রানু এখনও বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

'সেই কথাটাই ভুলে গেছিলে? তাহলে এসেছ কী করতে?' তামসকুমার বেশ যেন ক্ষুণ্ণ।

কী করতে এসেছে তা কি ছাই সে নিজেই জানে। কিন্তু এসে যখন পড়েছে ব্যাপারটা না

pathagar.net

বুঝে সে যাবে না। আপাতত কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে রানু বলল, 'আচ্ছা, আমারও তো চোরাই আলো একটা হলে হত কোথায় এখন পাওয়া যায়, বলো তো।'

তামস এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'চোরাই আলো চাই? তা বলনি কেন এতক্ষণ? চোরাই আলোর অনেক আড্ডা আছে। তবে পুথি পাড়াতে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধে।'

'কেন?'—রানু সোজাসুজি এবার জিজ্ঞেস করে ফেলল।

'ওদের আলো ভারী মজার। ফুঁ দিলে নেভে না, জলে ডোবালেও জেগে থাকে। আর লুকিয়ে নিয়ে বেড়াবার ভারী সুবিধে। চৌকিদাররাও সহজে চিনতে পারে না। তা ছাড়া ও আলোর কখনো ক্ষয় নেই। বিনা-তেলেই যুগযুগান্ত জ্বলে। চলো, ওই পাড়াতেই যাই।' তামস রানুর হাত ধরে এগিয়ে চলল।

দু-পাশে আবছা সব বাড়ি অমাবস্যার অন্ধকারে যেন বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটা একেবারে অন্ধকার, কোনোটার বন্ধ জানলার ভেতর দিয়ে অতি ক্ষীণ একটু আলোর রেখা যেন ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে।

এই অন্ধকারের ভেতর রাস্তার একটা মোড় ঘুরে হঠাৎ দূরে এক প্রকাণ্ড উজ্জ্বল ঝলমল বাড়ি দেখে রানু একেবারে অবাক হয়ে গেল।

'ওটা কী?'

'বাঃ, ওটাই তো জেলখানা। এতদিন যেখানে যে কেউ বেআইনি আলো জ্বেলেছে, সকলের হয়ে আলো জ্বলাবার অধিকারের জন্যে যারা লড়াই করেছে, সবাই ওই জেলখানায় বন্দি। সারা বছর ওরা নীরবে সব সয়ে যায়, শুধু বছরে এই একটিবার ওরা বিদ্রোহ করে। ও তো ওদের বিদ্রোহেরই আলো। দেখতে পাচ্ছ না, এরই মধ্যে জমাদারেরা সব নিভিয়ে ফেলেছে। ও আলোর দিকে চাওয়াও যে অপরাধ।'

সত্যি! দেখতে দেখতে সে আলো নিভে গেল। আবার সেই জমাট অন্ধকার।

পুথিপাড়ার দিকে বেশিদূর কিন্তু আর তাদের যেতে হল না। রাস্তার ধারে হঠাৎ একটা আলো তারা কুড়িয়ে পেল।

তামসকুমার তার হাতে আলোটা তুলে দিতে রানু অবাক হয়ে বলল, 'এ আলো এখানে এমনভাবে পড়েছিল কী করে?'

'হয়তো কেউ ধরা পড়ার ভয়ে ফেলে গেছে, কিংবা কেউ হয়তো আমাদের মতো কারোর হাতে পড়বার আশাতেই এ আলো এখানে রেখে গেছে। নিজের জীবন দিয়ে কতজন এমন আলোর আয়োজন করে রেখে যায় ভবিষ্যতের জন্যে।'

তামসের কথা শেষ হতে না হতেই দূরে মাঝ রাতের প্রহর বাজছে শোনা গেল। যেখানে যা সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল সব এবার একেবারে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। সঙ্গে সঙ্গে কাছেই কোথায় অশরীরী কণ্ঠে না বেতারে, বজ্রগম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল—'জয়, তিমিরেশ্বরের জয়, যিনি আদি, যিনি অনন্ত, যিনি শাশ্বত, সেই তিমিরেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি।'

'—হে আমার নিশুতিপুরের ভক্ত প্রজাবৃন্দ...'

রানু ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'এ আবার কী ভাই?'

এই স্বর শুনেই তামসকুমার কী যেন হয়ে গেছে।

কেমন যেন অভিভূতভাবে সে বলল, 'চুপ চুপ। মহামহিমের আহ্বান—বুঝতে পারছ না।'

রানু হতভম্ব হয়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল। মহামহিম তখন বলে যাচ্ছেন, 'আমার অভিষেক তিথির এই সাংবাৎসরিক উৎসবে তিমিরেশ্বরের পদতলে দাঁড়িয়ে সেই কথাই আবার আমি তোমাদের জানাই।—আলোক আমাদের পরম শত্রু, আমাদের জীবনের অভিশাপ। সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত বিপ্লব বিপর্যয়ের মূল, এই আলো। যার চোখ একবার আলোর

pathagar.net

স্পর্শ পেয়েছে, সমস্ত জীবন তার অভিশপ্ত—দেহ-মন তার চিরদিনের মতো বিষাক্ত, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতার আলোর তৃষ্ণায় জীবনে কোনোদিন সে আর শক্তি পায় না। আলোক-পিপাসার এই সংক্রামক ব্যাধি অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়।

আলোকের এই অমঙ্গল থেকে চিরদিন আমি তোমাদের রক্ষা করে এসেছি, চিরদিন রক্ষা করব। এখনও এদেশে সম্পূর্ণ নিরালোক সম্ভব হয়নি, কিন্তু ভ্রান্ত, ধর্মভ্রষ্ট, সমাজদ্রোহী যে সমস্ত পাষণ্ড আলোকের মাদকতার দ্বারা ভুলিয়ে এই পরম শান্তি ও সুখের রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করতে চায়, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে কোনোদিন আমি ত্রুটি করিনি।—আমাদের একমাত্র উপাস্য, তিমিরেশ্বরকে প্রণাম করে আবার আমি বলি, চির-স্নিগ্ধ, চির-মধুর চির-কল্যাণময় অন্ধকার আমাদের আচ্ছাদিত করে রাখুক, এরাজ্য থেকে সমস্ত আলো নির্বাপিত হয়ে যাক।—'

'জয়, তিমিরেশ্বরের জয়!'

'জয় তিমিরেশ্বরের জয়!' বলে, হঠাৎ তামসকুমারকে তার হাতের আলোটা ফেলে দিতে দেখে রানু অবাক হয়ে বলে উঠল, 'ওকী, করছ কী?'

তামসকুমার কাতরভাবে বলে উঠল, 'না না, আমি পাপী, আমি পাষণ্ড, হে তিমিরেশ্বর, আমার অপরাধ তুমি মার্জনা করো।'

তামসকুমার সেইখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আরকি! তার ঘাড় ধরে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রানু বলল, 'দেখতে পাচ্ছ, ওদিক দিয়ে কারা আসছে?'

'কারা আসছে?' তামস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অবাক হয়ে বলল, 'সত্যিই তো, ওই তো বিদ্রোহী আলোর মিছিল চলছে পাহাড়ের ওপর তিমিরেশ্বরের মন্দিরের দিকে। অন্ধকার যার চিরদিনের আবরণ সেই আদর্শবান মহামহিমকে ওরা স্বচক্ষে দেখবে, নিজের মুখে তাঁকে জানাবে নিজেদের নিবেদন...'

ফেলে দেওয়া আলোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সে আবার বলল, 'কিছু মনে কোরো না ভাই, কিছুক্ষণ কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে গেছিলাম। মহামহিমের স্বর শুনলেই কেমন যেন আমার সমস্ত দেহ-মন অবশ হয়ে যায়। কিন্তু আর ভয় নেই—এই মিছিলে যোগ দিতেই তো আমরা এসেছি, চলো!'

তারা কয়েক পা যেতে-না-যেতেই কিন্তু চারিদিকে ভয়ংকর কাণ্ড বেধে গেল। কোথা থেকে যমদূতের মতো বিশাল মিশ্‌কালো সব প্রহরী এসে আলোর মিছিলের ওপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব দল! একে একে সবাই বুঝি বন্দি হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত আলো যাচ্ছে নিভে।

রানুর শরীরের ভেতর দিয়ে যেন একটা আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠল। মিছিলের একজনের হাত থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে তামসকে টানতে টানতে ঝড়ের বেগে সে সমস্ত প্রহরীদের এড়িয়ে একেবারে সেই তিমিরেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে থামল।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। কিন্তু রানুর আর তামসকুমারের গায়ে এখন যেন শত-হস্তীর বল। দুজনের ধাক্কায় মন্দিরের দরজা মড় মড় করে ভেঙে পড়ল। মশাল হাতে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে এদিক-ওদিক চারিদিকে ব্যাকুল চোখ বুলিয়ে, তারা অবাক। কোথায় বা তিমিরেশ্বরের মূর্তি, কোথায় বা মহামহিম! তাদের কোনো চিহ্নই নেই। শুধু কয়েকটি ধেড়ে ইঁদুর আলো দেখে সভয়ে চারিদিকে দুড়দাড় করে ছুটে পালাল।

হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে তারা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। আম্‌সির মতো শুক্‌নো আর কোলা ব্যাং-এর মতো ধুমসো গুটি কয়েক লোক একদিকে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপছে। তাদের কারোর কাছে মুখে দিয়ে চেঁচাবার চোং, কারোর হাতে পুজোর ঘণ্টা, কারোর বা

Pathagar.net

বাটখারা, কারোর বা গায়ে শ্যামলা, কারোর মাথায় ঝলমল-জরির শাড়ি। রানু আর তামসকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা কাঁপতে কাঁপতে চাদর সরিয়ে বেরিয়ে এসে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'দোহাই বাবা, আমাদের প্রাণে মেরো না। তোমার যত খুশি আলো জ্বালো, তার আমরা কিছু বলব না। যত তেল লাগে কেনা দামে তোমাদের দেব।' কথা শুনে তামস তো এবার থ।

'ও, তোমরাই তাহলে এতদিন ফাঁকি দিয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এসেছ! আচ্ছা, দাঁড়াও!'

কিন্তু সে কিছু করবার আগেই যমদূতের মতো সেই সব প্রহরীরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে তাদের জাপটে ধরল একজন রানুর হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়ে মন্দিরের জানলা দিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অন্যেরা তখন পিছমোড়া করে তাদের বাঁধছে।...

রানু প্রাণপণে তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চীৎকার করে উঠল, 'বুজরুকি, তোমাদের সব বুজরুকি—আমি ফাঁস করে দেব।'

হঠাৎ নীচে থেকে তাকে নাড়া দিয়ে মামাবাবু বললেন, 'আরে পড়ে যাবি যে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কুস্তি করছিস?

রানু ধড়মড় করে ওপরের বাঙ্কে উঠে বসল, আরে—কোথায় নিশুতিপুর, কোথায় তিমিরেশ্বর আর কোথায় মহামহিম। সে তো মামাবাবুর সঙ্গে ট্রেনে মধুপুর যাচ্ছে।

কিন্তু নীচে ডানদিকের বেঞ্চিতে ওই চিমসে রোগা আর ধুমসো মোটা লোক দুটিকে চেনা-চেনা লাগছে না!

তিমিরেশ্বরের মন্দিরে এদেরই দেখেছিল নাকি?

জঙ্গলবাড়ির বউরানি

অনেকদিন থেকেই সাধ, অকুল বিশাল কোনো নদীর ওপর পানসি করে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়ালমতো স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেকদিন থেকে—মানে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝরাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনোহাঁসের পাখার শব্দ—সে আর মন থেকে কোনোকিছুতেই মুছে যায়নি। সেসব মধুর নামগুলোও ভুলিনি! শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোনো জায়গা বলে মনে হয় না আমার এখন। সে যেন কোনো রূপকথার ভৌগোলিক নাম। আমার ছিন্নপত্রের পদ্মায় তো রেলিব্রাদার্সের পাটের স্টিমার যায় না, সে পদ্মা সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর একটি—রুপো-গালানো তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড়োজোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর-সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলার সে সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল, তা বলতে পারি না, কারণ নদীটা পদ্মা নয়—ধলেশ্বরী। তাতে কিন্তু এমন কিছুই এসে যায় না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হল, ফুলে উঠলেই হল হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হল তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মায় ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হত। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগত কাটাকাটি মারামারি ; আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, আর স্মৃতিও জমত না মধুর করে।

আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কীসের! সেও ছোটোখাটো রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাঙন ধরায় লোকালয়ের কূলে। তার বুকে চর জাগে স্বপ্নের মতো, চখাচখির ডাকে তারও দুকূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে!

মাঝারি একটি পানসি ভাড়া করেছিলাম। মাঝিমাল্লা, চাকরবাকর নিয়ে সবসুদ্ধ আমরা ছজন মাত্র।

এত লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াহুড়োয় ধীরেসুস্থে যেমন খুশি, ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, তাও বড়ো বড়ো গঞ্জে, কি লোকালয়ের ভিড়-করা ঘাটে নয়, শূন্য নির্জন তীরে তীরে, শুধু পাখির ঝাঁক-বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবাইর ছুটি, একা চরণ বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার মোহানায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হয়, তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদের।

'ছিন্নপত্রের' স্বপ্নের কুয়াশা মনের মধ্যে না থাকলে পানসির জীবন বেশ পানসে হয়ে উঠতে পারত। গরমিল তো কম নয়। ছিন্নপত্রের পদ্মায় কচুরিপানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মন পড়ে না। তা ছাড়া রামসেবকদের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত—খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল ; কিন্তু আমি ছিলাম ওসবের প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে, এইজন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিকভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক-এক সময়ে নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝরাতে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পানসির খোলে, আর মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থমথম করছে, তখন মিশরের মমির মতো শুধু চরণ বসে আছে নিস্পন্দভাবে হালে। কামরা

pathagar.net

থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা!

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা-চেহারা হতে পারে, এ আমি আগে কখনো জানতাম না। রং তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন কী একটা অপার্থিব বিবর্ণতা! যেন অনেকদিন মাটির তলায় সে চাপা পড়েছিল! এই সবেমাত্র যেন উঠে এসেছে শ্যাওলা-ধরা ভিজে মাটি গা থেকে মুছে।

লোকটার ধরন-ধারনও অদ্ভুত। কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারী হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু-আধটু 'হাঁ-না' ছাড়া তাকে আর কিছু বলতে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলামেশাও নেই। তবু সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ করে দূরে রেখে চলে, সে কেবল তার মরা-চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্যে।

সেদিনও মেঘে-ঢাকা ভাঙা চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছমছম করছে।

সন্ধে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিসফিস গুনগুন শুনছিলাম। রাত একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেল।

একজন মাঝি সাহস করে এগিয়ে এসে, কান-মাথা চুলকে, আমতা-আমতা করে জানাল যে, আমি যদি তাদের একটা রাত ছুটি দিই, তাহলে তারা একটু ভালো 'যাত্রা' শুনে আসে।

যাত্রা কোথায় হচ্ছে, হেসে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেইখানেই নাকি ভারী নামজাদা এক দল এসেছে। এমন 'যাত্রা' শোনবার ভাগ্য নাকি এ তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে সে আমাকেও সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করে ফেলে এবার।

হেসে বললাম, 'না মাঝির পো, আমার অত শখ নেই। তবে তোমরা শুনে আসতে পার ইচ্ছে হয়েছে যখন। কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারব না।'

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানাল যে, আমায় সে-কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোরবেলা, কিন্তু আমার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম, 'তা যদি একটু করে, মন্দ কী!

মাঝি সাহস দিয়ে জানাল—এখানে ভয়ের অবশ্য কিছুই নেই। জল-ঝড়ের সময় নয়, নৌকো নোঙর-বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম, জানি না, 'চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে?'

মাঝির মুখে 'যাচ্ছে বই কী কর্তা' শুনে কেমন যেন আশ্বস্ত বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একেবারে পানসির কামরার ছাদে উঠে গিয়ে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখনো তো হয়নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানি ঠাকুর রামসেবকও পর্যন্ত সঙ্গে গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা-দুটো নৌকোর আলো পর্যন্ত নেই। বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—একথা ভাবতেও কেমন যেন পুলকে রোমাঞ্চ হয়!

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু পরে সেটা রইল না। রাত্রির নির্জনতা ধ্যান করতে করতে কখন বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গিয়েছে; ভাঙা চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কূলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন মলিন চেহারাটা ভারী অস্বস্তির লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখি দূর আকাশে কীরকম আর্তনাদের মতো ডাক ছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে উঠলাম একটু।

pathagar.net

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোনো উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম শরীরটা যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে!

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এত বড়ো একটা বিশাল পোড়োবাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটল ধরা বিশাল দেয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনও যেন আকাশ আড়াল করে আছে। বুঝলাম, এতক্ষণ জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এই পোড়ো প্রাসাদ কুয়াশায় মিশে ছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যের মতো জেগে উঠেছে। এই পোড়ো প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হল।

পেছনে কী একটা ঝনঝন করে শব্দ হল যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আরেকটি লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়।

'একী চরণ!'—প্রায় ধরা গলায় বললাম, 'তুমি কখন ফিরলে? যাত্রা দেখলে না?'

সে শেকল-সমেত নোঙরটা তুলে পানসির ওপর রেখে গম্ভীর স্বরে বলল, 'না!'

'কিন্তু নোঙর তুললে কেন?' অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার একদম ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'দেখেছেন!'

দেখিনি ; কিন্তু এইবার দেখলাম। সেদিন রাত্রিশেষে যে অদ্ভুত, আসাধারণ সব ঘটনা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছে আমার জীবনে, তখন সেসবের মর্ম তেমন ভালো করে বোধ হয় বুঝিনি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারীমূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

'কে ও? জানো নাকি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলাম বিস্ময়ে, উত্তেজনায়।

হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পানসিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত-ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান! দোহাই আপনার!'

সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম, 'আমার যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করব ; কিন্তু কী ব্যাপার, আমার আগে একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।'

আঁচল ঢাকা দিয়ে কী যেন একটা ভারী জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামরার চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে ভদ্রতা করে বললাম, 'ওটা বড্ড ভারী বোধ হয়, আমার হাতে দিতে পারেন।'

তিনি এমন আঁতকে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ওকথা বলতাম না। একটু বিমূঢ় ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল করে দিলাম!

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধ হয় একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত আকারের বাকসো বের করে আমার সামনে রেখে তিনি বললেন, 'আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি ; কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমনি হয়ে গেছি!'

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভালো করে দেখলাম। চেহারায় তাঁর স্পষ্ট বড়োঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা, ধরন-ধারন যেমন তাঁর অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত তাঁর পোশাক! যাই হোক, তখন সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। তাঁর কথার উত্তরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয়টা কীসের? কী আছে ওতে?'

pathagar.net

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সের ডালাটা এবার তুলে ধরলেন। লণ্ঠনের সেই সামান্য আলোতেই বাক্সের ভেতর কুণ্ডলী পাকানো একরাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়—হিরে-মুক্তোর জড়োয়া গহনা! তেমন গয়না আমি তো কখনো চোখে দেখিনি।

মহিলাটি মুঠো করে কয়েকটা গয়না বাক্স থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড়বস্তু নয়, জীবন্ত ক্রূর সরীসৃপ!

দরজায় খুট করে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি, চরণ। কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে সে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক!

পলক ফেলতে না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম, 'তুলে ফেলুন এসব বাক্সে। এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কী বলে এই রাতে একা বেরিয়েছেন!'

আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাকসে তুলতে তুলতে তিনি বললেন, 'বেরোব না? ওরা যে এসব ছিনিয়ে নিতে চায়!'

'ওরা কারা?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতে পারে! কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?'

'যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিনরাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু-ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি। আমায় সেখানে পৌঁছে দিন।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি।'—বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেওয়ার জন্যে বেরোলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! চরণ যেন আগে থাকতেই সব জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকো চলছে।

বললাম, 'ক্রোশ-দুয়েক বাদে নৌকো থামিয়ে খবর নিয়ো।'

নিশ্চলভাবে বসে থেকে সে কী যেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিল। অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার আমি কামরায় ঢুকে বললাম, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ-কামরার ভেতর থেকে দরজা দিয়ে দিন।'

তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন, 'না-না, সে আরও ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।'

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। একী! নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি! পানসি নিজের খেয়ালে ঘুরছে?

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে-যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মতো চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কী হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখে ও মুখে! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে!

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চিৎকার করে বাক্সটি সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা! আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপর। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কীরকম একটা আচ্ছন্ন—অভিভূত অবস্থা! চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

pathagar.net

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাক্সটি রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন ; কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে!

ধীরে ধীরে বাক্সটি কায়দা করে নিয়ে চরণ তাঁকে নৌকোর ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ হতাশায় শেষ শক্তি সংগ্রহ করে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাক্সসুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশমনও।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড় পেয়ে আমি চিৎকার করে ছুটে গেলাম পানসির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারী সেই বাক্সের টানে দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তাই সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। কটা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চিৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে একনিশ্বাসে তাদের যথাসম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দুজনে ডুবেছে, সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে শেষে হেসে উঠল। হেসে জানালে যে, এরকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না। যত ভারী জিনিসই হোক, একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু-দুটো লোককে। হাত ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে দুজন না হোক, একজন তো ভেসে উঠতই। আর তা ছাড়া দু-ক্রোশ কেন, এদিক-ওদিক বিশ-ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোনো পোড়োবাড়িই নদীর ধারে নেই। দামি গয়নার বাক্স-সমেত ওরকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে!

আমি রেগে উঠে বললাম, 'তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?'

বৃদ্ধগোছের একটি মাঝি একটা ডিঙির এককোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তারা কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্তস্বরে বললে, 'না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেননি, আমি জানি। আপনি জঙ্গলবাড়ির বউরানিকে দেখেছেন।

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম, 'জঙ্গলবাড়ির বউরানি! তুমি জান তাহলে! কোথায় জঙ্গলবাড়ি বলো তো?'

খানিক চুপ করে থেকে নীচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বলল, 'ওইখানে বাবু! আজ পঞ্চাশ বছর হল জঙ্গলবাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বউরানি তাঁর জ্বালা ভোলেননি। এখনও মাঝে মাঝে কারো কারো পানসিতে এসে ওঠেন।'

জেলেরাই আমার পানসি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝিমাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম, সব না হয় স্বপ্ন ; কিন্তু আমার পানসির নোঙর কে তুলল?

পানসির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার আর পানসি-বিহারে। আমি ছিন্নপত্রই পড়ব।

pathagar.net

ছড়া

pathagar.net

মিষ্টি মেঘ

উড়ো জাহাজ! উড়ো জাহাজ!
মেঘের দেশে যাও,
যে বাজগুলো আওয়াজ করে
নাও তো কেড়ে নাও।

ঝমঝমাঝম ঝরাক না জল
খেলুক রঙের খেলা,
আকাশ জুড়ে সাজাক নানান
মজার ছবির মেলা।

ঝড়ের ফুঁয়ে যাক না উড়ে
আকাশখানা মুছে,
ঝকঝকে নীল অবাক করুক
দাগগুলো সব ঘুচে।

কিলবিলিয়ে লিকলিকে সব
যেন আলোর সাপ,
বিজলি দিয়ে ধাঁধাক না চোখ
তাও করব মাপ।

কড়কড়াকড় ধমক কেন
কাঁপিয়ে আকাশ মাটি?
দুষ্ট তো নই, সবাই বলে
লক্ষ্মী সোনাটি!

উড়ো জাহাজ! উড়ো জাহাজ!
বাজগুলো সব কেড়ে
মেঘগুলোকে মিষ্টি করে
দাও তো এবার ছেড়ে।

জানলা ধরে একা একা
মেঘ দেখতে চাই,
শুধু দেখায় ভয় বলে তাই
মার কাছে পালাই।

মালগাড়ি

চাই না আমি তুফান কি মেল ট্রেন,
মালগাড়ি হই একটি শুধু যদি
ঘটর ঘটর দিনরাত্তির চলি,
নেইকো তাড়া, যেন ভাঁটার নদী।

জন্মদিনে মিষ্টি একটা পরি
ভুলে যদি আসে আমার বাড়ি,
চেয়ে নেব একটি শুধু বর,—
বলব, 'আমায় করো না মালগাড়ি।'

প্যাসেঞ্জার কি মেল ট্রেন সব যত
শুধু কাজের ধান্দা নিয়েই আছে,
স্টেশন পেলেই যাত্রী ওঠায় নামায়,
ভাবনা শুধু লেট হয়ে যায় পাছে।

আমার শুধু নিজের খুশির চলা,
দায় নেইকো টাইম টেবল দেখার।
যত দূরে-ই যেখানে যাই নাকো
সারা লাইন শুধু আমার একার।

ট্রেনগুলো তো এক লাইনেই ছোটে,
যাওয়া-আসার বাঁধা ঠিক-ঠিকানা।
আমার জন্যে সব রাস্তাই খোলা
থামতে যেতে কোথাও নেই মানা।

ওরা যখন হাঁসফাঁসিয়ে মরে,
যাচ্ছি যাব করেই আমার যাওয়া।
ওরা শুধু পৌঁছোতে চায় ছুটে,
আমার সুখ তো অশেষ চলতে পাওয়া।

Boighar.net

যাচ্ছি পুজোয়

মোটরে কেউ, কেউ স্টিমারে
কেউ চড়বে ট্রেনে,
এরোপ্লেনেও কেউ বা যাবে
ঝড়কে সাথি মেনে।

যাচ্ছে ওরা দার্জিলিঙে
চলল তারা পুরী,
হিল্লি দিল্লি কত মুলুক
করবে ঘোরাঘুরি।

আমি কোথায় যাচ্ছি, জানো?
—এমন মজার দেশে,
পাক দিয়ে এই দুনিয়াখানা
মেলে সবার শেষে।

সব কিছু তার অন্যরকম
মানুষ, মাটি, জল,
চোখ দিয়ে যে দেখতে জানে
তার কাছে কেবল!

খুশিতে নীল আকাশে তার
মেঘের সাদা হাসি,
তারই জবাব দিচ্ছে বুঝি
মাঠে কাশের রাশি।

রোদ নয় তো সোনা-ই যেন,
পড়ছে গলে ঝরে।
যে দিকে চাও পুজো পুজো
গন্ধে আকুল করে।

কেমন করে সে দেশে যায়?
কায়দাটা আজগুবি।
দরজা খুলে দাঁড়াও শুধু
বলছি চুপিচুপি।

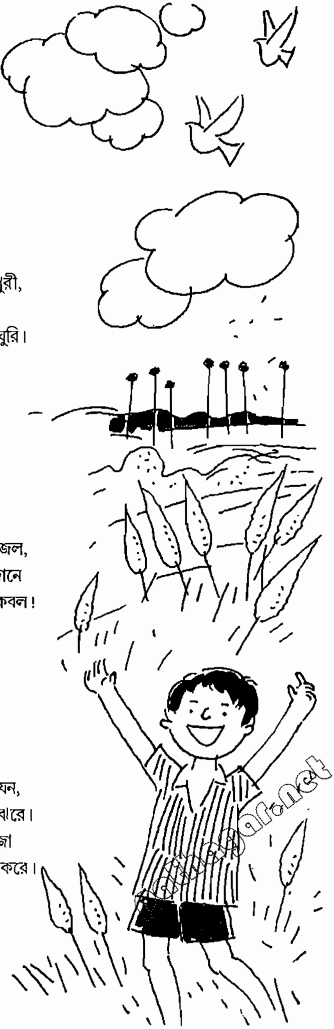

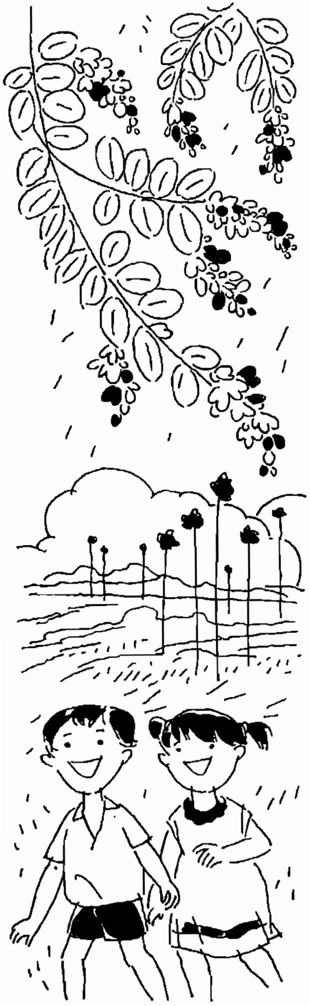

বই-টই

বই তো পড়ো টই পড়ো কি?
তাই তো কাটি ছড়া।
বই পড়া সব মিছে-ই যদি
না হল টই পড়া।

টই পড়া যায় পড়তে কোথায়?
বলছি তবে শোনো।
বই-এর মাঝে লুকিয়ে থাকে
টই সে কোনো কোনো।

আর পাবে টই সকালবেলা
বই থেকে মুখ তুলে
হঠাৎ যদি বাইরে চেয়ে
মনটা ওঠে দুলে।

টই থাকে সব রোদ-মাখানো
গাছের ডালে পাতায়,
টই থাকে সেই আকাশ-ছোঁয়া
খোলা মাঠের খাতায়।

টই চমকায় বিজলি হয়ে
আঁধার-করা মেঘে,
খই হয়ে টই ফোটে দিঘির
জলে বৃষ্টি লেগে।

টই কাঁপে সব ছোট্ট পাখির
রংবেরঙের পাখায়,
খোকা-খুকুর মুখে আবার
মিষ্টি হাসি মাখায়।

বই পড়ো খুব, যত পার
সঙ্গে পড়ো টই।
টই নইলে থাকত কোথায়
এতরকম বই।

pathagar.net

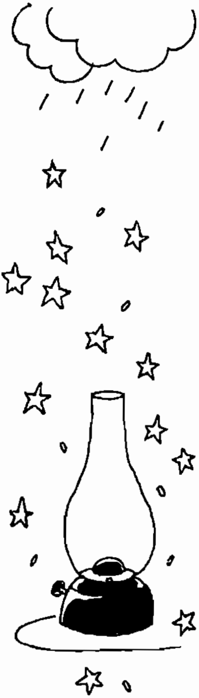

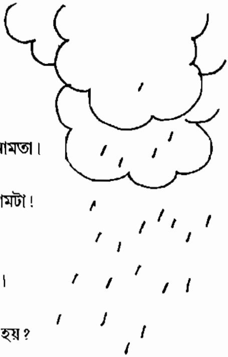

নতুন ধারাপাত

অঙ্ক কষ খুব তো সবাই
জানো অনেক নামতা।
নতুন গণিত শিখেছ কি?
জানি না ঠিক নামটা!

দুই-দুকুনে চার তো ঠিক-ই
চারে দুই-এ ছয়।
চাঁদের সাথে নদীর জলে,
যোগ দিলে কী হয়?

আকাশ যদি মেঘে ঢেকে
বৃষ্টি রাখ বাদ
বলতে পার বাদলা হাওয়ায়
কী হয় মনে সাধ?

কাজল কালো অন্ধকারে
ছিটিয়ে দিয়ে তারা
ঘরে বাতি নিভিয়ে দিলে
লাগে কেমন ধারা?

যে দিকে চাও আকাশ-ছোঁয়া
সবুজ ধানের ঢেউ,
তাইতে সাদা কাশের ফেনার
কী গুণ জানো কেউ?

এমনধারা অঙ্ক দেখে
গুটোও কেন হাত?
বৃষ্টি থেকেই পড়তে শেখো
নতুন ধারাপাত।

pathagar.net

মামলা

ওপারে তিনটে দাঁড়কাক আর
এপারে সাতটা শালিখ
মামলা লড়ছে,—মাঝের নদীর
কারা হক্কের মালিক।

বায়সেরা বলে, 'শোনো মুখখুরা,
কী বলে জলীয় আইনে,—
নদীটা তাদের,
যারা থাকে তার ডাইনে।'

শালিখেরা বলে, 'চুপ!
আইন বুঝিস খুব!
জোয়ার না কি সে ভাঁটার হিসেবে
খবরটা আগে তাই নে।'

দু-দলে চ্যাঁচায়, হেনকালে এক
পানকৌটির ছা,
মকদ্দমার ধারও ধারল না।
নদীর গভীরে
আচমকা দিয়ে ডুব,
মাছ নিয়ে যায়। জুলজুল চায়
দু-পারে যত বেকুব।

pathagar.net

অঙ্ক

তিন দুকুনে পাঁচ হয় কি?
চারে সাতে আট?
যতই কেন সার দাও না,
ধান হয় না পাট।
পাহাড় সাগর হয় না,
কাক হয় না ময়না,
চৌবাচ্চা যতই বাড়াও
নদী হয়ে বয় না।
দুনিয়াখানা অঙ্ক দিয়ে গাঁথা।
এক চুল তা নড়ায় এমন
ঘাড়ে নেইকো মাথা।
নেই কি তবে ফাঁক?
আছে, আছে। খুকুমণি
মুখটি করলে ফাঁক।
ফোকলা দাঁতের হাসিটুকু
ছড়িয়ে পড়ে যেই।
সব অঙ্ক উলটে যাবার
মানা তো আর নেই।

pathagar.net

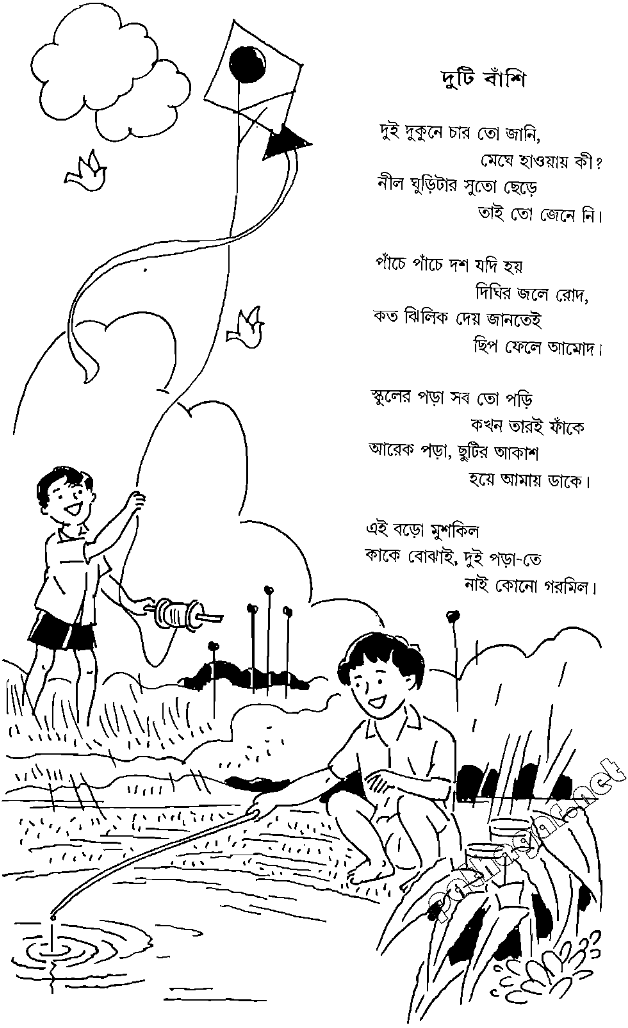

দুটি বাঁশি

দুই দুকুনে চার তো জানি,
মেঘে হাওয়ায় কী?
নীল ঘুড়িটার সুতো ছেড়ে
তাই তো জেনে নি।

পাঁচে পাঁচে দশ যদি হয়
দিঘির জলে রোদ,
কত ঝিলিক দেয় জানতেই
ছিপ ফেলে আমোদ।

স্কুলের পড়া সব তো পড়ি
কখন তারই ফাঁকে
আরেক পড়া, ছুটির আকাশ
হয়ে আমায় ডাকে।

এই বড়ো মুশকিল
কাকে বোঝাই, দুই পড়া-তে
নাই কোনো গরমিল।

মেঘের ঘুড়ি

বৃষ্টি-ধরা আজ বিকেলে,
জানো, কী চাই?
ভাবছ, সুতো মাঞ্জা-দেওয়া
ঘুড়ি, লাটাই?

মোটেই তা নয়, তুচ্ছ ঘুড়ি
চাইছি থোড়াই।
একটি শুধু ধবধবে মেঘ
পেলে ওড়াই!

ওরা যে সব ঘুড়ি ওড়ায়
সুতোয় বেঁধে
কতদূর বা উঠতে পারে
ককিয়ে কেঁদে?

মেঘের ঘুড়ি কোথায় না যায়
হাওয়ায় ভেসে!
ইচ্ছে হলে যেতেও পারে
চাঁদের দেশে।

দুনিয়াতে কোথাও যাবার
নেইকো মানা।
মন মেলবার সব আকাশই
তার ঠিকানা।

মেঘ উড়িয়ে চ্যাঁচায় না কেউ,
বড়াই করে,—ভোক্কাটা!
প্যাঁচ লড়ে না, চায় না কারো
খুশির ঘুড়ি হোক কাটা!

বলবে জানি, আজব কথা।
মেঘ কখনো হয় না ঘুড়ি।
নাই বা হল, ভাবতে কী দোষ!
ভেবে নিয়ে বলছি, থুড়ি।

মিষ্টি

যে আকাশে ঝড় ওঠে না
মেঘ ডাকে না,
—চাই কি?
রোদ ওঠে না জল পড়ে না,
ভালো লাগে তাই কি?

যে পথে নেই পিছলে পড়া,
হোঁচট খাওয়া, দুখ্‌খু,
গড়িয়ে যেতে সে পথে যে
পায় মজা সে মুখ্‌খু!

রাস্তা হোক না চড়াই-ভাঙা..
অনেক অনেক দূর।
আকাশে থাক ঝড় বৃষ্টি,
তার কিছু রোদ্দুর।

তাতেই হবে, তাইতে।
চিবিয়ে খেতে হয় বলে আখ
মিষ্টি সবার চাইতে!

pathagar.net

উপন্যাস

pathagar.net

কুহকের দেশে

দু-বছর আগে হঠাৎ তিনটি বড়ো বড়ো রাজ্যের ওপর যুদ্ধের মেঘ কালো হয়ে জমে উঠেছিল। রাজ্যগুলি ছোটখাটো নয় এবং তাদের মধ্যে একটি আবার সাম্রাজ্য। যেকোনো মুহূর্তে তখন মনে হয়েছিল এই তিনটি রাজ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারে।

এই সংগ্রামের কেন্দ্র হল একেবারে সুদূর প্রাচ্যে। কিন্তু এর সূত্রপাত কী থেকে, শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এর সূত্রপাত—সাধারণ একটি বাজারে—মধু রাখবার একটি বাঁশের চোঙায়।

মিচিনার বাজারে বাঁশের চোঙা করে এক জংলি কাচিন এসেছিল পাহাড়ি মধু বিক্রি করতে। সেই মধুর ভেতর ছিল একটি পোকা। সেই পোকা থেকেই তিনটি রাজ্যের ভেতর রেষারেষির সূত্রপাত।

এমন আজগুবি কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করতে পারবে না জানি, সমস্ত গল্প না বললে এর রহস্য এককথায় ব্যাখ্যা করাও যাবে না। সেই জন্যেই এই কাহিনির অবতারণা।

মিচিনা যে ব্রহ্মদেশের উত্তরে ইরাবতীর ধারে একটি শহর, একথা অনেকেরই বোধ হয় জানা আছে, রেঙ্গুন থেকে সাতশো মাইল রেলপথ পার হয়ে এখানে পৌঁছোতে হয়। রেলপথ এইখানেই শেষ। তারপর ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের দেশ। সে দেশের কথা সভ্য মানুষ খুব কমই জানে।

এত দেশ থাকতে এই মিচিনায় কেন যে আমার মামাবাবু চাকরি নিয়ে এসে বসেছিলেন, তা তাঁর অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতোই বোঝা কঠিন। মামাবাবু দেখতে নাদুসনুদুস নিরীহ চেহারার লোক। কথায়-বার্তায়, আচারে ব্যবহারে কোথাও তাঁর এমন কোনো লক্ষণ নেই যার দ্বারা মনে হতে পারে যে তিনি অসাধারণ কিছু করতে পারেন। চেহারা ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মনে হয় যে, সাধারণ কলেজের প্রফেসর বা অফিসের বড়োবাবু হলেই বুঝি তাঁকে মানাত। ছেলেবেলায় তাঁর সম্বন্ধে সেইরকম আশাই সবাই করেছিল। পড়াশুনায় তিনি ভালো। সবাই ভেবেছিল বড়ো হয়ে একটা আরামের কাজই তিনি বেছে নেবেন। কিন্তু তার বদলে সবাইকে অবাক করে মামাবাবু গেলেন মাইনিং পড়তে। মাইনিং সসম্মানে পাশ করে এসে দেশে চাকরি পাবার সুবিধে থাকতেও তিনি গেলেন সুদূর বর্মার জঙ্গলে প্রসপেক্টর হয়ে। তাঁর চেহারা বিলেত ঘুরে এসেও তেমনি আয়েশি নাদুসনুদুস ভদ্রলোকের মতো ছিল তখন। সবাই মানা করে বলেছিল যে, ও কাজের কষ্ট ও পরিশ্রম তাঁর সইবে না। সইল কি না বলা যায় না, কিন্তু মামাবাবু তো দেশে আর ফেরেননি। মিচিনায় তাঁয় হেডকোয়ার্টারস ; সেখান থেকেই তিনি কিছুদিন আগে আমায় বেড়াতে আসার জন্যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। কোনো কাজ সম্প্রতি ছিল না বলে আমিও রাজি হয়ে গেছিলাম। রেঙ্গুনের জাহাজে যেদিন উঠেছিলাম সেদিন কে জানত আমার ভ্রমণ মিচিনাতেই সাঙ্গ হবে না—ভাগ্য আমার জন্যে এমন রহস্যময়, এমন ভয়ংকর ভ্রমণকাহিনি নির্ধারিত করে রেখেছে, যা খুব কম লোকের জীবনেই ঘটে।

মিচিনায় মামাবাবুর বাড়িতে এসে প্রথমেই সেটা বাড়ি না জাদুঘর বুঝতে পারলাম না। মামাবাবু শুধু খনিজ বিদ্যাতেই তন্ময় নয়, আরও অনেক কিছু নিয়ে তিনি মাথা ঘামান। উত্তর ব্রহ্মের—পাথরের মূর্তি, কাঠের কাজ থেকে সেখানকার নানা জন্তুজানোয়ার, কীটপতঙ্গ সব কিছুরই নমুনা তিনি বাড়িতে সংগ্রহ করে রেখেছেন। দিনরাত সেই সব নিয়েই তিনি মেতে থাকেন।

মাথায় সামান্য একটু টাক পড়া ছাড়া মামাবাবুর চেহারার কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতিরও নয়। তাঁকে দেখলে সবারই মনে বুঝি একটু আগলাবার প্রবৃত্তি হয়—অসহায় ছেলেমানুষকে যেমন করে আগলাতে হয়, তেমনি। তাঁর সঙ্গে এক বছর কাটিয়ে ভালো করে পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও এখনও আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়।

মিচিনায় গিয়ে প্রথম কয়েকদিন বেশ শান্তভাবেই কাটল। মামাবাবুকে দেখে মনে হল, যৌবনে যাই থাকুন, বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেশ শান্ত হয়ে গেছেন। পড়াশুনা নিয়েই মেতে থাকেন, অন্যদিকে বেশি নড়বার-চড়বার আর উৎসাহ নেই। আর উৎসাহ থাকবেই বা কোথা থেকে। অভ্যেস অনেকগুলি তিনি খুব খারাপ করে ফেলেছেন—প্রায় নিষ্কর্মা বাঙালি জমিদারের মতোই। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে তোফা একটি ঘুম না দিলে তাঁর চলে না, রাত্রে রোজ আধঘণ্টা চাকরকে দিয়ে ভালো করে পা টেপানো তাঁর চাই। এ ছাড়া খাওয়াদাওয়ার বাবুয়ানির তো কথাই নেই। এরকম লোক কি আর নড়তে-চড়তে পারে বেশি! বুঝলাম, ছেলেবেলা তাঁকে যারা আয়েশি ভেবেছিল, তারা নেহাত ভুল করেনি। দিন কতক একটু জ্বলে উঠেই তিনি আবার নিভে গেছেন। তিনি যে বাংলাদেশে ফেরেননি, তার কারণ বোধ হয় এই, যে, একজায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার পরিশ্রম ও হ্যাঙ্গামটুকুও তিনি আর পোহাতে রাজি নন।

মামাবাবুর আশ্রয়ে দু-বেলা রাজভোগ খেয়ে ও নতুন দেশে একটু-আধটু বেড়িয়ে বেশ দিন কাটছিল। ওজনে যেভাবে বাড়তে শুরু করেছিলাম তাতে নিজেরই ভয় হচ্ছিল। এমন সময়—

এমন সময় কিছুই নয়, মিচিনার বাজারে এক জংলি কাচিন এল মধু বেচতে। সেই মধু বাঁশের চোঙা সমেত কিনে আনল আমাদের চাকর মংপো। এবং সেই মধু বিকেলবেলা প্লেটে করে চাখতে গিয়ে মামাবাবু হঠাৎ চমকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

আমি পাশেই বসে চা খাচ্ছিলাম, অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'হল কী মামাবাবু?'

'শিগ্‌গির আমার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসটা আন দেখি।' বলে মামাবাবু প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস এনে মামাবাবুর হাতে দেবার সময় ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলাম। প্লেটে মধুর ভেতর একটি পোকা, বোধ হয় মৌমাছিই হবে। সেইটে দেখেই মামাবাবুর এত উত্তেজনা।

মামাবাবু তখন কাচটা পোকাটির ওপর ধরে নিবিষ্ট মনে কী দেখতে আরম্ভ করেছেন। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নতুনরকম মৌমাছি নাকি?'

মামাবাবু মাথা তুলে আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'নতুন? নতুন কী—একেবারে অদ্ভুত! এর হুল আলাদা—এর'...এইবার মামাবাবু গড়গড় করে নামতার মতো এমন সব বৈজ্ঞানিক গোটাকতক নাম বলে গেলেন যার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। সামান্য একটা মৌমাছি নিয়ে এতটা উৎসাহও আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সামনের প্লেটে একটা সামান্য পোকার বদলে বুঝি সাত রাজার ধন মানিক পাওয়া গেছে। মামাবাবু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেই ডাক দিলেন, 'মংপো'!

মংপো আমাদের মগ চাকর, মামাবাবুর সঙ্গে বহুকাল বাস করার দরুন বাংলা কিন্তু সে বেশ বোঝে। মংপো এসে দাঁড়াবামাত্র মামাবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মধু সে কার কাছ থেকে কিনেছে। মধু খারাপ ভেবে মংপো তখন নিজের ওকালতি শুরু করে দিল—মধু সে খুব ভালো জায়গা থেকেই কিনেছে। আসল পাহাড়ি মধু। সে আর মধু চেনে না...ইত্যাদি।

মামাবাবু তাকে বক্তৃতার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মধু তুই খুব চিনিস। যার কাছে কিনেছিস তাকে নিয়ে আসতে পারিস এখানে?'

মধুওয়ালাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে শুনে মংপো তো প্রথমটা অবাক। তারপর অনেক

কষ্টে নিজেকে সামলে সে বলল, যে, মধুওয়ালা একজন পাহাড়ি কাচিন, সকালে এসেছিল বাজারে, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে আর।

'খুব পাওয়া যাবে। তুই খোঁজ গিয়ে দেখি।' বলে মামাবাবু তাকে ধমকে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন যে, পাহাড়িরা অমন দুশো তিনশো মাইল দূর থেকে জংলি জানোয়ারের ছাল, জংলি চাকের মধু প্রভৃতি নিয়ে শহরে আসে। শহরে তারা একদিন থেকেই কখনো চলে যেতে পারে না।

আমি বললাম, 'কিন্তু মধুওয়ালাকে খুঁজছই বা কেন?'

'বাঃ খুঁজব না?' শান্তশিষ্ট মামাবাবুর হঠাৎ গলার স্বরও গেছে বদলে, 'এরকম মৌমাছির চাক কোথায় হয় জানতে হবে না?'

'তা হবে বটে!' বলে একটু হেসে আমি তখন বেরিয়ে গেলাম।

মধুর ও নতুন রকমের মৌমাছির কথা আমি একরকম ভুলেই গেছিলাম। সমস্তদিন মামাবাবুর সঙ্গে দেখাও হয়নি। রাতে একসঙ্গে খেতে বসে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মধুওয়ালাকে পাওয়া গেল?'

মামাবাবু অন্যমনস্ক ভাবে কী যেন ভাবছিলেন। আমার কথায় সচেতন হয়ে একবার শুধু বললেন, 'হুঁ।' তারপর আবার নিজের ভাবনায় যেন ডুবে গেলেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথাকার মৌমাছি জানা গেল?'

মামাবাবু কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই অনেকটা বললেন, 'জানা তো গেছে, কিন্তু সেখানে যেতে পারলে খুব ভালো হয়। কে জানে আরও কত নতুন স্পিসিজ্ এমনকী জেনাস্ সেখানে পাওয়া যেতে পারে। এদিকের পোকামাকড় সম্বন্ধে ভালো করে গবেষণা এখনও হয়নি। সত্যিকারের এন্টোমোলজিক্যাল এক্সপিডিশন্ হয়নি একটাও।' বলতে বলতে মামাবাবু আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

বললাম, 'তা হলে চলুন না যাই!'

'তাই তো ভাবছি!'

একটু কৌতুক করেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'জায়গাটা কোথায়? কত দূর হবে?' কিন্তু পরমুহূর্তে মামাবাবুর উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মামাবাবু বললেন, 'বর্মার সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে হিমালয়ের ধারে, পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শ চারেক মাইল।'

একটু হেসে আমায় যেন খুশি করবার জন্যেই মামাবাবু আবার বললেন, 'ফিরতে পারলে একটা কীর্তি থাকবে। এ অঞ্চল সত্যি মানুষের একেবারে অজানা। এখনও পর্যন্ত কেউ সে দেশে যায়নি, অন্তত গিয়ে ফেরেনি!'

তারপর কদিন ধরে মামাবাবুর কাছে সে অদ্ভুত দেশের কথা একটু একটু করে শুনলাম। চীন, বর্মা, ও তিব্বতের সীমান্ত সেখানে এসে মিলেছে। সেটাকে বলা হয় 'অজানা ত্রিভুজ'। এই অজানা ত্রিভুজাকৃতি দেশ ইরাবতীর একটি প্রধান শাখার উৎপত্তিস্থল। সে উৎপত্তিস্থল এখনও কেউ দেখেনি। সে দেশের পাহাড় জঙ্গল, জানোয়ার, মানুষ সম্বন্ধে দু-একটা গুজব ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। সে দেশে যাবার পথকে দুর্গম বললে কিছুই বলা হয় না। যে কাচিন পাহাড়িদের কাছে সেখানকার খবর পাওয়া যায় তারাও নিজেরা খুব কমই সেখানে যায়। সেখানে দারু বলে বামনাকৃতি একরকম জাত আছে, তাদেরই ছুটোছাটা দু একটা শিকারি কাচিনদের কাছে কখনো কখনো এসে পাহাড়ি মধু, জানোয়ারের ছাল প্রভৃতি বিক্রি করে। আমাদের মধুওয়ালা এইভাবেই তার মধু পেয়েছিল।

এসব বিবরণ শুনে মনে মনে কিন্তু আমি একটু আশ্বস্তই হলাম। দুপুরবেলা যে লোকের

ঘণ্টা দুই আরামে ঘুম না দিলে চলে না, সে লোক যে এসব দেশে অভিযান করবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু অসম্ভবই একদিন ঘটে গেল। কদিন ধরে দেখছিলাম, আমাদের বাড়িতে চীনে মজুররা যাতায়াত করছে। বাড়িতেও ছোটো ছোটো ক্যাম্বিসের তাঁবু, প্যাকিং কেস প্রভৃতি নানা সরঞ্জাম জমা হচ্ছে। মামাবাবু রাতদিনই ব্যস্ত। কখনো একটা বাক্সে কাঠকয়লার গুঁড়ো ভরছেন, কখনো পোকা ধরার জাল সাজাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন এরই ভেতর স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম, পরের দিনই মামাবাবু সেই দূর দেশের জন্যে যাত্রা করবেন। আয়োজন সব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

অবিশ্বাসের স্বরে বললাম, 'বলছেন কী মামাবাবু, সত্যি যাচ্ছেন!'

'হ্যাঁ, না গিয়ে কী করি!' এমনভাবে মামাবাবু কথাটা বললেন, যেন তাঁর পিতৃদায় উপস্থিত। না গেলেই নয়।

খানিক চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললাম, 'আমিও তো যাচ্ছি?'

মামাবাবু একটু মাথা চুলকে বললেন, 'বড্ড কষ্ট, অনেক বিপদ-আপদ হতে পারে। ভাবছিলাম তুই না হয় থাক!'

আমি হেসে উঠলাম। মামাবাবু চল্লিশ বছর বয়সে ওই আয়েশি দেহ নিয়ে আমায় কষ্টের আর বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন!

বললাম, 'আমি যাবই।'

'তবে চ! অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে।' বলে মামাবাবু রাজি হয়ে চলে গেলেন। আমি কিন্তু নূতন অভিজ্ঞতার জন্যে মোটেই ব্যাকুল ছিলাম না। মামাবাবুকে সামলাবার জন্যই আমার যাওয়া।

পরের দিন আমাদের যাত্রার লটবহর দেখে আমি অবাক। কুড়িটি অশ্বতরের পিঠে বোঝা চাপিয়ে বিশজন চীনে সর্দার আমাদের সঙ্গে চলেছে। তাদের সে বোঝার ভেতর খাবারদাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওযুধপত্র থেকে বন্দুক, ডাইনামাইট প্রভৃতি সব জিনিস আছে। আমাদের চাকর মংপো ছাড়া আমাদের অন্যান্য কাজ করবার জন্যে আর দুজন কাচিন পাহাড়ি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটাকে সামান্য পোকা-শিকারের অভিযান ভাবতে আমার ভারী মজা লাগছিল। আগে লোকে দুর্গম বিপদসংকুল দেশে যেত দামি ধনরত্নের খোঁজে। এমন সামান্য পোকা সংগ্রহ করবার জন্যে মানুষ তার চেয়েও বিপদসংকুল দেশে প্রাণ হাতে নিয়ে যায়।

কিন্তু যাই হোক, এ মজা বেশি দিন রইল না। আমাদের এই অভিযান যে পোকা-শিকারের চেয়ে অনক বেশি কিছু হবে, তার পরিচয় শিগ্‌গিরই পেয়ে গেলাম।

আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থল ছিল হারটুজ কেল্লা। এই কেল্লা মিচিনা থেকে দুশো-কুড়ি মাইল। এই পথটুকু শীতকালটা একরকম সুগমই বলা যেতে পারে। ঘোড়ায় চেপেও যাওয়া যায়।

দু-ধারে ঘন জঙ্গল, তারই ভেতর দিয়ে মানুষের ও ঘোড়ার পায়ে মাড়ানো সংকীর্ণ পথ। এই পথ দিয়ে তিনদিন গিয়েই আমরা ইরাবতীর দুই শাখার সঙ্গমস্থল পেলাম। তারপরেই পাহাড় আরম্ভ। এখান থেকেই পথ একটু দুর্গম হতে আরম্ভ হয়েছে।

চারদিনের দিন আমাদের তাঁবু পড়ল ইরাবতীর পশ্চিম শাখার একটা ছোটো পাহাড়ের উপত্যকায়। এটা কাচিনদের দেশ। দূরে দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে কাচিনদের গ্রামের ছোটো ছোটো ঘরের চাল উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু গ্রামের সংখ্যা বেশি নয়। জঙ্গলই এখানে প্রধান। কাচিনরা বর্মার এই সীমান্ত প্রদেশের এক দুর্ধর্ষ জাত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদের উপদ্রবে আশপাশের সকলকে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হত। তখন এরা প্রায়ই আশপাশের দেশ আক্রমণ করে বন্দিদের ক্রীতদাস করে আনত। এখন এরা শুনলাম অনেকটা ঠান্ডা হয়েছে। কিন্তু একেবারে নয়।

boighar.com

এ দেশে বাঘের উপদ্রব বেশি বলে, আমাদের তাঁবু ও অশ্বতর বাহিনীকে সারারাত ভালো করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হঠাৎ মাঝ রাতে ভয়ংকর বাঘের গর্জন ও মানুষের চিৎকার শুনে সভয়ে জেগে উঠলাম। মামাবাবু দেখলাম আমার আগেই বন্দুক হাতে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার বন্দুক নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাইরে বেশ কনকনে ঠান্ডা। অন্ধকার এমন গাঢ় যে, চোখ খুলে থাকা না থাকা সমান মনে হয়। তারই ভেতর আমরা কানখাড়া করে খানিক অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আশ্চর্য, গোলমাল ও গর্জন একবার উঠেই একেবারে যেন থেমে গেছে! জঙ্গলের গাঢ় নিস্তব্ধতা চারিধারে।

আমাদের কিছুদূরের তাঁবুতেই মংপো ও আমাদের আর দুজন চাকর শোয়। তাদেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারা কী এমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে যে এই ভয়ানক শব্দ শুনতে পায়নি! তাদের একজনের তো জেগে পাহারা দেবার কথা! কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও মামাবাবু এবার টর্চ জ্বেলে সামনে এগিয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রথমে গিয়ে আমরা ঢুকলাম মংপোদের তাঁবুতে, তাদের জাগাবার জন্যে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁবুর ভেতরে মংপো ও আমাদের কাচিন দুজন চাকরের কেউ নেই। তাদের বিছানা পাতা রয়েছে, তাঁবুর জিনিসপত্রও কিছু অগোছালো নয়, শুধু তাদেরই পাত্তা নেই।

আমাদের চীনে অনুচররা পাহাড়ের একটু নীচে তাদের আস্তানা গেড়েছিল। তারা তাঁবু-টাবু এসব বালাইয়ের ধার ধারে না, অতি বড়ো শীতেও ঘোড়ার লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে অনায়াসে বাইরে শুয়ে রাত কাটায়। মামাবাবু এবার তাদের সর্দার লি-সিনের নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে সে চিৎকার চারিধারের পাহাড়ে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলল। কিন্তু তবু কারো সাড়া পাওয়া গেল না। মামাবাবু ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করলেন।...

সামান্য একটা বন্দুকের আওয়াজ যে এমন শোনাতে পারে তা আগে কখনো জানতাম না। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে চারিধারের পাহাড়ে অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে শব্দ যেন আমাদেরই চমকে দিল। মনে হল একটা নয়, আমাদেরই বন্দুকের সঙ্গে যেন দূরে দূরে আরও অনেক বন্দুক গর্জন করে উঠেছে।

ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজের ফলও হল অদ্ভুত। প্রতিধ্বনিটা ধীরে ধীরে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমাদের চীনা অশ্বতর-চালকদের দলের গোলমাল শোনা গেল। আমরা টর্চ জ্বেলে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, বন্দুকের শব্দে ভীত হয়ে তারাও কয়েকজন খোঁজ করতে আসছে। তাদের ভেতর দলের সর্দার লি-সিনও আছে।

মাঝপথে দেখা হতেই মামাবাবু একটু কঠোর স্বরে লি-সিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এত ডাকাডাকিতেও সে সাড়া দেয়নি কেন। লি-সিন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল এবার। কুণ্ঠিতভাবে জানাল সারাদিনের পরিশ্রমের পর গভীরভাবে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের ডাক শুনতে পায়নি তাই।

মামাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী, তোমরা বাঘের গর্জনও শুনতে পাওনি!'

লি-সিন আমাদের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল, 'বাঘের গর্জন আবার কোথায়?'

বাঘের গর্জন কোথায়? এরা বলে কী! এবারপ মামাবাবু ও আমি হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। লি-সিন কিন্তু অত্যন্ত জোর গলায় জানাল যে, কোনোরকম বাঘের গর্জন কোথাও হয়নি। হলে তারা হাজার ঘুমোলেও নিশ্চয়ই শুনতে পেত।

বাঘের গর্জনের ব্যাপারটা রহস্য হয়ে উঠলেও মংপো ও কাচিন চাকর দুজনের অন্তর্ধানের কারণ জানতে পেরে না হেসে থাকতে পারলাম না। চীনেদের দেখাদেখি হতভাগাদের আজ সন্ধ্যার পর একটুখানি তাদের মতো নলের ভেতর দিয়ে ধোঁয়া খাবার লোভ হয়েছিল। সে

pathagar.net

লোভের শাস্তি তাদের হাতে হাতে মিলেছে। চীনেদের চণ্ডুর নলে কয়েক টান দিয়েই তারা এমন কাত হয়েছে যে নিজেদের তাঁবুতে উঠে আসতেও তাদের ক্ষমতায় কুলোয়নি। চীনেদের সঙ্গেই তাদেরই কম্বল চাপা দিয়ে দুজনে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

তাঁবু ছেড়ে এভাবে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হলেও তখন আর তাদের ভর্ৎসনা করতে যাওয়া বৃথা। বিশেষ করে তাদের অবস্থার কথা ভেবেই হাসি পাচ্ছিল। লি-সিনের কাছে ব্যাপারটা শুনে মামাবাবু কোনোরকমে হাসি চেপে বলল, 'থাক, হতভাগাদের আর জাগিয়ে কাজ নেই। এই ঠান্ডায় সারারাত বাইরে শুয়ে কাল নিমোনিয়া ধরলে মজাটা আরও ভালো করে বুঝবে।'

লি-সিনের দলকে এবার বিদায় দিয়ে আমরা আবার তাঁবুর দিকে ফিরলাম। আমি একটু হেসে মামাবাবুকে বললাম, 'মিছিমিছি কী ভয়টাই পেলাম বলুন তো।'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে শুধু 'হুঁ' ছাড়া আর কিছু বললেন না।

তাঁবুতে ঢুকতে গিয়েই কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেরোবার সময় আমরা যে তাঁবুর কাপড়ের দরজা আটকে রেখে এসেছিলাম এ কথা আমাদের স্পষ্ট মনে আছে। এখন কিন্তু তাঁবুর দরজা দেখা গেল খোলা। আমাদের এই সামান্য অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ যে এসে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কে সে? তার উদ্দেশ্যই বা কী?

উদ্দেশ্য বোঝা আরও কঠিন এই জন্যে যে তাঁবুর ভেতরকার সমস্ত জিনিস যথাস্থানেই আছে। কোনোকিছু চুরি গেছে বলে আমরা বুঝতে পারলাম না। আমার সোনার হাতঘড়িটা শোবার আগে বিছানার ধারেই রেখেছিলাম। সেটা সেইখানেই এখনও টিকটিক করছে। আমাদের দামি গরম কাপড়ের পোশাকগুলোর ওপরও কেউ নজর দেয়নি।

তাঁবুর দরজা আটকে দেওয়ার কথা স্পষ্ট মনে না থাকলে এ ব্যাপারও বাঘের গর্জনের মতো আমাদের মনের ভুল ভাবতে পারতাম। কিন্তু তার তো পথ নেই।

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে সমস্ত রাত দুর্ভাবনায় ভালো করে ঘুমোতেই পারলাম না। সকাল হতে না হতেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

চারিদিকে ঘন কুয়াশা, জঙ্গলের গাছগুলো থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো টপটপ করে শিশির পড়ছে। কুয়াশার অস্পষ্টতায় হঠাৎ মনে হতে পারে যেন চারিদিকে কোমল দ্রুত পায়ে বনের পরিরাই চলা ফেরা করছে। কিন্তু রাত্রে অমন কল্পনা উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা নয়। রাত্রের অদ্ভুত ব্যাপারটার কোনো অর্থ না পেয়ে মেজাজ তখনও বিগড়ে আছে।

মামাবাবু আমার মতোই ঘুমোতে পারেননি সারারাত। সকাল হবার আগে থাকতে আলো জ্বেলে তিনি তাঁবুর ভেতর তাঁর বাক্স-টাক্স ঘেঁটে কী করছিলেন। দু-চারবার তাঁবুর সামনে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল নীচের দিকে। ভালো করে একটু লক্ষ করে দেখেই আমি উত্তেজিত স্বরে ডাকলাম, 'মামাবাবু!'

আমার গলার স্বর বোধ হয় একটু বেশিরকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। মামাবাবু ভীতভাবে বাইরে ছুটে এসে বললেন,, 'কেন, কী হয়েছে?'

আমি নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'দেখতে পাচ্ছেন, কীসের পায়ের দাগ?'

মামাবাবু কিন্তু আমার এ আবিষ্কারে মোটেই উৎসাহ দেখালেন না। নিতান্ত শান্তভাবে এবার বললেন, 'দেখতে পাচ্ছি বাঘের পায়ের দাগ। এ দাগ তাঁবুর ভেতরেও আছে।'

'তাঁবুর ভেতরেও?' আমি একেবারে চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ, তাঁবুর ভেতরেও আছে। কালকেই আমি দেখেছি।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'তাহলে কাল আমাদের তাঁবুতে বাঘই ঢুকেছিল।'

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু তাঁবুর দরজা খুলে ভেতর থেকে কম্পাস চুরি করে নিয়ে যায় এরকম বাঘের কথা তো শুনিনি।'

pathagar.net

আমি সত্যই বিমূঢ় হয়ে গেছিলাম। মামাবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'সত্যিই তাই। কাল আমাদের তাঁবুর এত জিনিস থাকতে শুধু কম্পাসটি চুরি হয়ে গেছে। অথচ কম্পাসটি ছিল আমার ব্যাগের একেবারে তলায়।'

'আর কোনো জিনিস চুরি যায়নি? ভালো করে দেখেছ তো?'

'এতক্ষণ ধরে তো তাই দেখলাম। আমার কাগজপত্রের বাক্সটা অবশ্য ঘাঁটাঘাঁটি করেছে কিন্তু সব কিছু ফেলে নিয়ে গেছে শুধু কম্পাসটি।'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'তাহলে কি বলতে চাও, কাল রাত্রে ওই যেটুকু সময় আমরা তাঁবুতে ছিলাম না, তারই ভেতর বাঘ ও চোর দু-ই ঢুকেছিল তাঁবুতে?'

মামাবাবু বললেন, 'তা ছাড়া কী বলব। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে—বাঘের পায়ের দাগ যেখানে পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট, সেখানে মানুষের পায়ের কোনো চিহ্নও নেই।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যত ভাবছিলাম, গত রাত্রের রহস্য তত যেন আরও জটিল হয়ে উঠছিল। আমরা এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে নিরাপদে থাকব ভেবে অবশ্য আসিনি। বিপদ আছে সেকথা আমরা জানতাম কিন্তু এরকম দুর্বোধ রহস্যজাল আমাদের ঘিরবে একথা আমরা কল্পনাও করিনি! যেদিক দিয়েই ভাবতে যাই সমস্ত ব্যাপারটার কোনো মানেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার। আসলে আমাদের খুব বেশি কোনো ক্ষতি না হলেও আমরা কিছুতেই স্বস্তি বোধ করতে পারছিলাম না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল কী গভীর একটা চক্রান্ত আমাদের চারিধারে জাল বিস্তার করে আছে। কালকের ব্যাপারে তার সামান্য একটু আভাস পেয়েছি মাত্র।

সেদিন ইচ্ছে করেই আমরা অনেক বেলা পর্যন্ত তাঁবু আর তুললাম না। বিপদের আভাস যখন পাওয়া গেছে তখন এর পর থেকে আমাদের আরও সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। মামাবাবু তারই ব্যবস্থা করছিলেন। এর মধ্যে লি-সিন দুবার এসে কখনো যাত্রা শুরু হবে তার খোঁজ করে গেছে। এর পর পথ নাকি অত্যন্ত গভীর বিপদসংকুল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রওনা না হলে আমরা সন্ধ্যার আগে সে জঙ্গল পার হতে পারব না এই তার বক্তব্য।

লি-সিন দ্বিতীয়বার এসে চলে যাবার পর আমি একটু ইতস্তত করে মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লি-সিনকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয় মামাবাবু?'

মামাবাবু আমার প্রশ্নে যেন অবাক হয়ে বললেন, 'কেন? খুব ভালো লোক তো!'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে!'

মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'কী?'

বললাম, 'বিশেষ করে কালকে রাত্রেই মংপো আর কাচিন চাকর দুটোর চন্ডু খেতে গিয়ে অজ্ঞান হওয়া একটু সন্দেহজনক বলে মনে হয় না আপনার!'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'হতে পারত, যদি লি-সিনকে আমি না জানতাম ভালো করে। এরকম বিশ্বাসী লোক খুব কম পাওয়া যায়। লি-সিন আমার সঙ্গে আগেও অনেক জায়গায় গিয়েছে।'

এরপর আর আমি কিছু বলতে পারলাম না। সত্যিই লি-সিনকে সন্দেহ করবার স্পষ্ট কোনো কারণ নেই। তাঁবুর ভেতর বাঘের পায়ের রহস্যজনক দাগ ও কম্পাস চুরির সঙ্গে তার সংস্রব কল্পনা করাও অসম্ভব। তবু মনের ভেতর একটা খোঁচা আমার থেকেই গেল। এই সন্দেহের মীমাংসা সেই সময়েই না করে নেওয়ার জন্যে একদিন আমাদের সর্বনাশ হবার উপক্রম হবে তখন যদি জানতাম!

pathagar.net

সেদিন তাঁবু তুলে যাত্রা করার পূর্বে আর একটি সংবাদ পেয়ে আমরা বিচলিত হলাম একটু। আমরা রওনা হবার উপক্রম করছি এমন সময় নিকটস্থ কাচিনদের গ্রামের মোড়ল এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে কয়েকজন অনুচর। আমাদের তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। তবু লৌকিকতা বজায় রাখবার জন্যে আলাপ করতে বসতেই হল। কাচিনদের রাজ্যে এসে তাদের অপমান করা তো আর যায় না।

মোড়লের আলাপ করতে আসার উদ্দেশ্য জানতে অবশ্য দেরি হল না। দু-এক কথার পর সে জানাল তার কাছে অত্যন্ত দামি দুষ্প্রাপ্য নানারকম জানোয়ারের ছাল আছে। খুশি হয়ে সে আমাদের কিছু উপহার দিতে চায়। বিনিময়ে সে কিছুই চায় না। শুধু এই জঙ্গলের দেশে গুলি-বারুদের বড়ো অভাব। আমরা তাকে সামান্য কিছু গুলি-বারুদ দিয়ে নিশ্চয় সাহায্য করব সে জানে।

মামাবাবু তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের সঙ্গে গুলি-বারুদ খুব অল্পই আছে। আমাদের নিজেদের পক্ষেই তা যথেষ্ট নয়, সুতরাং তা থেকে আমাদের কিছু দেওয়া অসম্ভব। সেই জন্যেই আপাতত তার চামড়ার লোভ আমাদের সংবরণ করতে হল।

কাচিন মোড়ল কিন্তু নাছোড়বান্দা। এবার সে জানাল যে সাধারণ চামড়া নয়, একটা আসল সাদা বাঘের ছাল সে আমাদের দিতে প্রস্তুত। গুলি-বারুদ না পারি, আমরা কিছু কেরোসিন তেল তো তাকে দিতে পারি।

মামাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, যে সাদা বাঘের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান হলেও আমাদের এখন মোট বাড়াবার উপায় নেই। ফেরবার পথে সম্ভব হলে তিনি সেটি নিয়ে যাবেন।

কাচিন মোড়ল মনে হল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু ওঠবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে সে বলল যে দু-দিন আগে আমাদের আগের দলের কাছে সে বিস্তর উপহার পেয়েও সাদা বাঘের চামড়া দেয়নি। সাদা বাঘের চামড়া দশ বছরে একটা মেলে কি না সন্দেহ। আমরা এ দুষ্প্রাপ্য জিনিস হেলায় ফেলে...

মামাবাবু এবার কিন্তু মোড়লকে তার বক্তৃতার মাঝেই থামিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের আগের দল? আমাদের আগের দল কী বলছ?'

মোড়ল মাটিতে তার বল্লম ঠুকে জানাল—মিছে কথা সে কিছু বলছে না, আগের দলকে সে সত্যিই দু-দিন আগে অনেক জিনিসের বদলেও সাদা বাঘের চামড়া দেয়নি।

মামাবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না, না তা বেশ করেছ। কিন্তু আগের দল কারা?'

সে কী, দু-দিন আগেই তো আমাদের মতো আরেক দল এই পথে গেছে। আমরা কি তা জানি না?—এবার মোড়ল জিজ্ঞাসা করল অবাক হয়ে।

মামাবাবু মনে হল অনেক কষ্টে নিজের উত্তেজনা শান্ত করে সহজ গলায় বলবার চেষ্টা করলেন, 'ও বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা কীরকম দল বলো দেখি?'

দল আর কীরকম। আমাদের চেয়ে কিছু বড়ো হবে, মোটাঘাটও তাদের অনেক বেশি।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাদের দলে কি সাহেব আছে?'

'সাহেব?' মোড়ল খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'সাহেব আছে বলে তো তার মনে হচ্ছে না। একজন চীনাই দলের নেতা।'

মামাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমাদের সাদা বাঘের ছাল উপহার দেবার কোনো আশা আর নেই দেখে কাচিন সর্দার শেষে ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিল। আমাদের তাঁবুও তারপর উঠল।

আজকের পথ ঘন বিপদসংকুল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। জঙ্গলটি আবার বেশ বড়ো। সন্ধ্যার আগেই সেটি পার হতে না পারলে বিশেষ ভয়ের কথা। লি-সিন ও তার দলের লোকেরা

pathagar.net

আমাদের অশ্বতর-বাহিনীকে তাই একটু জোরেই হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জঙ্গলে বিপদের আশঙ্কা আছে বলে মংপোকে বন্দুক দেওয়া হয়েছে। সে চলেছে অশ্বতর-বাহিনীর আগে লি-সিনের সঙ্গে। আমরা দুজনে সশস্ত্র হয়ে পেছনে চলেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে অত্যন্ত সরু পথ গিয়েছে। পাশাপাশি দুটি ঘোড়া যাবার রাস্তাও সব জায়গায় নেই। আমাদের অশ্বতর বাহিনীর দীর্ঘ সারি—প্রায় অধিকাংশই জঙ্গলের ভেতর আড়াল হয়ে আছে। কাচিন মোড়লের কাছে সেই সংবাদ শোনা অবধি মামাবাবু কেমন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছিলেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত পথে যেতে যেতেও তিনি কোনো কথা বললেন না। অবশেষে আমিই একটু অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

মামাবাবু খানিকক্ষণ আমার কথার উত্তর দিলেন না। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'ব্যাপার অত্যন্ত অদ্ভুত।'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'অদ্ভুত বলছেন কেন? আমাদের আগে আরেক দল এই পথে গেছে বলে?'

মামাবাবু বললেন, 'হুঁ'।

'কিন্তু সেটা এমন কী আশ্চর্য ব্যাপার?'

মামাবাবু এবার উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার নয়! এই দুর্গম দেশে এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্য ও রাজকর্মচারী ছাড়া কালেভদ্রেও সভ্যজগতের কেউ আসেনি; আমাদের অভিযানই এই পথে প্রথম। অথচ ঠিক আমাদের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যাচ্ছে আরেকটি দল এই পথে বেরিয়েছে, তাদের নেতা আবার চীনা, এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?'

আমি কিছু বলবার আগেই মামাবাবু আবার বললেন, 'এটাকে নিছক ঘটনার মিল বলে উড়িয়ে দিতেও আমি পারতুম যদি না মিচিনার কয়েকটা ব্যাপার এই সঙ্গে আমার মনে পড়ত।'

অবাক হয়ে বললাম, 'মিচিনায় আবার কী হয়েছিল? কই আমি তো জানি না!'

মামাবাবু বললেন, 'তোকে তখন সেকথা বলিনি। ব্যাপারটা তুচ্ছ মনে করে বলবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। মিচিনাতে আমাদের যাত্রা করবার দিন ছয়েক আগে একজন অচেনা চীনেম্যান আমায় অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে। সেদিন সার্ভে অফিস থেকে সন্ধেবেলা কয়েকটা ম্যাপ নিয়ে বেরোচ্ছি, হঠাৎ গেটের কাছে লোকটা আমায় টুপি তুলে নমস্কার করল। সাজপোশাক তার নিখুঁত সাহেবি, মুখ না দেখলে চীনেম্যান বলে চেনবার জো নেই। লোকটাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হল না, তাই শুধু প্রতিনমস্কার করেই চলে আসছিলাম। হঠাৎ লোকটা আমার নাম ধরে ডেকে বলল,—মি. রায়, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। আপনি তো বাড়ি যাচ্ছেন, এটুকু পথ আপনার সঙ্গে যেতে পারি কি?

'একটু অস্বস্তি হলেও আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম, কিন্তু লোকটার প্রথম কথায় একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। সে বলল— মি. রায়, আপনার অভিযানের সার্থকতা কামনা করি।

'গোপনে মিচিনার কয়েকজন বড়ো সরকারি কর্মচারীকে ছাড়া আমার অভিযানের কথা আমি কাউকে বলিনি। এ লোকটা সেকথা জানল কেমন করে বুঝতে না পেরে আমি তাকে উলটো প্রশ্ন করলাম,—আমি কোনো অভিযানে যে যাচ্ছি একথা আপনাকে কে বলল?

'চীনেম্যানের মুখ দেখেও মনের ভাব বোঝবার জো নেই। তবু মনে হল লোকটা যেন প্রথমটা একটু ভড়কে গেল। তারপরেই সামলে নিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে বলল—'আপনি কি কথাটা গোপন রাখবার জন্যে ব্যস্ত?

'বললাম,—না তা নয়, তবে কথাটা কেউ জানে না।

'চীনেম্যান বলল—ভালো খবর এমন ছড়িয়ে যায় একটু-আধটু। আপনার তাতে দুঃখিত হবারই বা কী আছে! এমন কিছু কাজ তো করছেন না যা লুকিয়ে রাখা দরকার।

'আমিই এবার একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—না না, তা নয়, আমি শুধু একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম প্রথমটা।

'এইবার লোকটার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করলাম। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। জোঁকের মতো আমার সঙ্গে লেগে থেকে সে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমার এ অভিযানের লক্ষ্য কোন জায়গা! কেন আমি হঠাৎ এখন কীট সন্ধানে চলছি। খনিজ সম্বন্ধেই আমার উৎসাহ হবার কথা, পোকামাকড় নিয়ে আমি আবার মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কতজন লোক আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, ইত্যাদি।

'একজন চীনেম্যানের এ বিষয়ে এই কৌতূহল একটু অস্বাভাবিক ঠেকলেও তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। সত্যিই আমাদের অভিযানে গোপন করবার তো কিছু নেই। যদি কেউ সে সম্বন্ধে জানতে চায় তো জানুক না। লোকটা বাড়ির কাছাকাছি এসে বিদায় নেবার পর আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কথা ভুলে গেছিলাম। লোকটার সঙ্গে তারপর আর দেখাও হয়নি।

'কিন্তু তারপর আর একটা ব্যাপার ঘটে, যার সঙ্গে সেই চীনেম্যানের সংশ্রব তখন অনুমান করতে না পারলেও এখন পারছি। আমাদের যাত্রা শুরু করবার দু-দিন আগে একটা উড়ো চিঠি আমার নামে আসে। চিঠিটা ইংরেজিতে টাইপ করা ; কোনো নাম নেই, কোনো সম্ভাষণ নেই, শুধু একধারে নীল কালিতে একটা ছবি আঁকা। ছবিটা একটু অসাধারণ বলেই এখনও মনে আছে—একটা বাদুড়ের দেহে একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ বসানো। চিঠিটাতে একরকম ভয় দেখিয়েই আমায় এ অভিযানে যেতে বারণ করা হয়েছিল। তাতে আরও লেখা ছিল যে আমি যদি নেহাতই এ অভিযানে যেতে চাই তাহলে অন্তত আর এক বছর অপেক্ষা করে যেন যাই।

সত্যি কথা বলতে কী, এ চিঠিটা আমি আমার কোনো বন্ধুর পরিহাস বলেই তখন উড়িয়ে দিয়েছিলাম। দু-একজন বন্ধু আমার এরকম বিপদসংকুল দেশে এ বয়সে যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ভেবেছিলাম তাঁরাই হয়তো চিঠি দিয়েছেন। মেয়েমুখো বাদুড়ের ছবিটাতে তো আমার মজাই লেগেছিল।'

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে মামাবাবুর কথা শুনছিলাম। মামাবাবু এবার চুপ করতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু এসব ব্যাপারের অর্থ আপনার কী মনে হয়? এরকম চিঠি দেওয়া, এরকম প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কী? কারা এসব করছে?'

'সেইটে বুঝতে পারছি না বলেই তো আরও অদ্ভুত লাগছে। আমরা নিরীহ সাধারণ লোক, চলেছি সামান্য পোকামাকড়ের খোঁজে। খাঁটি বৈজ্ঞানিকদের ছাড়া আর কারো আমাদের ব্যাপারে নজর দেবার কথা নয়। আমাদের বিরুদ্ধে এরকম ষড়যন্ত্র করে আমাদের বাধা দেওয়ায় কার কী স্বার্থ থাকতে পারে কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না। তা ছাড়া ঠিক আমরা যে সময়ে যে পথে বেরিয়েছি, সেই সময়ে সেই পথে আরেকটা চীনে দলের যাতায়াত অত্যন্ত রহস্যজনক!...'

মামাবাবু আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে আমরা এতক্ষণ খুব ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাচ্ছিলাম। ঘন জঙ্গলের সংকীর্ণ পথে আমাদের অশ্বতরবাহিনী যে একেবারে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে তা এতক্ষণ লক্ষ করিনি। হঠাৎ সামনের দিকে জঙ্গলের ভেতর বাঘের গর্জন ও মানুষের আর্তনাদ শুনে শিউরে উঠলাম।

এখানে জঙ্গল এমন ঘন ও ওপরের দিকে লতায় এমন আচ্ছন্ন যে দিনের বেলাই সব আবছা দেখায়। সেই অস্পষ্ট আলোয় সংকীর্ণ পথে ঘোড়া যতদূর সম্ভব জোরে চালিয়েও আমাদের ঘটনার স্থানে পৌঁছোতে বেশ দেরি হয়ে গেল। লি-সিন দেখলাম আমাদের আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। অন্যান্য চীনারাও চারিধারে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

আমরা যেতে ভিড় সরে গেল। এইবার দেখতে পেলাম সংকীর্ণ পথের ধারে একটা

pathagar.net

ঝোপের পাশে নরম কাদা ও রক্তে মাখামাখি হয়ে আমাদের একজন চীনা চালকের দেহ পড়ে রয়েছে।

লোকটার মুখে কান থেকে নাক পর্যন্ত দগদগে একটা ক্ষত, তা থেকে প্রচুর রক্ত পড়ছে। তার গায়েও নানা জায়গায় আঁচড়ের দাগ। তখনও লোকটা একেবারে মারা যায়নি। লি-সিন তাকে একটু কাত করে তুলে ধরে তার মুখে জল দিচ্ছিল। আমরা নিচু হয়ে তার কাছে বসতেই আমাদের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে সে যেন কী একটা কথা বলবার চেষ্টা করল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। কিন্তু জীবনী শক্তি তার তখন ফুরিয়ে গেছে। অস্পষ্ট ভাবে একটা শব্দ উচ্চারণ করেই সে একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

মামাবাবুর প্রশ্নে এবার লি-সিন সমস্ত ব্যাপার খুলে বলল। আমাদের মতো সেও বাঘের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ শুনে পেছন ফিরে আসে। এসে এই ব্যাপার দেখতে পায়। এখান পথ সংকীর্ণ বলে অশ্বতর চালকেরা একটু ছাড়াছাড়িভাবে যাচ্ছিল। যে লোকটি মারা গেছে সে একটু একলা পড়ে গেছিল বলে বোধ হয়। কারণ বাঘের গর্জন ও তার আর্তনাদ শুনলেও এই লোকটির পেছনের ও সামনের কোনো চালক বাঘ দেখতে পায়নি। চক্ষের নিমিষে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেছে। কাছের লোকেরা এসে শুধু লোকটিকে এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায়।

মামাবাবু লি-সিনের কথা শুনতে শুনতে নীচের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছিলেন। নীচে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ আমি আগেই দেখতে পেয়েছিলাম। বললাম, 'ও আমি আগেই দেখেছি। বাঘের পায়ের তো স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে।'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'স্পষ্ট বলেই তো দেখছি!' তারপর তিনি যা করে বসলেন তাতে তো আমরা সবাই অবাক। হঠাৎ দেখি মাটির ওপর নিচু হয়ে, পকেট থেকে একটা মাপবার ফিতে বার করে তিনি বাঘের দুটো পায়ের দাগের মধ্যেকার ব্যবধানটা মাপছেন।

দু-তিনটি দাগের তফাত মেপে দেখে মামাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে লি-সিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের অশ্বতরগুলি সব ঠিক আছে কি না।

লি-সিন বলল, 'না, যেটিকে এই লোকটি চালাচ্ছিল, বাঘের ভয়েই বোধ হয় সে বনের ভেতর পালিয়েছে। তার আর কোনো পাত্তা নেই।'

মামাবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাই হোক আমাদের দেরি করবার সময় নেই, এই লোকটির মৃতদেহ তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি এ জঙ্গল পার হবার ব্যবস্থা করো।'

লি-সিন এ কথায় যেন অবাক হয়ে গেল একটু। একটু ইতস্তত করে সে জানাল যে এই ঘন জঙ্গলে পলাতক অশ্বতরটি এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি। এখনও একটু খোঁজ করলে তাকে পেতে পারি। যদি নেহাত সে বাঘের হাতেই পড়ে থাকে তাহলেও আমাদের দামি জিনিসপত্রগুলো উদ্ধার হবে।

লি-সিনের কথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলেই আমার মনে হল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মামাবাবুর মতো বদলাল না। তিনি শুধু বললেন, 'না সে হবার নয়, তোমরা এগিয়ে চলো।'

আমি এবার বাধা না দিয়ে পারলাম না। বললাম, 'আপনি করছেন কী মামাবাবু? সামান্য একটু খোঁজ করলে জিনিসগুলো যদি পাওয়া যায় তাহলে সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত নয় কি? জঙ্গলের ভেতর বেশিদূর সে এখনও নিশ্চয়ই যায়নি।'

মামাবাবু অদ্ভুতভাবে এবার হেসে বললেন, 'তা হয়তো যায়নি। কিন্তু জিনিসগুলো পাবার আশা আর নেই?'

'কেন নেই?'

মামাবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'যে চীনে সর্দার মারা গেল তার জিম্মায় আমাদের কী ছিল দেখছিস—আমার সারভে করবার নানারকম যন্ত্রপাতির বাক্স। পোকা-শিকারে বেরিয়েও কাজে লাগতে পারে ভেবে এগুলো সঙ্গে নিয়েছিলাম। এ যন্ত্রপাতি ফিরে পাবার নয়।'

একটু বিরক্ত হয়েই এবার বললাম, 'আপনার হেঁয়ালি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

মামাবাবু তাঁর ঘোড়ায় চেপে বললেন, 'চ, যেতে যেতে সব কথা বলছি! এখন দেরি করবার সময় নেই।'

ঘোড়ায় চেপে খানিকদূর এগিয়ে যাবার পর মামাবাবু বললেন, 'আমাদের দলের মধ্যে বাঘের উপদ্রবটা একটু অদ্ভুত ধরনের নয় কি?'

'কেন?'

'একবার বাঘের উপদ্রবের সঙ্গে গেল কম্পাস চুরি, আর একবার বাঘ এসে এমন লোককে আক্রমণ করল যার জিম্মায় দামি জরিপের যন্ত্রপাতি!'

আমি এবার বিমূঢ়ভাবে বললাম, 'এর মানে আপনি কী বলতে চান?'

'এর খানিকটা মানে বাঘের পায়ের দাগ যেখানে পড়েছে সেখানটা ভালো করে লক্ষ করলে তুই নিজেই বুঝতে পারতিস। লক্ষ করেছিস কিছু?'

আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে এবার বললাম, 'বাঃ, বাঘের পায়ের দাগ আমিই তো আগে দেখেছি।'

মামাবাবু আমায় যেন ধমক দিয়েই এবার বললেন, 'কিচ্ছু দেখিসনি! দেখলে বুঝতে পারতিস ও বাঘের পায়ের দাগ নয়। হতে পারে না।'

'বাঘের পায়ের দাগ নয়!—আমি হতভম্ব হয়ে এবার উচ্চারণ করলাম।

'না, নয়। বাঘেরা নেহাত হালকা জানোয়ার নয়। অত বড়ো যে বাঘের থাবা, তার ওজন কমপক্ষেও কত হয় জানিস? অন্তত ছয় মণ! ছয় মণ বাঘের পায়ের দাগ নরম কাদাতে আরও ঢের গভীরভাবে পড়ত। তা ছাড়া বাঘ কী কখনো দু-পায়ে হাঁটে?'

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দু-পায়ে হাঁটার খবর কোথায় পেলেন?'

'পেলাম মেপে। বাঘের মতো চার পেয়ে জানোয়ারের আগুপাছু দাগের মধ্যে ব্যবধান আর দু-পায়ে যে হাঁটে তার দাগের ব্যবধান আলাদা!'

'তবে কি...'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে আমার কথার মাঝখানেই বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের তাঁবুতে ঢুকে যে কম্পাস চুরি করেছে ও আজ আমাদের চীনে সর্দারকে যে মেরেছে, সে, আর যেরকম প্রাণীই হোক, বাঘ নয়, তার পা মাত্র দুটি।'

মামাবাবুকে আরও একটু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় পেছনে পায়ের দ্রুত শব্দ পেলাম। ফিরে দেখি, লি-সিন দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে! ব্যাপার কী বুঝতে না পেরে আমরা ঘোড়া রুখলাম। লি-সিন হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছোতেই মামাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী লি-সিন?'

লি-সিন ডান হাতটা এবার উঁচু করে ধরল ; হাতে তার খেলনার ছোরার মতো একটি অস্ত্র, কিন্তু সে অস্ত্রের ধারালো ফলাটা জমাট রক্তে তখনও লাল। সেই ছোরাটি তুলে ধরে উত্তেজিতভাবে লি-সিন যা বলল তার মর্ম এই যে, চীনে চালকের মৃতদেহটা বয়ে আনবার জন্যে তোলার সময় তারা তার পিঠে এই অস্ত্রটি বিদ্ধ দেখতে পায়। বাঘের হাতে যে মরেছে তার পিঠে এরকম অস্ত্রবিদ্ধ থাকার কোনো মানে বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে লি-সিন মামাবাবুকে এটি দেখাতে এনেছে।

মামাবাবু সাবধানে লি-সিনের হাত থেকে ক্ষুদ্র ছোরাটি তুলে নিয়ে বললেন, 'যাক, এবার চরম প্রমাণ পাওয়া গেল। দেখছিস!'

কিন্তু তখন অন্য কোনোদিকে দেখবার আমার ক্ষমতা নেই। ছুরি সমেত ডান হাতটা উঁচু করে ধরার সঙ্গে সঙ্গে লি-সিনের জামার ঢোলা হাতাটা নীচে খসে গেছিল। তার সেই অনাবৃত হাতের দিকে চেয়ে আমি তখন আবিষ্টের মতো চোখ আর ফেরাতে পারছি না।

আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে হঠাৎ চমকে লি-সিন তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে ফেলল, কিন্তু তখন আমার দেখতে কিছু বাকি নেই।

লি-সিনের ডান হাতের উপরে নীল একটি অদ্ভুত উলকি আঁকা, উলকির ছবিটি মেয়ের মুখ বসানো একটা বাদুড়ের।

লি-সিন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দলের সকলের কাছে ফিরে গেল। আমি খানিকক্ষণ ধরে কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলাম না। মামাবাবু তখন ছুরিটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলছেন, 'ছুরিটা সাধারণ বর্মি ছুরি নয়, এরকম বাঁটের কারুকাজ বর্মার কোথাও হয় না বলেই আমি জানি।'

আমার কিন্তু মামাবাবুর কথায় বিশেষ কান ছিল না। লি-সিনের হাতে যা দেখেছি তার কথা মামাবাবুকে বলব কি না তাই ঠিক করতেই আমি তখন পারছি না। শেষ পর্যন্ত আমার মনে হল একথা আপাতত গোপন করে যাওয়াই ভালো। মামাবাবুর লি-সিনের ওপর অগাধ বিশ্বাস। লি-সিন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যে অমূলক নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ যতদিন সংগ্রহ করতে না পারছি ততদিন কোনো কথা তাঁকে জানাব না। ইতিমধ্যে লি-সিনের ওপর নজর রেখে আমার নিজের অনুসন্ধান নিজেই চালাতে হবে।

মামাবাবু ছুরিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এরকম জিনিস কোথাও দেখেছিস?'

বললাম, 'না, কিন্তু চরম প্রমাণ একে বলছ কেন?'

তিনি একটু হাসলেন। তারপর ছুরিটা আবার আমার হাত থেকে নিয়ে বললেন, 'এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে...'

আমি একটু অভিমান করে বললাম, 'আমার বুদ্ধি তেমন ধারালো নয়তো।'

মামাবাবু কৌতুকের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'না রে সেকথা বলছি না, কিন্তু এই ছুরি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের চীনে-চালক বাঘের আক্রমণে মারা যায়নি, মারা গেছে ছুরির আঘাতে। আর ছুরি কোনো জানোয়ার চালায়!'

আমি বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, আমার বুদ্ধি কম বলেই অন্য নানা কথা আমার মনে হচ্ছে?'

'কী মনে হচ্ছে আবার?' মামাবাবু একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন।

'ছুরিটা যে একমাত্র মানুষই চালাতে পারে, সেটুকু বুঝতে পারছি কিন্তু ছুরিটা যদি সত্যি ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে কখনো হয়েছে এবং কার দ্বারা হয়েছে তার কিছু হদিস কি পাওয়া যাচ্ছে এটা থেকে?'

মামাবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'তাঁর মানে?'

বললাম, 'তার মানেও কি বুঝিয়ে দিতে হবে? বলবার পর এবার—দুজনেই হেসে ফেললাম।

মামাবাবু এবার বললেন, 'তাহলে তুই কী বলতে চাস?'

'বেশি কিছু নয়, শুধু এই যে, ছুরিটা হয়তো প্রথম আক্রমণের পরেও ব্যবহার হতে পারে কিংবা আসল হত্যাকারীর এটা একটা চাল, আমাদের সন্দেহকে ঘুলিয়ে দিয়ে ভুল পথে চালাবার জন্যে।'

আমার দিকে খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকে মামাবাবু বললেন, 'আমার তা মনে হয় না।'

pathagar.net

কিন্তু আমার তাই মনে হয়। তবু আমার সন্দেহের সব কথা মামাবাবুর কাছে প্রকাশ করবার সময় হয়নি বলে, আমি তখনকার মতো চুপ করে গেলাম।

সেদিন সত্যিই সন্ধের আগে আমরা জঙ্গল পার হতে পারলাম না। অন্ধকার নেমে এল তার আগেই। ঘন জঙ্গলের ভেতর তাঁবু ফেলা অসম্ভব ব্যাপার। কোনোরকমে গাছ লতাপাতা কেটে আমাদের তাঁবুটুকু ফেলবার ব্যবস্থা হল। আর সকলকেই আগুন জ্বালিয়ে বাইরে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করতে হল। লি-সিন আর তার দল আজকে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছিই রইল। এদের কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। তাদের সঙ্গীর মৃতদেহের সৎকার করে জঙ্গলের ভাপসা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে তারা কোনো রকম আগুন-টাগুন না নিয়েই শুধু কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। জঙ্গলের হিংস্র শ্বাপদ সম্বন্ধেও তাদের ভয়ডর যেন নেই।

পথে বেরিয়ে এ কয়দিন কোনো বিশেষ অস্বস্তি ভোগ করিনি। কষ্ট বা অসুবিধাতে খুব কাতর হওয়া আমার স্বভাবও নয়। কিন্তু আজ এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর তাঁবুর মাঝেও কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। এ ধরনের অরণ্যবাসের অভিজ্ঞতা আমার নেই। অরণ্য সম্বন্ধে আমার সাধারণ যে কল্পনা ছিল তার সঙ্গে কিছুই এর মেলে না। বিছানা পাততে গিয়ে প্রথমেই তো গোটা দুই বড়ো বড়ো কাঁকড়াবিছে তাঁবুর ভেতরে আবিষ্কার করে মনটা খিঁচড়ে গেল। আলো জ্বেলেও বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না। জঙ্গলের অসংখ্য বিদঘুটে চেহারার পোকা সে আলোর নিমন্ত্রণে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করল। এমন আলো চতুর্দশ পুরুষের জীবনে তারা নিশ্চয় দেখেনি। সে পোকামাকড়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন হিংস্র বন্যার মতো এসে চারিদিক থেকে আমাদের চেপে ধরল। সে অন্ধকার নয় যেন শক্ত কালো পাথরের দেওয়াল। আমাদের পিষে ফেলবার জন্য উদগ্রীব। হাত দিলেই সে অন্ধকার যেন ছোঁয়া যাবে মনে হয়। তারপর জঙ্গলের অদ্ভুত শব্দময় নিস্তব্ধতা। আগাগোড়া একটা হট্টগোলের ভেতর থাকা যায়, কিন্তু এই যে জঙ্গলের পরিপূর্ণ নিঃশব্দতা থেকে থেকে অজানা কোনো জানোয়ারের আর্তনাদে বা কোনো নিশাচর শ্বাপদের আস্ফালনের শব্দে হঠাৎ যেন কাঁচের বড়ো আয়নার মতো ঝনঝন করে ভেঙে যাচ্ছে, —মনের সঙ্গে সমস্ত দেহের স্নায়ুও এতে অবশ হয়ে যায়। এ জঙ্গল কল্পনার জিনিস নয়, এ একেবারে মানুষের জীবন্ত শত্রু। বিশাল গাছগুলো যেন স্থানু নয়, বিরাটকায় দৈত্যদের বাহিনীর মতো তারা যেন মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সারি সারি কাঁটার ঝোপে, অসংখ্য তার ফাঁদ পাতা, অগণন তার অস্ত্র আর উপকরণ।

মামাবাবুর কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মিচিনার পাকা বাড়িতেই যেন শুয়েছেন এমনিভাবে তিনি বিছানায় পড়েই নাক ডাকাতে শুরু করলেন। আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল বিছানার ভেতর কোথায় যেন কাঁকড়াবিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন বাইরে কোনো জানোয়ারের নিঃশব্দ সঞ্চরণ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল দূরে যেন কোনো মানুষই আর্তনাদ করে উঠল, তাঁবুর দরজার পরদা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে মংপো আর আমাদের কাচিন চাকর যেখানে আগুন জ্বালিয়ে শুয়েছিল সেখানে একবার চেয়ে দেখলাম। কোথাও কিছু গোলমাল নেই, গনগনে না হলেও তাদের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। তারা বেশ সুখে আছে বলে অবশ্য মনে হল না। আগুনের রক্তাভ আলোয় মনে হল তাদের কম্বল প্রায়ই নড়ছে।

এ আলো দেখে কিন্তু বিশেষ ভরসা পেলাম না! বিছানাটা অন্ধকারেই একবার ঝেড়ে নিয়ে আবার এসে শুয়ে অবশ্য পড়তে হল। খানিক বাদে অনেককষ্টে একটু তন্দ্রাও এল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ আচমকা কীরকম একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখছিলাম কি না বলতে পারি না কিন্তু মনে হল কে যেন এইমাত্র তাঁবুর দরজার পরদা সরিয়ে বেরিয়ে গেল। স্পষ্ট যেন শুনলাম তাঁবুর পরদা নড়ার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি উঠে পরদার কাছে

pathagar.net

গেলাম। সেটা তখনও নড়ছে। কিন্তু হাওয়ায় হওয়াও সম্ভব। বাইরে সত্যিই বেশ জোরে কনকনে হাওয়া দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কী করব ভাবছি এমন সময় কাছেই পায়ের আওয়াজ শুনলাম। পরদার ভেতর দিয়ে শুধু মুখটুকু বাড়িয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে রইলাম। মংপোদের আগুন প্রায় নিভে এসেছে, তারা ঘুমে অচেতন। কে আর আগুনে মশলা জোগাবে? কিন্তু সেই নিভু নিভু আলোতেই আমার কাজ হয়ে গেল। যার পায়ের শব্দ শুনেছিলাম সে সেই আগুনের পাশ দিয়েই কোথায় দ্রুত বেগে চলেছে দেখা গেল। আর সমস্ত অন্ধকার হলেও শুধু তার পায়ের বিশেষ ধরনের জুতো দেখেই আমি তাকে চিনলাম। লি-সিন ছাড়া এ ধরনের জুতো আমাদের দলের কারুর নেই।

এই নিশুতি রাত্রে এমন সময় লি-সিন চলেছে কোথায়?

তাঁবুতে আমরা সাজপোশাক সমেত যে শুয়েছিলাম একথা বলাই বাহুল্য। কোমরবন্ধে পিস্তলও ছিল, শুধু বিছানা থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে আমি আর দ্বিধামাত্র না করে তাকে অনুসরণ করলাম।

অনুসরণ করা বেশ কঠিন। একে দারুণ অন্ধকার তায় জঙ্গলের পথ, প্রত্যেক পদে নানা লতাপাতার বাধা। নীচের শুকনো পাতা মড়মড় করে উঠলেই মনে হয় বুঝি সব জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু সে ভয় যে অমূলক অল্পক্ষণেই তা বুঝতে পারলাম। যাকে অনুসরণ করছি তার কাছেও নিজের পায়ের শব্দে ও জঞ্জালের খসখসানিতেই অন্য শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে। শুধু বেশি এগিয়ে বা পিছিয়ে পড়লে চলবে না। অন্ধকারে লোকটাকে হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত সহজ।

এভাবে অনুসরণ করার বিপদ যে কতখানি তা যে বুঝিনি তা নয়। সাপখোপ ও হিংস্র শ্বাপদের ভয় তো আছেই তা ছাড়া শত্রুর কবলে পড়ার সম্ভাবনাও কম নয়। লি-সিন কোথায় কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে কিছুই জানি না। সেখানে গিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করার বদলে হয়তো নিজেই আবিষ্কৃত হয়ে বিপন্ন হতে পারি, কিন্তু তবু এ অনুসরণ ত্যাগ করতে পারলাম না। মনে হল বিপদ যতই থাক, আমাদের চারিধারে যে রহস্য ঘিরে রয়েছে তার মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাবার এমন সুযোগ আর মিলবে না।

কোথা দিয়ে কোন দিকে যে যাচ্ছিলাম কিছুই জানি না। যাকে অনুসরণ করছি সেই আমার একমাত্র পথ-প্রদর্শক। ফিরে আসব কী করে, যদি সে ভাগ্য হয়, তাও তখন খেয়াল নেই। শুধু এক লক্ষ্য নিয়ে চলেছিলাম।

কিন্তু তাতেও বাধা পড়ল। অনেকক্ষণ বনের ভেতর দিয়ে কাঁটা গাছের ডালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে যেতে সহসা একজায়গায় আমাদের দুজনার মাঝখান দিয়ে কী একটা বিশাল জানোয়ার সশব্দে জঙ্গল ভেঙে ছুটে বেরিয়ে গেল। চমকে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তারপরে এগোতে গিয়ে দেখি লি-সিনকে হারিয়ে ফেলেছি। সে এর মধ্যে কোন দিকে গেছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তার পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করলাম। মনে হল যেন দূরে পায়ের চাপে পাতা গুঁড়িয়ে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে অনুসরণ করা শক্ত। নিজের পায়ের আওয়াজে সব শব্দ ঢেকে যায়।

এবার আমি সত্যি ভয় পেলাম। অনুসরণ ব্যর্থ তো হলই, তা ছাড়া আমার ফেরবার পথও যে বন্ধ। সকাল হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও আমি কি পথ খুঁজে যেতে পারব? মামাবাবু তাঁর লোকজন নিয়েই কি আমায় খুঁজে পাবেন? জঙ্গলে এইভাবে পথ হারিয়ে কত লোক এমনিভাবে মারা পড়েছে আমি শুনেছি। জঙ্গলের জাদু এমনি যে, সেখানে পথ হারিয়ে বেরোবার চেষ্টা করলে মানুষ কেবল ঘুরে ঘুরে যেখান থেকে যাত্রা করেছিল সেখানেই ফিরে আসে এবং শেষে একেবারে ক্লান্ত হয়ে মারা যায়।

কিন্তু না, এসব কথা ভাবলে চলবে না, আমার যেমন করে হোক বেরোতেই হবে। আর

একবার কান পেতে আমি পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করলাম এবং একটুখানি আভাস পাওয়া মাত্র আর ধরা পড়বার ভয় ভুলে প্রাণপণে সেদিকে দৌড়ে গেলাম খানিক। সেখান থেকেও অমনিভাবে একটু থেমে পায়ের আভাস পেয়ে আবার দৌড়োতে লাগলাম সেইদিকে। দৌড়োতে দৌড়োতে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম। যেদিকেই এসে থাকি, জঙ্গল যেন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। পদে পদে সেরকম বাধা আর নেই। বড়ো বড়ো গাছও অনেক দূরে দূরে।

বেশিদূর এমন করে দৌড়োতে হল না। সমস্ত জঙ্গল আচমকা কেঁপে উঠল বাঘের গর্জনে। গর্জন খুব কাছে।

কিন্তু আমি টর্চের আলোটা জ্বালাবার আগেই অন্য একদিক থেকে আরেকটা টর্চের আলো সেখানে এসে পড়ল অন্ধকার চিরে। সে আলোয় দেখা গেল দীর্ঘকায় এক চীনেম্যান হাতে একটা শিঙার মতো জিনিস নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

টর্চের আলো পড়ার পরও সেই শিঙা মুখে তুলে সে একবার ফুঁ দিল, বেরিয়ে এল এক ভয়ংকর বাঘের গর্জন।

ওদিক থেকে যে টর্চ ফেলেছিল সে লোকটা এবার এগিয়ে এল। দুজনের উপর আলো ফেলেই আমি চমকে উঠলাম। নতুন লোকটি আর কেউ নয়—মামাবাবু!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মামাবাবু ও সেই চীনেম্যান দুজনেই চমকে ফিরে তাকিয়েছিল। আমি এগিয়ে তাদের কাছে যাবার পর মামাবাবু একবার শুধু বিস্মিতভাবে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'তুই?' তারপরে আমাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে চীনেম্যানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ইংরেজিতে, 'কে তুমি?'

মামাবাবুর এক হাতে ছিল টর্চ ; কিন্তু আরেক হাতে যে জিনিসটি ছিল তাকে ভয় না হোক সম্মান না করা কঠিন।

কিন্তু সেই রিভলভারের নিঃশব্দ হুমকি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে অত্যন্ত সহজভাবে দীর্ঘাকার চীনেম্যান পরিষ্কার ইংরেজিতে উত্তর দিল, 'সেই প্রশ্ন আমিও আপনাদের করতে যাচ্ছিলাম।'

মামাবাবু কঠিন স্বরে বললেন, 'তামাশা রাখো, এখানে তুমি কী করছ?'

চীনেম্যান একটু হেসে বললে, 'স্থান কাল বিচার করে ঠিক আপনি কথা বলছেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'মিছিমিছি কথা বাড়াবার আগ্রহ আমার নেই।' মামাবাবু আরও রূঢ়ভাবে বললেন, 'তোমার পরিচয় ও এখানে উপস্থিতির কারণ আমি জানতে চাই।'

'কৌতূহল জিনিসটা শুধু আপনার একচেটিয়া মনে করছেন কেন? তা ছাড়া একরকম আমারই ঘরে বসে আমায় চোখ রাঙানো কি ভালো!'

'তোমারই ঘরে বসে! তার মানে?'

এবার চীনেম্যান মুখে উত্তর না দিয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার টর্চটা ধরে অপর দিকে ঘুরিয়ে দিল। নতুন দিকে আলো পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম। এতক্ষণ অন্ধকারে এ জিনিসটি আমরা দেখতেই পাইনি।

কাছেই বনের ভিতর একটা বড়ো তাঁবু ফেলা রয়েছে।

বিস্ময় সামলে ওঠবার আগেই দীর্ঘকার চীনেম্যান বলল, 'অসময়ে অস্থানে হলেও এ গরিবের তাঁবুতে দয়া করে পা দিলে অতিথি-সৎকারের একটু চেষ্টা করতে পারি।'

pathagar.net

এবার আমি শুধু নয় মামাবাবুও বোধ হয় বেশ একটু ভড়কে গিয়েছিলেন। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আজগুবি, তা ছাড়া এমন জায়গায় কোনো অজানা তাঁবু যে থাকতে পারে তা আমরা কল্পনাও করিনি। মামাবাবু একটু যেন অপ্রস্তুতভাবেই চুপ করেছিলেন।

চীনেম্যান আবার বলল, 'পরস্পরের আলাপ পরিচয় ওখানে গিয়েই ভালো করে হতে পারে। আপনারা অনেক কিছু প্রশ্ন করেছেন, আমারও হয়তো কিছু জানবার আছে।'

মামাবাবু এতক্ষণে স্থির হয়ে বললেন, 'কিন্তু এ সময়ে আপনার তাঁবুর বাইরে আসবার কারণ কী? এ অদ্ভুত শিঙা বাজাবারই বা কী অর্থ?'

চীনেম্যান আবার হেসে বলল, 'সেটুকু আগে না জানলে আপনাদের অপরিচিত তাঁবুতে হঠাৎ ঢুকতে সাহস হচ্ছে না কেমন?'

'জঙ্গলে এই রাত্রে যারা এতদূর আসতে পেরেছে তাদের আর যাই হোক সাহসের অভাব আছে একথা বোধ হয় বলা চলে না।' আমি বললাম।

চীনেম্যান বলল,'তা বটে! তাহলে কৈফিয়তটাই দিচ্ছি—শুনুন। কিন্তু এইমাত্র এই অদ্ভুত শিঙাটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বললে কি বিশ্বাস করতে পারবেন?'

'কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, কুড়িয়ে পেয়েছি। আপনারা ভাবছেন নিশ্চয়, যে এই অন্ধকার রাত্রে তাঁবু ছেড়ে শিঙা কুড়োতে বেরোনোটা একটু অস্বাভাবিক। আমি সত্যি সেই জন্যেই অবশ্য তাঁবু থেকে এমন সময়ে বার হইনি। বার হয়েছিলাম চোর তাড়া করতে।'

একটু চুপ করে থেকে আমাদের বিস্ময়টাকে বেশ যেন মজা করে উপভোগ করে চীনেম্যান বলল আবার, 'শুনলে অবাক হবেন যে, এই জঙ্গলের মাঝেও আমার তাঁবুতে খানিক আগে চোর ঢুকেছিল। আমি জেগে থাকায় সুবিধে করতে পারেনি অবশ্য। তাকে তাড়া করতেই বেরিয়েই এটি পেয়েছি। লোকটা কোনো কিছু অস্ত্রের অভাবেই বোধ হয় এটা মেরে আমায় জখম করতে চেয়েছিল। যাইহোক চোর ধরতে না পেরে তার জিনিসটার গুণ পরীক্ষা করছি এমন সময় আপনারা দেখা দিলেন আশ্চর্যভাবে।'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আপনি এরকম শিঙার আওয়াজ আগে কখনো শুনেছেন?'

চীনেম্যান একটু থেমে অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্যের বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করাতেই এখন মনে পড়ছে যে শুনেছি শুধু নয় ; এরকম আওয়াজে এই কদিন তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এটা যে সামান্য শিঙার আওয়াজ হতে পারে তা কখনো ভাবিনি। যাইহোক অনেক কিছু রহস্য আমাদের মীমাংসা করবার আছে মনে হচ্ছে। অনুগ্রহ করে আমার তাঁবুতে যদি আসেন তাহলে ভালো করে একটু আলাপ করতে পারি।'

মামাবাবু কী ভেবে এবার বললেন, 'চলুন'।

তার তাঁবুতে গিয়ে খানিকক্ষণ পরস্পরের পরিচয় দেওয়া নেওয়ার পর অনেক নতুন কথা জানতে পারলেও কোনো রহস্যই সরল হল না। এই চীনেম্যান সম্বন্ধে আমরা আগেই যা অনুমান করেছিলাম, তার অধিকাংশ সত্য বলে জানা গেল। কিছুদিন আগে সেই যে বিস্তর দলবল নিয়ে মিচিনা থেকে বেরিয়েছিল একথা সে নিজে থেকেই জানাল। এ পথে তার যাত্রা করবার কারণও পাওয়া গেল। সে চীনের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তপ্রদেশ ইউনানের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তার নাম লাওচেন। সেখানে সে নাকি বিশেষ বিখ্যাত। বৎসর খানেক আগে বিশেষ কোনো কারণে সেখানকার শাসনকর্তার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এখন আবার গোপনে এই পথে সে দেশে ঢুকতে চেষ্টা করছে।

দুঃখের বিষয়, যে রহস্যের কিনারা আমরা করতে চাইছিলাম তার সঙ্গে এ সমস্ত খবরের কিন্তু কোনো সংশ্রবই নেই। বরং না জেনে এই চীনাদলের সঙ্গে আমাদের গত কয়েকদিনের

ঘটনার যে যোগ আছে বলে আমরা কল্পনা করেছিলাম—এ সমস্ত খবর শুনে সে বিষয়ে সন্দেহই উপস্থিত হল। তার কথায় জানলাম জঙ্গলের পথে তাদের দলের ওপরও বাঘের বহু উপদ্রব হয়েছে।

লাওচেনের কাছে সব চেয়ে বিস্ময়কর খবর কিন্তু পাওয়া গেল শেষে। তার ওপর যেটুকু অবিশ্বাস ছিল এই খবরের পর সেটুকুও দূর হয়ে তার জন্য রীতিমতো দুঃখই হল। তার তাঁবুতে যখন ঢুকেছিলাম তখন অন্ধকারে বাইরের বেশি কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বেরোলাম তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে।

লাওচেন আমাদের এগিয়ে দেবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আমরা যে সামান্য পোকামাকড়ের খোঁজে এই বিপদসংকুল দেশে এসেছি একথা তাকে এখনও ভালো করে বিশ্বাস করাতে পারা যায়নি। সে তখনও বিস্মিতভাবে সেই সম্বন্ধেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

হঠাৎ মামাবাবু বললেন, 'আশ্চর্য! আর সব লোকজন আপনার কোথায়? আপনার তো মস্ত বড়ো দল! তাদের কাউকে তো দেখছি না।'

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ কাতরভাবে বললে, 'আপনাদের এ কথাটা জানাতে চাইনি। এবারে আমার দেশে যাওয়া আর হল না।'

'কেন বলুন তো?'

'আমার অধিকাংশ লোকজন এই গতকালই আমায়ছেড়ে চলে গেছে। কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে নেই। কাল রাত্রে আমার তাঁবুতে চোর আসতে সাহসও বোধ হয় করেছিল তাই।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ এরকম ছেড়ে যাওয়ার কারণ!'

'কারণ যে কী তা ঠিক আমিও বুঝতে পারছি না। তবে তারা যে বিশেষ একটা কিছুর ভয় পেয়ে সরে গেছে এটা ঠিক। তাদের ইউনান পর্যন্ত যাবার কথা, কিন্তু এই পর্যন্ত এসে আর তারা কিছুতে এগোতে রাজি হল না। মাইনে বকশিশ সব কিছুর লোভ দেখিয়েও তাদের রাখতে পারলাম না। আপনারা সাবধান থাকবেন, শেষ পর্যন্ত আপনাদের দলে না এমনি কিছু হয়।'

'এখনও পর্যন্ত তো হয়নি। কিন্তু ভয়টা কীসের মনে করেন?'

লাওচেন বলল, 'শুধু বাঘের উপদ্রব নয়। উত্তরের জঙ্গলে দাবুরা খেপে গিয়ে বিষের তির ছুঁড়ে সকলকে মেরে ফেলছে এমনি এক গুজব নাকি রটেছে।' তার কথার ধরনে কিন্তু মনে হল যে এই গুজবই সব নয়। এ ছাড়া বিশেষ কোনো একটা কথা সে চেপে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লাওচেনের কাছে বিদায় নিয়ে জঙ্গলের পথে নিজেদের তাঁবুর দিকে যেতে যেতে মামাবাবুর সঙ্গে প্রথম ভালো করে সব কথা আলোচনা করবার সময় পেলাম। প্রথমে মামাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে কীজন্যে কীভাবে আমি এই অন্ধকার রাত্রে জঙ্গলের মাঝে বেরিয়ে পড়েছিলাম তার কাহিনি বলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আপনি কী করে এলেন এখানে?'

মামাবাবু বললেন, 'আমাদের তাঁবু থেকে যে লোকটা রাত্রে বেরিয়ে যাওয়ায় তোর ঘুম ভেঙে গেছিল, সে লোকটা কে বল দেখি?'

'বুঝতে পারছি না।'

মামাবাবু এবার হেসে বললেন, 'সে আমিই।'

'আপনিই! আপনি কীজন্যে অত রাত্রে বেরিয়েছিলেন, লি-সিনের ওপর তাহলে আপনারও লক্ষ্য ছিল বলুন।'

pathagar.net

'না লি-সিনকে আমি দেখি-ইনি। এখন তোর কথায় বুঝতে পারছি, আমি যার পিছু নিয়েছিলাম, লি-সিনের লক্ষ্যও ছিল সে-ই।'

'সে আবার কে? আমি তো দেখিনি কাউকে!'

'তুই কী করে দেখবি? তুই লি-সিনকেই অনুসরণ করেছিস। সে যার পিছু নিয়েছিল তাকে দেখতে পাবার তোর কথা নয়।'

আমি বিস্মিত হয়ে খানিক চুপ করেছিলাম। মামাবাবু আবার বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। লি-সিন আর আমি দুজনই একই লোককে অনুসরণ করেও পরস্পরকে দেখতে পাইনি, তুই আবার লি-সিনেরই পিছু নিয়েছিলি।'

'কিন্তু তোমরা যাকে অনুসরণ করেছিলে সে কি আমাদেরই দলের কেউ?'

'তাই তো আমার বিশ্বাস।'

'সে কে হতে পারে?'

মামাবাবু বললেন, 'তা এখন বলতে পারব না—কিন্তু এই কয়দিনের সমস্ত রহস্যের মূলে সে যে কতকটা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে শিঙা থেকে বাঘের ডাক বেরোয় সেটা তারই কাছে ছিল।'

'তার মানে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে সে লাওচেনের তাঁবুতেও চুরি করতে ঢুকেছিল?'

মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'সেইরকমই তো দেখা যাচ্ছে!'

সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু অত রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে তুমি তার সাড়া পেলে কী করে?'

আমায় একেবারে অবাক করে দিয়ে মামাবাবু বললেন,'আমি ঘুমোইনি। তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম শুয়ে শুয়ে।'

'তার মানে তুমি আগে থাকতেই জানতে সে যাবে! তাহলে তাকে ধরবার বন্দোবস্ত করোনি কেন?'

'তাহলে তার গন্তব্যস্থান জানতে পারতাম না।'

'কিন্তু জানতেও আমরা কিছুই পারলাম না। সে তো লাওচেনের তাঁবু থেকেও পালিয়ে গেল।'

মামাবাবু এবার গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, 'তা বটে'! তারপর খানিক নীরবে চলার পর আবার বললেন, 'দেখা যাক লি-সিন কী খবর দেয়।'

কিন্তু লি-সিনের কাছে কোনো খবর পাবার আশা আমার ছিল না। মামাবাবু যাই বলুন, লি-সিনের গতিবিধির আমি অন্যরকম ব্যাখ্যাই করেছিলাম এবং সে ব্যাখ্যা যে ভুল নয় ঘটনার দ্বারা খানিকটা প্রমাণও হয়ে গেল।

নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে কী দেখব সে বিষয়ে আমার একটু ভয়ই ছিল। লাওচেনের লোকদের মতো আমাদের বাহকেরাও আমাদের ফেলে সরে পড়তে পারে হয়তো।

কিন্তু তাঁবুতে পৌঁছে দেখা গেল—সেরকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমাদের অনুচরদের সকলেই উপস্থিত। শুধু এক লি-সিন ছাড়া।

লি-সিন সম্বন্ধে মামাবাবুর গভীর বিশ্বাসে একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না এবার, 'আপনার লি-সিনের তো পাত্তা নেই, মামাবাবু! চোর না ধরে বোধ হয় ফিরবে না মনে হচ্ছে!'

মামাবাবু আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বললেন 'তোর কি এখনও লি-সিনের ওপর সন্দেহ গেল না?'

একটু অপ্রসন্নভাবেই বললাম, 'কেমন করে যাবে তা তো বুঝতে পারছি না। আর সকলেই

pathagar.net

তো উপস্থিত, শুধু লি-সিনকেই পাওয়া যাচ্ছে না, এর মানে কী? আমাদের দলের যে সাংঘাতিক লোককে কাল অনুসরণ করেছিলে বলছ সেও তো বোঝা যাচ্ছে কোনোরকমে দলে ফিরে এসেছে!'

মামাবাবু একথা ভেবেছিলেন কি না বলা যায় না কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন।

আমি আবার অসহিষ্ণুভাবে বললাম, 'আমাদের ভেতর অমন ভয়ানক লোক কে আছে তাও তো খুঁজে বার করা দরকার। ঘরের ভেতর বিষাক্ত সাপ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাও তো উচিত নয়।'

এবার মামাবাবু যা উত্তর দিলেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না! মনে হল কদিনের ঘটনা-বিপর্যয়ে তাঁর মাথাই একটু খারাপ হয়েছে। তিনি বললেন, 'ভাবনা নেই! সাপ কোথায় আছে জানলে যথাসময়ে মারা যাবে। তা ছাড়া এখন আমাদের কিছুদিন আর কোনো ভয় নেই।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন বলো দেখি?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে।'

মামাবাবুর পাগলামিতে বিরক্ত হয়েই আমি এবার চুপ করে গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মামাবাবুর কথা কিন্তু এবার আশ্চর্যভাবে ফলল। এতদিন যে বিপদ আমাদের অনুসরণ করে আসছিল জাদুমন্ত্রে তা যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। হার্টজ কেল্লা পর্যন্ত পাহাড়ের পথে আমাদের সামান্য একটু-আধটু জঙ্গলের অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই ভোগ করতে হল না। আশ্চর্যের বিষয় লি-সিনের সেই রাত্রের পর আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। না পাওয়াতে আমি বিশেষ দুঃখিত সত্যি হইনি। আমার ধারণা, সে সময় বুঝে এবার নিজের পথ দেখেছিল। ভেবেছিলাম মামাবাবু খুব বিচলিত হবেন। আমার কথায় লি-সিন সম্বন্ধে বিশ্বাস তাঁর একটু শিথিল হয়েছিল সম্ভবত। কিন্তু তাঁকে তেমন কিছু ব্যাকুল দেখা গেল না। তা ছাড়া সম্প্রতি পথে লাওচেনের সঙ্গ পেয়ে দিনগুলো ভালো কাটছিল। লাওচেনের আমাদের সঙ্গে এসে মেলা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে। তার সঙ্গে পরিচয় হবার দিনই সে নিজে আবার দেখা করতে আসে আমাদের সঙ্গে এবং জানায় যে আমরা তাকে একটু সাহায্য করলে সে এখনও নিজের দেশ ইউনানে গিয়ে উঠতে পারে। তার লোকলশকর নেই ; সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে এই বিপদসংকুল পথে যাবার ভরসা তার হয় না। আমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলে তার অনেক সুবিধে হয়ে যায়।

মামাবাবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ তাকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি আসবেন ভেবে আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছিলাম।' লাওচেন একটু অবাক হলেও হেসে বলেছিল, 'আপনার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ।' লাওচেন সেই থেকে আমাদের সঙ্গেই আছে। এবারের যাত্রা লাওচেন থাকার দরুণই অনেকটা সহজ হয়েছিল। এদিকের পথঘাট তার বেশ জানা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারই পরামর্শ মতো চলে আমাদের অনেক সুবিধে হয়েছে। লাওচেনের লোকলশকর যে মিছিমিছিই একটা ভয়ের ছুতো করে তাকে ছেড়ে গেছে এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছিল। পথে কোনো গোলমালের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হার্টজ কেল্লার কাছাকাছি যখন পৌঁছোলাম তখন কয়েকদিন পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়ে গোড়ার দিকের ভয়ংকর ঘটনাগুলোও আমাদের কাছে যেন অবাস্তব হয়ে গেছে।

কে জানত সেই দিনই আবার নতুন করে তাদের সূত্রপাত হবে।

কাচিন পাহাড়ের উঁচু-নিচু জঙ্গলময় আঁকাবাঁকা পথে ঘোরার পর হার্টজ কেল্লার প্রথম দেখা পেয়ে মনে আপনা থেকেই যেন শান্তি আসে। চারিদিকের সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণির মাঝখানে সমতল বিশাল উপত্যকায় কেল্লাটি অবস্থিত। সেখানে শস্যশ্যামল প্রান্তরের মাঝে কৃষকদের পরিচ্ছন্ন গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। বৌদ্ধ পাগোডার চূড়া উঠেছে এখানে সেখানে। এখানকার অধিবাসীরা কাচিন নয় 'শান' জাতি। তারা এককালে যোদ্ধা হিসেবে এ দেশ জয় করলেও এখন অকর্মণ্য অলস হয়ে গেছে। কাচিনরাই এখন তাদের ওপর উৎপাত করে।

এই হার্টজ কেল্লার পরই দারুদের অজানা দেশে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝে অশ্বতর বাহিনী পর্যন্ত চলতে পারে না। পায়ে হেঁটে কুলির মাথায় মোট নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পাহাড় থেকে হার্টজ কেল্লার সমতল প্রান্তরে নামবার আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে সেই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। লাওচেনের তাঁবুতেই আমরা সকলে বসেছিলাম। এ কয়দিন আমাদের দুজনদের তাঁবু কাছাকাছিই ফেলা হচ্ছে। কুলি সংগ্রহ ও পথঘাট সম্বন্ধে একঘেয়ে আলোচনা কতক্ষণ সহ্য করা যায়। খানিক বাদে আমি উঠে পড়লাম। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমতল প্রান্তরের দৃশ্যটি সন্ধ্যার আলোয় আর একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ধারে সেই জন্যেই যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে আমাদের তাঁবুর দিকে চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে একটা লোক সন্তর্পণে আমাদের তাঁবুতে ঢুকছে। আমার দিকে পেছন ফিরে থাকলেও সে যে মংপো বা আমাদের কাচিন চাকর নয় তা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। আমাদের অশ্বতর চালকদের কেউও সে নয়। তার পোশাক পর্যন্ত আলাদা।

প্রথমে আমার ইচ্ছে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ মামাবাবু ও লাওচেনকে ডাকতে। কিন্তু তারপরে মনে হল লোকটার উদ্দেশ্যটা আগে গোপনে জানা দরকার। পা টিপেটিপে আমি আমাদের তাঁবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটা তখন ভেতরে ঢুকেছে। একটুখানি অপেক্ষা করে আমি হঠাৎ তাঁবুর পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে বললাম, 'কে তুমি?' কিন্তু আর অগ্রসর হতে আমায় হল না। তাঁবুর ভেতর তখন আলো জ্বালা হয়নি। বাইরের তুলনায় সেখানে বেশ অন্ধকার। ভালো করে কিছু দেখতে পাবার আগেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। মামাবাবুর ক্যাম্প খাটের কোণে সজোরে আমার মাথাটা ঠুকে গেল। লোকটা তখন ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

মাটি থেকে উঠে আমিও তার পেছু নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাথায় চোটটা একটু বেশিই লেগেছিল। তাঁবু থেকে বেরোতেই মনে হল সমস্ত পা টলছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। লোকটা আমার চোখের সামনেই তখন দ্রুতবেগে পাহাড়ের প্রান্তে যেখানে পথ নেমে গিয়েছে সেই দিকে দৌড়োচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে ধরা অসম্ভব জেনে আমি চিৎকার করে মামাবাবুকে ডাকলাম।

লাওচেন ও মামাবাবু একসঙ্গেই বেরিয়ে এলেন ব্যস্ত হয়ে তাঁবু থেকে। কিন্তু তখন লোকটাকে ধরবার আর কোনো আশা নেই। দেখতে দেখতে সে পাহাড়ের ধার দিয়ে নীচে নেমে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশই যেরকম গাঢ় হয়ে আসছিল তাতে লোকজন লাগিয়েও তাকে খুঁজে বার করা তখন অসম্ভব।

মামাবাবু কাছে এসেই অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী, তোর মাথায় রক্ত কেন?'

মাথা কেটে যে রক্ত পড়ছিল তা এতক্ষণ টের পাইনি। দেখলাম কাঁধের জামাটা পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তখন সময় নেই। আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা তাঁদের বললাম।

pathagar.net

লাওচেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেও মামাবাবু নিতান্ত সহজভাবে বললেন, 'দাঁড়া তোর মাথাটা কতখানি কাটল আগে দেখি।'

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'মাথা পরে দেখলে চলবে। এদিকে লোকটা যে পালিয়ে গেল।'

'তার আর কী করা যাবে? এখন তো আর উপায় নেই।' বলে মামাবাবু তাঁবুর আলোটা জ্বালাতে গেলেন।

বিস্মিতকণ্ঠে লাওচেন জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটার মতলব কী ছিল মনে হয়?'

মামাবাবু আলো জ্বালতে জ্বালতে বলেন, 'কী আবার! চুরিটুরি হবে। এখানকার কাচিনরা তো এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।'

আমি উত্তেজিতভাবে বলতে যাচ্ছিলাম, 'সে কাচিন নয়, কাচিনদের অমন চেহারা বা পোশাক হয় না।' কিন্তু সেকথা বলবার দরকার হল না। আলো জ্বলে উঠতেই ঘরের মেঝেয় একটি জিনিস একসঙ্গে আমাদের তিন জনেরই চোখে পড়ল।

ভাঁজ করে মোড়া একটি কাগজ মেঝেয় পড়ে আছে। সে কাগজের ওপর মেয়ের মুখ বসানো বাদুড়ের সেই ছবি আঁকা।

লাওচেন নিচু হয়ে সেটা কুড়োতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে মামাবাবু একরকম ছোঁ মেরেই সেটা তুলে নিলেন।

মামাবাবু কাগজটা তুলে নিয়েই ভাঁজ খুলে সেটা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন।

মামাবাবু যত দেরি করছিলেন, লাওচেন ও আমি তত বেশি অধীর হয়ে উঠছিলাম। লাওচেনের অধৈর্য বুঝি আমার চেয়ে বেশি।

মামাবাবু কিন্তু বৃথাই চেষ্টা করছিলেন বোঝা গেল। খানিকবাদে কাগজটা লাওচেনের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, 'পড়ে দেখুন। চীনে ভাষার বিদ্যে আমার অত্যন্ত সামান্য। যেটুকু জানি তাতে এ চিঠি পড়া অসম্ভব। শুধু একটা কথার বোধ হয় মানে করতে পেরেছি।'

আমি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'শুধু একটা কথা পড়বার জন্যে এতক্ষণ ধরে কসরত করবার কী দরকার ছিল!'

মামাবাবু বললেন, 'শুধু দেখলাম একটু চেষ্টা করে।'

লাওচেন চীনে ভাষা নিশ্চয়ই জানে কিন্তু সেও চিঠিটার ওপর যতক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল তাতে চীনের মতো শক্ত ভাষারও গোটা একটা গল্প বোধ হয় পড়া যায়। মামাবাবু ততক্ষণে আমার কপালটা বেঁধে ফেলেছেন। সে যে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এটুকু বোঝা যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে যেন নিজেকে শান্ত করে সে মামাবাবুকে বলল, 'আপনি চিঠির কী মানে করেছেন?

মামাবাবু একটু থেমে বললেন, 'মানে আমি কিছুই ঠিক করতে পারিনি। চীনে অক্ষরের তো আর মাথামুণ্ডু বোঝবার উপায় নেই। এক-একটা অক্ষরের এক জাহাজ মানে। তবে বাদুড়ের ডানা সম্বন্ধে কী একটা কথা যেন আছে।'

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে মামাবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। বাদুড়ের ডানার কথা এতে আছে এবং তার সঙ্গে আর যা আছে তা ভয়ংকর।'

ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী'?

চিঠিটা খুলে ধরে লাওচেন বলল, 'চিঠিটা আগে তর্জমা করে বলি শুনুন। চিঠিতে লিখছে—মায়াবাদুড়ের চোখ অন্ধকারেও দেখতে পায়, অরণ্য-পর্বত তার ডানাকে বাধা দিতে পারে না। প্রস্তুত থেকো। আজ তোমাদের শেষ দিন।'

'কিন্তু এ হুমকির মানে কী? মায়াবাদুড়ই বা কী?'

লাওচেন বলল, 'মায়াবাদুড় যে কী, সেটুকু আপনাদের বলতে পারি। বলতে বলতে

pathagar.net

লাওচেনের স্বরও যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠল। 'আমি এদের কথা কিছু জানতে পেরেছি। মায়াবাদুড় একজন কেউ নয়—একটা প্রকাণ্ড গোপন সম্প্রদায়। সমস্ত চীন ব্রহ্মদেশ জাপান পর্যন্ত এদের শাখা আছে। এরা যে কী ভয়ানক হিংস্র তা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না। এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই, এদের ক্ষমতাও অসাধারণ।'

'কিন্তু আমাদের ওপর এদের আক্রোশ হবার কারণ কী? মিচিনাতেও মামাবাবু এইরকম চিঠি পেয়েছিলেন।'

লাওচেন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'মিচিনাতেও পেয়েছিলেন? কী ছিল তাতে?'

মামাবাবু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আমি বললাম, 'তাতে আমাদের এ অভিযানে বেরোতে মানা করা হয়েছিল।'

লাওচেন বলল, 'তবু আপনারা সে মানা শোনেননি। তবে আপনারা তো জানতেন না। মায়াবাদুড়-সম্প্রদায়ের সব কথা জানলে বোধ হয় পারতেন না এ পথে আসতে।'

'কিন্তু বেরিয়ে যখন পড়েছি এখন কী করা যাবে! আজকের চিঠিতে এভাবে ভয় দেখাবার অর্থ কী?'

লাওচেন গম্ভীরভাবে বলল, 'শুধু শুধু ভয় এরা দেখায় না।'

'তাহলে আপনি কী বলতে চা !'

'আমি বলতে চাই না, আমি জানি যে আজ ভয়ংকর কোনো কাণ্ড ঘটবেই। একটা প্রাণ অন্তত নষ্ট হবেই।'

মামাবাবু এই ভয়ংকর মুহূর্তেও একটু হেসে বললেন, 'সেটা আমাদের তো নাও হতে পারে।'

লাওচেন কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলল, 'সেই চেষ্টা তো অন্তত করতে হবে। আমাদের আজ অত্যন্ত সাবধান আর সজাগ থাকা দরকার।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাদের কী করা উচিত?' তাঁবুতে আর দুজন পাহারার ব্যবস্থা করব?'

'তা করতে পারেন। কিন্তু আজ আমি নিজে এসে আপনাদের সঙ্গে থাকব।'

মামাবাবু ভদ্রতা করেই বোধ হয় বললেন, 'তার দরকার নেই। আমাদের বিপদ আপনার ঘাড়ে চাপাতে চাই না।'

লাওচেন সে কথায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'আপনারা আমার যে উপকার করেছেন তার বদলে এটুকু করবার সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। অবশ্য আমি কতটুকু সাহায্য করতে পারব জানি না।'

মামাবাবু আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লাওচেন বাধা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, 'সে হবে না। আপনাদের বিপদের ভাগ নিতে আমি বাধ্য। আজ আমি এখানেই কাটাব।'

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল। ঠিক হল লাওচেনের তাঁবুতে মংপো ও আর আমাদের কাচিন চাকর পাহারায় থাকবে। আমাদের তাঁবুতে থাকব আমরা তিনজন। আমাদের অনুচরদের ভেতর থেকে আর কাউকে পাহারায় ডাকতে মামাবাবু রাজি হলেন না। প্রথমত ব্যাপারটাকে জানাজানি হতে দিয়ে অনুচরদের ভেতর ভীতিসঞ্চার করতে তিনি চান না, দ্বিতীয়ত অনুচরদের ভেতর কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী তাঁর মতে ঠিক করা এখন কঠিন। তাদের কাউকে ডাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

pathagar.net

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জঙ্গলের পথে এমন অদ্ভুত রাত আমাদের কোনোদিন কাটেনি। সশস্ত্র হয়ে তিনজনে মুখোমুখী বসে আছি। তাঁবুর ভেতর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর রাত্রে পাছে ঘুম আসে বলে স্টোভে কড়া কফির জল ফুটোনো হচ্ছে। কোনোরকম সাড়াশব্দ আর নেই। আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পর্যন্ত পারছি না।

রাত ক্রমশ বাড়তে লাগল। জঙ্গলের পোকামাকড়ের গাঁদি লেগে গেছে তাঁবুর ভেতরে। তবু আলো জ্বালিয়ে রাখতেই হবে। লাওচেন এক সময়ে উঠে পড়ে বলল, 'ইচ্ছে করলে আপনারা একজন একজন করে ঘুমিয়ে নিতে পারেন!'

আমি রাজি হলেও মামাবাবু কিন্তু রাজি হলেন না। বললেন 'কী দরকার ; এত কষ্ট সওয়া গেছে, একটা রাত জাগলে কী আর হবে।'

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জঙ্গলও যেন জেগে উঠছে। রাত্রির অন্ধকারে চারিধারে অদ্ভুত সব শব্দ। সেসব শব্দের অর্থ বুঝতে পারলে জঙ্গলের বিচিত্র কাহিনি যেন জানা যায়। একবার মনে হল অনতিদূরে কোথায় যেন কাশির মতো শব্দ পাওয়া গেল। সে কাশি সম্ভবত কেঁদো বাঘের গলার আওয়াজ! হঠাৎ এক সময়ে সমস্ত জঙ্গল সচকিত হয়ে উঠল ভীষণ সোরগোলে। সে সোরগোল কিন্তু খানিক বাদেই থেমে গেল। গাছের মাথায় বাঁদরেরা কীসের ভয় পেয়ে কিচিমিচি করে লাফালাফি করে উঠেছিল। হয়তো কোনো বিশাল বোড়া সাপই তাদের আশ্রয়ে হানা দিয়েছে, কিংবা শয়তান কোনো নিঃশব্দচারী চিতা। থেকে থেকে নিশাচর প্যাঁচার অদ্ভুত ডাক আমাদের কাছেই শোনা যাচ্ছে।

প্রত্যেক বার শব্দ হলেই লাওচেন সভায় উৎসুকভাবে কান খাড়া করে থাকছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী শুনছেন?'

লাওচেন অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, 'মায়াবাদুড়ের সংকেত শোনবার চেষ্টা করছি।'

'সংকেত আবার কোথায়? জঙ্গলের জানোয়ারের আওয়াজই তো পাওয়া যাচ্ছে।'

'জানোয়ারদের আওয়াজ নকল করেই তারা সংকেত করে পরস্পরকে।'

লাওচেনের কথা শেষ হতে না হতে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত সমস্ত শরীরকে অবশ করে যেন বয়ে গেল। অদ্ভুত একরকম পাখির ডাক। অন্ধকার যেন ককিয়ে উঠেছে। লাওচেন না বলে দিলেও বোধ হয় বুঝতে পারতাম সে আওয়াজ স্বাভাবিক নয় কোনোমতেই।

লাওচেন ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তার হলদে মুখ আরও হলদে হয়ে গেছে ভয়ে। অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'সময় হয়েছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে টর্চটা ফেললাম। আমাদের তাঁবুর কাছের একটা গাছ থেকে পাখা ঝটপট করতে করতে সত্যিই একটা বড়ো পাখি উড়ে গেল। আর কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ফিরে এসে বললাম, 'কোথায় কী? সত্যিই তো একটা পাখি দেখলাম।'

লাওচেন তেমনি পাংশুমুখে বলল, 'ভালো! তবু এবার প্রস্তুত থাকুন।'

মামাবাবুর কী হচ্ছিল বলতে পারি না কিন্তু আমার তো সমস্ত দেহ উত্তেজনায় কাঁপছিল। জানা শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি যোঝা যায়, সে শত্রু যত ভয়ংকরই হোক, কিন্তু এই অদৃশ্য রহস্যময় শত্রুর অপেক্ষায় এভাবে বসে থাকার যন্ত্রণা অসহ্য। কীভাবে সে দেখা দেবে কিছুই জানি না। তার আক্রমণের ধরণাও অজ্ঞাত। তাঁবুর তিনদিকে তিনটি ফুটোতে মাঝে মাঝে চোখ

pathagar.net

লাগিয়ে দেখছি, বাইরের অন্ধকারে কী হচ্ছে কিছুই কিন্তু তাতে বোঝা যায় না। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। পিস্তলটা শক্ত করে চেপে ধরলেও বুঝতে পারছিলাম আমার হাত ঘেমে উঠে, মুঠি শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ নিশাচর পাখির সেই অদ্ভুত ডাকে আবার মনে হল রাত্রির আকাশ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে গেল। তারপরেই আমাদের তাঁবুর ফাঁকগুলির ভেতর দিয়ে দেখা গেল আগুনের আঁচ। কাছেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে!

ব্যাপার কী? আমি বাইরে ছুটে বেরোতে গেলাম। মামাবাবু আমায় একবার বাধা দিতে গেলেন কী ভেবে কে জানে। তারপর বললেন, 'চল।'

লাওচেন চিৎকার করে বলল—'সবাই মিলে অমন করে বেরোবেন না।'

কিন্তু আমি তখন উত্তেজনার শিখরে উঠেছি। নিজেকে থামাবার ক্ষমতা আর নেই। আমি বেরিয়ে পড়লাম কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে। তাঁবুর ভেতর ওইভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে তিলতিল করে যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে যাহোক একটা কিছু করতে পারলে বেঁচে যাই।

বাইরে বেরিয়েই শুনলাম, মংপো ও কাচিন চাকরটার চিৎকার। লাওচেনের তাঁবুই দাউদাউ করে জ্বলছে। এবং তার ভেতর থেকে তারা কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কাচিন চাকরটার দু-এক জায়গা বেশ পুড়ে গিয়েছিল। তার ভীত চিৎকার আর কান্না তার থামতে চায় না।

আগুন নেভাবার চেষ্টা করা তখন বৃথা। সমস্ত তাঁবু ধরে উঠেছে। তার শিখায় বনের অনেকখানি আলোকিত। কিন্তু দেখবার সেখানে কিচ্ছু নেই। কেমন করে আগুন লাগল, তারা কিছু দেখেছে কি না সেসব তখন জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তাদের দুজনকে একটু শান্ত করে আমাদের তাঁবুতে আনবার ব্যবস্থা করছি এমন সময়ে আবার চমকে উঠলাম। এবার পিস্তলের শব্দ। এবং আমাদেরই তাঁবুর ভেতর থেকে।

এতক্ষণে খেয়াল হল, মামাবাবু আমার সঙ্গে আসবেন বলেও তো আমায় অনুসরণ করেননি। সেই সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠল আতঙ্কে। লাওচেন বলেছিল, 'একটি প্রাণ আজ নষ্ট হবেই।'

মংপোকে আমায় অনুসরণ করবার ইশারা করে আবার নিজেদের তাঁবুতে এসে ঢুকলাম। তারপর সামনে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে খানিকক্ষণের জন্যে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল।

আমার পায়ের শব্দে প্রথমে লাওচেন চমকে উঠে পিস্তলটা আমার দিকেই তুলে ধরেছিল কিন্তু তারপর লজ্জিতভাবে সেটা নামিয়ে বলল, কাতরভাবে, 'দেখুন কী হয়েছে! এই জন্যেই আপনাকে যেতে বারণ করেছিলাম। তিনজনে একসঙ্গে থাকলে বোধ হয় এ-ব্যাপার ঘটত না।'

'কিন্তু কী হয়েছে কী! মামাবাবু বেঁচে আছেন তো!'

লাওচেন আমার কথার উত্তরে যা বলল তাতে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে আপশোসের আর সীমা রইল না। কেন আমি মূর্খের মতো এ বিপদের মধ্যে বেরোতে গিয়েছিলাম। মামাবাবু আমার সঙ্গে যাবার জন্যে পেছন ফিরে তাঁর পিস্তলটা নিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে লাওচেন দরজার গোড়ায় শত্রুকে দেখতে পায়। মামাবাবু তখন তার সামনে। পিস্তল ছোঁড়বার সুবিধা পাবার আগেই শত্রু ভারী একটা দণ্ড দিয়ে মামাবাবুর মাথায় সজোরে আঘাত করে। লাওচেন তারপর গুলি করেছে সত্য কিন্তু ক্ষতি কিছু করতে পারেনি।

লাওচেন যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ আমি মামাবাবুর কাছে বসে তাঁকে পরীক্ষা করছিলাম। মাথার আঘাত গুরুতর, রক্ত সেখানে চুলের সঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। মামাবাবুর জ্ঞান এখনও নেই কিন্তু প্রাণ আছে বলেই মনে হল। বুকের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

লাওচেন সেকথা শুনে আগ্রহভরে মামাবাবুকে আরেকবার পরীক্ষা করে বলল, 'হ্যাঁ আছে বলেই মনে হচ্ছে। এখন খুব সাবধানে রাখা প্রয়োজন। আগে মাথার ঘা-টা পরিষ্কার করে বাঁধতে হবে।'

আমি সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে সহসা চমকে উঠে বললাম, 'দরজার কাছে কীসের রক্ত লাওচেন? মামাবাবুর রক্ত তো ঘরের মাঝখানেই পড়েছে।'

'দরজার কাছে রক্ত? কই দেখি।' বলে লাওচেন এগিয়ে এল। তারপর সোল্লাসে বলল, 'তাহলে আমার গুলি ব্যর্থ হয়নি। নিশ্চয়ই তার গায়ে ভালোরকম লেগেছে। এইতো রক্তের আরও দাগ। শীগ্‌গির আসুন আমার সঙ্গে। লোকটা দস্তুরমতো জখম হয়েছে। এরকম গুলি খেয়ে বেশিদূর সে যেতে নিশ্চয়ই পারেনি। এখনই তাকে ধরতে পারা যাবে।'

'কিন্তু মামাবাবু যে রইলেন!'

'দু-মিনিট শুধু। মংপো রয়েছে কোনো ক্ষতি হবে না। মামাবাবুর জন্যই এ শয়তানকে ধরবার চেষ্টা করা উচিত।'

সেই কথা ভেবেই কাচিন চাকরটাকে দরজায় রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম।

রক্তের দাগ কিন্তু খানিকটা দূর গিয়েই একেবারে যেন ভোজবাজিতে মিলিয়ে গেল। আশেপাশে সমস্ত তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, লুকোবার কোনো জায়গা নেই। এক জায়গায় অনেকখানি রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মনে হল সেখানে লোকটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তারপর সে গেল কোথায়! নিঃশব্দে কোনো হিংস্র শ্বাপদই কি তাকে তুলে নিয়ে গেছে কিন্তু তাহলেও তো রক্তের দাগ থাকবে। আর এখন নিভে এলেও তখন যেরকমভাবে লাওচেনের তাঁবু জ্বলছিল তাতে হিংস্র শ্বাপদের কাছাকাছি সাহস করে আসা সম্ভব নয়।

বিমূঢ়ভাবে কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা আবার তাঁবুতে ফিরলাম, কিন্তু সেখানে আরও ভয়ানক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তাঁবুতে ঢুকে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভেতরে মংপো বা মামাবাবু কেউ নেই। মাত্র এই কয়েক মিনিট। কাচিন চাকর দরজায় বসে আগাগোড়া পাহারা দিচ্ছে। এর ভেতর একটু সুস্থ ও একটি অচেতন লোক এই তাঁবুর ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল কোথায়?

তাঁবুর ভেতর ঢুকে খানিকটা বিস্ময়ে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। লাওচেনের মুখ দেখে তো মনে হচ্ছিল আমার চেয়ে সে যেন অনেক বেশি ভয় পেয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছে। কী যে এখন করা উচিত সে বিষয়ে মনস্থির করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁবুর ভেতর আমরা যা দেখে গিয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি বিশৃঙ্খলতার কোনো চিহ্ন নেই। যে 'রাগের' ওপর মামাবাবুকে শোয়ানো হয়েছিল সেটা পর্যন্ত এতটুকু ভাঁজ হয়নি। কোথাও এতটুকু ধ্বস্তাধস্তির পরিচয়ও পাওয়া গেল না। মামাবাবু না হয় অচৈতন্য হয়েছিলেন কিন্তু মংপো তো সুস্থ ছিল ; সে কি একটু বাধা দেবার অবসরও পায়নি! সুস্থ ও অচৈতন্য দুটি লোককে এই অল্প সময়ের মধে কাবু করে সরিয়ে ফেলা তো কম বাহাদুরি নয়।

যারাই যেমনভাবে একাজ করে থাক তাদের ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। সমস্ত ব্যাপার এমন নিঃশব্দে নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে, অলৌকিক কোনো ব্যাখ্যার দিকেই মন প্রথমটা ঝুঁকে পড়ে।

সম্ভবত সেই জন্যেই প্রথমটা আমরা তাঁবুর ভেতর অসাধারণ কিছু দেখতে পাইনি।

এইবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

লাওচেনও বোধ হয় আমার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেয়েছিল। দুজনে একসঙ্গে তাঁবুর ধারে এগিয়ে গেলাম। এবার আর বুঝতে বাকি রইল না, দরজায় কাচিন চাকর পাহারায় থাকা সত্ত্বেও কোথা দিয়ে শত্রু তাঁবুতে প্রবেশ করে তাদের কাজ হাসিল করেছে। কোনো ধারাল অস্ত্রে তাঁবুর

pathagar.net

পেছনের দোয়ালের কাপড় প্রায় তিন হাত চেরা হয়েছে দেখা গেল। সেইখানের তাঁবুর কাপড় সরিয়েই যে তারা ভেতরে ঢুকেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তারপর কেমন করে নিঃশব্দে দটি মানুষকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে রহস্য অবশ্য এই সূত্রটুকু থেকে মীমাংসিত হল না। আমরা দুজনেই তৎক্ষণাৎ পেছনের সেই কাটা অংশ সরিয়ে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে লাওচেনের তাঁবুর আগুন প্রায় নিভে এসেছে। চারিধারের গাঢ় অন্ধকার সে নিভু নিভু আগুন কিছুমাত্র আর দূর করতে পারছে না।

আমাদের তাঁবুর এই পেছন দিকটা, আগুন যখন প্রবলভাবে জ্বলছে তখনও নিশ্চয়ই অন্ধকার ছিল। শত্রু সেই অন্ধকারেরই সুযোগ নিয়েছে। আমরা যখন প্রথমবার তাঁবুর বাইরে রক্তের দাগ অনুসরণ করে যাই; তখন আমাদের কয়েক হাত মাত্র দূরে থাকলেও তাদের আমরা দেখতে পাইনি।

টর্চ নিয়ে আমরা এবার অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। কিন্তু এই গহন অন্ধকারে কোথায় তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে! আগের বারে তবু রক্তের দাগ ধরে খানিকটা অগ্রসর হওয়া গিয়েছিল এবারে সামান্য কোনো চিহ্নও নেই। এক রাত্রের মধ্যে দুবার আমাদের একরকম চোখের ওপরেই এমন রহস্যময় অন্তর্ধান ঘটল যার কোনো কিনারাই হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হতাশ হয়ে যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম তখন আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করবার মতো নয়। প্রথম দিকটা বিপদের মাঝে বিমূঢ় হয়ে ভালো করে কিছু উপলব্ধি করতে পারিনি। এইবার সম্পূর্ণভাবে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিসত্যি চোখে অন্ধকার দেখলাম!

মুখে আগে যাই বলে থাকি, এই অজানা দেশে বিপদের মাঝে যাঁর ভরসায় আসতে সাহস করেছিলাম সেই মামাবাবুর এই পরিণামের পর আমার উপায় কী হবে! কোথায় আমি দাঁড়াব এখন। কী আমার এখন কর্তব্য?

জীবিত থাকুন বা না থাকুন মামাবাবুর সন্ধান করা এখন দরকার। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? সম্পূর্ণ অজানা বিপদসংকুল দেশ। এ পর্যন্ত সামান্য যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে বোঝা কঠিন নয় যে শত্রুও যেমন রহস্যময় তেমনি অসামান্য শক্তিমান। তাদের বিরুদ্ধে আমি কী করতে পারি! করতে চাইলেও মামাবাবুর অভাবে আমাদের দলের লোকেরাই আমার বাধ্য আর থাকবে কি না সন্দেহ। একা একা এখানে কিছু করবার চেষ্টা বাতুলতা। হিংস্র শ্বাপদের হাতেই তাহলে আগে প্রাণ দিতে হবে।

অথচ ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। মামাবাবুর খোঁজ না নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ফিরে যেতে আমি কিছুতেই পারব না।

হতাশভাবে কোনো দিকে কোনো কূল দেখতে না পেয়ে আমি দু-হাতের ভেতর মাথা গুঁজে বসেছিলাম। লুকিয়ে কোনো লাভ নেই, এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে পড়ে তখন আমার চোখও সজল হয়ে উঠেছিল। সজল হয়েছিল নিজের কোনো বিপদের কথা ভেবে নয়। সব দিক দিয়ে এমন করে সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায়, নিজের অক্ষমতায় ও মামাবাবুর শোচনীয় পরিণামের কথা ভেবেই ক্ষোভে দুঃখে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি।

মাথা গুঁজে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। লাওচেন কাছে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখেছে।

আমি মুখ তুলে তাকাতেই সে বলল, 'ভাববেন না মি. সেন, আপনার মামার সন্ধান আমি করবই। এই শয়তানির প্রতিশোধ নেওয়া আমার নিজের দায় বলে আমি মনে করি জানবেন।'

মুখে আমি কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু আমার চোখে সে মুহূর্তে যে অসীম কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল তা বুঝতে লাওচেনের নিশ্চয়ই ভুল হয়নি।

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমার এতে একদম স্বার্থ নেই মনে করবেন না। আপনাদের সাহায্য নিয়ে আমি ইউনানে যাবার চেষ্টা করছিলাম। আপনাদের অভিযান ব্যর্থ হলে তাই আমারও সমূহ ক্ষতি। তা ছাড়া এ কয়দিনে আপনাদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তার জন্যেও এ অবস্থায় আমি শুধু নিজের সুবিধার কথা ভাবতে পারি না। বন্ধুত্বের উপকারের ঋণও অন্তত আমায় শোধ করবার চেষ্টা করতে হবে।'

আমি এইবার বললাম, 'আপনার কি আশা হয় মামাবাবুর খোঁজ পাওয়া যাবে? আপনি নিজেই তো মায়াবাদুড়দের ভয়ংকর প্রতাপ ও ক্ষমতার কথা বলেছেন।'

'তা বলেছি এবং এখনও বলছি যে তারা ভয়ংকর। কিছু তাদের অসাধ্য নয়, তাদের শত্রুতা করা মানে স্বয়ং যমকে ঘাঁটানো। কিন্তু তা বলে তো নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না।'

এই চীনেম্যানের প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় সত্যি আমি এবার অভিভূত হয়ে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে বুঝি একটু বিহ্বলভাবেই বললাম, 'এ সময়ে তোমার এ সাহায্যের কথা আমি জীবনে ভুলব না লাওচেন! অথচ একদিন তোমাকেও আমি সন্দেহ করেছিলাম.'

লাওচেন কোনোপ্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে তার টেরছা চীনে চোখ শুধু অর্দ্ধ নিমীলিত করে বলল, 'সময়ই আমাদের সব ভুল শুধরে দেয় মি. সেন!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিন্তু মামাবাবুর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। অন্তত এই কয়দিনে তেমন কোনো সূত্র আমরা আবিষ্করা করতে পেরেছি বলতে পারি না। লাওচেনের পরামর্শমতো, পাহাড় থেকে সমতলক্ষেত্রে নেমে হার্টজ কেল্লা বাঁদিকে রেখে শানেদের দেশের ভেতর দিয়ে আমরা আবার গহনতর পার্বত্য অরণ্যে এসে পৌঁছেছি। হার্টজ কেল্লায় আমরা ইচ্ছা করেই আশ্রয় নিইনি। লাওচেনের মতো যে ঠিক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমার ছিল না। সেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা। তারা মায়াবাদুড়-এর ব্যাপার আজগুবি বলেই সম্ভবত উড়িয়ে দিত। তার ওপর মামাবাবু না থাকায় আমাদের আর অগ্রসর হবার অনুমতি পাওয়াই শক্ত হত। তাদের সাহায্য চাইতে গিয়ে সব দিক নষ্ট করার চেয়ে নিজেদের চেষ্টায় যতটা করতে পারি তার ব্যবস্থা করা ঢের বেশি প্রয়োজনীয় বুঝেই আমরা গোপনে শান প্রদেশ পার হয়ে এসেছি।

অবশ্য পথ ও গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমাকে লাওচেনের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। এ অঞ্চল তার পরিচিত। শত্রুদের চলাচলও তারই জানা। এ ব্যাপারে তার ওপর কোনো কথা বলা আমার উচিত নয়। তার প্রয়োজনও হয়নি।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল পার হয়ে লাভ কী হল? পর্বত যেমন দুরারোহ, অরণ্য এখানে তেমনি গভীর। সর্বশ্রেষ্ঠ দু-পেয়ে জীব হিসাবে এখানে মানুষ নিজের গৌরব সব জায়গায় বজায় রাখতে পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয় এমন খাড়াই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত পাহাড়ই বেশি। এর কিছুদূরেই বামনাকৃতি দাবুদের অজানা দেশ। মামাবাবুর অভিযানের এই দেশই অবশ্য লক্ষ্য ছিল কিন্তু তাঁর সন্ধানে এখানে আসা কতদূর যুক্তিযুক্ত আমি বুঝতে পারছিলাম না। লাওচেনের অবশ্য ধারণা অন্যরকম। মায়াবাদুড়দের সন্ধান এখানেই পাওয়া যাবে বলে তার স্থির বিশ্বাস। এতদিনেও কোনো ঘটনায় সে ধারণার সমর্থন না পেয়ে একদিন আমি তার সঙ্গে একথা আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

পাহাড়ের দুর্গম চড়াই-উতরাই ভেঙে সমস্ত দিনে সেদিন মাত্র মাইল সাতেক আমরা পার

হয়েছি। যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছে সেটি দুটি পাহাড়ের মাঝখানের একটা গলির মতো স্থান—ঘন অরণ্যে ঢাকা দু-ধারে খাড়া পাহাড় কতদূর যে উঠে গেছে বলা যায় না। তারই মাঝখানে সংকীর্ণ একটু গিরিসংকটে তাঁবুর ভেতরও যেন স্বস্তি বোধ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল দু-ধার দিয়ে পাহাড় যেন জীবন্ত দৈত্যের মতো, যেন কোনো মুহূর্তে আমাদের চেপে পিষে ফেলতে পারে।

লাওচেন ও আমি আজকাল এক তাঁবুতেই থাকি। আমাদের কুলিরা সমস্ত মালপত্র নিয়ে আরেকটি তাঁবু ব্যবহার করে। এখানে শীতের প্রচণ্ডতার জন্য ও হিংস্র শ্বাপদের ভয়ে তাঁবু ব্যবহার না করে উপায় নেই।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার রাত। লাওচেন একটা কাগজের ওপর ম্যাপ এঁকে আমাদের যাত্রাপথ ঠিক করছিল। আমি আমার বন্দুকটা পরিষ্কার করতে করতে তাকে বললাম, 'আর অগ্রসর হতে আমার মন কিন্তু চাইছে না লাওচেন!'

'কেন?' লাওচেন ম্যাপ থেকে মুখ না তুলেই বলল।

আমি একটু বিরক্ত স্বরেই বললাম, 'কেন, তাও বলতে হবে? এতদিনে কোনো পাত্তাই তো মিলল না। আমরা যে ভুল পথে যাচ্ছি না তার প্রমাণ কী?'

লাওচেন ম্যাপটা সরিয়ে রেখে বলল, 'প্রমাণ অবশ্য কিছু নেই—'

'তাহলে এ হয়রানিতে লাভ কী? আমার মনে হয় মায়াবাদুড়দের অত ভয়ংকর ভেবেই আমরা ভুল করেছি। আমাদের হার্টজ কেল্লাতেই যাওয়া উচিত ছিল। এই গহন জঙ্গলে অন্তত তাদের কোনো খোঁজ মিলবে না।'

আমার মুখের কথা মুখেই খানিকটা রয়ে গেল। লাওচেন ও আমি দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলাম। বাইরে নিশাচর কোনো পাখির ভয়ংকর ডাকে অন্ধকার পর্যন্ত যেন শিউরে উঠল।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। মামাবাবুর দেহ যেদিন অন্তর্হিত হয় সেদিন এই নিশাচর পাখির ডাক থেকেই কীসব বিভীষিকাময় ঘটনার সূত্রপাত হয় সেকথা তো কোনো দিন ভোলবার নয়। নিজের অজ্ঞাতে আমার হাত কোমরবন্দের পিস্তলে গিয়ে তখন পৌঁছেছে।

কিন্তু লাওচেন প্রথমে চমকে উঠলেও তারপর হেসে উঠল।

'ওকী হাসছেন যে!' আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'হাসছি আপনার রকম দেখে।'

'আমার রকম দেখে! কেন আপনি কি কালা নাকি! শুনতে পাননি?

'শুনতে পাব না কেন! কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।'

আমায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে লাওচেন আবার বলল, 'আসল আর নকলের তফাত বোঝবার মতো আপনার কান এখনও তৈরি হয়নি। এ হল এদেশের 'টিংকার বার্ড' বলে একরকম পাখির আসল ডাক। মায়াবাদুড়েরা এই আওয়াজেরই নকল করে—সংকেত করবার জন্যে। কিন্তু সে নকল আওয়াজ ধরা যায়।'

আমি আবার একটু অপ্রস্তুত হয়েই বন্দুক পরিষ্কার করায় মন দিলাম। লাওচেনের কথায় সত্যি কথা বলতে গেলে আশ্বস্ত হওয়ার চেয়ে হতাশই হয়েছিলাম বেশি। ভয় যতই পেয়ে থাকি, সেই নিশাচর পাখির ডাকে প্রথমে মনে একটু আশাও জেগেছিল। আশা হয়েছিল এই ভেবে যে, মায়াবাদুড়দের সাড়া অন্তত এতদিনে পাওয়া গেল। যেকোনো রকমে মায়াবাদুড়দের সন্ধান পাওয়াই এখন আমাদের দরকার। তা না হলে মামাবাবুর খোঁজ কেমন করে, কোন সূত্র ধরে করব। যাকে মায়াবাদুড়ের সংকেত মনে করেছিলাম এখানকার সত্যকার কোনো পাখির সাধারণ ডাক শুনে তাই ভয় দূর হলেও মনটা খারাপ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দুক পরিষ্কার করা শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। লাওচেন তখন তার ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিশেষ মন দিয়ে কী দেখছে।

সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ম্যাপটার দিকে চেয়ে বললাম, 'আপনার এত ম্যাপ দেখা-দেখির অর্থ আমি বুঝতে পারি না লাওচেন! ম্যাপ দিয়ে কি আমাদের শত্রুর সন্ধান পাওয়া যাবে?'

ম্যাপটা উলটে রেখে আমার দিকে ফিরে লাওচেন যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই এবার বলল, 'ম্যাপ না হলে আমরা চলব কী ধরে?'

'কিন্তু আমরা চলেছি কোথায়?'

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল। তার পর আমায় তার পাশে বসতে বলে একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার ওপর কয়েকটা দাগ টেনে বলল, 'এর মানে কিছু বুঝতে পারছেন?'

'বুঝতে পারছি?'। আমরা যে গিরিপথে এখন এসে পড়েছি এটা তারই মানচিত্র।'

'ঠিক ধরেছেন। কিন্তু একটা কথা আপনি জানেন না। এ মানচিত্র সম্পূর্ণ নয়। আমাদের ডানদিকে পাহাড়ের পেছনে কী আছে আমরা জানি না। কেউ জানে না! এ পাহাড় দুর্লঙ্ঘ্য বলে এ পর্যন্ত সেখানকার মানচিত্র তৈরি হয়নি।'

'কিন্তু মানচিত্র ঠিক করতে তো আমরা আসিনি।'

'না তা আসিনি ; কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই আমাদের পাহাড়ের ওদিকে যাওয়া দরকার।'

'যেখানকার কথা কেউ জানে না, সেখানে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে মনে করছেন কেন?'

লাওচেন এতক্ষণে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'সব কথা বোঝাতে পারব না মি. সেন। এখানে আমার ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে।'

'তা করছি, কিন্তু ভেবে দেখুন এতদিনেও এতটকু সূত্র কোথাও না পেয়ে আমার পক্ষে হতাশ হওয়া স্বাভাবিক কি না। তা ছাড়া আর একটা কথা। এ পাহাড় তো দুর্লঙ্ঘ্য বলেছেন। পার হব কী করে?'

'যেমন করে হোক, যতদূর ঘুরে হোক পার হবার চেষ্টা করতে হবে, যদি না—'

'যদি না—কী?'

'যদি না ভাগ্যক্রমে দারুদের গোপন পথ খুঁজে পাই! এ পাহাড় পার হবার একটা সহজ গোপন রাস্তা আছে মি. সেন। শুধু দারুরা এবং আমার বিশ্বাস মায়াবাদুড়েরা সে পথের সন্ধান জানে—'

লাওচেনের কথা শেষ হবার আগেই অপ্রসন্ন মনে আমি উঠে তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তির স্বরেই বললাম, 'তারা তো গলা ধরে সে খবর আমাদের জানিয়ে যাবে না। আমাদের এই পাহাড়জঙ্গলে অকারণে ঘুরে মরাই সার হবে। এর চেয়ে হার্টজ কেল্লায় গিয়ে খবর দিলে হয় তো এতদিনে একটা কিনারা হত।'

লাওচেন এ কথার কোনো উত্তর দিল না। আমি অন্যমনস্কভাবে তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে হঠাৎ চমকে উঠে উত্তেজিত স্বরে চাপা গলায় বললাম, 'লাওচেন, আমার টর্চটা শিগগির!'

বাইরে গভীর অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকির আলো ছাড়া আর কিছু দেখবার উপায় নেই। কিন্তু তারই ভেতর শুকনো জঙ্গলের পাতা মাড়িয়ে কারুর দৌড়ে চলে যাবার শব্দ আমি স্পষ্ট শুনেছি।

লাওচেন টর্চ আনতেই কিন্তু সে শব্দ থেমে গেল। টর্চ ফেলে চারিদিকে ঘুরিয়ে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

pathagar.net

লাওচেন উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কী, হয়েছে কী?'

বললাম, 'কে যেন আমাদের তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছিল। আমি বাইরে মুখ বাড়াতেই পালিয়ে গেল।'

'পালিয়ে গেল! কিন্তু এখান থেকে তো পালাবার পথ নেই! এই সংকীর্ণ গিরিপথ পেছনের দিকে মাইল চারেক এবং সামনের দিকে কতদূর যে দীর্ঘ তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। গোপন রাস্তা না জানলে আমাদের হাত এড়িয়ে সে কিছুতেই যেতে পারবে না।'

লাওচেন নিজেই এবার টর্চটা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। পায়ের শব্দটা আমাদের কুলিদের তাঁবুর দিকেই গিয়েছিল! কিন্তু সেখানে পৌঁছে চারিধারে টর্চ ফেলেও কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। সংকীর্ণ গিরিপথ। অনেক বড়ো গাছ চারিদিকে থাকলেও আমাদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে থাকবার সুযোগ কোথাও ছিল না। দ্রুত পালিয়ে গেলেও পায়ের শব্দ আবার পাওয়া যেত।

হঠাৎ একটা সন্দেহ হওয়ায় আমি লাওচেনকে বললাম, 'আমাদের কুলিদের একবার ডাকো দেখি।'

'কেন? না না তোমার সন্দেহ অমূলক। তারা কেউ একাজ করবে না। তারা সবাই বিশ্বাসী। তা ছাড়া রাত্রে নাটের অর্থাৎ ভূতের ভয়ে একলা বার হবার সাহস তাদের কারুর নেই।'

আমি তবু জেদ করে বললাম, 'না থাক, তবু একবার দেখলে ক্ষতি কী! তুমি না হয় বাইরে টর্চ জ্বেলে, চারিদিকে লক্ষ রাখো, আমি গিয়ে দেখি।' আমি চলে যাচ্ছিলাম ; লাওচেন হঠাৎ আমার হাতটা ধরে ফেলে বলল, 'দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।'

'কিন্তু বাইরেও দৃষ্টি রাখা দরকার একজনের।'

'তাহলে তুমি বরং বাইরে থেকো, আমি ভেতরে যাচ্ছি কুলিদের খবর নিতে।'

লাওচেনের বাইরে একলা থাকতে আপত্তি দেখে সত্যি একটু হাসি পেল। যাইহোক নেহাত তার ইচ্ছা নেই দেখে অগত্যা রাজি হলাম।

কুলিরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়। ডাকাডাকি করে তাদের তুলতে লাওচেনের সময় লাগল। ভেতরে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে তার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

বাইরে দাঁড়িয়ে কান খাড়া রেখে তখনও আমি চারিধারে আলো ফেলে দেখছি। চারিধার নিস্তব্ধ, আমার টর্চ ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো গাছের ছায়া ছাড়া আর কিছু নড়ছে না। বাইরের কনকনে শীতে মনে হচ্ছে নাকের ভেতর দিয়ে বুক পর্যন্ত জমানো বরফ চলে যাচ্ছে।

এরকমভাবে বৃথা আর দাঁড়িয়ে থাকব কি না ভাবছি এমন সময় মনে হল পাহাড়ের দিকে একটা বড়ো গাছের ছায়ায় সামান্য একটু যেন কীসের নড়ার আভাস পাওয়া গেল।

পিস্তলটা বেল্ট থেকে খুলে ডান হাতে নিয়ে, বাঁ হাতে টর্চ ধরে আমি এবার ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। বেশি দূর এগুতে হল না, শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে অকস্মাৎ গাছের আড়াল থেকে যে জীবটি বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়োল তাকে চিনতে পেরে প্রথমটা হাসিও যেমন পেল, লজ্জা তার চেয়ে কম হল না। এই সামান্য প্রাণীটির জন্যে ভয় পেয়ে, আমি কী মিথ্যে হইচ-ই না বাধিয়ে তুলেছি। সেটি এদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের ছাগল ও হরিণের মাঝামাঝি একরকম প্রাণী, নাম গুরাল। রাত্রির অন্ধকারে আমাদের তাঁবুর ধারে বোধ হয় সাহস করে চরতে এসেছিল, তারপর পালিয়েছিল আমার সাড়া পেয়ে। তাকেই শত্রু-চর ভেবে মিছেমিছি শীতের ভেতর আমি নিজে নাকাল হয়েছি, লাওচেনকেও নাকাল করেছি।

যাইহোক শিকার হিসাবে গুরাল দুষ্প্রাপ্য জিনিস। পিস্তল দিয়ে লক্ষ্য ঠিক করা কঠিন হলেও একেবারে চেষ্টা না করে ছেড়ে দেওয় আমার উচিত মনে হল না। তা ছাড়া জানোয়ারটাকে বেশ বাগেই পাওয়া গেছে। গিরিপথ সংকীর্ণ এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে অভ্যস্ত

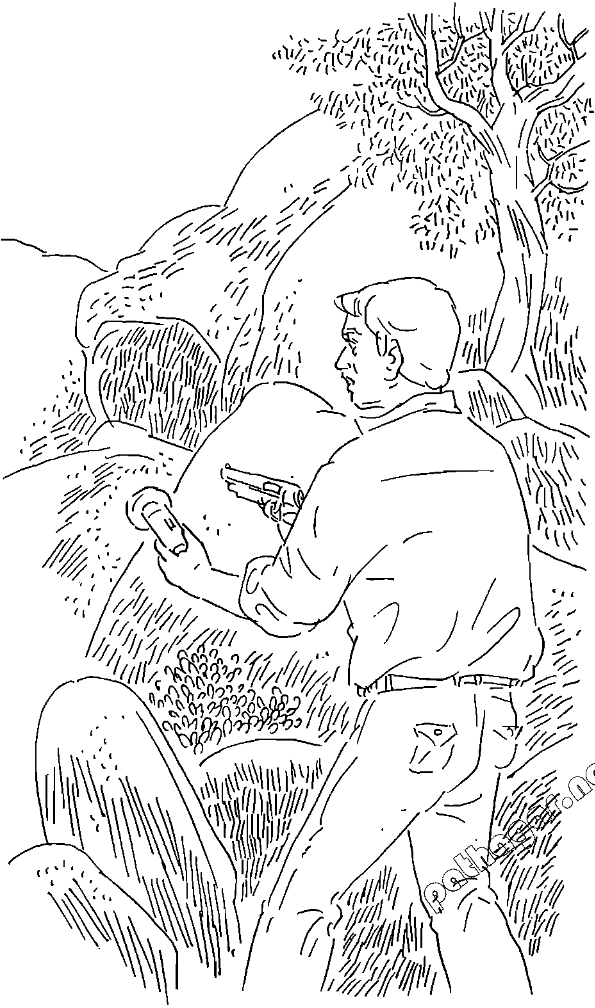

pathagar.net

হলেও সামনের খাড়া পাহাড় গুরালটির পক্ষে পার হয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাকে শেষ পর্যন্ত আমার দিকে ফিরতেই হবে এবং তখন পিস্তল দিয়ে তাকে মারা সম্ভব হলেও হতে পারে।

সামনের ছোটো একটা টিবির আড়ালে প্রাণীটি গিয়ে থেমেছিল আমি লক্ষ করেছিলাম। সতর্কভাবে পিস্তল বাগিয়ে ধরে আমি সেদিকে আবার অগ্রসর হতে লাগলাম। টিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে সে একবার ছুটতে আরম্ভ করলেই আমি গুলি করব। টিবির ওধারে পাহাড়ের দেয়াল আরম্ভ হয়েছে সুতরাং সেদিকে তার যাবার উপায় নেই।

কিন্তু টিবির অত্যন্ত কাছে এসেও জানোয়ারটার নড়বার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি এবার টর্চ নিভিয়ে টিবির অপরদিকে পা টিপেটিপে গিয়ে হঠাৎ টর্চটা আবার জ্বেলে ফেললাম। কিন্তু না শোনা গেল দ্রুত পলায়নের শব্দ, না দেখা গেল গুরাল বা কোনোরকম প্রাণী। সামনের পাহাড়ে সংকীর্ণ একটা গুহা শুধু ভয়ংকর কোনো প্রাণীর মতো মুখব্যাদন করে আছে!

নবম পরিচ্ছেদ

মাত্র দু-সেকেন্ড বোধ হয় আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরেই আমার মাথার ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ আগেকার লাওচেনের সঙ্গে আলাপের কথাগুলো বিদ্যুতের মতো খেলে গেল।

সামনের গুহামুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। বিশেষ গভীর বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না। মুখের ফাঁকটা বেশ ছোটোই বলতে হবে। সাধারণ আকারের মানুষকে মাথা নিচু করে খুব হেঁট হয়েই তার ভেতর ঢুকতে হয়। কিন্তু তবু সেটা পরীক্ষা না করে ফেরা উচিত মনে হল না। অন্তত গুরালটির অন্তর্ধান-রহস্যের মীমাংসা যে সেই গুহার মধ্যেই হবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

টর্চের আলো ভেতরে ফেলে হেঁট হয়ে তার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। অনবরত মাথা নিচু করে যাওয়া বেশ কষ্টকর। আমার টর্চের আলোয় ভয় পেয়ে অসংখ্য চামচিকে ঝটপট করতে করতে চারিধারে উড়ে বেড়াচ্ছে। গুহাতে হিংস্র কোনো প্রাণীও থাকতে পারে। তবু সামান্য কয়েক পা যাবার পরই গুহাপথ একদিকে বেঁকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়তনে বিস্তৃত হতে দেখে উৎসাহে কোনো বিপদের কথাই আর মনে রইল না।

এবারে আমার মনে কোনো সন্দেহই আর নেই। আশ্চর্যভাবে দারুদের রাজ্যের গোপন পথই যে আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।

কিন্তু কতদূর এই পথ ধরে একলা যাব! পথ যখন আবিষ্কৃত হয়েছে তখন কাল সদলবলে এসে তা অনুসরণ করলেই চলবে। আপাতত ফিরে গিয়ে লাওচেনকে এ সংবাদ দেওয়া দরকার। গুহাপথ যেরকম নানা শাখায় জায়গায় জায়গায় বিভক্ত হয়ে গেছে তাতে বেশিদূর এগোলে হয়তো ফেরবার সময় পথ ভুলও হতে পারে।

এই সমস্ত ভেবে পেছু ফিরতে যাচ্ছি এমন সময় সামনের একটি শাখাপথ থেকে সেই গুরালটি দ্রুতভাবে বেরিয়ে আমার একেবারে সামনে ভীতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার লাফ দিয়ে পালাতে উদ্যত হল। তার সঙ্গে দেখা যে কী কুক্ষণে হয়েছিল তখন যদি জানতাম। দেখবামাত্র হাতের পিস্তলের গুলি যেন আপনা থেকে ছুটে গেল এবং সেই সঙ্গে বুঝতে পারলাম নিজের নির্বুদ্ধিতায় কী সর্বনাশ নিজের করেছি।

পিস্তল নয়, মনে হল যেন একেবারে আমার মাথার ওপর অনেকগুলি বজ্রপাত হয়েছে। সেই সংকীর্ণ বহুদূর বিস্তৃত গুহাপথে পিস্তলের আওয়াজ যে কী ভয়ংকরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল তার বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আওয়াজ হলেও রক্ষা ছিল। পিস্তলের আওয়াজে কেঁপে

pathagar.net

উঠে সমস্ত পাহাড়ই যেন দুলে উঠল। তারপর যা আরম্ভ হল তাকে প্রলয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

পিস্তলের শব্দের এত বড়ো শক্তি আগে কখনো কল্পনা করিনি।

গুহাপথের ওপরের ছাদে বহু আলগা পাথর নিশ্চয়ই ছিল। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজে কেঁপে উঠে সেগুলি ভয়ংকর শব্দে পড়তে আরম্ভ করল। খানিকক্ষণ সেই ভয়ংকর বিপদের মধ্যে মাথার ঠিক বোধ হয় ছিল না!

অনেকক্ষণ বাদে পাথর পড়া বন্ধ হবার পর স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি যেন ফিরে পেলাম। শরীর দু-এক জায়গায় পাথরের কুচিতে ক্ষত হলেও মাথাটা কেমন করে বেঁচে গেছে বলতে পারি না। কিন্তু ধুলোবালি পড়া চোখ রগড়ে, আতঙ্কের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে যখন টর্চটা জ্বেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেলেই এর চেয়ে ভালো ছিল। দেখলাম বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই পড়ে আমার দু-ধারের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এই অজানা পাহাড়ের গুহাপথে নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমি আমার জীবন্ত সমাধি রচনা করেছি।

পিস্তলটা ডান হাত থেকে একটা আলগা পাথরের ঘায়ে ছিটকে পড়ে হারিয়ে গেলেও টর্চটা কেমন করে থেকে গিয়েছিল। সেই টর্চের আলো ফেলে উন্মত্তের মতো আমি চারিদিক পরীক্ষা করে দেখলাম। না, পথ কোথাও নেই, সামনে পেছনে দু-দিকেই আমার রাস্তা একেবারে পাথর দিয়ে গেঁথে যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আলগা পাথর সব জায়গাতেই খসে পড়েছে ; ওপরের গুহার ছাদ এখানে সাধারণত যেরকম উঁচু তাতে সেরকম পাথর ছয়-সাত হাত উঁচু টিবি হয়ে পড়লেও আমি অনায়াসে তার ওপর দিয়ে টপকে যেতে পারতাম, কিন্তু সামনে ও পেছনে দুটি বাঁকের মুখে সুড়ঙ্গের ছাদ যেখানে অত্যন্ত নিচু হয়ে এসেছে সেইখানেই বড়ো বড়ো পাথর ওপর থেকে ধসে পড়ায় সামান্য একটা ইঁদুর গলবার রাস্তাও বুঝি আর ছিল না।

প্রথমটা আমি এই বিপদে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেও একেবারে আশা ছাড়িনি। ভেবেছিলাম পাথরগুলিকে একটু-আধটু নড়িয়ে বেরোবার পথ বোধ হয় আমি করে নিতে পারব। প্রথমে তাঁবুতে ফিরে যাবার পথ যে পাথরের স্তূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিকে আমি নড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। সেদিকে গুহার একটা বড়ো অংশই ধসে পড়েছে। অসুরের মতো শক্তি নিয়ে জন দশেক লোকও সে পাথর নড়াতে পারে কি না সন্দেহ। পেছনে ফিরবার উপায় না দেখে এবার আমি সামনের দিকেই বেরোবার পথ বার করবার চেষ্টা করলাম। সেদিকে পাথরগুলো তেমন বড়ো বড়ো নয়। একটার পর আর একটা যেমন-তেমনভাবে পড়ায় মাঝে মাঝে তার ফাঁকও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানেও খানিকক্ষণ ব্যর্থ পরিশ্রমের পর আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম, শুধু ক্লান্তিতে নয় ভয়ংকর আতঙ্কে। সত্যিই যে আমার আর বেরোবার উপায় নেই এই জীবন্ত সমাধি থেকে! এদিকের পাথরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো হলে কী হয় আমার মতো একজন লোকের পক্ষে তাদের সরানো অসম্ভব। লোহার শাবলের মতো কোনো অস্ত্র থাকলেও হয়তো কিছু আশা ছিল। কিন্তু শুধু হাতে কিছুই করবার জো নেই। ক্ষতবিক্ষত হাত নিয়ে দারুণ হতাশায় ও ক্লান্তিতে আমি এবার সেইখানেই বসে পড়লাম। পাহাড়ের এই গোপন সুড়ঙ্গপথে এরকম ভাবে বন্দি হবার পরিণাম যে কী তা আমি ভালো রকমেই জানি। সঙ্গে কোনোরকম খাবার এমনকী জল পর্যন্ত নেই। মৃত্যুর সঙ্গে বেশিদিন যুঝতে আমার হবে না এবং তারপর আমার কঙ্কাল পর্যন্ত চিরদিন এ পাহাড়ের ভেতর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে পচতে থাকবে।

আমার হতাশা তখন এমন গভীর যে পিস্তলটা সঙ্গে থাকলে অনাহারে দীর্ঘ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে শ্রেয় মনে করে আমি হয়তো আত্মহত্যাই করতে পারতাম। কিন্তু পিস্তলটা কোথায় যে ঠিকরে পড়ে পাথর ও বালির আবর্জনায় চাপা পড়েছিল খানিক আগে টর্চ জ্বেলে চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। টর্চের আলো বেশি খরচ করতেও ভয় হচ্ছিল। ওই আলোটুকুই

আমার ভরসা। এই গুহায় এই নিদারুণ অন্ধকারে আলোকটুকুর সান্ত্বনা না থাকলে আমি বোধ হয় খানিকক্ষণের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যেতাম। নেহাত প্রয়োজন না হলে এবং মাঝে মাঝে নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্যে ছাড়া টর্চটা আমি ব্যবহার করব না ঠিক করেছিলাম। ওপর দিকে আলো ফেলে এর মধ্যে একবার আমি সেদিকে কোথাও কোনো বেরোবার পথ আছে কি না খুঁজে দেখেছি। গুহার ছাদ মাঝামাঝি জায়গায় বেশ উঁচু। আমার জোরালো টর্চের আলোও সেখানে পৌঁছোয় না, নীচে থেকে মনে হয় ছাদ সেখানে যেন নেই, অন্ধকার রাত্রের আকাশই দেখা যাচ্ছে। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে কালো পাথরের এবড়োখেবড়ো চেহারা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। যাইহোক সেখানে অসংখ্য উড়ন্ত চামচিকে ছাড়া কোনো ফোকর আমি দেখতে পেলাম না।

ক্লান্ত হতাশভাবে কতক্ষণ আমি বসেছিলাম বলতে পারি না। এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর সময়ের কোনো হিসাব রাখা অসম্ভব। দিন-রাত্রি এখানে নেই, নিজের বুকের স্পন্দন ছাড়া আর কোনো কিছুর দ্বারা সময় যে বইছে তা এখানে জানা যায় না। ক্লান্তিতে, হতাশায় চোখও আমার বুজে এসেছিল। মনে হচ্ছিল মৃত্যুই যদি হয় তবে ঘুমের মধ্যে অচেতন অবস্থায় তা হওয়াই ভালো।

হঠাৎ আমি চমকে চোখ খুলে তাকালাম। আমার নিজের স্পন্দন শুধু নয়, আরও একটা কী মৃদু শব্দ আমি যেন শুনতে পেয়েছি। ওপরে চামচিকেদের পাখার শব্দও সে নয়। শব্দ আমার অত্যন্ত কাছে।

চোখ খুলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আতঙ্কে। গুহার মেঝের উপর নীলাভ কয়েকটা আলো যেন নড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে।

সত্যিই কি আমার মাথা এর মধ্যেই খারাপ হয়ে গেছে! আমি নিজের চুল ধরে মাথাটাকে ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসলাম। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে পাথরের মেঝের সেই সমস্ত আলো গুহাপথের ধারের ছোটো একটি ফাটলের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমূঢ়ভাবে আমি এবার টর্চটা জ্বাললাম। আতঙ্কে গলা আমার কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। আমার গুলিতে নিহত গুরালটির মৃতদেহ শুধু পাথরগুলোর ভেতর পড়ে আছে।

সত্যিই কি তাহলে এদেশের লোকেরা যাকে নাট বলে সেই প্রেতমূর্তি আমি দেখেছি। এই বিপদের মাঝেও আমার হাসি পেল। ওসব কোনো নাট বা ভূতে আমি বিশ্বাস করি না। না, বিপদ যত বড়ো হোক এরকম কুসংস্কারের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আমায় যেমন করে হোক মাথা ঠিক রাখতে হবে।

কিন্তু আলোটাই বা তাহলে কীসের? আমি টর্চটা নিভিয়ে আবার রুদ্ধশ্বাসে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কোনো কিছুই দেখা গেল না, কোনো সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। তারপর হঠাৎ গুহাপথের দেয়ালের একটা ফোকরে সেই আলো দেখা গেল। একটি দুটি করে অনেকগুলি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গুরালটার মৃতদেহের চারিধারেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনকে শক্ত করবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার সমস্ত গা শিউরে উঠল! তৎক্ষণাৎ টর্চের বোতাম টিপে দিলাম।

আশ্চর্য! টর্চের আলো পড়তেই আলোর বদলে গোটাকতক ধেড়ে ইঁদুর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সেইফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ধেড়ে ইঁদুর দেখে ত্রস্ত হওয়া দূরে থাক বিস্ময়ই কিন্তু আমার বেড়ে গেল। অন্ধকারে ইঁদুরের গা থেকে আলো বেরোয় একথা তো কখনো শুনিনি। টর্চটা নিয়ে আমি ইঁদুরদের ফোকরটার দিকে এগিয়ে এলাম। ফোকরটা বেশ বড়ো। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে তার ভেতরে

pathagar.net

আলো ফেলে দেখলাম সেটা নীচের দিকে নেমে যায়নি, সামনের দিকেই অনেক দূর সোজা চলে গিয়েছে। আর একবার যদি সে ইঁদুরগুলো আসে সেই আশায় একটা পাথর হাতে নিয়ে সেই ফেকরের ধারে এবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার নিজের যে জীবন্ত কবর হয়েছে সে বিপদের কথা এই নতুন রহস্যের মীমাংসা করবার উত্তেজনায় তখন আর আমার মনে নেই।

আমার গন্ধ পেয়ে, কিংবা যেকোনো রকমে আমার উপস্থিতি টের পাবার দরুন, ইঁদুরগুলোর কিন্তু এদিকে বেরোবার আর উৎসাহ দেখা গেল না। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আমি আবার টর্চ জ্বালতে যাচ্ছি এমন সময় স্পষ্ট মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।

এখানে মানুষের পায়ের শব্দ! প্রথমটা অবাক হলেও আমার বুঝতে দেরি হল না যে, ফোকরের ওধারে আরেকটি গুহাপথ, আমি যে সুড়ঙ্গটিতে আছি তারি গা ঘেঁষে গেছে। মাঝখানে সামান্য খানিকটা পাথরের ব্যবধান।

মানুষের পায়ের শব্দ শুনে প্রথমটা আমি মুক্তি পাবার আশায় তাদের ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে আহ্বান আমার মুখ দিয়ে বেরোল না। মেঝের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে ফোকর দিয়ে আমি অপরদিকের লক্ষ রেখেছিলাম। পায়রে শব্দ সেই ফোকরের কাছে আসার সঙ্গে—নীলচে আলোয় সেখানকার অন্ধকার দূর হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম অপর দিকের পথ দিয়ে যারা পার হয়ে যাচ্ছে তাদের সকলের পা দিয়ে অদ্ভুত একরকম নীলচে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এবার সত্যি আমার মনে হল প্রকৃতিস্থ আমি আর নেই। ভয়ংকর বিপদে কেমন করে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্রথমে ইঁদুরের গা দিয়ে এবং তারপর মানুষের পা থেকে আলো বেরোতে দেখার এ ছাড়া আর কোনো মানে হতে পারে না। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে আমি জানি এ ব্যাপার কখনো সম্ভব হতে পারে না। এ নিশ্চয় আমার উন্মত্ত মস্তিকের দুঃস্বপ্ন।

নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে আমি অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম। এবং সেই চিৎকারের ফলেই আশ্চর্যভাবে আমার মুক্তির উপায় হয়ে গেল।

কাল্পনিক বা বাস্তব প্রাণী যাইহোক আমার চিৎকারের সঙ্গেই ওধারে যারা যাচ্ছিল তারা থেমে পড়ল। ফোকরের ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম অনেকগুলি খালি লম্বা লম্বা পা সেখানে তাদের নিজেদের আলোতেই দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার ফোকরের ধারের পাথরে লোহার শাবলের মতো কোনো অস্ত্রের ঘা শুনতে পেলাম। বুঝলাম তারা পাথর সরিয়ে এ ধারের আওয়াজের কারণ জানবার চেষ্টা করছে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তাও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। যদিও তার একবর্ণ আমার বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। আমার জানিত কোনো ভাষার সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নেই।

না, কাল্পনিক প্রাণী এরা নয়। কিন্তু এরা কে? এদের হাতে পড়লে আমি যে আরও বিপন্ন হব না তারই বা নিশ্চয়তা কী? তাদের অস্ত্রের ঘায়ে ফাটলের ধারের একটা পাথর ক্রমশ আলগা হয়ে আসছিল। সে পাথরটা সরে গেলে তাদের পক্ষে এগিয়ে আসা আর শক্ত হবে না জেনে আমি কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলাম না। পাথরটা আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ও বাড়ছিল।

একবার হঠাৎ তাদের শাবলটা পাথর থেকে ফসকে কেমন করে এধারে এসে পড়ল এবং সেই মুহূর্তেই কিছু না ভেবেই আমি সেটা সবলে চেপে ধরলাম। তারপর একটা হেঁচকা দিতেই শাবলটা আমার কবলে এসে পড়ল। ওধারে যে শাবল চালাচ্ছিল, সে এরকম ব্যাপারের জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না। জোর করে শাবলটা টেনে রাখবার সে সময়ই পায়নি।

'ওধারে তাদের চ্যাঁচামেচি শুনে বোঝা যাচ্ছিল তারা যেমন বিমূঢ় তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের কাছে আর কোনো অস্ত্র বোধ হয় ছিল না। অন্তত আর পাথরের উপর কোনো ঘা শোনা গেল না।

শাবলটা কেড়ে নেবার সময় সত্যিই আমি নিজের মুক্তির কথা কিছু ভাবিনি। তাদের

এদিকে আসতে না দেবার উদ্দেশ্যেই আমি সেটা কেড়ে নিয়েছিলাম। এতক্ষণে আমার মনে হল এই শাবল দিয়েই আমি তো আমার পথ পরিষ্কার করতে পারি।

একথা মনে হবার পর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করা যায় না। ওধারের লোকেরা এরপর কী করবে কে জানে! যেমন করে হোক আমায় এখান থেকে বেরোতেই হবে।

পেছনে ফেরার পথ একেবারেই বন্ধ। তাই সামনের দিকে পাথরগুলির ফাটলের ভেতর শাবল চালিয়ে আমি প্রাণপণে এক জায়গায় চাড় দিলাম। শাবল হাতে পড়ায়, উৎসাহের সঙ্গে আমার শক্তিও বুঝি বেড়েছিল। দেখতে দেখতে একটা পাথর সরে গিয়ে সশব্দে অপর দিকে পড়ে গেল। পথ তাতে একেবারে পরিষ্কার হল না বটে, কিন্তু আগেকার দুর্ভেদ্য দেওয়ালে যে ফোকর হল তার ফলে দেখা গেল তার ভেতর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে আমার মতো চেহারার লোক গলে যেতে পারে। শাবলটা প্রথমে ওধারে ফেলে আমি টর্চটাকে নিয়ে সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে কোনোরকমে হাত-পা একটু-আধটু ক্ষতবিক্ষত করে অপর দিকে গিয়ে পড়লাম।

সুড়ঙ্গপথ এখান থেকে বাঁক নিয়ে কোথায় যে গিয়েছে আমি জানি না। হয়তো শাবল যাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি তাদের কাছে গিয়েই আবার পড়তে পারি। কিন্তু আমার তখন তা নিয়ে ভাববার সময় নেই। এগিয়ে আমায় যেতেই হবে।

মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথটা একটু দেখে নিয়ে আমি বেশিরভাগ অন্ধকারের ভেতরেই ছুটতে লাগলাম। সুড়ঙ্গপথের অনক শাখা, অনেক বাঁক। সবসুদ্ধ একটা গোলকধাঁধার মতো। কিন্তু আমি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে যখন যেটা উচিত মনে হচ্ছিল, সেইটেই অনুসরণ করছিলাম। কোনোরকমে এই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময় পাহাড় থেকে আমায় বেরোতেই হবে।

কিছুক্ষণ ধরে আমার পায়ের শব্দ ছাড়া আর একটা আওয়াজ আমার মাঝে মাঝে কানে আসছিল। আওয়াজটা অনেকটা ক্ষুব্ধ গর্জনের মতো, কিন্তু কোনো প্রাণীর গলা থেকে নিরবচ্ছিন্ন অমন গর্জন আর হওয়া সম্ভব নয় ; তা ছাড়া আওয়াজটা আমার এগোবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমানভাবে বাড়ছিল।

খানিক বাদে একটা বাঁক ফিরতেই আওয়াজটার মানে বোঝা গেল। কিন্তু সেই সূত্রে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখবার কল্পনা আমি করিনি।

দশম পরিচ্ছেদ

সুড়ঙ্গপথ বাঁক নিয়েই যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাহাড়ের ভেতরটা কেটে কারা যেন বিশাল এক হল তৈরি করেছে মনে হল। মাঝখানে তার পাথরের মেঝের বদলে প্রকাণ্ড এক জলের কুণ্ড। পাহাড়ের এক ধারের একটি গহ্বর থেকে প্রচণ্ড বেগে জল এসে সে কুণ্ডে পড়ছে। এতক্ষণ এই জলের কল্লোলই আমি শুনেছিলাম। কিন্তু এই জলের কুণ্ড ও প্রপাতের চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল এখানকার অদ্ভুত এক নীলাভ আলো। পাহাড়ের গা বেয়ে মোটা পেশির মতো মিশকালো একরকম পাথর জলপ্রপাতের মুখ থেকে কুণ্ডের ভেতর নেমে গিয়েছে। কুণ্ডের ধারে ধারে অন্য দিকেও সেরকম পাথর আছে। অন্ধকারে সেই পাথরগুলিই যেন জ্বলছে মনে হচ্ছিল।

নিজের বিপদ ভুলে এ দৃশ্য হয়তো আরও খানিকটা আমি দেখতাম, কিন্তু সহসা কুণ্ডের ওপারে দৃষ্টি পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। আমি যেটি দিয়ে পৌঁছেছি, সেটি ছাড়া আরও অনেক সুড়ঙ্গ নানা দিক থেকে কুণ্ডটিতে এসে মিলেছে। ওপারের তেমনি একটি সুড়ঙ্গপথের শেষে জলের ধারে দুটি লোক দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ অন্যান্য দিকে দৃষ্টি থাকাতেই তাদের চোখে পড়েনি। তাদের একজন আমার দিকে পিছন ফিরে নিচু হয়ে কী করছিল, কিন্তু যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, অস্পষ্ট আলোতেও তাকে চিনতে আমার বিলম্ব হল না। সে লি-সিন।

নিঃশব্দে তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। হঠাৎ লি-সিন মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, এবং সেই সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে যে চিৎকার বেরোল, জলের কল্লোলে খানিকটা চাপা পড়লেও আমার তা ঠিক আদরের ডাক বলে মনে হল না।

পেছন ফিরে আমি পালাবার জন্যে দৌড় দিলাম কিন্তু বেশিদূর সেদিকেও এগোতে হল না।

সামনে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে অসংখ্য উজ্জ্বল কঙ্কাল আমার দিকে এগিয়ে আসছে! কঙ্কালগুলির ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত নীলচে আলোয় সুড়ঙ্গপথ এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে যে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না।

আমার তখনকার অবস্থাটা বর্ণনা করাও শক্ত। পেছনে আমার বিশাল জলের কুণ্ড ও তার ওপারে পরম শত্রু লি-সিন, আর সামনে রহস্যময় উজ্জ্বল সব কঙ্কালের সারি!

সেই ভয়ংকর মুহূর্তে বেছে নেবার উপায় থাকলে আমি বোধ হয় অজানা জলের কুণ্ড ও লি-সিনের সঙ্গে সাক্ষাতের বিপদই পছন্দ করতাম এই ভূতুড়ে কঙ্কালদের সংসর্গের চেয়ে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। রহস্যময় কঙ্কালগুলি তখন একেবারে আমার কাছে এসে পড়েছে।

হতভম্ব হয়েই আমি বোধ হয় কিছু না করবার খুঁজে পেয়ে, টর্চটা টিপে দিলাম। সেই মুহূর্তে যেন ভোজবাজিতে সে উজ্জ্বল কঙ্কালের সার মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় টর্চের আলোয় দেখা গেল গুহাপথে অদ্ভুত একজাতের অসংখ্য মানুষের সারি। এদেরই দেহের সমস্ত হাড় থেকে অন্ধকারে অমন অদ্ভুত আলো এতক্ষণ বেরোচ্ছিল। আকারে তারা নিতান্ত ছোটো। চার ফুট, সাড়ে চার ফুটের বেশি লম্বা তাদের ভেতর কেউ নেই। একলা এরকম গোটা দশেক মানুষকে কাবু করেও আমি বোধ হয় বেরিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তারা গোটা দশেক তো নয়, অমন দু-শো লোক গুহাপথ ও তারপরের রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিরস্ত্রও নয়, অনেকেরই হাতে ছোটো বল্লম ও তির-ধনুক দেখা গেল। কয়েকজনের হাতে কলসির মতো একরকম মাটির পাত্রও রয়েছে।

আমাকে দেখতে পাওয়া মাত্র তারা সকলে মিলে উন্মত্ত চিৎকার করে উঠল। আমার পরিণাম যে এই উন্মত্ত জনতার হাতে কী হবে, তা তখন বুঝতে আমার বাকি নেই, তবু মরবার আগে অন্তত কাপুরুষের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব না সংকল্প করে আমি তখন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার গায়ে প্রথম যে আঘাত করবে শুধু হাতেই অন্তত তাকে আমি সাবাড় করে তবে ছাড়ব।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমায় আক্রমণ বা অস্ত্র দিয়ে আঘাত তারা কেউ করল না। চারিদিক থেকে এসে তারা আমায় ঘিরে দাঁড়াল। হাতে তাদের উদ্যত বল্লম, আর বাগিয়ে ধরা তির-ধনুক দেখে বুঝতে পারলাম আমায় না মেরে বন্দি করাই তাদের উদ্দেশ্য। সে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা আপাতত নিষ্ফল জেনেই আমিও কোনোরকম প্রতিবাদ করলাম না।

আমাকে মাঝখানে রেখে, এবার তারা সামনের দিকেই এগিয়ে চলল। নিজেদের মধ্যে, আমার অবোধ্য ভাষায়, উত্তেজিতভাবে কী আলোচনা করতে করতে কুণ্ডের সামনে গিয়েই তারা থামল। চেয়ে দেখলাম লি-সিন বা তার সঙ্গীর কোনো চিহ্ন ওপারে নেই। বিপদ বুঝেই হোক বা অন্য যেকোনো কারণে তারা একেবারে গা ঢাকা দিয়েছে।

যে অদ্ভুত জাতের মানুষের ভেতর আমি পড়েছিলাম তাদের সম্বন্ধে ভাববার মতো মনের অবস্থা এতক্ষণে আমার হয়েছে। কিন্তু ভেবে কোনো কূলকিনারাও পাচ্ছিলাম না। তাদের বামনের মতো আকৃতি দেখে, দারু বলেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু দারুদের হাড়ের ভেতর থেকে এরকম অদ্ভুত আলো বার হবার কথা তো কখনো শুনিনি। এ আলোর অর্থই বা কী? এই রহস্যময় আলোর কথা ভাবতে গেলে সত্যিই সমস্ত ব্যাপারটা এমন আজগুবি হয়ে ওঠে যে নিজের চোখে

boiRboi.net

দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা মনে হয় ভৌতিক। কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যাই তার খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হচ্ছিল জাগ্রত অবস্থাতেই আমি যেন ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখছি। তারা আমায় বন্দি করার পরই আমি টর্চটা নিভিয়ে ফেলেছিলাম। তারাও কী কারণে বলা যায় না আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নেয়নি বা নিতে সাহস করেনি। টর্চ নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মূর্তিগুলি আবার উজ্জ্বল কঙ্কালে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার অজানা গুহাপথে চারিধারে সেই অগ্নিময় কঙ্কালে বেষ্টিত হয়ে থাকা যে কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। বেশিক্ষণ এই সংসর্গে থাকলে মনে হচ্ছিল আমার মস্তিষ্ক, এতক্ষণে যদি না হয়ে থাকে তাহলে, এবার সত্যিই বিকৃত হয়ে যাবে!

তারা আপাতত কুণ্ডের কাছে থেমে যা করছিল তাও অদ্ভুত। সেটা তাদের ধর্মের যে একরকম অনুষ্ঠান এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমে সকলের কণ্ঠ থেকে অদ্ভুত একরকম কাঁদুনির মতো গান শোনা গেল। তারপর এক এক করে কয়েকটি লোক, কলসির মতো যে মাটির পাত্র তাদের হাতে দেখেছিলাম, তাই মাথায় করে কুণ্ডের ভেতর নেমে গেল। সে কলসি কুণ্ডের জলে ভরে যখন তারা উঠে এল, তখন সমবেত সকলে মাটির ওপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আবার সেই কাঁদুনির মতো গান শুরু করেছে। আমি প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই ছিলাম, কিন্তু তারা কয়েকজন মিলে আমায় একরকম জোর করেই মাটিতে শুইয়ে দিল। কলসি মাথায় করে উজ্জ্বল কঙ্কালগুলি আমাদের যেমন ইচ্ছে মাড়িয়ে একেবারে এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ আর উঠল না গানও থামল না।

এবার ফিরে চলার পালা। পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথের গলির পর গলি পার হয়ে তারা যে আমায় কোথায় নিয়ে চলেছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না! আচ্ছন্নের মতো তাদের সঙ্গে যেতে যেতে এক সময়ে শুধু মনে হল, কঙ্কালগুলির আলো যেন ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। তার কারণ বুঝতেও দেরি হল না! সুড়ঙ্গপথ এবার নিশ্চয় কোনো খোলা জায়গায় শেষ হতে চলেছে। বাইরের আলো ভেতরে এসে পড়ার ফলেই কঙ্কালগুলি ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে মানুষের আকৃতি পেয়ে গেল।

গুহাপথ থেকে তখন আমরা বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ভোরের আলোয় সামনে অপরিচিত পাহাড় জঙ্গলের দেশ দেখা যাচ্ছে। নানারকম উত্তেজনায় পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় গোটা রাত যে আমার কেটে গেছে এতক্ষণ সে খেয়াল হয়নি।

লাওচেন পাহাড় পেরিয়ে যেখানে পৌঁছোতে চেয়েছিল, এ যে দারুদের সেই গোপন দেশ এ বিষয়ে আর আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এভাবে এখানে পৌঁছোতে তো আমি চাইনি। আমার সম্বন্ধে এদের যে কী মতলব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আপাতত অদূরের একটা ছোটো পাহাড়ের দিকেই তারা আমায় নিয়ে চলেছিল। পাহাড় না বলে তাকে বড়ো পাথরের ঢিবি বলাই উচিত। কলকাতার মনুমেন্টের চেয়ে তার চুড়ো বেশি উঁচু নয়। সেই চুড়োয় কয়েকটা ঘর দেখতে পাচ্ছিলাম।

খানিক বাদে পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠে দেখলাম শক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি সেখানে খুপরি খুপরি অনেকগুলি ঘর সারি সারি সাজানো। তারই একটায় আমায় ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার আগে আমি সমস্ত জায়গাটা কিন্তু ভালো করে দেখে নিয়েছি। পালাবার সুযোগ খোঁজাই ছিল উদ্দেশ্য কিন্তু সে সুযোগ সত্যিই সেখানে নেই। আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম সেই দিকটা ঢালু হলেও পেছনের দিকে পাহাড় খাড়াভাবে বহুদূরে নেমে গেছে। আমার ঘরটাও একেবারে সেই খাড়াই-এর কিনারায়। দারুদের পাহারা শুধু সামনের দিকেই হলেও পেছন দিয়ে নেমে যাবার কোনো আশাই দেখলাম না।

ঘরগুলির মাথায় পাতার ছাওনি দেওয়া। দেওয়ালগুলি শুধু বাঁশের খুঁটিতে তৈরি। তার ভেতর যথেষ্ট ফাঁক আছে। সেই বাঁশের বেড়ার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম আমার পাশের ঘরগুলিতেও অনেকগুলি লোক পড়ে আছে। তারা দাবুদেরই জাতের, কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় তারা একেবারে মৃত্যুর দরজায় এসে পৌঁছেছে। উত্থানশক্তি পর্যন্ত তাদের অনেকের নেই, মাটিতে পড়ে তাদের অনেকেই কাতরাচ্ছে।

তারা কিন্তু আমার মতো বন্দি মনে হল না। দাবুরা সসম্ভ্রমে এসে তাদের খুপরির সামনে যেরকম সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে যাচ্ছিল তাতে সেকথা মনে করা শক্ত। রহস্যটা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে কেমন একটা অজানা আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছিল। গুহাপথের উজ্জ্বল কঙ্কাল থেকে আরম্ভ করে, এই অদ্ভুত জাতের যাকিছু কাণ্ডকারখানা এপর্যন্ত দেখেছি সমস্তই দুর্বোধ্য রহস্য। এরা যে আমায় নিয়ে কী করবে কিছুই জানি না, কিন্তু কেমন যেন অনুভব করছিলাম, সে পরিণামের চেয়ে মৃত্যু বুঝি লোভনীয়।

এ আতঙ্ক আর একটি কারণে আরও বেড়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকার পর হঠাৎ একটি লোক কয়েকজনের সঙ্গে বাঁশের আগড় খুলে ভেতরে ঢুকল। সাধারণ দাবুদের চেয়ে সে অনেক বেশি লম্বা চওড়া ; দাবুদের মধ্যে তাকে দৈত্য বলেই মনে হয়—কিন্তু সেইটেই তার প্রধান বিশেষত্ব নয়। বিশেষত্ব তার মুখ। এখানকার দাবুদের অনেকের মুখেই নানারকম রং মাখানো, কিন্তু মানুষের মুখ শুধু রঙের ছোপে যে কী ভীষণ হয়ে উঠতে পারে এই লোকটিকে না দেখে বোঝা যায় না। লোকটা আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ আমায় সবলে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলে। সেমুহূর্তে তার রং-করা পৈশাচিক মুখে সবলে একটা ঘুসি মারবার লোভ আমি যে কী করে সংবরণ করেছিলাম বলতে পারি না। লোকটা শুধু আমায় দাঁড় করে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, এতক্ষণ কেউ যা করেনি তাই সে করে বসল। হঠাৎ আমার হাত থেকে টর্চটা টেনে ছিনিয়ে নিয়ে সে আমায় সবলে একটা ধাক্কা দিল। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। উঠে তার দিকে উন্মত্তভাবে ছুটে যাবার আগেই আর সকলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে সে আগড় বন্ধ করে দিল। তার সেই মুহূর্তের হাসি কোনোদিন ভোলবার নয়। সে হাসি ভয়ংকর কি না আমি বলতে পারি, না কিন্তু তখন মনে হয়েছিল অমন অদ্ভুত হাসি মানুষের কণ্ঠ থেকে যেন বেরোতে পারে না।

এর পরেও কয়েকবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে চাইতে তাকে যাতায়াত করতে সেদিন দেখেছিলাম, কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি আমার ভাগ্যের উপর কতখানি হাত তার সেদিন আছে।

বুঝতে পারলাম রাত হবার পর। সারাদিন অনাহারের পর আমার মাথা তখন ঝিমঝিম করছে। তারই ভেতর অবাক হয়ে দেখলাম আমার পাশের সমস্ত ঘরে মানুষ আর নেই। উজ্জ্বল কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে সারি সারি। গুহাপথের অন্ধকারে যেসব কঙ্কাল দেখেছিলাম তার চেয়েও এদের জ্যোতি অনেক বেশি প্রখর। মনে হয় যেন জ্বলন্ত ইস্পাত দিয়ে সেগুলি তৈরি।

বাইরে অন্ধকারে অনেক লোকের হট্টগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। খানিকবাদে একটা মশাল সেখানে জ্বলে উঠল। দেখলাম পাহাড়ের খাড়াই-এর ঠিক সামনেই একটা প্রকাণ্ড মোটা খুঁটি পোতা। তার সামনে বেদির মতো খানিকটা উঁচু জায়গায় মশালের আলোয় অনেকগুলি দাবুকে দেখা গেল। তাদের চারিধারে খানিকটা দূরত্ব রেখে আরও অসংখ্য দাবু দাঁড়িয়ে আছে। মশালের রাঙা অস্পষ্ট আলোয় তাদের দেখাচ্ছে অদ্ভুত।

কোনো পৈশাচিক অনুষ্ঠানের জন্যে যে তারা প্রস্তুত হচ্ছে তা বোঝা কঠিন নয়। যখন কয়েকজন মিলে উদ্যত বল্লম হাতে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই বেদিতে দাঁড় করিয়ে দিল তখন একথাও বুঝলাম যে, আমিই সেই অনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ।

pathagar.net

কিন্তু কী সে অনুষ্ঠান? রক্তাক্ত যুপকাষ্ঠ বা খড়্গ নয়, উত্তপ্ত তেলের কড়াইও নয়! সাধারণত যেসব জিনিস অসভ্য জাতিদের পৈশাচিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা জড়িত থাকে বলে মনে করি, সেসব কিছুই সেখানে নেই। বেদির ওপর একটি গর্তের ভেতর মশালটি পোঁতা। একটি কলসি জল ছাড়া আর বেদির ওপর কোনো জিনিসও নেই। শুধু বেদির পেছনে খাড়া পাহাড় আর বেদির ওপর দারুদের সেই রংমাখা দৈত্যের উপস্থিতি ছাড়া ভয় করবার আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। দারুদের দৈত্যের দৃষ্টি তখনও আমার মুখের ওপর অদ্ভুতভাবে মাঝে মাঝে অনুভব করছিলাম। সে দৃষ্টি দুর্বোধ্য! বুঝতে পারছিলাম না কী এদের মতলব! এরা কি তাহলে এই খাড়া পাহাড় থেকে আমায় নীচে ফেলে দিতে চায়! তাদের নরবলির রীতি কি এই?

বেশিক্ষণ দ্বিধায় থাকতে কিন্তু হবে না মনে হল। অনুষ্ঠান এর মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছ। পেছনের খুঁটিতে আমায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দুজন শীর্ণকায় দারু কী একরকম শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আমার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারিধারে অসংখ্য দারুও কাঁদুনি সুরে অদ্ভুত একরকম আবৃত্তি শুরু করে দিল।

ব্যাপারটা এখন একটু একটু আমি বুঝতে পারছি না এমন নয়। এরা আমায় দেবতা হিসাবে পুজো করছে, বলির আগে ছাগলকে যেমন করা হয়। কিন্তু পুজোর পর কী হবে? ভীতভাবে আমি একবার পেছনের অতল খাদ ও সামনের সেই দারু দৈত্যের মুখের দিকে তাকালাম। আমার পাশেই আমাকে পাহারা দেবার জন্যেই যেন সে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখে কোনো ভাবান্তর নেই—রঙের পৈশাচিকতা ছাড়া।

কিন্তু আমায় ধরে পাহাড় থেকে ফেলে দেবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। খানিক বাদে আবৃত্তি থামতেই কাঠের একটি বাটির মতো পাত্রে একজন বুড়ো দারু কলসি থেকে জল ঢেলে সসম্ভ্রমে আমার কাছে নিয়ে এল। সমবেত দারুরা তখন মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে আবার নতুন রকম আবৃত্তি আরম্ভ করেছে।

অনুষ্ঠানের শেষে যাইহোক আপাতত তার এই অঙ্গটুকুতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। সমস্ত দিন নির্জলা উপোসে এবং ভয়ে ভাবনায় আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞ হয়েই আমি সে জলের জন্যে হাত বাড়ালাম।...

...আর সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। জলের পাত্র আমি মুখে তুলতে যাচ্ছি হঠাৎ দৈত্যাকার সেই দারুর প্রকাণ্ড এক চড়ে জলের পাত্র আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। আমি বিমূঢ় হয়ে মুখ তুলতে না তুলতেই দেখি বেদির ওপর থেকে মশালটা উপড়ে নিয়ে সে সজোরে পাহাড়ের ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। উল্কার মতো অতল শূন্যে মশালটা অদৃশ্য হতেই রাতের অন্ধকার যেন বন্যার মতো আমাদের ওপর নেমে এল। চারিধারে শুধু অসংখ্য উজ্জ্বল কঙ্কালের জ্যোতি।

সেই ভয়ংকর অন্ধকারে স্পষ্ট বাংলায় শুনতে পেলাম, 'শিগ্‌গির দড়ি ধরে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে নেমে যাও। পেছনের খুঁটিতে দড়ি বাঁধা আছে।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

সে ভাষা, সে স্বর এমন অপ্রত্যাশিত যে প্রথমটা আমি আরও বিমূঢ় হয়ে একেবারে স্থানুর মতোই দাঁড়িয়ে রইলাম। সবকিছু যেন আমার গুলিয়ে গেছে। ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে কথাগুলোর সোজা অর্থ যেন আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।

পর মুহূর্তেই আবার ধমকানি শোনা গেল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়। শিগ্‌গির নেমে যাও।'

pathagar.net

এবার আর আমার অসাড়তা রইল না। সত্যিই সময় যে নিতান্ত অল্প। পালাবার এমন সুযোগ পেয়েও কি হারাব! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে আমি নিচু হয়ে বসে পড়ে অন্ধকারে খুঁটির গোড়ায় হাত দিলাম। সেখানে সত্যিই মোটা একটা দড়ি শক্ত করে বাঁধা রয়েছে. সেই দড়ি ধরে পাহাড়ের ধার থেকে নীচে ঝুলে পড়া তিন সেকেন্ডের কাজ। যদি যথেষ্ট লম্বা হয় তাহলে তা ধরে পাহাড়ের খাড়াইটা যে অনায়াসে নেমে যেতে পারব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু দড়ি ধরে পাহাড়ে পা ঠেকিয়ে নেমে যেতে যেতে হঠাৎ আমি থেমে গেলাম।

ওপরে এরই মধ্যে উত্তেজিত হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। সমবেত জনতা এতক্ষণে বুঝি প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

চিৎকার করে বললাম, 'মামাবাবু, তুমি কী করবে?'

অন্ধকারে মামাবাবুর স্বরই যে শুনেছিলাম এ বিষয়ে আমার অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিল না। গলার স্বর সম্বন্ধে ভুল করা যদি বা সম্ভব হয় এই অজানা দারুদের দেশে বাংলা যে আর কেউ বলতে পারে না এটা ঠিক।

চারিধারের উত্তেজিত কলরবের ভেতর মামাবাবুর গলা আবার শোনা গেল, 'দেরি করে সমস্ত মাটি করলে আহাম্মুখ! আমার জন্যে ভাববার আর সময় পেলে না! আমি তোর পরেই যাচ্ছি, তুই তাড়াতাড়ি নেমে যা।'

বকুনি খেয়ে আমি আর বিলম্ব করতে সাহস করলাম না। দড়ি ধরে পাহাড়ে পা ঠেকিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগলাম। কিন্তু মন আমার কিছুতেই আশ্বস্ত হচ্ছিল না।

মামাবাবু যে ওই উত্তেজিত দারুদের ভেতর কত বড়ো বিপদের মধ্যে আছেন তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত নয়। তাদের হাত ছাড়িয়ে তিনি নেমে আসবার সুযোগ পাবেন কি না কে জানে! এই অবস্থায় শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নেমে যেতে কিছুতেই আমার মন সরছিল না।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে নামতে নামতে হঠাৎ ওপরে বন্দুকের শব্দ শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আর একটু হলেই দড়ি থেকে হাত খুলে গিয়ে আমি নীচে পড়ে গিয়েছিলাম আর কি!

কোনোরকমে সে বিপদ সামলে নেবার পর আমি কিন্তু আর নামতে পারলাম না। বন্দুক যখন ছুঁড়তে হয়েছে তখন ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে কে জানে! মামাবাবু একা সমস্ত দারুদের বিরুদ্ধে কী করতে পারবেন! তারা সবাই মিলে শুধু ঠেলেই তাঁকে এই পাহাড় থেকে তো ফেলে দিতে পারে।

কথাটা মনে হতেই আর নিশ্চেষ্ট হয়ে নেমে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি নিজেও নিরস্ত্র। এভাবে একলা মামাবাবুর সাহায্যে গিয়ে কিছু করতে পারব না জেনেও আবার দড়ি ধরে ওপরে না উঠে পারলাম না।

কিন্তু বেশি দূর উঠতে আমায় হল না। হঠাৎ দড়িতে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। এবং তারপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে!

মামাবাবু ওপর থেকে চিৎকার করে বললেন, 'এ কী! এতক্ষণে এটুকু নেমেছিস। তাড়াতাড়ি আরও তাড়াতাড়ি। আমি আসছি।'

টর্চের আলো নিভিয়ে মামাবাবু এইবার নামতে শুরু করলেন। আমার কাছে তিনি না আসা পর্যন্ত কিন্তু আমি থেমেই রইলাম।

মামাবাবু আমার কাছে পৌঁছোবার পর বকুনি দেবার আগেই বললাম, 'কিছু বোলো না মামাবাবু! তোমায় বিপদের মধ্যে রেখে একলা নেমে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন বাঁচলে দুজনেই বাঁচব। পাহাড় থেকে পড়ে মরতে হয় দুজনেই মরব।'

pathagar.net

'আচ্ছা খুব বাহাদুরি হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি চল!'

আমাদের আর কোনো কথাবার্তা অনেকক্ষণ হল না। দুজনে পরপর দড়ি ধরে খাড়া পাহাড়ের গায়ে যথাসম্ভব পায়ের ভর দিয়ে নেমে যেতে লাগলাম। কাজটা নিতান্ত সোজা যে নয় তা বলাই বাহুল্য। খাড়া পাহাড় কতদুর পর্যন্ত নেমে গেছে কে জানে। পায়ের ভর দেওয়ার ক্রমশই আর সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। হাতের ওপর অসম্ভব ভার পড়ছিল। মোটা ঘাসের দড়িতে হাতের চামড়া যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই মনে হচ্ছিল শেষ যেন আর নেই।

চারিধারে সূচীভেদ্য অন্ধকার। তাতে অবশ্য একটু সুবিধেই হয়েছিল। ওপরের দারুরা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু পাহাড় থেকে কিরকম অবস্থায় শূন্যে কোথায় ঝুলছি বুঝতে না পেরে অস্বস্তিও হচ্ছিল ভয়ানক।

ওপরে পাহাড়ের ঠিক কিনারে গণ্ডগোল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের দড়িটা প্রচণ্ড বেগে নড়ে উঠল।

থেমে পড়ে ভীতস্বরে বললাম, 'ব্যাপার কী?'

মামাবাবু শান্তস্বরে বললেন, 'থামিসনি, ওরা দড়িটার কথা এইবার জানতে পেরেছে।'

এই অবস্থায়ও মামাবাবুকে শান্ত থাকতে দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। নামতে নামতে বললাম, 'তাহলে উপায়?'

'উপায় আরও জোরে হাত চালানো!'

কিন্তু, হাত যে আর চলতে চায় না। মনে হচ্ছিল দড়িটা যেন কেটে হাতের ভেতর বসে যাচ্ছে। সমস্ত বাহু অসাড় হয়ে শরীরের ভার আর যেন বইতে পারছে না।

মামাবাবু হঠাৎ সেই অবস্থায় টর্চটা জ্বেলে উপরে ফেললেন। পাহাড়ের ধারে অসংখ্য দারু ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে আমাদের দেখবারই বোধ হয় চেষ্টা করছিল। টর্চের আলো দেখেই তারা চিৎকার করে উঠল। কিন্তু সে চিৎকারে নয়, সেখানকার জনতার ভেতর একটা ব্যাপার দেখে আমার সমস্ত শরীর যেন সহসা হিম হয়ে গেল।

ভীত উত্তেজিত স্বরে বললাম, 'মামাবাবু ওরা কী করছে জানেন?'

'—কী?'

'আমাদের দড়ি কাটছে যে!'

টর্চের আলো নিভিয়ে তেমনি শান্তস্বরে মামাবাবু বললেন, 'কাটুক, ভয় নেই।'

ভয় নেই! আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ ভয় আর কী। সমস্ত শরীরটা গুঁড়ো হয়ে যাবে এই যা! এর চেয়ে ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে সসম্মানে যুঝে মরতে পারতাম!'

মামাবাবুর কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনা দেখা গেল না। শুধু বললেন, 'না, মরতে হবে না, আমরা নীচে না পৌঁছোলে ও দড়ি কাটা পড়বে না। একটু হাত চালা।'

হাত চালানো ছাড়া আর কী করা যায়! কিন্তু আমি তখন সমস্ত আশা পরিত্যাগ করেছি। মামাবাবুর প্রশান্তিতে শুধু অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। বললাম, 'কাটা যে পড়বে না তা জানলে কেমন করে? ওদের ছুরিও কি ভোঁতা?'

'না ভোঁতা নয়, কিন্তু ছুরি চালাচ্ছে মংপো!'

'মংপো'

'হ্যাঁ মংপো! মাথায় দারুদেরই প্রায় সমান বলে তাদের ভেতর থেকে ওকে চেনা যায় না। মংপো আমার সঙ্গেই ছিল বরাবর।'

আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটভাবে বেরোল শুধু, 'কিন্তু মংপো দড়ি কাটছে কেন?'

মামাবাবু সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'আহাম্মুখ, তা না হলে ওদের কেউ-ই যে কাটত!'

pathagar.net

ঠিক দরকারের সময় মংপো কেমন করে যথাস্থানে এসে উদয় হল, মামাবাবুই বা কেমন করে এমনভাবে এসে আবির্ভূত হলেন, সেই ভয়ংকর রাতের পর তাঁদের কী পরিণাম হয়েছিল, এতদিনই বা কী করেছিলেন এ সমস্ত জানবার কী অদম্য কৌতূহল যে তখন হচ্ছিল তা বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রহেলিকার মতো—সত্য বলে বিশ্বাস করাই যায় না, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তি করবার সময় এখন নয়। হাতের মাংস দড়ির ঘর্ষণে কেটে যাচ্ছে, দুটো কাঁধ যন্ত্রণায় মনে হচ্ছিল যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে! সমস্ত দিন অনাহারে থাকবার দরুণই আরও বেশি ক্লান্ত যে হয়ে পড়েছিলাম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনভাবে কতক্ষণ আর দড়ি ধরে থাকবার জোর গায়ে থাকবে তা বুঝতে পারছিলাম না। ওপরে মংপো চালাকি করে উন্মত্ত দাবুদের বা কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। না, এত করেও বুঝি কিছু হল না। সমস্ত হাত অসাড় হয়ে আসছে, হাতের শিথিল মুঠির ভেতর দিয়ে দড়ি যেন পিছলে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম।

মনের হতাশা মুখ থেকে আপনা থেকেই প্রকাশ পেয়ে গেল। 'আর পারছি না মামাবাবু! হাতে আর সাড় নেই।'

মামাবাবুর উত্তর শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'ছেড়ে দে তাহলে হাত।'

প্রাণের মায়া বড়ো সামান্য জিনিস নয়। সত্যিই তখনও আমি প্রাণপণে দড়ি ধরে থাকবারই চেষ্টা করছি। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেড়ে দেব? বাঃ বেশ তো তুমি! এই পাহাড়ে আমার গুঁড়ো হওয়াই তুমি চাও?'

'না রে গুঁড়ো হবি না, আর হাত তিনেক মাত্র আছে। আমি গুণে গুণে আসছি। অনায়াসে ছাড়তে পারিস।'

মামাবাবুর কথা শেষ হবার আগেই শক্ত পাথরের ওপরে আমি হাত ছেড়ে দিয়ে পড়েছি। আঘাত অবশ্য একটু লাগল, কিন্তু নিরাপদে মাটিতে পা দেওয়ার আনন্দ ও হাতের যন্ত্রণা শেষ হওয়ার আরামের কাছে সে আঘাত কিছুই নয়।

মামাবাবু আমার পরেই অন্ধকারে সেখানে এসে নেমে বেগে দড়িটাকে একটা ঝাঁকানি দিলেন টের পেলাম। তার কয়েক মুহূর্ত বাদেই দড়িটা ওপর থেকে কাটা হয়ে সশব্দে আমাদের পায়ের কাছে পড়ল। দড়িটা অমনভাবে কাটা হয়ে না পড়লে হয়তো আমাদের জীবন কী ভয়ংকর ভাবে বিপন্ন হয়েছিল ভালো করে বুঝতে পারতাম না। আর মিনিট খানেক আগেও দড়ি কাটা পড়লে আমাদের আর চিহ্ন থাকত না।

ওপরের দাবুরা ইতিমধ্যে কয়েকটা মশাল সেখানে জ্বেলে ফেলেছে। দড়ি কাটা পড়বার পর নীচের দিকে মশাল জ্বালিয়ে পাহাড়ের ধার থেকে ঝুঁকে পড়ে তারা ফলাফলটা দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তাদের বৃথা। তাদের মশালের আলো এই গাঢ় অন্ধকারে কতদুর আর পৌঁছোবে।

আমি তাই জন্যে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে এই দারুণ শক্তি পরীক্ষার পর একটু জিরোবার কথাই বুঝি ভাবছিলাম। দাবুরা আপাতত আমাদের আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং একটু দম নিলে ক্ষতি কী! বিশেষ করে মনের ভেতর যত প্রশ্ন জমে আছে, তাদের কয়েকটার উত্তর না পেলে যে স্থিরই থাকতে পারছি না।

কিন্তু মামাবাবু আমায় সে অবসর দিলেন না। পাহাড়ের ধারে মশালের আলো দেখা যেতেই তিনি আমার হাত ধরে টান দিয়ে প্রাণপণ বেগে নীচে নামতে শুরু করলেন।

অন্ধকারে পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি নামা সোজা কথা নয়। পদে পদে হোঁচট লাগছিল। আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি এমন সময় মামাবাবু যে মিছিমিছি পালাবার জন্যে ব্যস্ত হননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমাদের হাত দুয়েক দূরে সশব্দে একটা

প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই তখন পড়েছে। সে পাথরের পর ছোটো-বড়ো আরও অনেক পাথর এবার নীচে এসে পড়তে লাগল। কী ভাগ্যি আমরা তখন পাহাড়ের আরেক দিকে সরে গেছি মামাবাবুর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। নইলে সেই একটি পাথর মাথায় পড়লেই আর আমাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না।

দারুরা এতক্ষণ যে কেন এ উপায় অবলম্বন করেনি কে জানে। তাহলে মংপোর সমস্ত চাতুরি সত্ত্বেও দড়ি বেয়ে নীচে নামা আর আমাদের ভাগ্যে হত না। সম্ভবত আমাদের মারবার জন্যে দড়ি কাটাই যথেষ্ট মনে করে তারা এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল। অন্য কোনো উপায়ের কথা তাদের মাথায় খেলেনি।

উঁচু-নিচু এবড়োখেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে পথ দেখবার উপায় নেই, কারণ তাহলে আমরা কোথায় আছি দারুদের আর জানতে বাকি থাকবে না।

অনেকক্ষণ বাদে মামাবাবু যখন থামলেন তখন বারবার হোঁচট খেয়ে ও পড়ে গিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। দম ফিরে পেতেও আমাদের কম সময় লাগল না। কিন্তু এত কাণ্ডের পর এমনভাবে মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় এলেও মামাবাবুকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসরও আমি পেলাম না।

প্রথমেই মামাবাবু বললেন, 'এইবার কিন্তু ছাড়াছাড়ি দরকার।'

বিস্মিত যত হলাম, তার চেয়ে ক্ষুণ্ণ হলাম যে বেশি একথা বলাই বাহুল্য। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

মামাবাবু একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন, 'তর্ক করবার সময় নয়। যা বলছি তাই কর।'

কিন্তু তবু আমি জেদ করাতে মামাবাবু আমায় বুঝিয়ে যা বললেন তা যুক্তিযুক্ত হলেও মনঃপূত কিছুতেই আমার হল না। মামাবাবুকে মংপোর জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। মামাবাবু ও মংপোর এ অঞ্চল পরিচিত, তাঁরা কোনোরকমে আলাদা হয়েও দারুদের এড়াতে পারবেন, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে বিপদ বাড়বে। আমায় তাই আগে থাকতে তিনি নিরাপদ জায়গায় পাঠাতে চান। দারুরা এখনও আমাদের সন্ধানে চারিধারে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। এই বেলা অন্ধকারে আমার চলে যাওয়ার সুবিধা আছে।

সব কথা শুনে বললাম, 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু যাব কেমন করে! এ অঞ্চল যে চিনি না, তা তো নিজেই বলছ।'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'যেখানে যেতে বলছি সে জায়গা অন্তত তুই চিনিস।'

'আমি চিনি!'

'হ্যাঁ, যে সুড়ঙ্গ থেকে দারুদের সঙ্গে বেরিয়ে ছিলি সেটা মনে আছে তো!'

'সেখানে আবার কেন?'

'সেখানেই আমাদের আস্তানা।' বলে মামাবাবু এবার সেই সুড়ঙ্গপথের গোলকধাঁধার ভেতর কোথায় একটি গোপন গুহার মতো স্থানে তিনি আস্তানা করেছেন তা খুঁজে নেবার উপায় বুঝিয়ে দিলেন।

অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করবার ছিল কিন্তু মামাবাবু একেবার অটল। মামাবাবুর দেওয়া টর্চটা নিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবেই তাই এগিয়ে যেতে হল।

নিরাপদ বলে যেখানে আমায় পাঠাবার জন্যে মামাবাবুর এত আগ্রহ, সেখানে কী বিপদ অপেক্ষা করছে মামাবাবু যদি তখন জানতেন!

pathagar.net

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মামাবাবু একটা কথা ঠিকই বলছিলেন। বিশাল একটা পাহাড় খুঁজে বার করা বিশেষ কঠিন নয়, মামাবাবু যেরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে ঘণ্টা খানেক হাঁটবার পর সুড়ঙ্গপথও পেয়ে গেলাম। কিন্তু সুড়ঙ্গপথের মুখে এসে কেন বলা যায় না প্রথমটা থমকে দাঁড়াতেই হল। মনে যতই জোর করি না কেন, গাটা আপনা থেকেই তখন ছমছম করছে। এই পাহাড়ের সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে যেসব অদ্ভুত ব্যাপার আমি এক রাত্রে দেখেছি তা ভোলা সহজ নয়। সুড়ঙ্গগুলি সত্যই দুর্বোধ্য রহস্যে আমার কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঢুকতেই হল। এতক্ষণ বাইরের খোলা জায়গায় আমি টর্চ ব্যবহার করিনি বললেই হয়। সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকেই কিন্তু সেটা জ্বেলে ফেললাম। মামাবাবু যেরকম বলে দিয়েছিলেন তাতে বেশিদূর আমার যাবার দরকার নেই। সুড়ঙ্গের কয়েকটা বাঁকা পথ ঠিকমতো ঘুরেই পাথরের দেওয়ালে একটা ফাটল দেখা যাবে। সেই ফাটলের একধারে একটু চাপ দিলেই কব্জা দেওয়া দরজার মতো পাথরটা ঘুরে গিয়ে একটি সংকীর্ণ পথ বেরিয়ে পড়বে। তার ওধারেই মামাবাবুর আস্তানা।

মনের সন্ত্রস্ত অবস্থায় পথ ভুল করবার জন্যে বা মামাবাবুর নির্দেশেরত্রুটির দরুন, যে কারণেই হোক পাথরের দেওয়ালের সে ফাটল কিন্তু আধঘণ্টা ধরে খুঁজে হয়রান হয়েও আমি পেলাম না। দেরি হবার সঙ্গে অধৈর্য আমার বাড়ছিল। সুড়ঙ্গের গলির পর গলি ঘুরে তখন আমি বার হবার রাস্তাও গুলিয়ে ফেলেছি। এই পাহাড়ে আগের এক রাতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে শুধু পরিশ্রমে নয় ভয়েও শীতের রাত্রে আমার কপাল ঘেমে উঠেছে। ভয় আমার অমূলকও নয়। এ অবস্থায় কী করা উচিত ঠিক করবার জন্যে একটি দু-মুখো গলির মোড়ে দাঁড়িয়েই আমি চমকে উঠে টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। সুড়ঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমি আলো নেভাবার পরই সে পায়ের শব্দ থেমে গিয়েছিল কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হবার কিছুই নেই! মানুষ বা পশু যার পায়ের শব্দই শুনে থাকি না কেন, সে যে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে এবং পালাবার চেষ্টা যে তার নেই, এটুকু পায়ের শব্দ থামা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়।

অত্যন্ত সন্তর্পণে নিশ্বাস নিতে নিতে আমি যেদিক থেকে শব্দ এসেছিল তার উলটো দিকে নিঃশব্দে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম। উপবাসী শরীরের এই ক্লান্ত অবস্থায় কারুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে নামবার উৎসাহ যে আমার তখন ছিল না একথা লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি। পালানোই তখন আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু আমি নড়বামাত্র মনে হল অন্ধকারে আর একজনও নড়ছে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে আমার কোনো পরমবন্ধু যে এভাবে আমার পিছু নেয়নি তা বুঝতে আমার দেরি হল না। কিন্তু সে কে! দারুদের কেউ হলে সম্ভবত অন্ধকারে তার অস্তিত্ব গোপন থাকত না। অবশ্য দারুদের সবার গা থেকেই আলো বেরোয় না এবং আমার আততায়ী তেমন একজন সাদাসিধে দারুও হতে পারে। ক্ষীণকায় একজন দারুকে হয়তো এই দুর্বল শরীরে কাবু করতেও পারি। কিন্তু সে যে দারু তারই নিশ্চয়তা তো কিছু নেই। ভরসা করে এগিয়ে যাওয়া তাই উচিত মনে হল না।

ব্যাপারটা এতক্ষণে সত্যি শিকার ও শ্বাপদের পাঁয়তাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে আমি নিঃশব্দে তাকে এড়াবার চেষ্টা করছি, সেও আমাকে বাগে পাবার সুযোগ খুঁজছে।

সুড়ঙ্গের ভেতর পায়ের শব্দও ঠিকমতো সব সময়ে বোঝা যায় না। তার জন্য সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আমার হচ্ছিল। আমি তার অবস্থান যেমন ভুল করছিলাম, সেও তেমনি সঠিকভাবে আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছিল না।

কিন্তু এই সাংঘাতিক খেলা আর কতক্ষণ চালানো যায়। ক্রমশই আমি হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ একবার আলো জ্বেলে পথটা দেখে নিয়ে সোজা দৌড় দেবার চেষ্টা করব কি না ভাবছি, এমন সময়ে কে আমার গায়ের ওপর সজোরে লাফিয়ে এসে পড়ল।

অন্ধকারে তার তাগ অবশ্য ঠিক হয়নি।.তা না হলে এ কাহিনি আমায় আজ লিখতে আর হত না। প্রথমটা পড়ে গেলেও বিদ্যুৎবেগে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে আমি উঠে পড়ে টর্চটা জ্বেলে ফেল্লাম। এখন আর অন্ধকারকে ভয় করাবর কিছু নেই।

কিন্তু এ কী! যে ধারালো বড়ো ছুরিটা তখনও পাথরের ওপর পড়ে ঝকঝক করছে, তার কথাও আমি সে মুহূর্তে ভুলে গেলাম।

আমার সামনে লাওচেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে!

কিন্তু সে রাত্রে আমার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ওইখানেই শেষ হবার নয়।

লাওচেন খানিক বাদে যেন নিজেকে সামলে সবিস্ময়ে বলল, 'একী তুমি! আমি যে লি-সিন ভেবেছিলাম।'

'লি-সিন।' আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লি-সিনকে তুমি চেন নাকি?' লাওচেন একটু হেসে বলল, 'তা চিনি বই কী! তাদের দুজনের পরিচয়ের ইতিহাস জানবার জন্যে কিন্তু তখন আমার কৌতূহল নেই। বললাম, 'লি-সিনের প্রতি তোমার অনুরাগ এত বেশি আমি অবশ্য জানতাম না। কিন্তু তাকে দেখলে কোথায়?'

'এই সুড়ঙ্গের ভেতরই খানিক আগে। আমি তার পেছু পেছুই অনুসরণ করছিলাম। হঠাৎ একজায়গায় এসে সে যেন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এখানে আলো নিভতে দেখে আমি তাকে পেয়েছি ভেবে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।'

লি-সিন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে শুনেই কিন্তু আমার চিন্তার স্রোত অন্যদিকে বইতে শুরু করেছে। লি-সিনের এই অদৃশ্য হওয়ার ভেতর কত বড়ো বিপদের ইঙ্গিত আছে বুঝে উত্তেজিতভাবে বললাম, 'লি-সিন অদৃশ্য হয়ে গেছে—কী বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! আমিও তখন একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। একটা জলজ্যান্ত মানুষ একেবারে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি তার খুব বেশি পেছনে ছিলাম না। আমি যে তাকে অনুসরণ করছি সেকথা সে জানতে পেরেছিল বলেও মনে হয় না। হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই দেখি সে নেই। সেখানে একটিমাত্র পথ অনেক দূর পর্যন্ত সোজাভাবে চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি দৌড়োলেও আমি সেখানে পৌঁছোবার আগে তার পক্ষে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তবু তাকে দেখতে পেলাম না।'

'যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল, সেখানে আমায় নিয়ে যেতে পারো, এক্ষুনি?' আমার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উত্তেজনার আভাস পেয়ে বোধ হয় লাওচেন সবিস্ময়ে বলল, 'কিন্তু সেখানে এখন গিয়ে কী হবে' আমি তখনই আলো জ্বেলে খুব ভালো করে খুঁজে দেখেছি? আর এতক্ষণ সে কি সেখানে আমাদের জন্যে বসে আছে মনে করো।'

'তুমি নিয়ে যেতে পার কি না তাই বলো না?'

'তা বোধ হয় পারি, কিন্তু কেন?'

'সব কথা বলবার এখন সময় নেই। তাড়াতাড়ি চলো।'

লাওচেন কী ভেবে আর কিছু আমায় জিজ্ঞাসা করল না। আমায় পথ দেখিয়ে সামনের সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়ে চলল।

সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় আমি হলে বোধ হয় কিছুতেই পথ চিনে যেতে পারতাম না, কিন্তু লাওচেনের দেখলাম এ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কোথাও সে একবার থামল না, দ্বিধা করল না কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে। অনায়াসে গুটিদশেক মোড় ঘুরে, একজায়গায় এসে বলল, 'এইখানে।'

pathagar.net

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক জানো এইখানে? পথ ভুল হয়নি তো তোমার?'

'না পথ ভুল হবে কেন! এ দু-দিন ধরে অধিকাংশ সুড়ঙ্গই ঘুরে ঘুরে মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'তার মানে! সুড়ঙ্গের পথে ঘুরে বেড়িয়েছ কেন? আর এ পথের সন্ধান পেলেই বা কেমন করে?'

লাওচেন একটু চুপ করে থেকে হেসে বলল, 'ঘুরে বেড়িয়েছি তোমার খোঁজে। আর সন্ধান পেয়েছি তুমি সে রাত্রে নিরুদ্দেশ হবার পর পাহাড়ের ভেতর আওয়াজ শুনে।'

সত্যিই তো! লাওচেনের এ সুড়ঙ্গ পথে দেখা দেওয়া যে বিস্ময়কর তা এতক্ষণ অন্য সব ব্যাপারের উত্তেজনায় মনে হয়নি। আমার গুলির শব্দে যে পাহাড় ধসে পড়েছিল তার শব্দ লাওচেনের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছেছে শুনে অবশ্য একটু অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু সেসব কথা আলোচনার অন্য সময় ঢের পাওয়া যাবে। আমি টর্চটা পাথরের দেওয়ালের চারিধারে ঘুরিয়ে ফেলতে ফেলতে হঠাৎ আনন্দে উত্তেজনায় কেঁপে উঠলাম। বললাম, 'এইবার হয়তো তোমার ছোরা কাজ লাগতে পারে লাওচেন! প্রস্তুত থাকো!'

'ছোরা কেন আমার কাছে পিস্তল আছে, কিন্তু পাথরের দেওয়ালে ছুঁড়ব নাকি!'

পাহাড়ের সেই ফাটলের কাছে সরে গিয়ে সেটায় একটু মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, 'না, পাথরের দেওয়ালে নয়, মামাবাবুর গোপন আস্তানার সন্ধান জেনে যে সর্বনাশ করতে এসেছে, তাকে পালাতে না দেবার জন্যে।'

লাওচেনের ট্যারা চীনে চোখও এবার যেন কপালে উঠল।

'মামাবাবুর গোপন আস্তানা!'

ফাটলের ধারে জোরে চাপ দিতেই দরজার পাথরটা তখন ঘুরে গিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে পড়েছে। টর্চটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলে চুপিচুপি বললাম, 'হ্যাঁ, লি-সিন কেমন করে সন্ধান পেয়েছে জানি না, কিন্তু এর ভেতরই সে অদৃশ্য হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবার তাকে এখানে ধরতে হবেই।'

সুড়ঙ্গপথ দিয়ে এবার আগুপিছু হয়ে আমরা দুজনে এগিয়ে চললাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দু-ধারে দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে আমি সামনের পথ ঠিক করছি, লাওচেন পেছন থেকে আমার কাঁধ ছুঁয়ে চলেছে। বেশিদূর এভাবে যেতে হল না। খানিক এগিয়ে সুড়ঙ্গ পথ একটি প্রকাণ্ড বিশাল গুহার মুখে শেষ হয়েছে। সেইখানে পৌঁছেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লাওচেনের হাতে চাপ দিয়ে থামতে ইশারা করলাম। সামনের গুহাটি যেমন লম্বা চওড়া তেমনি উঁচু, সে গুহার একেবারে অপর প্রান্তে মিটমিট করে একটি আলো জ্বলছে। বিশাল গুহার অন্ধকার তাতে দূর হয়নি। কিন্তু সেই আলোই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। গুহার ভেতর আসবাবপত্র বিশেষ কিছু থাকলেও ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের দিকে পিছন ফিরে পাথরের মেঝেয় পাতা ঘাসপাতার একটি বিছানার ওপর বসে লি-সিন একান্ত মনোযোগ সহকারে একটা কিছু যে দেখছে তা আমরা কিন্তু বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলাম।

এখানে তার অনুসরণ যেকেউ করতে পারে না, এ বিষয়ে লি-সিন বোধ হয় বেশ নিশ্চিন্তই ছিল। সেই জন্যেই বোধ হয় আমরা সন্তর্পণে তার হাত তিনেক কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছু টের পায়নি। তারপর হঠাৎ আমাদের মৃদু পদশব্দেই বোধ হয় চমকে সে ফিরে তাকাল। সেই মুহূর্তে টর্চটা জ্বেলে তার মুখে ফেলে আমি বললাম, 'খবরদার নোড়ো না, তাহলেই মরবে।'

লি-সিনের তখনকার স্তম্ভিত মুখভঙ্গি দেখবার মতো। আমাকেও লাওচেনকে একসঙ্গে এভাবে দেখবার আশা সে নিশ্চয়ই করেনি। চীনাদের মুখোশের মতো মুখে কোনো ভাব ফোটে না এ কথা যে মিথ্যা সেই দিনই তা বুঝেছিলাম। কিন্তু এরকমভাবে হাতের মুঠোয় পেয়েও আর একটু হলে আমরা তাকে হারাতে বসেছিলাম। স্থাণুর মতো কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে হঠাৎ

আমাদের চমকে দিয়ে লি-সিন লাওচেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাওচেন একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এই আকস্মিক আক্রমণের জন্যে। তার পিস্তলের গুলি ছুটল—কিন্তু ছুটল উলটো দিকে। এবং লি-সিনের ধাক্কায় পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটাও ছিটকে পড়ল মেঝের উপর। সত্যি কথা বলতে কী প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলাম। লাওচেনকে চিৎ করে ফেলে আর একটু হলেই লি-সিন সুড়ঙ্গ দিয়ে বোধ হয় সরে পড়ত। ধরা পড়ল সেও নিজেরই দোষে। লাওচেনকে কাবু করে ফেলে সোজা ছুটে পালালে আমার বোধ হয় কিছু করবার ক্ষমতাই থাকত না। কিন্তু সে গুহার ভেতর থেকে ছোটো একটা নোটবইয়ের মতো খাতা তুলে নিতে গিয়েই নিজের বিপদ বাধাল। আমার বিমূঢ়তা তখন কেটে গেছে। পিস্তলটা যেখানে ঠিকরে পড়েছিল সেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমি লি-সিন দৌড় দেবার আগেই তার দিকে লক্ষ্যস্থির করে দাঁড়ালাম। বিছানা থেকে বইটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ানো আর লি-সিনের হল না। আমার দিকে চেয়ে সে স্থির হয়ে বসে পড়ল। লাওচেন ততক্ষণে সামলে উঠে বসেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে পেছন থেকে গিয়ে লি-সিনকে জাপটে ধরলে। এবারে লি-সিনের আর কোনো বেয়াড়াপনা করবার সাহস বোধ হয় ছিল না। হাত থেকে বইটা কেড়ে নেবার সময় সে শুধু আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, 'কাজটা ভালো করলেন না ; আপনাকে এর জন্যে পস্তাতে হবে।'

'তার আগে তুমি এখন পস্তাও।' বলে আমি লাওচেনকে ভালো করে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে বললাম।

লাওচেন অবশ্য শত্রুকে একেবারে শেষ করে দেবারই পক্ষপাতী। তার যেরকম জেদ দেখলাম তাতে মনে হল পিস্তলটা আমার হাতে না থাকলে সে লি-সিনের গায়ে গোটা কয়েক গুলির ফুটো করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু যত বড়ো শত্রুই হোক এরকমভাবে জানোয়ারের মতো তাকে গুলি করে মারা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিছানার একটা কম্বলকে ছুরি দিয়ে কেটে দড়ি বানিয়ে লি-সিনকে আমরা পিছমোড়া করে বেঁধে গুহার একদিকে শুইয়ে দিলাম। তর্ক বাধল তারপর কী করা যায় তাই নিয়ে। গুহার ভেতরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে লাওচেন ও আমি ওই নোটবই ও সামান্য কয়েকটা রান্নাবান্নার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। নোটবইয়ের ভিতরও একটি কাগজে সামান্য কয়েকটা দুর্বোধ অঙ্কের অক্ষর ছাড়া আর কিছু নেই। নোটবইটাতে যাই থাক সেটা যে অত্যন্ত মূল্যবান এবং লি-সিনের যে সেটা চুরি করাও সংকল্প ছিল এ বিষয়ে আমার মনে তখন কোনো সন্দেহ নেই। সে চুরি যখন নিবারণ করা গেছে তখন মামাবাবুর মংপোকে নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ওই গুহাতেই অপেক্ষা করতে চাইছিলাম। কিন্তু লাওচেন কিছুতেই রাজি হল না। তার মতে আমাদের গুহায় থাকা মানে অকারণে নিজেদের বিপন্ন করা। লি-সিন যে একাই এ গুহার সন্ধান জেনেছে তার ঠিক কী? তার দলের লোকেরা হয়তো একথা জানে এবং তার দেরি দেখে তার খোঁজেও আসতে পারে। তখন আমরা ধরা পড়বই। মামাবাবু এ নোটবইয়ের মূল্য যখন তাদের কাছে এত বেশি, তখন এটা তাদের হাত থেকে রক্ষা করাও আমাদের কতর্ব্য, এই হল তার যুক্তি।

বললাম, 'কিন্তু মামাবাবুরাও তো এসে এদের কবলে পড়তে পারেন?'

লাওচেন একটু হাসল, 'না তা পড়বে না!' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'মামাবাবুর ওপর এত অবিশ্বাস কেন! এদের হাত থেকে যিনি অমনভাবে একবার পালাতে পেরেছেন তিনি সহজে ধরা দেবার পাত্র নন। আমাদের এখান থেকে নিজেদের তাঁবুতে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না কোনো দিক দিয়ে। আমার সন্দেহ যদি অমূলক হয়, লি-সিনের দলের লোক যদি কেউ নাও আসে, তাহলেও আমি এখানে যে চিঠি রেখে যাচ্ছি তা থেকেই মামাবাবু সব কথা জানতে পারবেন। আমাদের ঠিকানাও রেখে যাচ্ছি।'

boighar.net

লাওচেনের কথাতেই শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল। নোটবইয়ের একটি পাতা ছিঁড়ে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে লিখে লাওচেন চর্বির মিটমিটে বাতিটির কাছে পাথর চাপা দিয়ে চিঠিটি রেখে দিল।

কিন্তু তবু সুড়ঙ্গের গুপ্ত দ্বার ঠেলে বেরিয়ে যাবার সময় মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল। লি-সিন আমাদের চলে আসবার সময় কোনো কথাই বলেনি। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে লাওচেন তার সে পথ বন্ধই করে দিয়েছিল, তবু তার শেষ মুহূর্তের দৃষ্টি ভোলবার নয়। তার ভেতর দুর্বোধ কী ভয়ংকর ইঙ্গিত যেন আছে। মামাবাবুর বুদ্ধিতে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, কিন্তু তিনিও এখানে অসন্দিগ্ধভাবে আসছেন। সতর্ক হবার আগেই যদি আবার তিনি এদের কবলে পড়ে যান।

লাওচেনের সঙ্গে যেতে যেতে নিজের মনের উদ্বেগ আমি বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম,'আমাদের এভাবে চলে আসা ঠিক হল না কিন্তু। মামাবাবু যদি সত্যি আবার কোনো বিপদে পড়েন।'

লাওচেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলল, 'শুনুন মি. সেন, বিপদ যদি আজ কারুর ঘনিয়ে থাকে সে মায়াবাদুড়দের সর্দারের!'

'মায়াবাদুড়দের সর্দার!'

'হ্যাঁ আজই তার দেখা পাবেন। আজ রাত্রেই তার লীলা শেষ।'

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী তুমি বলছ লাওচেন? হঠাৎ এমন সবজান্তা হলে কী করে?'

লাওচেন তেমনি গম্ভীর ভাবে বলল, 'একটা অনুরোধ করছি, মি. সেন কোনো প্রশ্ন এখন আর করবেন না। মায়াবাদুড়দের রহস্যভেদ করবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমার কথা আপনাকে আজ বিনা প্রতিবাদে শুনতে হবে।'

তখনকার মতো কোনো কথাই আর বললাম না, কিন্তু প্রশ্ন না করার প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত রাখা গেল না, যদিও সে প্রশ্নের বিষয় আলাদা।

লাওচেনের সোজা পথ জানা ছিল বলেই পাহাড়ের ভেতরকার সুড়ঙ্গগুলি ক্লান্ত অবস্থাতেও এবার তেমন দীর্ঘ বোধ হয়নি। পাহাড় থেকে বেরিয়ে লাওচেনের তাঁবুর দরজার কাছে পৌঁছে কিন্তু আমায় থমকে দাঁড়াতে হল। আমরা ঢোকবার আগে তাঁবুর ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে লাওচেনকে অভিবাদন করে চলে যাচ্ছিল! সম্ভবত তাঁবুর পাহারাতেই তাকে রাখা হয়েছিল। তাঁবুর দরজার কাপড় সরাবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরকার আলোয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তার মুখ দেখতে পেলেও তাকে চিনতে আমার দেরি হয়নি। আমার সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়বার কারণও তাই।

লাওচেন আমার হাত ধরে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আবার দাঁড়ালেন কেন? চলুন, ভেতরে।'

'যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা তার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি।'

লাওচেন হেসে বলল, 'না আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। করুন জিজ্ঞাসা, কিন্তু মায়াবাদুড় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে জানবেন আমি বোবা।'

'না মায়াবাদুড় সম্বন্ধে নয়, যে লোকটি এইমাত্র বার হয়ে গেল তার সম্বন্ধে। একে কোথায় পেলেন?'

লাওচেন আমার দিকে চেয়ে আবার হেসে বলল, 'যাক লোকটা তাহলে মিথ্যা বলেনি। আপনি তাহলে চিনতে পেরেছেন?'

'না চেনবার কী আছে, লোকটা আমাদের অশ্বতর চালকদের একজন ছিল।'

pathagar.net

'তবে ওর তো কোনো অপরাধ হয়নি ও আমার কাছে নিজেই তা বলেছে।'

একটু অধৈর্যভাবে বললাম, 'অপরাধ আছে লাওচেন। লোকটা আমাদের দল থেকে রহস্যজনকভাবে একদিন সরে পড়ে, তারপর ও এখানে উদয় হল কী করে।'

কথা কইতে কইতে আমরা এবার তাঁবুর ভেতর এসে ঢুকেছিলাম। লাওচেন একটা চেয়ারে বসে পড়তে গিয়ে, হঠাৎ চমকে আমার দিকে ফিরে বলল, 'সে কী! রোগে পড়ার দরুন আপনারা ওকে কাচিনদের এক গ্রামে রেখে আসেননি?'

আমি একটু হাসলাম মাত্র। লাওচেন যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে বলল, 'আপনাদের বিশ্বাসী লোক ভেবেই একদিনের পরিচয়ে আমি যে ওকে তাঁবুর পাহারায় পর্যন্ত রেখেছিলাম। কাল সবে ও এখানে কাজ নিয়েছে ; আমায় জানিয়েছে যে, রোগ সারবার পর ও নিজে আপনাদের খোঁজে এতদূর এসেছে।'

'আমাদের খোঁজেই এসেছে ঠিক, কিন্তু প্রভুভক্তিতে নয়। মায়াবাদুড়দের সর্দার ধরবার জোগাড় করছেন, অথচ তাদের অনুচরদের চেনেন না মি. লাওচেন।'

লাওচেন খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভেবে বলল 'আপনি বিশ্রাম করুন মি. সেন, আমি আসছি।'

বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'আপনি মিছিমিছি যাচ্ছেন, তার দেখা পাওয়ার আশা অল্প। আমাকেও সে দেখেছে।'

'তবু একবার যাওয়া দরকার।' বলে লাওচেন বেরিয়ে গেল এবং বহুক্ষণ বাদে যখন ফিরে এল তখন আমি দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করে শ্রান্ত হয়ে একটু বিছানায় গা এলিয়েছি।

আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার হল না। উদ্বিগ্নমুখে চেয়ারে বসে পড়ে লাওচেন বলল, 'আপনার কথাই ঠিক। তার কোনো পাত্তাই নেই।'

একটু বিদ্রূপের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ময়াবাদুড়দের সর্দারের দেখা কি তবুও আজ পাওয়া যাবে মনে হয়!'

লাওচেন এবারে অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, 'সে বিষয়ে আরও নিঃসংশয় হলাম।'

তার গলার স্বরে আমার ব্যঙ্গ করবার প্রবৃত্তি কিন্তু কেমন করে উড়ে গেল। সে স্বর শুধু দৃঢ় নয় কেমন যেন হিংস্র।

বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমায় কী করতে হবে?'

লাওচেন একটু হেসে বলল, 'বিশেষ কিছু নয়, এই ঘরে প্রথম যে প্রবেশ করবে তাকে গুলি করতে হবে।'

লাওচেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আলো নিভে গেল। লাওচেনের পদশব্দও পেলাম। তাঁবুর দরজা সরিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু বলবার আগেই বাইরে থেকে তার গলা শুনতে পেলাম।

'আমি বাইরে আছি। ঘর থেকে নড়বেন না।'

লাওচেন তো বেশ অনায়াসে বলে গেল, 'ঘর থেকে নড়বেন না', কিন্তু সেই অন্ধকার ঘরে প্রতি মুহূর্তে কান খাড়া করে পরম শত্রুর পায়ের শব্দের জন্যে অপেক্ষা করা যে কী ভয়ানক ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। লাওচেনের অনুমান সত্য হলে মায়াবাদুড়দের সর্দার যেকোনো মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ মানুষ তো সে নয়। অসীম তার ধূর্ততা, অদ্ভুত, এবং এক হিসাবে অলৌকিক তার ক্ষমতা। চোখ-কান বুজে ভালো মানুষটির মতো সোজাসোজি ঘরে ঢুকে আমার গুলিটি বুক পেতে সে নিশ্চয়ই নেবে না। কী ভয়ানক অভিসন্ধি নিয়ে, কীরকম অপ্রত্যাশিতভাবে সে এসে উপস্থিত হবে কে জানে। পিস্তলের গুলি যদি ছোটে—তাহলেও কার যে আগে ছুটবে, তা বলা কঠিন। লাওচেন বাইরে লুকিয়ে

pathagar.net

পাহারায় আছে জেনেও, কোনো সাহস, সত্যি কথা বলতে গেলে পেলাম না। মায়াবাদুড়দের হাতে লাওচেন তো কম নাকাল এ পর্যন্ত হয়নি, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে বাঁচাতে পারলে তো আমায় সাহায্য করবে! গাঢ় অন্ধকারে পিস্তলটা সজোরে মুঠোতে চেপে তাঁবুর দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকতে থাকতে টের পাচ্ছিলাম আমি বেশ ঘেমে উঠেছি। এরকমভাবে ঘরের ভেতর অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় থাকার দরুনই বোধ হয় অস্বস্তি ও যন্ত্রণা এত বেশি হচ্ছিল। তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায় শত্রুর সম্মুখীন হতে হলে আমার মনের জোর এতটা বোধ হয় কমে যেত না।

লাওচেন ঘরে কেউ ঢোকবামাত্র গুলি করতে বলেছে। তার একথা থেকে এটুকু বোঝা কঠিন নয় যে, গুলি করার তৎপরতার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে,—আমার জীবন পর্যন্ত। এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে বা লক্ষ্য ঠিক না হলে আপশোস করবার জন্যও বোধ হয় আর বেঁচে থাকতে হবে না। জন্তুজানোয়ার ছাড়া মানুষের ওপর কখনো পিস্তল ব্যবহার এর আগে করিনি। কিন্তু এখন সে বিষয়ে কী উচিত-অনুচিত তা ভাবছিলাম না। শুধু ভয় হচ্ছিল ঠিক সময়ে হাত ও মনের জোর বুঝি থাকবে না। যেরকম উত্তেজনার মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত কাটছিল, তাতে খানিকক্ষণ বাদে মনের অবসাদ আসা খুব স্বাভাবিক। সামান্য একটু শব্দতেই থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম, তাঁবুর ভেতরকার অন্ধকারে চোখের ওপর যেন অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি ভেসে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, কোনটা মনের ভুল আর কোনটা সত্য, তাই ঠিক করতে পারব না।

সময় এমনি করে বড়ো কম কেটে গেল না। এক-একবার মনে হচ্ছিল লাওচেনের কথায় অতখানি বিশ্বাস করবার হয়তো কোনো হেতু নেই। তার ধারণা হয়তো সম্পূর্ণ ভুল। মিছিমিছিই এমনিভাবে অপেক্ষা করায় যন্ত্রণা ভোগ করছি। কিন্তু সেকথা ভেবেও নিশ্চিন্ত হয়ে একাগ্র পাহারা শিথিল করতে পারলাম কই!

একবার মনে হল লাওচেনের কথা অমান্য করে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! বিছানা থেকে উঠে পরদার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিধার নিস্তব্ধ, বাইরে শীতের যে কনকনে হাওয়া এখানে রোজ রাত্রে সজোরে বয় তাও শান্ত হয়ে এসেছে। পরদা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরে তাকালাম, কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে কী আর দেখতে পাব! বাইরে কান পেতে কোনো শব্দ শোনা যায় কি না বোঝবার বৃথাই চেষ্টা করলাম। সমস্ত পাহাড় অরণ্যও যেন নিশ্বাস রোধ করে কী একটা ভয়ংকর ঘটনার প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু আওয়াজ কোথাও নেই।

লাওচেনের কথা ঠেলে তাঁবু থেকে বেরোতে শেষ পর্যন্ত পারলাম না। যাই ঘটুক না কেন, আমায় আজ তাঁবুর ভেতর থেকে পাহারা দিতেই হবে। মনকে সেই জন্যেই প্রস্তুত করা দরকার! যা হবার তা যেন তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই এখন অবশ্য ভালো হয় মনে হচ্ছিল, অধীরভাবে এই অপেক্ষা করে থাকার উদ্বেগ ও উত্তেজনা আর সহ্য করা যাচ্ছে না!

আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যেই যেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁবুর পেছন দিকে অকস্মাৎ অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা গেল। ধারালো ছুরিতে তাঁবুর কাপড় অনেকখানি একটানে কে যেন কেটে ফেলেছে। গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর অতর্কিতে এই শব্দ শুনে সমস্ত গায়ে আপনা থেকেই যে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল একথা অস্বীকার করব না, কিন্তু হতবুদ্ধি সত্যিই হয়ে পড়িনি। মামাবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় যেদিন সরিয়ে নিয়ে যায়, সেদিনও তাঁবুর কাপড় এইরকমভাবে যে কাটা ছিল তা তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হয়েছে. শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে ফিরে আওয়াজ ধরেই লক্ষ্য ঠিক করে গুলি ছুঁড়লাম একটি—দুটি।

কোনো প্রত্যুত্তর, কোনো সাড়াশব্দ তারপর আর নেই। টর্চটা বিছানার ওপরই কী ছিল! সেটা খুঁজে নিয়ে জ্বালতে যাচ্ছি, হঠাৎ পিঠের ওপর একটা শক্ত জিনিসের খোঁচা অনুভব করলাম! খোঁচাটা যে কীসের তা বুঝতে বিলম্ব হবার কথা নয়। মেরুদণ্ডের ঠিক বাঁ দিকে

pathagar.net

পিস্তলের নল যে ঠেলে ধরেছে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করারও তার নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য নেই। তাঁবুর পিছনের দিকে যখন আমি কাপড় চেরার শব্দ লক্ষ করে গুলি করছি তখনই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে শত্রু কিভাবে আমায় বোকা বানিয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো তখন বৃথা, তার সময়ও ছিল না।

পিঠে পিস্তলের খোঁচা যে দিয়েছিল এবারে তার কথা শোনা গেল।

কিন্তু সে কথা আমার কাছে অর্থহীন। সেটা যে চীনা ভাষা তা বুঝলেও, তার ভেতর এক, 'লাওচেন' এই সম্বোধন ছাড়া আর কিছুই আমার বোধগম্য নয়। কথা না বুঝলেও, লাওচেনের প্রতি বিশেষ প্রীতি যে মায়াবাদুড়দের সর্দারের নেই তা তার বলার ধরণ থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। আমি যে লাওচেন নই, একথা জানতে পারলেও হয়তো তার আক্রোশ দূর হবে না, তবু আমার মতো সেও একটু ঠকেছে তা জানাবার লোভ ত্যাগ করতে পারলুম না। তার কথা শেষ হবামাত্র বললাম, 'তোমার পিস্তলের নল বসাতে একটু ভুল হয়েছে ; এটা লাওচেনের পিঠ নয়।'

ইংরেজিতে কথাগুলো বলার দরুণ, সন্দেহ ছিল, সে তা বুঝবে কি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার বক্তব্য শেষ না হতেই হঠাৎ আমার পিঠ থেকে পিস্তলের নল সরে গেল। কিন্তু নল সরে যাবার দরুন নয়, সেই মুহূর্তে রহস্যময় মায়াবাদুড়দের সর্দারের মুখ থেকে অতর্কিতে যে বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল তাতেই চমকে পেছনে ফিরে টর্চটা জ্বেলে ফেললাম।

একী মামাবাবু!

মামাবাবু মুখের ওপরকার পরদাটা সরিয়ে ফেলে গম্ভীরভাবে বললেন, 'হুঁ, আমি এরকমটা আশা করিনি। লাওচেন কোথায় গেল?'

'লাওচেন আপনার পেছনেই আছে মি. রায়। আপনার পিস্তলটা শুধু দয়া করে টেবিলের ওপর রাখুন।'

ঘরের আলোটা ইতিমধ্যে জ্বেলে দিয়ে লাওচেন মামাবাবুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত অর্থহীন ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো। বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি তখন সত্যই হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। প্রথমে মায়াবাদুড়দের সর্দারের জায়গায় মামাবাবু, তারপর মামাবাবুর বিরুদ্ধে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে লাওচেন, যেকোনো সুস্থ মাথাকে ঘুলিয়ে দেবার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু তখনও অনেককিছু দেখতে আমার বাকি আছে।

মামাবাবু আমারই মতো ঘটনার এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত বোধ হয় ছিলেন না, কিন্তু মুখে তাঁর কোনোরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। পিস্তলটা লাওচেনের কথা মতো টেবিলের ওপর রেখে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'তুমি আজ তাহলে জিতেছ মনে হচ্ছে, লাওচেন?'

লাওচেন এগিয়ে এসে আমার শিথিল হাত থেকেও পিস্তলটা টেনে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'আপনার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ মি. রায়, আমার কাজ যে অনেক সহজ করে দিয়েছেন তার জন্যেও বোধ হয় কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। আপনার নোটবুকটি পেয়ে আমার অনেক পরিশ্রম, অনেক হাঙ্গামা বেঁচেছে।'

লাওচেনের স্বরের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গতেও মামাবাবুকে কিন্তু বিচলিত হতে দেখলাম না। হেসে বললেন, 'হ্যাঁ নোটবুকটা খুব দামি আমার কাছে।'

'দামি বলেই তো আপনাকে এর জন্যে ফাঁদে ফেলতে পারব জানতাম।' বলে লাওচেন হেসে উঠল। আসল রহস্য না বুঝলেও লাওচেনের স্বরূপ এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল টুঁটি চেপে ধরে তার ওই কুৎসিত হাসি বন্ধ করে দিই। কিন্তু আমরা নিরুপায়। লাওচেনের পিস্তল আমাদের দিকে হিংস্রভাবে মুখ উঁচিয়ে আছে।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন তাহলে তুমি কী করতে চাও?'

pathagar.net

'বিশেষ কিছু না। নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে এবার শুধু বিদায় নিতে হবে। ইউনানে আমার জন্যে সত্যিই অনেকে অপেক্ষা করে আছে।'

'তারা বৃথাই অপেক্ষা করে আছে লাওচেন। নোটবুক নিয়ে সেখানে তুমি পৌঁছোতে পারবে না।' মামাবাবুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর যে-কারণে হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে তখন বজ্রগম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা টের পেয়ে কোনোমতে আমি তখন উত্তেজনা দমন করে আছি।

লাওচেনও সে স্বরে চমকে উঠেছিল, কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে সে হেসে বলল, 'এখনও রসিকতা করবার মতো মনের অবস্থা আপনার আছে দেখে খুশি হচ্ছি মি. রায়।'

'মাথার কাছে পিস্তলের নল আমি ঠিক রসিকতা বলে মনে করি না লাওচেন। লি-সিন, নলটা না হয় মাথায় ঠেকিয়েই দাও।'

আমাকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে সত্যিই লি-সিন খানিক আগে তাঁবুর কাটা পরদা দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে একটু এগিয়ে এল।

লাওচেনের মুখ তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। মামাবাবু তাকে বললেন, 'তুমি গুলি করে বড়োজোর একজনকে জখম করতে পার, কিন্তু তাহলেও এ নোটবুক ইউনানে পৌঁছোবে না তুমি জান।'

নিঃশব্দে খানিক বসে থেকে লাওচেন নিজের পিস্তলটা এবার ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর অদ্ভুতভাবে একটু হেসে বলল, 'এইটুকু আমার ভুল হয়েছিল বুঝতে। আমি দুই শত্রুকে আলাদা আলাদা করে দেখেছিলাম।'

'হ্যাঁ, মায়াবাদুড়দের সঙ্গে নিরীহ কীটতত্ত্ববিদের সংযোগ হতে পারে তা তুমি ভাবতে পারনি, কিন্তু ওই সামান্য ভুলের জন্যেই সর্বনাশ হয়। নোটবইটা এবার তাহলে দিতে পারো।'

লাওচেন অমন সুবোধ বালকের মতো সেটা যে বার করে মামাবাবুর হাতে তুলে দেবে তা ভাবিনি। তার মুখের ভাব দেখেও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম।

মামাবাবু নোটবুকটা খুলে ভালো করে দেখে শুনে সন্তুষ্ট চিত্তেই পকেটে রাখতে যাচ্ছেন, এমন সময় লাওচেন আর একবার হেসে উঠে বলল, 'শেষ পর্যন্ত আমারই কিন্তু জিত হল মি. রায়!'

এবার মামাবাবুই বিদ্রূপ করে বললেন, 'আমার বুদ্ধিটা খুব সূক্ষ্ম নয়, একটু বুঝিয়েই বলো।'

'বোঝবার বিশেষ কিছু নেই, ও নোটবই বৃথাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন!'

'তার মানে?'

'মানে—এ বই আমার হাত থেকে খোয়া যাবার অপেক্ষায় আমি চুপ করে বসেছিলাম না। ঘণ্টা তিনেক আগে আমার লোক এ বইয়ের আসল তথ্যটুকু নিয়ে ইউনান রওনা হয়ে গেছে। আপনার ভাগনে মি. সেন তাকে চেনেন। আপনি মিচিনা পৌঁছোবার আগেই ইউনান সরকারের কাছে আপনার দেওয়া ল্যাটিচিউড্ লঙ্গিচিউডের হিসাব পৌঁছে যাবে। ইউনানের সীমান্ত নির্দেশ এখনই চলেছে। সামান্য একটু সীমান্তরেখার অদলবদল করার ব্যবস্থাও অনায়াসে হয়ে যাবে ততদিনে...'

মামাবাবুর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে একটু থেমে নিষ্ঠুরভাবে হেসে লাওচেন তার কথা শেষ করল, 'কে জানবে বলুন সেই সামান্য অদলবদলের ফলে একটা গোটা রেডিয়ামের খনি বর্মার হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

লাওচেনের কুৎসিত হাসি থেমে যাবার পর সমস্ত তাঁবু খানিকক্ষণের জন্যে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মামাবাবু ও লি-সিনের মুখ অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার কাছে সমস্তই একেবারে দুর্বোধ। এইমাত্র যেসব ঘটনা চোখের ওপর দ্রুত ঘটে গেল, যে সমস্ত অদ্ভুত খবর শুনলাম সেগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধই আমি নির্ণয় করতে পারিনি। নোটবুক

pathagar.net

নিয়ে কাড়াকাড়ি, ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড, ইউনানের সীমান্ত, শেষ পর্যন্ত রেডিয়াম—এসব যেন লাওচেনের অসম্বন্ধ প্রলাপ, আমাদের অভিযানের সঙ্গে এই সমস্ত অবান্তর কথার কী সম্পর্ক আমি কিছুতেই ভালো করে গুছিয়ে বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

শুধু মামাবাবুর গম্ভীর মুখের কঠিন রেখাগুলি দেখে মনে হচ্ছিল এর ভেতর সত্যকার গভীর রহস্য সম্ভবত আছে।

লাওচেন আবার একটু হেসে বলল, 'এখন মনে হচ্ছে নাকি যে সত্যিসত্যি কীটতত্ত্বের সন্ধানে বেরোলেই ভালো করতেন? তবে কিছু কাজ হত।'

মামাবাবু গম্ভীর মুখেই বললেন, 'তুমি ভুল করছ লাওচেন, আমরা সত্যি পোকার সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম। সে সন্ধান অন্য পথে গেছে শুধু তোমারই জন্যে।'

'আমার জন্যে?'

মামাবাবু একটু হাসলেন, 'আমাদের কম্পাস, জরিপের যন্ত্রপাতি এমন অদ্ভুতভাবে চুরি না গেলে আমার চোখ খুলে যেত না। তুমি নির্বিঘ্নে তোমার কার্য সিদ্ধি করতে পারতে। আমরা কোনো কিছু না জেনে পোকামাকড় নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।'

লাওচেন বিদ্রূপের স্বরেই বলল, 'তাই নাকি! আলেয়া-দারুদের দেশ খোঁজবার কোনো উদ্দেশ্য আপনার ছিল না বোধ হয়?'

'বিশ্বাস তুমি না করতে পার কিন্তু কম্পাস প্রভৃতি চুরি যাবার পরও আমি আলেয়া-দারুদের কথা জানতাম না।'

লাওচেন হাসল, 'যাক শেষ পর্যন্ত জেনে আমাদের উপকারই করেছেন। আপনার যন্ত্রপাতি চুরি যেই করুক, এখন মনে হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। ভাগ্যিস আপনার কাছে বাড়তি সরঞ্জাম ছিল, নইলে ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড এত সহজে পাওয়া যেত না।'

'আবার একটু ভুল করলে লাওচেন, বাড়তি যন্ত্রপাতি আমার ছিল না।'

'তার মানে!' লাওচেন সন্দিগ্ধভাবে মামাবাবুর দিকে তাকাল।

মামাবাবু হেসে বললেন, 'না, তোমার সে সন্দেহের কারণ নেই। তোমায় মিথ্যে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছি না। বাড়তি যন্ত্রপাতি আমার দরকারই হয়নি।'

'তাহলে?'

'আমার যন্ত্র, সূর্য আর তারা আর এই জিনিসটি'—মামাবাবু পকেট থেকে 'ক্রোনোমিটার' ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে আবার বললেন, 'ক্ষমতা ও বুদ্ধি থাকলে এই দিয়েই কাজ চলে যায় জানলে অত হ্যাঙ্গাম তুমি বোধ হয় করতে না।'

লাওচেন খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'তাই দেখছি। যাই হোক হ্যাঙ্গাম যে শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে, আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে সেজন্য ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদটা আর একটু পরে দিও লাওচেন। এখনও কিছুই বলা যায় না। মিচিনা দূর হতে পারে কিন্তু হার্টজ কেল্লা ততটা বোধ হয় নয়। সেখানে সম্প্রতি একটা সামরিক বেতার ঘাঁটিও তৈরি হয়েছে বলে শুনেছি। আমরা আজই রওনা হচ্ছি, এই মুহূর্তে।'

লাওচেন হেসে উঠল,'এই মুহূর্তে রওনা হয়ে দিনরাত সমানে পা চালিয়েও সাতদিনের আগে হার্টজ কেল্লাতে পৌঁছোতে পারবেন না। এখান থেকে ইউনানের রাজধানী 'ইউনান'-এর পথ মাত্র তিন দিনের। আমার দূতকে সাহায্য করবার জন্যে পথে লোকজনও আগে থাকতে মজুত আছে।'

'তবু একেবারে চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত কি? তা ছাড়া তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিতে তো হবে!'

'আমাকে! কেন?'

'তোমার পায়ের মাপ সাধারণের চেয়ে একটু বড়ো বলে।'

আমি বিমূঢ়ভাবে মামাবাবুর দিকে তাকালাম। এ আবার কীরকম রসিকতা। লাওচেনের পা যে একটু বড়ো মাপের তা আমরা সবাই অবশ্য আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেকথা এখানে কী সূত্রে আসে।

লাওচেন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'আপনার কথারই প্রতিধ্বনি করে বলছি, আমার বুদ্ধিটা অত সূক্ষ্ম নয়, একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'বলবার দরকার নেই, চাক্ষুষই দেখাচ্ছি।' বলে মামাবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাঁবুর যে ধারে লাওচেনের বিছানা ছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে লাওচেনের বড়ো চামড়ার ব্যাগটা খুলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই লাওচেন চিৎকার করে উঠল, ব্যাগে হাত দেবেন না মি. রায়!'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'আমার অনধিকার-চর্চা মার্জনা কোরো। তোমরা সাজ সরঞ্জাম সম্বন্ধে আমার অনেকদিনের কৌতূহল আজ একটু মেটাব।...এই যে পেয়েছি বোধ হয়।'

মামাবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই তাঁবুর মধ্যে অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটে গেল। মামাবাবু কী করছেন জানবার আগ্রহে আমি ও লি-সিন একটু বুঝি অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। সেই সুযোগেই হঠাৎ এক লাফ দিয়ে টেবিলের ওপরকার বাতিটা হাত দিয়ে উলটে ফেলে লাওচেন ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও লি-সিন দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তার পিছু নিয়েছিল। আমরা টেবিলের তলা থেকে বাতিটা জ্বালবার আগেই বাইরে দুবার পিস্তলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম।

বাতি জ্বালা হবার পর আমিও বেরোতে যাচ্ছিলাম। মামাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'দরকার নেই। লি-সিন একাই যথেষ্ট, তা ছাড়া বাইরে মংপো আছে।'

'কিন্তু এরকম হঠাৎ পালাবার কারণ কী?'

মামাবাবু কাগজের মোড়া খুলে অদ্ভুত আকারের জুতোর মতো দুটি জিনিস টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'হঠাৎ মোটেই নয়। পালাবার কারণ যথেষ্ট আছে। তার মধ্যে একটি এই।'

অদ্ভুত জুতো দুটো হাতে তুলে নিয়ে আমারও আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। সাধারণ জুতো সে নয়। তার তলা ঠিক বাঘের থাবার মতো তৈরি। মাটির ওপর চাপ দিলে ঠিক বাঘের পায়ের দাগই পড়ে।

মামাবাবু বললেন, 'এই জুতোই তার বিরুদ্ধে খুনের প্রধান প্রমাণ। এই জুতো পায়ে দিয়েই আমাদের তাঁবুতে হানা দিয়েছে, পথের মাঝে আমাদের অনুচরকে খুন করেছে। লাওচেনের পায়ের মাপ অসাধারণ না হলে এ জুতো পেয়েও, তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করতে আমাদের বেগ পেতে হত।'

কিন্তু এ প্রমাণ আমাদের প্রয়োগ করবার সুবিধা বুঝি আর হল না। খানিক বাদে লি-সিন ও মংপো দুজনেই হতাশভাবে ফিরে এসে জানাল অন্ধকারে লাওচেন তাদের এড়িয়ে পাহাড়ের সেই সুড়ঙ্গ পথেই ঢুকে পড়েছে। সেখানকার গোলকধাঁধায় তার সন্ধান তারা পায়নি। মংপো ও লি-সিন দুজনেই দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু লাওচেন তাতে আহত হয়েছে বলে মনে হয় না।

তাঁবুর সমস্ত লোকজন নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে আর একবার সন্ধান করা হয়তো চলত, কিন্তু তাতেও ফল পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। লি-সিনের এ প্রস্তাবের তাই প্রতিবাদ করে আমি বললাম, 'আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হার্টজ কেল্লায় যাওয়াই বেশি জরুরি নয় কি!'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'তা সত্যি লি-সিন। মায়াবাদুড়দের চোখ সব দেখতে পায়, তার ডানা কোনো বাধা মানে না। দুবার ফসকালেও তিনবারের বার প্রতিশোধ নেবার সময় পরেও হবে। কিন্তু ইউনানের সীমান্তের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি কিনারা না করলে আর সুযোগ মিলবে না। আমাদের এখুনি রওনা হতে হবে।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,'দুবার ফসকাবার মানেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মায়াবাদুড় কার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়!'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'কার ওপর আবার! তাদের বিশ্বাসঘাতক ভূতপূর্ব সর্দার লাওচেনের ওপর।'

'তাহলে সেই ভয়ংকর রাত্রে আমাদের শাসিয়ে চিঠি দেবার মানে কী! আপনাকেও জখম করে ধরে নিয়ে যাবার কী উদ্দেশ্য!

মামাবাবু আবার হেসে উঠলেন, 'সে রাত্রে মায়াবাদুড় আমাদের শাসিয়ে চিঠি দেয়নি, শাসিয়েছিল লাওচেনকে।'

'লাওচেনকে! আপনি কী করে জানলেন?'

মামাবাবুর চোখে কৌতুকের দৃষ্টি দেখেই আমার মনে পড়ে গেল, খানিক আগে তাঁর মুখে বিশুদ্ধ চীনে ভাষা আমি শুনেছি।

আমার বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে মামাবাবু বললেন, 'চীনেভাষা যে আমি জানি তা তখন ইচ্ছে করেই প্রকাশ করিনি, লাওচেন কী বলে দেখবার জন্যে! সে নিজের সুবিধামতো সে চিঠির ভুল ব্যাখ্যা আমাদের শুনিয়েছিল। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই সে সেদিন আমাদের তাঁবুতে রাত কাটিয়েছে, আমাদের পাহারা দেবার জন্যে নয়।'

'কিন্তু আপনাকে জখম করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া!'

'আমায় জখম লাওচেনই করে তার পিস্তলের বাঁট মাথায় মেরে। যে গুলির শব্দ তুমি শুনেছিলে, তাও লাওচেনের পিস্তলের। আমি সাবধান হবার আগেই আমার পেছনে আত্মরক্ষা করে সে প্রথম লি-সিনকে গুলি করে। লাওচেনের তাঁবুতে আগুন ধরার পরও তাকে বেরোতে না দেখে লি-সিন সন্দিগ্ধ হয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে আসছিল। লাওচেনের হঠাৎ আক্রমণের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আমি সামনে পড়াতেই লি-সিন আর কিছু করতে পারেনি। নিজে সাংঘাতিক আহত হয়ে সে ফিরে যায়। আমি কিছু করবার আগেই লাওচেন আমাকেও আঘাত করে।'

'কিন্তু লি-সিনের রক্তের দাগ খানিক দূর গিয়েই অমন আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে গেল কী করে! আপনাকে ও মংপোকেই বা অমন উধাও করে কে নিয়ে গেল?'

'ব্যস্ত হোয়ো না, এক এক করে বলছি, লি-সিনের রক্তের দাগ মাঝ-রাস্তায় মিলিয়ে যাওয়ার রহস্য, জলের মতো সোজা। সেটা বুঝলে আমার অন্তর্ধানও অনায়াসে বুঝতে পারতে। লি-সিন খানিকদূর গিয়ে আবার তাঁবুর দিকে নিজের পথে ফিরে আসে বলেই তার রক্তের দাগ আর দেখা যায়নি। তোমরা যখন রক্তের দাগের সন্ধানে বাইরে বেরিয়েছ তখন সে তাঁবুর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁবুর পরদা চিরে ফেলেছে। প্রচুর রক্তপাত হয়ে তার অবস্থা তখন বেশ খারাপ।'

আমি নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলাম এবার।

মামাবাবু আবার বললেন, 'আমায় ধরে নিয়ে যাওয়ার রহস্য? আমায় কেউ ধরে নিয়ে যায়নি। তোমরা যখন বাইরে বেরোচ্ছ তখনই আমার জ্ঞান হয়েছে। আমার চোট তেমন গুরুতর ছিল না। আমি আর মংপোই আহত লি-সিনকে নিয়ে পালিয়ে গেছিলাম। শুধু লি-সিনকে বাঁচাবার জন্যে নয়, বাইরে থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুবিধা হবে বলে। তোমায় একটু বিপদের মধ্যে ফেলে গেছিলাম বটে, কিন্তু আমি জানতাম লাওচেন তোমায় সন্দেহ করে না, আসল কাজ হাসিল হবার আগে পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

'কিন্তু আসল কাজটা কী!'

'আলেয়া-দারুদের দেশ আবিষ্কার!'

'আলেয়া-দারুরা অদ্ভুত জাত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আবিষ্কার করবার গৌরব এত বড়ো যে তার জন্যে এত কাণ্ড এত ষড়যন্ত্র এত খুনোখুনি পর্যন্ত দরকার হল?'

মামাবাবু খানিক চুপ করে আমার দিকে কৌতুক ভরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস যে তাদের দেশে আশ্চর্যরকম প্রচুর, আলেয়া-দাবুরা তারই জীবন্ত প্রমাণ!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে মামাবাবুর কাছে ওর বেশি আর কিছু জানতে পারিনি। হার্টজ কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্যেই তখন আমাদের ব্যস্ত হতে হয়েছে। আমাদের অনুচরেরা সকলেই বিশ্বাসী। লাওচেনের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ ছিল না। লাওচেনের নিজের লোক যে কজন ছিল তারা আগেই সরে পড়েছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে আমাদের কোনো হ্যাঙ্গামা হয়নি।

লাওচেন একটা কথা ঠিকই বলেছিল। হার্টজ কেল্লা দিনরাত হাঁটলেও সাত দিনের আগে পৌঁছোনো অসম্ভব। জঙ্গলের পাহাড়ের পথে দিনরাত্র হাঁটা সম্ভব নয় ; আমরা যাও বা তাড়াতাড়ি করছিলাম, মামাবাবুর কুড়েমিতে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এত পরিশ্রম করার ক্ষমতা, এত উৎসাহ যাঁর মধ্যে দেখেছি তিনি যেন আরেক লোক হয়ে গেছেন। এরই মধ্যে মনে হচ্ছে যেন মিচিনার বাড়িতে দুপুরের দিবানিদ্রাটির জন্যে তাঁর প্রাণ আইঢাই করছে। আমাদের কাজ যে কত জরুরি তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। আমরা বেশি তাড়া দিলে হেসে বলেন, 'বর্মার সীমান্তের জন্যে তো আর প্রাণটা দিতে পারি নারে বাপু! তাড়াতাড়ি তো যথাসাধ্য করছি।'

এরপর আর কথা চলে না। সাত দিনের জায়গায় দশ দিনে আমরা হার্টজ্ কেল্লায় গিয়ে পৌঁছোলাম। পথের মধ্য মামাবাবুর কাছে আমাদের অভিযানের সমস্ত রহস্য অবশ্য আমি পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছিলাম। গোড়া থেকে মায়াবাদুড়রা আমাদের শত্রু, এই ভুল করাতেই যে সমস্ত ব্যাপার দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মায়াবাদুড়রা ইউনানের একটি গুপ্ত দল। ইউননে নানা জাতি আছে, তাদের মধ্যে মুসু শান ও লোলো জাতই প্রধান। এই মুসুরা ইউনানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এককালে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। তারপর তাদের কর্তৃত্ব লোপ পায়। মুসুদের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার জন্যে মায়াবাদুড় দলের সৃষ্টি হয়েছিল অনেক বৎসর আগে। কিন্তু এই দলের নেতা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপক্ষের কাছে দলের লোকেদের ধরিয়ে দেয়। মায়াবাদুড়দের অধিকাংশকেই তার ফলে প্রাণ দিতে হয়। যারা তখন পালিয়ে বেঁচেছিল তারা এখনও প্রতিহিংসার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। লি-সিন সেই পলাতক মায়াবাদুড়দেরই একজন। লাওচেন তাদের বিশ্বাসঘাতক সর্দার। লাওচেন একটা কোনো গোপন অভিযানে যাবার জন্যে বর্মায় এসেছে সন্ধান পেয়েই লি-সিন তাকে অনুসরণ করে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করে। সেই সময়েই মামাবাবুও তাকে সঙ্গে যাবার জন্যে ডাকেন। মামাবাবুর কাছে সে অনেক উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞ, সে ডাক সে উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু লাওচেন কীরকম ভয়ংকর চরিত্রের লোক, তার গোপন অভিযানের বাধা যাকে মনে হবে লাওচেন কীরকম পৈশাচিকভাবে তার সর্বনাশ করতে পারে, একথা জেনে লি-সিনই মায়াবাদুড়ের চিহ্ন অঙ্কিত চিঠি দিয়ে মামাবাবুকে তাঁর অভিযান বন্ধ করতে বা এক বৎসর পিছিয়ে দিতে বলে। মামাবাবু সে বারণ না শোনাতে বাধ্য হয়ে সে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। যে মায়াবাদুড়ের উল্কি লি-সিনের হাতে দেখে আমি তার বিরুদ্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম, মামাবাবু সেটা দেখেই তখন বুঝেছিলেন, আমাদের শত্রু মায়াবাদুড় নয়, ভয়ংকর অপর কোনো পক্ষ। কম্পাস প্রভৃতি চুরি যাওয়াতে তাঁর প্রথম সন্দেহ হয় মূল্যবান কোনো দেশ আবিষ্কারই তাদের উদ্দেশ্য। আমরা খোঁজ পেলেও তার অবস্থান যাতে নির্ণয় করতে না পারি সেই চেষ্টাই তারা প্রথম করেছে। কিন্তু কোথায় সে দেশ, কী তার মূল্য, প্রথমে কিছুই তিনি বুঝতে পারেননি। লাওচেনের দলের লোক আমাদের ভেতরও আছে জেনে

তিনি গোপনে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। আমাদের যে অনুচরটি নিহত হয় তার কাছাকাছি যে দুজন অশ্বতর-চালক ছিল, তাদের ওপর তিনি ও লি-সিন দুজনেই নজর রাখেন। ঘটনার সময়ে তারা সাহায্য করতে না আসাতেই তাঁর সন্দেহ হয়। যখন আমি লি-সিনকে বনের পথে অনুসরণ করি, লি-সিন ও মামাবাবু দুজনেই সে রাত্রে সন্দিগ্ধভাবে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে সেই অনুচরেদের একজনের পেছু নেন। লাওচেন তখনই নিজের দলকে অন্যত্র যেতে আদেশ দিয়ে গভীর দুরভিসন্ধি নিয়ে আমাদের সঙ্গে ভিড়বার সংকল্প করেছে। লাওচেনের সেই দলের সন্ধান পেয়েই লি-সিন তাদের কাছাকাছি থেকে তাদের গন্তব্যস্থান ও উদ্দেশ্য জানবার চেষ্টা করে। সেই জন্যেই সে আমাদের তাঁবুতে প্রথমত ফেরেনি। লাওচেন আমাদের তাঁবুতে এসে আশ্রয় নেবার পর তার পক্ষে ফিরে না আসাই সুবিধার হয়। লি-সিনকে একবার দেখতে পেলেই ধূর্ত লাওচেন সাবধান হয়ে যেত, তা ছাড়া তার সঙ্গে যে আমাদের যোগ আছে একথা লাওচেনকে লি-সিন জানাতে চায়নি। লাওচেন সুড়ঙ্গপথে লি-সিনের দেখা পাবার পরও সেকথা অনুমান করতে পারেনি। মামাবাবুর লাওচেনকে নিজের দলে নেওয়ার ভেতর গভীর উদ্দেশ্য ছিল। চোরের উপর তিনি বাটপাড়ি করতে চেয়েছিলেন। লাওচেন আমাদের দলে ভিড়েছিল আমাদের উদ্দেশ্য জানবার জন্য এবং দরকার হলে সহজে পথের কাঁটা নির্মূল করে দেবার জন্যে। মামাবাবু তাকে স্থান দিয়েছিলেন তার অভিযানের আসল রহস্য গোপনে জেনে নেবার জন্যে। লাওচেন আলাদা তাঁবুতে থাকলেও মামাবাবু মংপোর সাহায্যে তার কাগজপত্র উলটে জেনেছিলেন, আলেয়া-দারু বলে এক অদ্ভুত জাতের দেশ আবিষ্কার করাই তার উদ্দেশ্য। প্রথমে ব্যাপারটা তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। তারপর আলেয়া-দারুদের হাড়ের ভেতর দিয়ে রাত্রে আশ্চর্য আলো বেরোয় জানতে পেরে সমস্ত রহস্য তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই মুহূর্ত থেকেই লাওচেনের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য বুঝে তাকে ব্যর্থ করবার সংকল্প তিনি করেন। মামাবাবু খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কিন্তু কিছুদিন আগে আমেরিকার একটি আশ্চর্য ঘটনার সংবাদ খবরের কাগজে না পড়লে আলেয়া-দারুদের ব্যাপার তিনি বোধ হয় বুঝতে পারতেন না। আমেরিকার সেই খবর থেকে সেখানকার একটি ঘড়ির কারখানার কয়েকজন কর্মচারীর আশ্চর্যভাবে মৃত্যুর কথা জানা যায়। সে রোগ আর কিছু নয় দেহের ভেতর রেডিয়ামের ক্রিয়া। ঘড়ির কাঁটা ও ঘণ্টা যাতে অন্ধকারেও দেখা যায় সেই জন্যে রেডিয়াম মিশ্রিত একটি পদার্থ দিয়ে তাদের ঘড়ির ডায়ালে দাগ দিতে হত। লেখবার কলম মুখের লালায় ভিজিয়ে তারা কাজ করত। এইভাবে সামান্য মাত্র রেডিয়াম তাদের উদরে গিয়ে রক্তে সঞ্চারিত হয়। রেডিয়ামের ধর্ম এই যে শরীর থেকে তা বেরিয়ে যায় না, দেহের সমস্ত হাড়ের ওপর গিয়ে জমা হতে থাকে এবং সেখান থেকে প্রচণ্ড শক্তিমান জ্যোতিকণা বিকীরণ করে দেহের রক্ত কণিকা নষ্ট করে দেয়। এই কর্মচারীদের দেহেও রেডিয়ামের ক্রিয়া এইভাবে প্রকাশ পায়। রাত্রে অন্ধকারে তারা নিজেদের শরীরের ভেতর থেকে আলো বেরোতে দেখে প্রথমে চমকে উঠে। তারপর ডাক্তারের পরীক্ষায় সমস্ত রহস্য প্রকাশ পায়। আলেয়া-দারুদের দেশে কোনো না কোনো জলের উৎসে যে রেডিয়াম-লবণের অস্বাভাবিক প্রাচুর্য আছে এবং তাদের শরীরের উজ্জ্বল আলো যে সেই রেডিয়াম-লবণেরই পরিচয় একথা বুঝে, সে দেশে এই মূল্যবান ধাতুর অত্যন্ত সমৃদ্ধখনি আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

লাওচেনের দ্বারা আহত হয়েও সে রাত্রে আমাদের বিমূঢ় করে কীভাবে তিনি অন্তর্হিত হন তার কথা আগেই বলা হয়েছে। যে তিনজন বৌদ্ধ শ্রমণের কথা শুনেও আমরা তেমন গা করিনি, তারাই মামাবাবু, লি-সিন ও মংপো। বৌদ্ধ শ্রমণের বেশেই তাঁরা আমাদের আগে আলেয়া-দারুদের দেশ সন্ধান করেছেন এবং সেখানে আমি দারুদের হাতে বিপন্ন হবার পর আমায় রক্ষা করেছেন। দারুদের সেই পূজানুষ্ঠানের রাত্রে আমার হাতের জলের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে না দিলে

এতদিনে আমার সেই আলেয়া-দারুদের অবস্থাই হত। আমি পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে যে আশ্চর্য কুণ্ড দেখেছিলাম, রেডিয়ামের সেইটিই প্রধান উৎস। শুধু তার জলে রেডিয়াম লবণ প্রচুরভাবে মিশ্রিত যে আছে তা নয়, তার গা দিয়ে রেডিয়ামের প্রধান আকর পিচব্লেণ্ডের বড়ো বড়ো শিরা জলের তলায় নেমে গেছে। সেখানে লি-সিনের সঙ্গে মামাবাবুও ছিলেন। লি-সিন সেদিন আমায় ডাকবার জন্যেই পিছু নিয়েছিল কিন্তু আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। লি-সিনকে এইভাবে ভুল বোঝার জন্যে মামাবাবুর গোপন আস্তানায় লাওচেনকে নিয়ে গিয়ে আমি নিজেদের কী সর্বনাশ যে করতে বসেছিলাম ভাবলেও এখন শিউরে উঠতে হয়।

মামাবাবুর কাছে আমাদের অভিযানের সমস্ত রহস্য জেনে কিন্তু আমি আরও হতাশই হয়ে গেলাম। এত কষ্টের পর মামাবাবুর আবিষ্কার এভাবে লাওচেন আত্মসাৎ করে নেবে ভাবলেও যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। মামাবাবুর কিন্তু সে বিষয়ে কোনো উদ্বেগই যেন নেই। সাত দিনের জায়গায় দশ দিনে হার্টজ কেল্লায় পৌঁছেও তাঁর বিশেষ কিছু দুর্ভাবনা দেখতে পেলাম না! হার্টজ কেল্লায় আমাদের অবশ্য মামাবাবুর পরিচয় পাবার পর বেশ ভালোরকমই খাতির হল। বেতারযন্ত্রে বর্মা সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রীকে খবর পাঠানোর কথা শুনে কিন্তু কেল্লার অধিনায়ক বেঁকে দাঁড়ালেন! এরকম অদ্ভুত অন্যায় বায়না শুনতে তিনি কিছুতেই পারেন না।

বললেন, 'যদি এই ব্যাপারের ওপর বর্মা, চীন ও ইউনানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তবুও না?'

লেফটেনান্ট ব্লাইদ গম্ভীরভাবে বললেন, 'আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না।'

মামাবাবু আধঘণ্টা ধরে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দেবার পর কিন্তু লেফটেনান্ট ব্লাইদ ভয়ংকর রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল।

'এর মানে যুদ্ধ, বুঝতে পারছেন মি. রায়? ফাঁকি দিয়ে এভাবে নিজের সুবিধামতো সীমান্ত নির্দেশ করে নিলে যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী!'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'সেইটেই তো নিবারণ করতে চাই।'

এরপর বেতারে খবর পাঠানো সম্বন্ধে কোনো অসুবিধা আর হল না। মামাবাবু সীমান্ত-নির্দেশের মূল অফিসে বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করে পাঠালেন, 'ইউনানের সঙ্গে বর্মার সীমান্ত-নির্ণয় শেষ হয়ে গেছে কি না?'

তখন আমরা সকলে সেখানে সমবেত হয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে উত্তরের প্রতীক্ষা করছি।

উত্তর আসতেও বিশেষ বিলম্ব হল না। সে উত্তরে বুক কিন্তু একেবারে দমে যাবারই কথা। বৈদেশিক মন্ত্রী জানিয়েছেন যে সীমান্ত নির্ণয়ের কাজ একেবারে সম্পূর্ণ। ইউনান সরকার শেষ মুহূর্তে সামান্য অদলবদল করবার প্রস্তাব করে একটু গোল বাধিয়েছিলেন, তবে তাঁদের সে অনুরোধও শেষ পর্যন্ত রাখা হয়েছে।

লেফটেনান্ট ব্লাইদ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'বর্মা এ ফাঁকি কিছুতেই সইবে না। একটা যুদ্ধ আসন্ন, আমি আপনাকে জানাচ্ছি।'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'না লেফটেনান্ট ব্লাইদ, যুদ্ধের আর দরকার হবে না। ফাঁকি বর্মা পড়েনি।'

আমরা সমস্বরে বললাম, 'তার মানে?'

'তার মানে, আমার নোটবই, পরিণামে শত্রুর হাতেই পাছে যায় এই ভয়ে আমি লঙ্গিচিউড ল্যাটিচিউডের ঠিক হিসাব তাতে টুকে রাখিনি। ইচ্ছে করে কিছু ভুল রেখেছিলাম। ইউনান সেই ভুল হিসাব ধরে সীমান্ত নির্ণয় করে নিজেই ঠকেছে।'

pathagar.net

ড্র্যাগনের নিশ্বাস

বেলা প্রায় আটটা। আমার দাড়ি কামানো, স্নান করা, চা খাওয়া সব শেষ হয়েছে, খবরের কাগজটা আষ্টেপৃষ্ঠে মায় বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি, তবু মামাবাবুর দেখা নেই! অথচ কাল থেকে ঠিক হয়ে আছে সকাল সাড়ে আটটায় আমরা নিশ্চিত বেরোব। কলকাতার বাইরে মাইল দশেকের মধ্যে একটা চমৎকার দিঘিওয়ালা বাগান বিক্রি আছে। মামাবাবু সেটি কিনবেন বলে মনে করেছেন। সেটি দেখবার জন্যেই আমাদের যাবার কথা। মাছ ধরবার একটা কায়েমি সুবিধে হবে বলে আমার উৎসাহ এ ব্যাপারে একটু বেশি।

ঘড়ির কাঁটা আরও মিনিট পনেরো এগিয়ে গেল। এবার আমি সত্যি একটু অধৈর্য হয়ে পড়লাম। যা রাখতে পারবে না, সেরকম কথা দেওয়া কেন বাপু? এই সকালটা একটু সুইমিং করেও তো আসতে পারতাম! মামাবাবুকে তো চিনতে আমার বাকি নেই! এমন গেঁতো আলসে লোক বাঙালির ভিতরও দুটি আছে কি না সন্দেহ। কোনোরকমে নিখিল ভারত নিদ্রা প্রতিযোগিতার একটা ব্যবস্থা করলে মামাবাবু আর সকলকে অনায়াসে যে সাতরাত্রি পিছনে ফেলে যেতে পারবেন, এ বিষয়ে আমি বাজি ধরতে পারি।

হ্যাঁ, ঘুম বটে! স্বয়ং কুম্ভকর্ণকে নাক ডাকার দু-একটা প্যাঁচ মামাবাবু শিখিয়ে দিতে পারেন। নিদ্রাটাকে এমন একটা চারুকলা হিসেবে আর কেউ বোধ হয় কখনো চর্চা করেনি। সকাল, বিকেল, দুপুর, রাত্রি, সময়ের বাচবিচার নেই, শয্যার তারতম্য নেই, যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো স্থানে মামাবাবু সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারেন ও পড়ে থাকেন। প্রচুর নিদ্রা ও তার সঙ্গে পর্যাপ্ত ভোজ মিললে যা হয় তাই হয়েছে, একে ছোটোখাটো গোলগাল মানুষ, তার উপর এইরকম প্রশ্রয় পেয়ে চেহারাটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমান হয়ে উঠেছে!

এই মামাবাবুই বর্মার সুদূর জঙ্গলে প্রস্পেকটার-এর মতো কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজে একদিন চরম কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

বর্মায় মামাবাবুর শেষ কর্মস্থল হল মিচিনা। সেখান থেকে গত বছর চাকরি থেকে পেনসন নিয়ে হঠাৎ কী খেয়ালে তিনি আবার বাংলাদেশে এসেই বাস করছেন। 'হঠাৎ' বললাম এই জন্যে যে, মামাবাবু কখনো যে বাংলায় ফিরবেন এ আশা তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কোনোদিন ছিল না! বিলেত থেকে মাইনিং পাস করবার পর যখন সবাই আশা করেছিল যে তিনি দেশে এসে একটা ভালো আয়েসি চাকরি অনায়াসে জোগাড় করে নেবেন, তখন তিনি সাধ করে গিয়েছিলেন বর্মার দুর্গম অঞ্চলে অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের ও তদনুপাতে অত্যন্ত অল্প মাইনের চাকরিতে শুধু যেন বিপদের লোভে। বর্মাকেই একরকম ঘরবাড়ি করে তোলবার পর আবার সব পাত্তাড়ি গুটিয়ে বাংলাদেশে তিনি ফিরে আসবেন, কেউ তা ভাবেনি।

কিন্তু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে সবরকম উৎসাহতেই বোধ হয় ভাঁটা পড়ে আসে। তা ছাড়া, মামাবাবুর ভিতর চিরকাল একটা আরামপ্রিয় নিষ্কর্মা জমিদারি মনোভাব লুকিয়ে ছিল বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশে ফেরবার পর এখানকার জোলো হাওয়ায় সে মনোভাবটি বেশ সহজেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া তাঁর কোনো বিষয়ে উৎসাহ আছে বলেই মনে হয় না আর। ওজনে নিয়মিতভাবে বাড়া ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন তাঁর নেই।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা!

এবার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলাম। একটা দিন কি একটু সময়ে উঠতে নেই! মামাবাবুর মগ চাকর মংপোকে উপরে মামাবাবুর ঘরের দিক থেকে নেমে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীরে মামাবাবু এখনও ওঠেননি ঘুম থেকে?'

pathagar.net

'বাবু।' মংপো সরল বাংলায় জবাব দিল, 'না, তিনি তো এখন জাগাচ্ছেন।'

মংপো বর্মিজ হলে কী হয়, বাংলা ভাষার প্রতি তার অসীম অনুরাগ। মামাবাবুর সঙ্গে গত ছয় বছর বর্মায় থাকলেও বাংলা শেখবার বিশেষ সুবিধে তার হয়নি। এই এক বছর বাংলাদেশে এসে বাস করেই কিন্তু সে যথাসম্ভব সে-দুঃখ ঘুচিয়ে এ ভাষা দখল করে নিয়েছে। শুধু দখলই সে করেনি। নবীন উৎসাহে বাংলা ছাড়া আর কিছু সে ব্যবহারই করে না, এবং আমাদের মাঝে মাঝে সে জন্যে কম বিপন্ন হতে হয় না!

আপাতত মংপোর কথার অর্থবোধ অতি সহজ হলেও ব্যাপারটায় আরও বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

'জাগাচ্ছেন'—অর্থে মংপো নিশ্চয় 'জাগ্রত আছেন' বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু মামাবাবুর এরকম আচরণের অর্থ তাতে আরও দুর্বোধ হয়ে ওঠে যে!

সব ঠিকঠাক করে এবং সময়মতো ঘুম থেকে উঠেও তিনি আমায় এখানে অপেক্ষা করিয়ে রেখে দিব্যি নিজের ঘরে বসে আছেন!

বেশ রাগের সঙ্গেই সিঁড়িটা সশব্দে কাঁপিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। মামাবাবুর ঘরের দরজা খোলা। তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন, কিন্তু এখনও বিছানা ছাড়েননি। বেশ আরাম করে কোমর পর্যন্ত একটা চাদর চাপা দিয়ে একটা নতুন শিকারের মাসিকপত্র পড়ছেন।

আমায় ঢুকতে দেখেও কোনোরকম মুখের বিকার তাঁর দেখা গেল না। আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই, যেন ইংরেজি পত্রিকাটিকেই সম্ভাষণ করে একটু মধুর হেসে বললেন, 'কীরে ঘুম ভাঙল?'

রাগের চোটেই উত্তর আর মুখ দিয়ে প্রথমটা বার হল না।

কিন্তু চুপ করেই বা কতক্ষণ রাগ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, সে রাগ যদি কারোর চোখে না পড়ে? মামাবাবু শিকারের পত্রিকায় এমন তন্ময় যে আমার প্রতি কোনোরকম মনোযোগ দেবার লক্ষণই তাঁর নেই।

অগত্যা রাগটা সশব্দে প্রকাশ করতেই হল। বেশ একটু কড়া গলায় আরম্ভ করলাম, 'আচ্ছা মামাবাবু....'

মামাবাবুর কোনো প্রকার পরিবর্তন নেই। কাগজের ওপর চোখ রেখেই তিনি বললেন, 'ওই ড্রয়ারে বিস্কুটের টিন আছে, বার করে নে। আর এই ট্রেতে চা...'

'চা-বিস্কুট খেতে আমি আসিনি!'

এবার আমার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় মামাবাবুরও চমক ভাঙল।

আমার দিকে ফিরে একটু অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে?'

'তবে! আজ আমাদের কোথায় যাবার কথা!'

'ওঃ!' মামাবাবু একটু হাসলেন, সেই বাগানটা দেখতে? সে আজ তো আর হয় না!'

'কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী এমন তোমার জরুরি রাজকাজ আছে?'

'কাজ! কাজ একটু রয়েছে যে!' মামাবাবু একটু কিন্তু হয়েই বললেন, 'আজ এই মিস্টার মরগ্যানের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।'

বেশ একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিস্টার মরগ্যান আবার কে?'

'মিস্টার মরগ্যান! এই যে 'সায়ামে শিকার' বলে এই কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন!'

এবার আবার চটে উঠে বললাম, 'তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, তোমারও পড়া হয়েছে, তারপর আবার দেখা করবার কী আছে?'

মামাবাবু যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'বাঃ—দেখা করতে হবে না? এরকম একটা আশ্চর্য ব্যাপার!'

'কী আশ্চর্য ব্যাপার? সায়ামে শিকার করতে যাওয়ার ভিতর আশ্চর্যটা কোথায়। যে-কেউ তো সেখানে যেতে পারে!'

'আহা, শিকারে যাওয়া নয়, মরগ্যান যে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা লিখেছেন। সায়ামের উত্তরে লুয়ং পাহাড়ের পুবে প্রতি বছর এক জাতের বিগড়ি হাঁস আসে শীতের সময়। আর বছর মরগ্যান একটাও হাঁস সেখানে দেখতে পাননি।'

'সত্যি,' একেবারে অবাক হয়ে বললাম, 'তারই জন্যে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? এ তো জলের মতো সোজা। বিগড়ি হাঁসের পাল এবার হয়তো আসেই-নি সেখানে।'

মামাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা হতেই পারে না। যাযাবর হাঁসেদের স্বভাব জানলে অমন কথা বলতিস না। অসাধারণ কোনো কারণ না ঘটলে তারা প্রতি বছর আকাশপথে একই জায়গায় ফিরে আসবেই।'

'অসাধারণ কারণটা কী হতে পারে তাহলে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'তা বলব কী করে? মরগ্যানের কাছে তা জানবার জন্যেই তো যাচ্ছি। ভালো করে সব বিবরণ নিতে হবে।'

মামাবাবুকে বাগান দেখতে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'মরগ্যান কোথায় থাকেন? এই ভারতবর্ষে কি?'

মামাবাবু এবার একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ; এই কলকাতাতেই আপাতত আছেন। বিলেতের একটা বড়ো কোম্পানির এজেন্ট। ব্যাংককেও তাঁদের অফিস আছে। আর বছর সেখানে থাকবার সময় সায়ামের উত্তর অঞ্চলে শিকার করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তারই কথা এই কাগজে লিখেছেন।'

একবার শেষ চেষ্টা করে বললাম, 'বিগড়ি হাঁসের রহস্যটা কি না জানলেই নয়? সুদূর সায়ামের উত্তরে কী হয়েছে না হয়েছে, আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ আছে কিছু?'

মামাবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু আশান্বিত হয়ে আবার বললাম, 'একবার মধুর চোঙার একটা মৌমাছি থেকে কুহকের দেশের অত বড়ো রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করেছিলে বলে, তুমি কি মনে করো বারবার তাই হবে? রহস্য অমনি পথেঘাটে ছড়াছড়ি যাচ্ছে।'

মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আমি কি তা বলেছি? কিন্তু মরগ্যানের সঙ্গে একটু দেখা করে এলে ক্ষতি তো কিছু নেই।'

সেদিন সত্যিই মামাবাবুর সঙ্গে মিস্টার মরগ্যানের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হল।

মিস্টার মরগ্যান আলিপুরে একটা বেশ বড়ো গোছের বাড়ি নিয়ে থাকেন। বাড়িতে তিনি একা। স্ত্রী-পুত্র আছে, কিন্তু তারা বিলেতেই থাকে।

মামাবাবুর কার্ড পাওয়া মাত্র মিস্টার মরগ্যান অতখানি খাতির করে যে আমাদের অভ্যর্থনা করবেন, তা সত্যি ভাবিনি। দেখলাম—মামাবাবুর নাম শুধু বর্মায় নয়, সায়াম ও ইন্দো-চায়নার শ্বেতাঙ্গমহলেও বেশ ভালোরকম পরিচিত।

নামটা অত্যন্ত পরিচিত হলেও মামাবাবুকে চাক্ষুষ দেখে মিস্টার মরগ্যান বোধ হয় একটু হতাশই হলেন। তাঁর হতাশাটা খুব অসঙ্গতও নয়। লম্বা-চওড়া একজন জোয়ান শিকারির চেহারা তিনি বোধ হয় আশা করেছিলেন। তার জায়গায় গোলগাল নেহাত নিরীহ চেহারার এই ছোট্ট মানুষটি।

মিস্টার মরগ্যানের মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল, 'আপনি মিস্টার রায়!'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'কেন? বিশ্বাস করতে পারছেন না নাকি?'

মিস্টার মরগ্যান একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে বললেন, 'না, না, তা নয়, তবে কি জানেন, মানে আপনার কীর্তিকাহিনি যা শুনেছি তার সঙ্গে আপনার চেহারা ঠিক মেলে না।'

মামাবাবু আবার হেসে ফেললেন, বললেন, 'সেটা আমার কীর্তির দোষ, এমন চেহারার মর্যাদা রাখতে পারল না।'

দুজনে খানিকক্ষণ এমনি হালকা কথাবার্তার পর আসল বিষয়ের আলোচনা শুরু হল। মরগ্যান তাঁর শিকারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যা যা বললেন, সায়ামের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে যে জাতের যাযাবর হাঁস প্রতি বৎসর ঝাঁক বেঁধে নামে তাদের বিষয়ে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা দুজনের মধ্যে হল, তার অধিকাংশই আমার কাছে নেহাত জোলো ও দুর্বোধ।

দুজনের কথায় শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে, এরকম ঘটনা পক্ষিতত্ত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত অসাধারণ এবং রীতিমতো রহস্যজনক। এমনকী, এই সূত্রে যাযাবর পাখিদের সম্বন্ধে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ খানিকটা উলটে যাবার সম্ভাবনাও নাকি আছে।

বলাই বাহুল্য যে, এসব তত্ত্বকথায় কিছুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। দুজনের আলোচনা যত দীর্ঘ হয়ে উঠছিল, আমি তত অস্থির হয়ে উঠছিলাম এ প্রসঙ্গ শেষ হবার আশায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরগ্যানের কাছে বিদায় নিয়ে আসবার সময় তাঁর একটা কথা আমাকেও একটু কৌতূহলী করে তুলল।

মিস্টার মরগ্যান মামাবাবুকে বলেছিলেন, 'দেখুন, আমার এই সামান্য শিকার-কাহিনি এত লোকের নজরে পড়বে বলেই আমি ভাবতে পারিনি।'

'কেন, আমাদের মতো আর কেউ এ বিষয়ে খোঁজ নিয়েছে নাকি?' জিজ্ঞাসা করলেন মামাবাবু।

মিস্টার মরগ্যান মাথা নেড়ে বললেন, 'না, ঠিক যাযাবর হাঁসের বিষয়ে আপনাদের মতো কেউ খোঁজ করেনি। তবে আমি একটা ভারী মজার চিঠি পেয়েছি কাল!'

মামাবাবু একটু যেন বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, 'কীরকম চিঠি?'

'একরকম চোখ-রাঙানো চিঠিই বলতে পারেন' বলে মিস্টার মরগ্যান হাসলেন, তারপর আবার বললেন, 'দাঁড়ান, চিঠিটা আপনাদের দেখাই।'

মিস্টার মরগ্যান নিজেই পাশের ঘরে উঠে গিয়ে একটা ফাইল নিয়ে এলেন। তা থেকে যে চিঠিটা বার করে আমাদের দেখালেন, তা পড়ে সত্যিই আমরা অবাক!

সম্বোধন নেই, ঠিকানা-তারিখ নাম-স্বাক্ষর কিছুই নেই, শুধু টাইপ-করা কটি লাইন ইংরেজিতে। 'বাংলায় তার অর্থ হল—বন্দুক আর কলম চালানো এক জিনিস নয়। সকলের একসঙ্গে এ দুই সাজে না। আনাড়ির হাতে বন্দুকের চেয়ে অল্পবুদ্ধির হাতে কলম যে বেশি বিপজ্জনক একথা জেনে ভবিষ্যতে শিকার-কাহিনি লিখে বাহাদুরির চেষ্টা আশা করি করবেন না।'

মিস্টার মরগ্যান চিঠিখানি পড়ে নিজেই হেসে বললেন, 'এ উদ্ভট রসিকতার অর্থই তো বুঝতে পারছি না। আমার তুচ্ছ শিকার-কাহিনিতে কারোর কোনোরকম চটে উঠবার কারণই তো নেই।'

মামাবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। মিস্টার মরগ্যান তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার অবশ্য মনে হয়, এ আমার কোনো জানা বন্ধুর বেনামি ঠাট্টা। শিকার আমার বাই বলে, এইরকম তামাশা করেছে।'

মামাবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন কে জানে? কিন্তু মিস্টার মরগ্যানের এই কথার পর আর কিছু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না।

মিস্টার মরগ্যানের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম, তখন বেশ বেলা

হয়েছে। স্নানাহারের চেষ্টা না করে মামাবাবুকে সেই অবস্থাতেই লাইব্রেরি-ঘরের দিকে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার সমস্যা কি এখনও মিটল না মামাবাবু?'

মামাবাবু গম্ভীর মুখে শুধু বলে গেলেন, 'এই তো শুরু!'

মামাবাবু অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে কথাটা বললেও, মনে মনে তাঁর সন্দেহকে বিশেষ আমল আমি দিইনি।

মরগ্যানের সঙ্গে দেখা করে আসবার পর দু-দিন একটা মফস্‌সল ফুটবল টিমের হয়ে বাইরে খেলতে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে মামাবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে আমি অবাক!

'এসব হচ্ছে কী মামাবাবু?'

'কই, কী আর হচ্ছে! এই চারটে বন্দুক, একটা ছোটো কোল্যাপসিবল্ তাঁবু, একটা ওযুধের বাক্স, একটা দূরবিন, গোটা কতক ...'

মামাবাবুর ফিরিস্তিতে বাধা দিয়ে বললাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এসব কেন!'

মামাবাবু যেন অত্যন্ত সংকুচিতভাবে বললেন, 'একটু বেরোতে হবে যে!'

'বেরোতে হবে? কোথায়?'

নেহাত যেন লিলুয়া যাওয়া হচ্ছে এই ভাব করে মামাবাবু বললেন, 'এই প্রথমত ব্যাংকক্, তারপর সেখান থেকে রেলে উত্তরাদিত, তারপর সেখান থেকে নৌকায় পার হয়ে হাঁটা-পথে লুয়ং পাহাড়ের পুবে...'

'তুমি যাবে সেই পাণ্ডব-বর্জিত জঙ্গল-পাহাড়ের দেশে?'

মামাবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'বাঃ, না গেলে চলে কী করে!'

'না গেলে চলে না মানে? কটা বিগড়ি হাঁসের উড়ো খবরের জন্যে সেই সায়ামের জঙ্গলে যাবে? তোমার কি মাথা খারাপ নাকি!'

মামাবাবু তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে পাশের টেবিল থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'বিগড়ি হাঁসের রহস্যটা এত সোজা মনে কোরো না। পড়ে দেখো।'

কাগজটা আগের দিনের।

মফস্‌সলে ফুটবলে যেতে থাকবার দরুন আমি মনোযোগ দিয়ে কাগজটা পড়েই দেখিনি। দেখলাম—কাগজের একটা জায়গা লাল কালিতে দাগ দেওয়া।

দাগ দেওয়া সংবাদটি পড়ে সত্যি স্তম্ভিত হলাম।

আমরা দেখা করে আসবার দিনই মিস্টার মরগ্যানকে তাঁর বাড়িতে কোনো অজানা আততায়ী রাত্রে আক্রমণ করে। মিস্টার মরগ্যান বাড়িতে একাই থাকেন। তাঁর চাকরবাকররা থাকে আলাদা। তারা এ আক্রমণের কিছুই জানতে পারেনি। পরের দিন সকালে তাঁর খাসবেয়ারা তাঁর শোবার ঘরে একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় মিস্টার মরগ্যানকে দেখতে পায়। মিস্টার মরগ্যান হয়তো প্রাণে বাঁচবেন, কিন্তু হাসপাতালে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। এখনও তাঁর জ্ঞান হয়নি। খবরটা পড়ে অত্যন্ত বিস্মিতভাবে মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খবরটা খুব দুঃখের, কিন্তু এর সঙ্গে তোমার বিগড়ি হাঁসের কী সম্বন্ধ তা জানতে পারলাম না। এ তো পুলিশের তদন্তের ব্যাপার। তাদের কাছে খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি।'

'কী বলে তারা?'

মামাবাবু অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'তারা মরগ্যানের একজন বাবুর্চির তল্লাশ করছে। কদিন আগে চুরি করার জন্যে মরগ্যান তাকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দেন। পুলিশের বিশ্বাস—সেই রাগের প্রতিশোধ নেবার জন্যে এইরকমভাবে মরগ্যানকে আক্রমণ করেছে।'

pathagar.net

'তাহলে তো গোল চুকেই গেল। আর আমাদের এ নিয়ে ভাবনার কী আছে?'

মামাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পুলিশের এ ব্যাখ্যা আমার বিশ্বাস হয় না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বিশ্বাস হয় না? না বিশ্বাস হবার কী আছে? আক্রোশের বশে এরকম আক্রমণের কথা তো হরদম শোনা যায়। তা ছাড়া যদি অন্য কোনোরকম সন্দেহ থাকে, তাহলে তার মীমাংসা তো এই কলকাতাতেই হওয়া সম্ভব।'

মামাবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, এ রহস্যের সূত্র সেই সুদূর সায়ামে আছে বলে আমার ধারণা এবং আমায় যেতেই হবে।'

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে যখন বুঝলাম, মামাবাবুর এ সংকল্প টলাবার নয়, তখন জোর গলায় হাঁক দিয়ে মংপোকে ডাকতেই হল।

মংপো এসে দাঁড়াতেই বললাম, 'আমার বিছানাপত্রও গুছিয়ে নে, মংপো।'

মামাবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'সেকী! তুই সেই জঙ্গলে কোথায় যাবি? আমি এবার একাই যাব ঠিক করেছি যে।'

একটু রাগের সঙ্গেই বললাম, 'হ্যাঁ, তোমায় একা আমি যেতে দিচ্ছি। এই আয়েশি অথর্ব শরীর নিয়ে তুমি যে ফ্যাসাদ বাধাবে তা তো বুঝতে পারছি, সঙ্গে থাকলে তবু সামলাতে পারব।'

মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'বেশ, চল তাহলে।'

তার পর মংপোকে আদেশ দিলেন, 'যা, ছোটোবাবুর বিছানাপত্রও বেঁধে দে, আর একটা মশারি আর বন্দুকও দিবি।'

মংপোর তবু নড়বার নাম নেই। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল, কী রে! কী হল হঠাৎ?'

মংপো গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি গেলাম।'

'অ্যাঁ! গেলাম কী রে কী হল হঠাৎ?'

মংপো বেশ জোরের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, আমি খুব গেলাম।'

এবার তার কথার মানেটা বুঝে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। মামাবাবু কোনোরকমে হাসি চেপে বললেন, 'বুঝেছি। ভেবেছিলাম এ যাত্রায় সঙ্গী আর কাউকে করব না। তা আর হল না! আচ্ছা, তুইও চল।'

মংপো দাঁত বার করে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জাহাজে কালাপানি পার হয়ে ও সিঙাপুর ঘুরে ব্যাংকক পৌঁছে যেদিন উত্তরাদিত যাবার টানা রেলপথে ট্রেনে উঠে বসলাম, তখনও সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে নেহাত ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে।

ইংরেজিতে 'ওয়াইলড্ গুস চেস' বলে যেকথা আছে আমরা একেবারে সত্যিসত্যিই অক্ষরে অক্ষরে তাই করতে চলেছি বলে আমার ধারণা।

কোথায় একটা তুচ্ছ শিকারের কাহিনিতে কী বাজে খবর বেরোল কটা বুনো হাঁস নিয়ে, আর আমরা তার পিছনে ছুটলাম হন্তদন্ত হয়ে—এরকম পাগলামির কোনো মানে হয়!

নেহাত দেশভ্রমণটাই লাভ।

ব্যাংকক থেকে উত্তরাদিত রেলে বারো ঘণ্টার পথ। ট্রেনে যেতে যেতে দিগন্তবিস্তৃত ধানের খেত দেখলে যেন বাংলাদেশের ভিতর দিয়েই যাচ্ছি মনে হয়। মাঝে মাঝে চাষাদের কুটিরের একটু আলাদা চেহারা ও তাদের নতুন ধরনের পোশাক না দেখলে বুঝতেই পারতাম না যে, অন্য কোনো দেশে এসেছি।

pathagar.net

উত্তরাদিতে নেমে এবার নৌকায় নান নামে জনপদের দিকে রওনা হলাম। এইবার প্রাকৃতিক দৃশ্য একটু বদলাতে শুরু করেছে। ধানের চাষই এখানকার লোকদের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু তার সঙ্গে জংলি কাঠের কারবার আছে। সেগুন আবলুস প্রভৃতি দামি কাঠের ওটি একটি বড়ো কেন্দ্র।

উত্তরাদিত থেকে নান একশো মাইলের সামান্য কিছু বেশি। বর্ষাকালে বন্যার সময় স্টিমার পর্যন্ত এপথে চলে!

এখন শীতের গোড়ায় জল কমে যাওয়ার দরুন এই পথটুকু পার হতেই আমাদের দিন দশেক লেগে গেল।

নানকে ঠিক শহর বলা যায় না, গ্রামও ঠিক নয়। সায়ামের বিখ্যাত লাও সর্দারদের এটি একটি প্রধান রাজধানী হলেও এখন শহরের পর্যায়ে ওঠেনি।

লাও সর্দারদের অবস্থা আজকাল খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আগেকার জাঁকজমক একেবারে যায়নি। কুবলাই খাঁর দ্বারা বিতাড়িত হবার আগে তারা যে এককালে চীনের অধীশ্বর ছিল, সে গৌরব তারা ভোলেনি।

সরকারি সুপারিশপত্র থাকার দরুন আমাদের খাতিরযত্ন খুব ভালোরকমই হল।

বিশেষ করে অছ্‌থামা নামে একজন তরুণ লাওসর্দার আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে একরকম দিনরাত্রের সঙ্গীই হয়ে উঠল।

অছ্‌থামা, আসলে অশ্বত্থামা শব্দের অপভ্রংশ। এখানকার বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের চেহারা একেবারে মোঙ্গোলীয় হলেও নামের ভিতর এইরকম প্রাচীন হিন্দু সংস্পর্শের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের অনেক বড়ো বড়ো নাম ভাঙাচোরা অবস্থায় এদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। অছ্‌থামা বেশ চটপটে চালাক ও মিশুক ছেলে। ব্যাংককে ইয়োরোপীয় স্কুলে সে পড়াশুনা করেছে, ফরাসি ভাষা বেশ ভালোই বলতে পারে, ইংরেজিও কাজ-চালানো গোছের. জমিদারি দেখবার জন্যে তাকে এখানে একরকম নির্বাসনে থাকতে হয়। আমাদের সঙ্গ পেয়ে সে যেন ধন্য হয়ে গেছে!

কিন্তু আমাদের অভিযান সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। বরং প্রাণপণে সে যেন আমাদের নিরস্ত করতে চায়।

শিকার করবার কি আর জায়গা নেই? লুয়ং পাহাড়ের পুবে কী এমন শিকার পাবেন? চলুন না, তার চেয়ে ঢের ভালো জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। বাঘ হাতি থেকে যত রকমের পাখি চান, সব আশ মিটিয়ে শিকার করবেন—এই হল তার বক্তব্য।

তবু লুয়ং পাহাড়ের পুবের উপত্যকায় ছাড়া আমরা আর কোথাও যেতে চাই না জেনে সে রীতিমতো বিচলিত হয়ে ওঠে।

'কেন এরকম বেয়াড়া জেদ আপনাদের বলুন তো? আমি বলছি সেখান কোনো শিকার আপনারা পাবেন না।'

'কেন বলুন তো?' মামাবাবুর চোখের দৃষ্টি যেন একটু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'কেন?' অছ্‌থামা কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে বলে, 'কেন তা আর নাই শুনলেন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করুন। সেখানে কোনো শিকার পাবেন না। লোকজনের সঙ্গে বুনো শুয়োর পর্যন্ত সে-দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

এবার অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কী বলছেন কী। সেখানকার লোকেরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে মানে! পালাবেই বা কেন?'

অছ্‌থামা একটু ইতস্তত করে বলে, 'দেখুন আপনারা আজকালকার শিক্ষা পাওয়া লোক, যা আপনাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না, তা কুসংস্কার বলেই হেসে উড়িয়ে দেন। আপনাদের তাই

pathagar.net

আমি কিছু বলে হাস্যাস্পদ হতে চাই না। তবে আমার আন্তরিক অনুরোধ—আপনারা ওখানে যাবেন না।'

একটু থেমে সে আবার বলে, গেলে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।'

মামাবাবু একটু হেসে বলেন, 'বেশ তো আপনি তো এখানকার একজন বড়ো লোক। আপনি চলুন না আমাদের রক্ষাকর্তা হয়ে।'

'আমি!' হঠাৎ অশ্বত্থামার চোখে যে ভয়ংকর আতঙ্ক ফুটে ওঠে তা সত্যি বিস্ময়কর। 'না, না, আমার যাওয়া অসম্ভব।' বলে সে ঘর থেকেই বেরিয়ে যায়।

আমরা বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই।

আমাদের কোনোক্রমে এ অভিযান থেকে নিরস্ত করতে না পেরে বিশেষ দুঃখিত হলেও অশ্বত্থামা আমাদের সাহায্যের ত্রুটি করল না।

নান থেকে লুয়ং পাহাড়ের পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম। কোনোরকম যানবাহন সেখানে চলে না, টাট্টু ঘোড়াই একমাত্র অবলম্বন।

অশ্বত্থামা আমাদের ভালো তিনটি টাট্টু তো জোগাড় করে দিলই, তার সঙ্গে বেশ প্রচুর রসদ। তার দৃঢ় বিশ্বাস—লুয়ং-এর অভিশপ্ত উপত্যাকায় আমরা খাবার সংগ্রহ করা বিষয়েও বিপদে পড়ব।

যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ। বাইরে টাট্টু ও বাহকেরা তৈরি। অশ্বত্থামা তখনও একেবারে হাল ছাড়েনি কিন্তু।

আসল বিপদটা যে কী, তা কিছুতেই স্পষ্ট করে বলতে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের নানাভাবে ঘুরিয়ে সে যা বোঝাতে চেষ্টা করল তা এই যে, সে-উপত্যাকায় গেলে আর কেউ ফেরে না। ডিক্‌সন্ নামে একজন খনিতত্ত্ববিদ্ সাহেব এই বৎসরই গোঁয়ার্তুমি করে লোকলশকর নিয়ে সেখানে গিয়ে কী অবস্থায় পড়েছেন তার বিবরণও সে বলতে ভুলল না। ডিক্‌সন্ সাহেব ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে আর কয়েকবার নাকি যাতায়াত করেছেন। এ ধারে ধোঁয়াহীন কয়লার খনি পাওয়া যেতে পারে বলে তাঁর ধারণাবশে অনেক ঘোরাঘুরি করে এ পর্যন্ত তিনি কোনো ফল পাননি। এবার লোকলশকর নিয়ে সেই সন্ধানে যাবার সময় অনেকেই তাঁকে বারণ করে কিন্তু তিনি কারোর কথা না শুনে অগ্রসর হন। কিছুদিন বাদেই তাঁর সঙ্গের লোকদের প্রায় সকলেই ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। তিনি এখন প্রাণে বেঁচে আছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর যে কী অবস্থা হয়েছে, তা কেউ জানে না।

অশ্বত্থামার বিবরণ শুনে মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'লুয়ং উপত্যকা চিরদিন কী এইরকম অভিশপ্ত?'

'চিরদিন কেন হবে? দু-বছর আগেও এ উপত্যকা চাষিদের স্বর্গ ছিল বললেই হয়। প্রতি দশ মাইল অন্তর জাপানি আড়তদারেরা তখন ধান কেনবার কুঠি বসিয়েছে। কারণ এদিকের মতো উঁচু দরের ভালো চাল সমস্ত সায়ামে হয় কি না সন্দেহ। তারপর আচম্বিতে এই সর্বনাশ!'

মামাবাবু অশ্বত্থামার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'এখানকার চাল বুঝি জাপানেই বেশি চালান যায়?'

'সমস্ত সায়ামের চালই তো বলতে গেলে জাপানে যায়।'

মামাবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আড়তদারেরা সব এখন কোথায়?'

'কোথায় আর! লোকদের সঙ্গে, চাষ-আবাদ নষ্ট হয়ে যেতে তারাও একে একে সরে পড়েছে। সমস্ত লুয়ং উপত্যকায় মানুষ অধিবাসীদের মধ্যে দু-একটা জাপানি আড়তদারই টাকার লোভে এখনও হয়তো পড়ে আছে। তাদের দাদন দেওয়া ফসল এই শীতে নিজেরাই যথাসম্ভব কেটে সরে পড়তে পারলে তারা বাঁচে।'

pathagar.net

মামাবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'সায়ামের গভর্নমেন্ট এ-বিষয়ে কী করেছেন? এত বড়ো একটা জায়গা—যে কারণেই হোক, এরকম জনশূন্য হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁরা কি একেবারে উদাসীন?'

'উদাসীন ঠিক বলা যায় না। কিন্তু জানেন তো এই সুদূর সীমান্তপ্রদেশের খবর, প্রথমত সহজে সেখানে পৌঁছোয় না, দ্বিতীয়ত সরকারি কলের চাকা চিরদিনই ঘোরে অতি আস্তে। এ ব্যাপারটায় সরকারি টনক এখনও ঠিকভাবে নড়েনি। তা ছাড়া ব্যাপারটা সরকারি মহলও এখনও আজগুবি কল্পনা বলেই উড়িয়ে দিতে চায়।'

মামাবাবু এবার একটু হেসে বললেন, 'আজগুবি কল্পনা বলে মনে তো হতেই পারে, অশ্বথামা! এই বিংশ শতাব্দীতে আগুনের নিশ্বাসফেলা জীবন্ত বিরাট ড্র্যাগনের অস্তিত্ব কেমন করে সহজে বিশ্বাস করা যায় বলুন।'

কথাটা শুনে আমি তো চমকে উঠলামই, অশ্বথামা যেন আরও অবাক হয়ে গেছে মনে হল।

খানিক চুপ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে সে বলল, 'আপনি তাহলে শুনেছেন?'

মামাবাবু শান্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ শুনেছি। কুসংস্কার নিয়ে হাস্যাস্পদ হবার ভয় আপনার মতো সকলের তো নেই। কাল আপনার কাছে আভাস পেয়েই আমি আর পাঁচজনের কাছে এ বিষয়ে খোঁজ করি। সংকোচ করা দূরে থাক, অত্যন্ত উৎসাহ ভরেই সবাই যথাসম্ভব রং ফলিয়ে ড্র্যাগনের কাহিনি আমায় জানিয়েছে। অবশ্য আমার তাতে এ অভিযানের উৎসাহ আরও বেড়ে গেছে।

'আপনি ভুল করেছেন মিস্টার রায়! এসব ব্যাপার লোকে একটু রং ফলিয়ে বলেই থাকে বটে, তবু এর ভিতর কোনো সত্য নেই তা মনে করবেন না। আপনি যখন সব জেনেই ফেলেছেন তখন বলি শুনুন—এ ড্র্যাগনের আবির্ভাব আমাদের কাছে নেহাত আকস্মিক নয়। আজ পাঁচশো বছর ধরে লাওদের মধ্যে এই বিশ্বাস চলে আসছে যে, সায়ামের উত্তরের পাহাড়ে দেবতারূপে যেদিন ড্র্যাগন দেখা দেবে, সেইদিন থেকেই পৃথিবীতে নতুন যুগের সূত্রপাত। আজ ড্র্যাগনের আবির্ভাব তাই আমরা সহজেই বিশ্বাস করতে পেরেছি।'

একটু থেমে আমাদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অশ্বথামা আবার শুরু করল, 'পশ্চিমের শিক্ষা আপনাদের মতো আমিও কিছু পেয়েছি মিস্টার রায়! কিন্তু আমার প্রাচ্য মন তার কাছে একেবারে দাসত্ব স্বীকার করেনি। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, পশ্চিমের বিজ্ঞান যা কল্পনাও করতে পারে না, এমন অনেক রহস্য এখনও পৃথিবীতে আছে। যত আজগুবিই মনে হোক, আমি জানি এ ড্র্যাগনের কথা মিথ্যা নয়। তা ছাড়া, ড্র্যাগনের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইচ্ছে করলে এখনই আপনারা দেখতে পারেন।'

অশ্বথামা অত্যন্ত শান্তভাবে কথাগুলো বললেও মামাবাবু পর্যন্ত এবার চমকে উঠলেন।

'প্রত্যক্ষ প্রমাণ কীরকম?'

'হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলতে পারেন। কাল রাত্রে একজন চীনে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় নান এসে পৌঁছেছে লুয়ং পাহাড় থেকে। তার একটা কাঁধ ও হাত একেবারে আগুনে ঝলসানো। আপাতত সে অজ্ঞান অবস্থায় আমার এই অতিথিশালাতে আছে। জ্ঞান হারাবার আগে মাত্র দুটি কথা সে বলতে পেরেছিল।'

মামাবাবু এবার একটু হেসে বললেন, 'আজগুবি কল্পনা বলে মনে তো হতেই পারে, অশ্বথামা! এই বিংশ শতাব্দীতে আগুনের নিঃশ্বাস-ফেলা জীবন্ত ড্র্যাগনের অস্তিত্ব কেমন করে সহজে বিশ্বাস করা যায় বলুন!'

উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কথা দুটি কী?'

pathagar.net

অশ্বত্থামা গম্ভীরভাবে বলল, 'ড্র্যাগনের নিশ্বাস।'

মামাবাবু ভিতরে ভিতরে আমারই মতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বাইরে তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেননি। এখনও বেশ শান্তভাবেই বললেন, 'আমরা অভিযানে বেরোবার আগে তাকে একবার দেখতে পারি কি?'

'নিশ্চয় ' বলে অশ্বত্থামা উঠে পড়ল।

অশ্বত্থামার অতিথিশালার যে ঘরটিতে আমাদের থাকবার জায়গা হয়েছিল, তারই পাশের লম্বা বারান্দা দিয়ে অশ্বত্থামা খানিক দূর আমাদের নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে হাজির করল।

ঘরের মাঝখানে একটি বিছানার চারধারে বেশ ভিড় জমে গেছে ইতিমধ্যেই। অশ্বত্থামাকে আমাদের সঙ্গে আসতে দেখে তারা সরে গেল একপাশে। চীনে লোকটি এখনও অজ্ঞান অবস্থায় এক পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ডান কাঁধ ও পিঠটা আগুনে ঝলসে এমন একটা চেহারা হয়েছে যে, তাকাতে ভয় হয়। পোড়া ঘায়ের উপর স্থানীয় কোনো মলম লাগানো হয়েছে।

লোকটার আগুনে ঝল্‌সানো পিঠ দেখেই হয়তো ফিরে আসতাম। হঠাৎ অজ্ঞান অবস্থাতেই যন্ত্রণায় কাতরে লোকটা চিত হবার চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে তার মুখ দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

এ যে লি-সিন।

আমাদের কুহকের দেশের সেই ভয়ংকর অভিযানে সঙ্গী ও সহায়, ভুলক্রমে সন্দেহ করে আমি যার প্রতি একদিন চরম অবিচার করেছিলাম।

নিয়তির কী আশ্চর্য সংঘটন! লি-সিন হঠাৎ আমাদের এই নতুন অভিযানের পথে এই অবস্থায় উদয় হবে কে ভাবতে পেরেছিল?

মামাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি না হলে আমি হয়তো মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই ফেলতাম, কিন্তু মামাবাবুর চোখের ইশারায় বুঝলাম, লি-সিনকে যে আমরা চিনি একথা প্রকাশ করতেই তিনি চান না।

মামাবাবুর এই অদ্ভুত খেয়ালে অত্যন্ত বিস্মিত হলেও নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মামাবাবু সোজা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ টাট্টুতে চেপে লুয়ং পাহাড়ে রওনা হবেন, এটা কিন্তু ভাবতে পারিনি। লি-সিনের শুশ্রূষার চেষ্টা না হয় নাই করা গেল, তার জন্যে লোকের অভাব হবে না বলে মনে হয়, কিন্তু লি-সিনের কাছে ড্র্যাগনের রহস্য জানবার জন্যে তার জ্ঞান হবার অপেক্ষায় থাকা আমাদের উচিত ছিল না কি?

তা ছাড়া ড্র্যাগনের রহস্য যাই হোক, লি-সিনের মতো আমাদের বিশ্বস্ত অনুচরের কাছে ওই অঞ্চলের কিছু সংবাদ তো পাওয়া যেত। এই সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ অবহেলা করার সত্যি কোনো মানেই খুঁজে পেলাম না।

pathagar.net

কলকাতা থেকে বুনো হাঁসের রহস্য সন্ধানের নামে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন সত্যিই এই অভিযান এমন সাংঘাতিক রূপ নেবে ভাবিনি। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ছেলেখেলা বলেই মনে হয়েছিল।

মিস্টার মরগ্যান তখন অজানা আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন সত্য, কিন্তু তাঁর দুর্ঘটনাটার সঙ্গে আমাদের অভিযানের কোনো সম্পর্ক আছে বলে সত্যিই তখন ভাবিনি।

এখন কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, মরগ্যানের ওপর আক্রমণ, লি-সিনের আগুনে ঝলসে নান জনপদে এসে আশ্রয় নেওয়া, জীবন্ত ড্র্যাগন সম্বন্ধে এ অঞ্চলের গুজব—কোনোটাই অবান্তর ঘটনা নয়। কী একটা জটিল দুর্বোধ যোগসূত্র এসবের মধ্যে আছে!

কী সে যোগসূত্র? এ সমস্ত রহস্যের আসল মূল কী?

মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এই কয়দিনে তিনি যেন আরেক মানুষ হয়ে গেছেন। অবিরাম অক্লান্তভাবে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকে লক্ষ্য তাঁর নেই। লুয়ং পাহাড়ই এখন তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, সেখানে না পৌঁছোনো পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

কলকাতা থেকে এ অভিযানে বার হবার সময় থেকেই তাঁর এই অসাধারণ একাগ্রতা অবশ্য আমার লক্ষ করা উচিত ছিল। কোনো নিষেধ-বাধা তিনি মানেননি, কোনোকিছু তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। মিস্টার মরগ্যান যখন হাসপাতালে মুমূর্ষ তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা পর্যন্ত তিনি করেননি, পরম বিশ্বস্ত অনুচর লি-সিনকে এতদিন বাদে এমন বিপন্ন অবস্থায় দেখেও তাকে না দেখার ভান করে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন! কোনোমতে বিলম্ব যেন তাঁর সইছে না!

কী তিনি মনে মনে ভেবেছেন কে জানে? কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমার ও মংপোর অবস্থা তো কাহিল। মামাবাবু যেন অন্য মানুষ! এই আয়েশি দেহে এত শক্তি ও সহিষ্ণুতা কোথায় যে লুকিয়ে ছিল কে জানে? কোথায় গেছে তাঁর ঘুম আর বিশ্রাম আর খাওয়াদাওয়া! শুধু এগিয়ে চলো আর এগিয়ে চলো।

সে এগিয়ে চলার রীতিও আবার তাঁর খেয়াল অনুযায়ী!

অশ্বত্থামা যে টাট্টু ও লোকজন সঙ্গে দিয়েছিল, দু-দিন দু-রাত্রি তাই নিয়ে অগ্রসর হবার পর, হঠাৎ একদিন ভোর রাত্রে মামাবাবু গায়ে হাত দিয়ে নিঃশব্দে আমাদের জাগিয়ে তুললেন।

শীতকাল তখন শুরু হয়ে গেছে। যে পাহাড়ের অঞ্চলে আপাতত আমরা এসে পড়েছি, সেখানে ভোরের ঠান্ডাটা মারাত্মক রকমের।

এই শীতে মোটা কম্বলের তলায় আরামের শয্যা ছেড়ে ওঠা যে কী কষ্টকর তা বোঝাবার প্রয়োজন নেই, তবু মামাবাবুর আদেশে উঠতেই হল।

অন্যান্য অনুচরেরা তখন ঘুমোচ্ছে। তাদের কিছু না জানিয়ে, নিতান্ত দরকারি কয়েকটি জিনিস ও যথাসম্ভব কম্বল টাট্টুর পিঠে চাপিয়ে মামাবাবুর ইঙ্গিতে বেরিয়ে পড়লাম।

খানিক দূর গিয়েই মামাবাবু সোজা ও বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের পথ ধরলেন।

এতক্ষণ কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিনি। এবার কৌতূহল আর দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরকম করে লুকিয়ে পালিয়ে এলে কেন বলো তো?'

মামাবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'যে কারণে লুকিয়ে পালাতে হয়!'

কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? আমাদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা ছিল নাকি? এই এতখানি রাস্তায় কোনো বিপদ তো হয়নি!'

'হয়নি বলেই হবে না এমন কোনো মানে আছে?'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'তোমার দার্শনিকতা রেখে দাও। হঠাৎ এতকাল পরে আমাদের বিপদ ঘটাতে চাইবে কে?'

তেমনি সংক্ষেপে জবাব এল, 'যারা আমাদের এতকাল পরে বিপজ্জনক বলে মনে করছে।'

মামাবাবুর কাছে আপাতত কোনো কথাই বার করা যাবে না বুঝে একটু রাগ করেই টাট্টুটাকে সবেগে চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

রীতিমতো পাহাড়ের দেশে এবার এসে পড়েছি। উপত্যকাটি যেন বিশাল ধাপে ধাপে ক্রমশ বিরাট পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। এইরকম ধাপে ধাপে না উঠলে এ উপত্যকা কখনো চাষের উপযোগী হত না। প্রকৃতির আসল রূপ এখানে কঠোর, কিন্তু মানুষ নিজের জোরে যেন তার কাছে অনিচ্ছার দান আদায় করে নিচ্ছে।

pathagar.net

যত এগিয়ে চলছিলাম ততই সমস্ত দেশটার উপর একটা ভয়ংকর অভিশাপের ছায়া যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম।

বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত ধানের খেত—কিন্তু অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে। এক-একটা গ্রাম চোখে পড়ছে। কিন্তু সে গ্রামে মানুষজন নেই। চাষিরা যা-কিছু আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে নামহীন আতঙ্কে যেন হঠাৎ পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই জনশূন্য অভিশপ্ত দেশের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দিনের আলোতেও যেন নামহীন একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা মনের ভিতর জাগতে থাকে।

চারধারে বিরাট যে অভ্রভেদী পাহাড়গুলি এ উপত্যকাকে ঘিরে আছে, মনে হয় সেগুলি যেন মূর্তিমান নিষেধের প্রাচীর। দেবতার কোপ যে এই উপত্যকার উপর পড়েছে, ভ্রূকুটি-ভীষণ পাহাড়গুলিতে তারই যেন নির্দেশ!

সারাদিন অক্লান্তভাবে পথহীন মাঠ-বনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম। মাঝে শুধু একটু আহার করবার মতো অবসর মামাবাবু আমাদের দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, এতখানি পথের মধ্যে দু-একটি পাখি ছাড়া কোনো জনপ্রাণী আমাদের চোখে পড়েনি।

সন্ধ্যায় উপত্যকার দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে আমাদের যাত্রা থামল। উপত্যকার দ্বিতীয় স্তরটি খুব বেশি চওড়া নয়। অত্যন্ত বন্ধুর হলেও এখানেও ধানের চাষ হয়। নীচের স্তর থেকে দু-হাজার ফুট উঁচু বলে এখান থেকে সমস্ত নীচের উপত্যকাটি ছবির মতো বেশ ভালোরকম দেখা যায়।

দ্বিতীয় স্তরের পরই পাহাড় প্রায় খাড়াভাবে মেঘলোকে উঠে গেছে। ছোটো-বড়ো পাথরের স্তূপ ও ঢিবি দ্বিতীয় স্তরটিতে বড়ো কম নেই।

এইরকম একটি পাথরের স্তূপের পাশে আমাদের রাতের মতো ডেরা বাঁধবার ব্যবস্থা করে, মামাবাবু হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন।

মংপো আমাদের তিনটি টাট্টুকে দড়ি সমেত কয়েকটা পাথরের সঙ্গে বাঁধতে যাচ্ছিল। মামাবাবু তাকে নিষেধ করে হঠাৎ গলার দড়ি খুলে এক-এক করে তিনটি টাট্টুকে পিছনে চাবুক মেরে ছেড়ে দিলেন।

টাট্টুগুলোও যেন প্রথমে এই ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় চাবুক পড়ার পর আর তাদের কিছু বলতে হল না। পাথরের পথে খটাখট্ খুরের শব্দে নিস্তব্ধ উপত্যকা কাঁপিয়ে তারা সবেগে নীচের দিকে নামতে নামতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'করলে কী, মামাবাবু? এই বিপদের দেশে ওই বাহন কটিই যে আমাদের ভরসা।'

মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'কটা টাট্টুর ভরসায় কি এই বিপদের দেশে এসেছি বলতে চাস?'

'কিন্তু তা বলে ওদের ছেড়ে দেবার কী মানে হয়!'

'ছেড়ে দিলাম ওরা নিজেদের ঘর চিনে ঠিক ফিরে যাবে বলে।'

আরও বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তারপর? অশ্বত্থামা আর তার লোকেরা কী ভাববে! তারা নিশ্চয় মনে করবে আমাদের কোনো সাংঘাতিক বিপদ হয়েছে।'

'তাই মনে করাতেই তো আমি চাই।'

'তার মানে?'

'তার মানে এখন থেকে আমাদের অজ্ঞাতবাস শুরু। আমরা যে বেঁচে আছি, একথা কাউকে জানাতে চাই না।'

'তাও কী দরকার?'

মামাবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আমার তো তাই ধারণা।'

pathagar.net

'তাহলে তুমি ড্র্যাগনের কিংবদন্তির ভিতর একটু সত্য আছে বলে বিশ্বাস কর?'

মামাবাবু আমায় একেবারে অবাক করে বললেন, 'কিছু না, আমি তার সবটাই সত্যি বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস, ড্র্যাগন আমরা শিগ্‌গিরই দেখতে পাব।'

আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বার হল না। বিংশ শতাব্দীতে মামাবাবুর মতো বৈজ্ঞানিক মনোভাবের লোক জীবন্ত ড্র্যাগনে বিশ্বাস করে এই অসম্ভব কথা শুনে আরও কতক্ষণ আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম বলতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ আমাদের পিছনে মংপো চেঁচিয়ে উঠল, 'জ্বালা করছে! জ্বালা করছে!'

জ্বালা করছে কী? বিষাক্ত কিছু কামড়াল নাকি?

সভয়ে আমরা তার কাছে ছুটে গেলাম। মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় জ্বালা করছে? কী কামড়াল দেখেছিস?'

মংপো উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বলল, 'কামড়ে না, কামড়ে না। জ্বালা করছে, ওই পাহাড় জ্বালা করছে।'

পাহাড় জ্বালা করছে! অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে মামাবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'তাই বল হতভাগা, পাহাড়ের এক জায়গায় আগুন জ্বলছে।'

মংপো অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তো বলি আগুন জ্বালা করছে।'

'তোমার মুণ্ডু জ্বলছে হতভাগা! মামাবাবু ধমকে উঠলেন, 'ফের যদি তুই বাংলা বলেছিস তো দেখবি!'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আগুনটা কিন্তু কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে। জঙ্গলের আপনা হতে জ্বলা আগুন এ নয়, সুতরাং একটু সন্ধান নিতে হবে।'

মংপোকে আমাদের ডেরায় পাহারায় রেখে দুজনে একটি করে বন্দুক নিয়ে সন্তর্পণে এবার সেই আগুন লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম।

খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের ডেরার আধ মাইলের মধ্যেই একটা ছোটো পাহাড়ের পাশে সেটি জ্বলছে। কাছাকাছি আসার পর সেই আগুনের আলোতেই একটি মেটে বাড়ির খানিকটা অংশ ও একটি বিশাল ধানের মরাই দেখা গেল। বুঝলাম—এটি কোনো আড়তদারের কুঠি। আর সকলের মতো এই আড়তদার এখনও বোধ হয় কুঠিতে মজুদ শস্যের মায়া ছেড়ে যেতে পারেনি।

আমি সোজাসুজি কুঠির ভিতরে যাবারই উদ্যোগ করছিলাম।

মামাবাবু আমায় নিষেধ করে বললেন, 'দাড়া, একটু দেখাই যাক না আগে।'

আরও কাছে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বহুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করার পরও কোনো কিছু আমরা দেখতে পেলাম না। লোকজনের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। নিস্তব্ধ নীরব রাত! মাঝে মাঝে জ্বলতে জ্বলতে পোড়া কাঠ ফেটে যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু আমরা শুনতে পাচ্ছি না।

না কথাটা ঠিক হল না। যে উঠোনে এই আগুন জ্বলছিল, তার সামনের একটি ঘর থেকে মাঝে মাঝে কী-একটা অস্ফুট আওয়াজ আসছে না?

মামাবাবুরও সে শব্দের প্রতি মনোযোগ পড়েছে বুঝলাম।

আরও খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবার পর, দুজনে আমরা আঙিনা পেরিয়ে সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

ঘরের দরজা খোলা।

ভিতরে পা দেবার আগেই কিন্তু চমকে উঠতে হল।

মুখ থেকে পা পর্যন্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটি লোক সেখানে পড়ে আছে। মুখের বাঁধনের ভিতর দিয়ে এই লোকটিরই অস্ফুট গোঙানি নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম।

pathagar.net

pathagar.net

লোকটা কে এবং কেন এ অবস্থায় বাঁধা, সেসব কথা বিচার করবার এখন সময় নয়।

তার কাতর দৃষ্টির মিনতি না দেখতে পেলেও আমরা এ সময়ে কোনো প্রকার দ্বিধা নিশ্চয় করতাম না।

মামাবাবু ও আমি দুজনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে এক-এক করে তার সমস্ত বাঁধন খুলে দিলাম।

কতক্ষণ সে এই অবস্থায় পড়ে ছিল কে জানে! আমাদের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমেই সে বলল, 'একটু জল।'

পাশেই একটি জলের কলসি রয়েছে দেখলাম। সেখান থেকে এক পাত্র জল তাকে দেওয়া মাত্র ব্যাকুলভাবে সেটি নিঃশেষ করে সে ধীরে ধীরে ক্ষীণ স্বরে ভাঙা ইংরেজিতে বলল, আপনারা কে জানি না, কিন্তু আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কী বলে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না।

লোকটিকে এতক্ষণ আমরা বেশ ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেছি। সে যে জাপানি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সম্ভবত এটা তারই ধানের কুঠি।

কিন্তু তার নিজের কুঠিতে কে তাকে এমন করে কী উদ্দেশ্যে বেঁধে রেখেছিল?

এই প্রশ্নই তাকে করতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় উত্তরটা আপনা হতেই মিলে গেল!

দরজার দিকে আমরা এতক্ষণ পিছন ফিরে ছিলাম। জাপানি লোকটির মুখ ছিল দরজার দিকে।

হঠাৎ তার চেখে মুখে ভয়ংকর আতঙ্ক ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কণ্ঠে পিছন থেকে শুনলাম—'হিরোতার ইতিমধ্যে নতুন বন্ধু জুটে গেছে দেখছি!'

চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সমস্ত দরজা জুড়ে বিশাল চেহারার এক জোয়ান সাহেব নিষ্ঠুরভাবে আমাদের দিকে বন্দুক তুলে ধরে আছে!

কয়েকটা মুহূর্ত!

তার মধ্যে কত কী যে হয়ে গেল ভাবা যায় না। হিরোতার ভীত চিৎকার শুনতে পেলাম—'ডিক্সন্! এই সেই শয়তান, আমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে এসেছে।'

আমার অবশ হাতটা মেঝেয় রাখা বন্দুকটার দিকে কিছুতেই যেন এগোচ্ছে না মনে হল।

সেই সঙ্গে মামাবাবুর সেই বিশাল দেহ বিদ্যুতের মতো আমার সামনে দিয়ে যেন ছিটকে গেল মনে হল। তারপর একটা সজোরে পতনের শব্দ। খানিকটা ধস্তাধস্তি। তারপরেই দেখা গেল, সেই বিশালকায় শ্বেতাঙ্গকে মেঝেতে চিত করে ফেলে, মামাবাবু তার বুকের উপর চেপে বসে বলছেন, 'শিগ্‌গির দড়ি দিয়ে বাঁধো।'

আমাদের কি তখন আর দুবার বলতে হয়! হিরোতা ও আমি চক্ষের নিমেষে ডিক্সন্‌কে পিছমোড়া করে বাঁধতে লেগে গেলাম।

হিরোতার উৎসাহ দেখে কে! এক-একটা করে বাঁধন দেয় আর বলে, 'শয়তান! আমায় না পুড়িয়ে মারবার জন্যে আগুন জ্বেলেছিলি! আমারই কুঠিতে? আজ তোকেই তোর নিজের জ্বালা আগুনে পুড়িয়ে মারব।'

ডিক্সনের মুখ অপমানে যন্ত্রণায় তখন রাঙা হয়ে উঠেছে কিন্তু তবু তেজ তার কমেনি। হিরোতার প্রতি কথার উত্তরে সে শুধু ইংরেজিতে একটা কথা বলে, 'শুয়ার!'

ডিক্সন্‌কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাগের চোটে হিরোতা তাকে সত্যিই তখুনি আগুনের কাছে টেনে নিয়ে যায় আর কি!

মামাবাবু তখন হেসে বাধা দিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা কী সব শুনি আগে।'

হিরোতা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'শোনবার কিছুই নেই! এ শয়তানকে যত তাড়াতাড়ি

নিকেশ করে দেওয়া যায় ততই ভালো। জানেন, ও আজ আমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার জন্যে ওই আগুন জ্বেলেছিল।'

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কেন? তোমার ওপরই বা ওর এত আক্রোশ কীসের?'

'আক্রোশ? আক্রোশ টাকার জন্যে!' হিরোতা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'আপনারা জানেন না এদেশের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে আমার মতো কত নিরীহ জাপানি কুঠিওয়ালার ও সর্বনাশ করেছে! ভয় দেখিয়ে, দরকার হলে খুন করে, ও টাকা লুঠ করেছে—এই ওর পেশা। নইলে এই নির্জন দেশে ও কী জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে করেন?'

'কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, ডিক্‌সন্ নামে একজন খনিতত্ত্ববিদ্ এ অঞ্চলে ছিলেন!'

'হ্যাঁ এই সেই ডিক্‌সন্! কিন্তু ওর খনি হল আমার মতো কুঠিওয়ালাদের গুপ্তধনের খনি। আমাকে আজ সেই জন্যেই ও বেঁধে পোড়াতে যাচ্ছিল। আমার অনেক কষ্টে জমানো ব্যবসার টাকা ও তো সব নিয়েছেই, তার উপর ওর ধারণা—আমার কোথাও টাকা লুকোনো আছে। সেই লুকোনো টাকার সন্ধান বার করবার জন্যে ও আমায় জ্যান্ত পোড়াবার আয়োজন করেছে। এবার নিজের দাওয়াই ও একবার নিজেই চেখে দেখুক।'

মামাবাবু হিরোতার উত্তেজনায় আবার হেসে ফেলে বললেন, 'আচ্ছা, সে ব্যবস্থা তো যখন হোক করলেই হবে। আপাতত দিন কতক ওকে এই অবস্থায় বেঁধে রাখা যাক। আমার মনে হয়, ওর এই লুঠ করা পেশার সঙ্গে আরও কিছু রহস্য জড়ানো আছে। সেগুলো আমাদের জানা দরকার।'

হিরোতা একটু হতাশভাবে বলল, 'রহস্য তো সব জলের মতো পরিষ্কার! খুনে ডাকাতের আবার রহস্য কী?'

মামাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, যত খারাপই হোক, একজন ইংরেজ এই দূর দুর্গম দেশে শুধু ডাকাতি করতে আসবে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'ইংরেজ!'—হিরোতা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'ইংরেজ আপনি কোথায় দেখলেন? ও তো রুশ! জাপানিদের চিরকালের শত্রু। ওর আসল নাম হল ডিনিস্কি! ও নাম ভাঁড়িয়ে ডিক্‌সন্ বলে পরিচয় দেয়।'

মামাবাবু এবার ডিক্‌সনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে?'

মনে হল চাপা রাগে ডিক্‌সনের মুখ দিয়ে যেন কথাই বেরোতে চাইছে না! আমাদের দিকে আগুনের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অতি কষ্টে যেন বলল, 'তোমাদের মতো পশুদের আমি উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ করি!'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'তাহলে বাধ্য হয়েই তোমাকে আমাদের বন্দি করে রাখতে হবে।'

হিরোতা একবার শেষ চেষ্টা করে বলল, 'আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সুতরাং আপনাদের ওপর আমি কথা কইতে চাই না। কিন্তু ও শয়তান ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবে দেখবেন!'

হিরোতার কথা কদিনের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে জানত!

কিন্তু তার আগেই কয়েকটি ঘটনা ঘটল, যার কাছে ও ব্যাপারও নিতান্ত তুচ্ছ।

সেই রাত্রি থেকেই হিরোতার আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমরা সময়মতো এসে না পড়লে ডিক্‌সন্ যে তাকে পীড়ন করে খবর বার করবার জন্যে সত্যি পুড়িয়ে মারত, এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমাদের কী করে খুশি করবে, সে যেন ভেবে পায় না। আমাদের কোনোরকম ওজর-আপত্তি না শুনে, সে আমাদের জোর করেই তার কুঠিতে আশ্রয়

pathagar.net

নিতে বাধ্য করেছে। সে নিজেও এখানকার পাত্তাড়ি গুটিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে চলে যাবে। আর সব লোক ভয়ে এ-দেশ ছেড়ে যাবার পর দুটি মাত্র শান চাকর তার সঙ্গে ছিল। দুজনকে সে নান থেকে যেকোনোরকম বাহন জোগাড় করে আনতে পাঠিয়েছে। তারা বাহন নিয়ে ফিরে এলেই, সে তার যা-কিছু সম্পত্তি নিয়ে এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে সরে পড়বে। আমরা যখন খেয়াল বশে এখানে এসেই পড়েছি, তখন যে-কদিন সম্ভব সে যেন আমাদের সেবা করতে পায়—এই হল তার বক্তব্য।

আমাদেরও এ অভিশপ্ত দেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে চলে যাবার জন্যে সে অনুরোধ বড়ো কম করেনি। কোনোমতে আমাদের রাজি করাতে না পেরে অবাক হয়ে শেষে জিজ্ঞাসা করল, 'কী জন্যে, আপনারা এই সর্বনাশের জায়গায় এসেছেন বলতে পারেন? যদি বলেন শিকারের জন্যে, তাহলে বলব এখানে একটা বুনো হাঁসের দেখাও তো পাবেন না!'

মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমাদের এখানে আসবার আসল কারণ তুমি ধরে ফেলছ।'

হিরোতা অবাক হয়ে বললে, 'কীরকম?'

মামাবাবু তারপর আমাদের অভিযানের প্রথম সূত্রপাত কী করে হয় তা বর্ণনা করে বলেছেন, যাযাবর হাঁস পর্যন্ত কেন এখানে নামে না, তাই সন্ধান করতেই আমাদের এখানে আসা।

খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে হিরোতা বলেছে, 'বলিহারি আপনাদের কৌতূহল আর দুঃসাহস। কিন্তু আপনারা কি কিছুই জানেন না? কেন এ-দেশ আজ জনশূন্য, কেন আমার মতো অসংখ্য হতভাগ্যকে সর্বস্ব ফেলে চলে যেতে হচ্ছে, কেন আকাশের পাখি পর্যন্ত এ উপত্যকার উপর দিয়ে সভয়ে উড়ে যায়, তার কি কিছুই শোনেননি?'

মামাবাবু বলেছেন, 'শুনেছি—নান-এ এসেই শুনেছি। কিন্তু যে ড্র্যাগনের ভয়ে সমস্ত দেশের লোক পলাতক, এ কয়দিনে আমরা তো তার চিহ্ন দেখতে পেলাম না!'

হিরোতা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছে, 'দেখতে যে পাননি, সেটা আপনাদের সৌভাগ্য মনে করুন। তবে এ সৌভাগ্য বেশি দিন নাও থাকতে পারে তাও বলে দিচ্ছি।'

মামাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তুমি কি স্বচক্ষে কখনো দেখেছ?'

হিরোতার স্বর আতঙ্কে সহসা রুদ্ধ হয়ে গেছে, 'দেখেছি।'

তারপর যেন এ প্রসঙ্গ অসহ্য বলেই সে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে গেছে।

মামাবাবু খানিক নিস্তব্ধ হয়ে থাকার পর অনেকটা নিজের মনেই বলেছেন, 'একটা ব্যাপার কিছুতে আমি বুঝতে পারছি না।'

আমি উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কেমন করে এ যুগে ড্র্যাগনের অস্তিত্ব সম্ভব—তাইতো?'

মামাবাবু মাথা নেড়ে বলেছেন, 'না, আমি বুঝতে পারছি না ডিক্সন্-এর আসল রহস্যটা কী?'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'ড্র্যাগনের চেয়ে তোমার চোখে ডিক্সন্-এর রহস্যটাই বড়ো হল? তারই জন্যে বুঝি রোজ তার খাবার নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা কর। কিন্তু এতদিন বন্দি হয়েও তার তেজ তো দেখি কিছুমাত্র কমেনি!'

'না, তার কোনো লক্ষণ দেখছি না।'—বলে মামাবাবু কী ভাবনায় এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন যে, তাঁকে আর বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমি হিরোতার খোঁজে বেরিয়ে গেছি।

দুজনে প্রায় সমবয়েসি বলে হিরোতার সঙ্গে এ কয়দিনেই আমার বেশ বন্ধুত্বই হয়ে গেছে বলা চলে। হিরোতা নেহাত অশিক্ষিত মূর্খ ধানের আড়তদার নয়। নিজেই সেকথা গর্ব করে বলে, 'এই বিদেশে চালের কুঠিতে পড়ে থাকি বলে আমায় মুখ্খু ভেবো না; ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

pathagar.net

আমি দস্তুরমতো পড়াশুনো করেছি। তোমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের কবিতাও আমার পড়া। অবশ্য আমাদের নোগুচি ঢের ভালো লেখেন।'

আমি হেসে বলি, 'তাহলে রবীন্দ্রনাথ পড়ে তো তুমি সব বুঝেছ। তোমাদের জাপানিদের একটা মহৎ দোষ কী জানো? অবশ্য সেটা তোমাদের উন্নতিরও কারণ!'

হিরোতা তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে, 'কী?'

'নিজেদের অন্ধ স্তুতি। নিজেদের দোষ তোমরা দেখতে পাও না।'

'কী আমাদের দোষ, একটা দেখাও,' ও প্রায় উগ্রভাবে বলে।

'দোষ তোমাদের কি কিছু নেই?'—আমি হেসে বলি, 'দুর্বল পেয়ে এই চীনের ওপর চড়াও হওয়াটা খুব একটা মহত্ত্ব বোধ হয়!'

হিরোতা খানিক আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, 'জাপানের চীন-আক্রমণ তাহলে তুমিও অন্যায় মনে করো?'

'নিশ্চয় করি! কী অধিকারে আরেকটা জাতির স্বাধীনতা তোমরা কেড়ে নিতে চাও?'

হিরোতা মাথা নিচু করে বলে, 'সত্যি ভাই, নিজের দেশের এই কলঙ্কে আমি যে কতখানি লজ্জিত, তা বলতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কী, পাছে নিরীহ নিরপরাধ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে হয় বলেই—আমি এই দুর্গম প্রবাসে অত্যন্ত ছোটো কাজ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

হিরোতাকে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিয়ে আমি বলি, 'না, না, তুমি আমার কথায় কিছু মনে কোরো না। জাপানিদের সবাই যে সাম্রাজ্য লোলুপতায় অন্ধ নয়, তা আমি জানি। জাপানি, জঙ্গিনেতাদের এই আচরণে জাপানের অনেকেই মনে মনে দুঃখিত।'

হিরোতা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ় বেদনারস্বরে বলে, 'জাপানিরা যে সত্যি কত বড়ো জাত, তা আশা করি তোমায় দেখাবার সৌভাগ্য একদিন হবে।'

আপাতত হিরোতার খোঁজে বেরিয়ে তাকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলাম না। কুঠির কোণের দিকের মজবুত একটি ঘরে ডিক্‌সন্‌কে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মংপো ঘরের বাইরে পাহারায় থাকে। তাকে জিজ্ঞাসা করেও হিরোতার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। হিরোতা কোন দিকে গেছে সে দেখেনি।

হিরোতা হঠাৎ গেল কোথায়? আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাকে একটু বেশিরকম উত্তেজিত মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু কুঠির এলাকা ছাড়িয়ে কোনো কারণেই কোথাও যাবার লোক সে তো নয়! স্বভাবত তাকে একটু ভীরু বলেই আমার মনে হয়েছে। নেহাত ব্যবসার দায়ে সে এই বিপজ্জনক জায়গায়, তার অনুচরদের নান থেকে ফেরার আশায় এ-কয়দিন পড়ে আছে। পারতপক্ষে কুঠির এলাকা ছেড়ে সে বেরোতে চায় না এটা আগেও লক্ষ করেছি।

মংপোর কাছে হিরোতার কোনো খোঁজ না পেয়ে অন্য দিকে তাকে সন্ধান করতে যাচ্ছি, এমন সময় ডিক্‌সনের ঘরের দরজায় পরপর কয়েকটা ধাক্কার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

'ব্যাপার কী মংপো?'

মংপো সভয়ে বলল যে, সারাদিন ডিক্‌সন্‌ থেকে থেকে ওইরকম পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা দেয়, জানলা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করে।

কৌতূহলভরে জানলার কাছে গিয়ে এবার ভিতরে তাকালাম। দেখলাম, ডিক্‌সনের হাতের বাঁধন ছাড়া আর সবই খুলে দেওয়া হয়েছে। বিশাল দুশমনের মতো চেহারা নিয়ে, সে হিংস্র শ্বাপদের মতো যেরকম অস্থিরভাবে ঘরের ভিতর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, তাতে সত্যি ভয় হয়

pathagar.net

এ ঘরের দরজা-জানলা অত্যন্ত মজবুত সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই অসুরকে তবুও বিশ্বাস কী! আমি জানলায় যাবামাত্র যেরকম হিংস্র অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল, তাতে মনে হল একবার ছাড়া পেলে সে বোধ হয় আমাদের ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম ডিক্সনের বাঁধন আরও শক্ত করার কথা মামাবাবুকে অবিলম্বে জানাতে হবে। শুধু হাতের বাঁধনের পর নির্ভর করে তাকে এভাবে ছেড়ে রাখা যে নিরাপদ নয়—সে বিষয়ে মামাবাবুকে সাবধান না করলেই নয়।

কিন্তু পর পর আরও উত্তেজনাময় কয়েকটি ঘটনায় মামাবাবুকে একথা জানাবার অবসর আর পেলাম কোথায়?

যে পাথুরে টিবির গায়ে ধানের কুঠিটি অবস্থিত, হিরোতার সন্ধানে চারধারে ঘুরে তখন ফিরছি, হঠাৎ একটা ভেঙে-পড়া জীর্ণ ঘরের দিকে নজর পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। ঘরটি এককালে গোলা হিসেবেই ব্যবহার করা হত বলে মনে হয়। তারপর বহুদিনের অযত্নে, অব্যবহারে সেটি সকল কাজের বার হয়ে গেছে?

এই ধসে-পড়া পরিত্যক্ত ঘরের ভিতর থেকে কী যেন নাড়াচাড়ার শব্দ পেয়ে অবাক হয়ে কাছে এগিয়ে গেলাম।

ভাঙা দরজাটা হাট করে খোলা হলেও ভিতরের অন্ধকারে কিছু ভালো করে দেখা গেল না। কিন্তু সেখানে কেউ যে আছে, এটা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম।

'ভিতরে কে?'—জিজ্ঞাসা করলাম কড়া গলায়।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। গলা আরও চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে ভিতরে?'

হঠাৎ ভিতর থেকে হিরোতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে? মিস্টার সেন! শিগ্‌গির ভিতরে আসুন। একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছি।'

এবার ভিতরে ঢুকে পড়ে দেখলাম, ছোটো একটা হাতবাক্সের মতো জিনিস হিরোতা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে। আমি কাছে আসতেই সে উত্তেজিতভাবে বলল, 'এটা কী বুঝতে পারছেন?'

যন্ত্রটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বললাম, 'পোর্টেবল ট্রান্সমিটার বলেই তো মনে হচ্ছে, বেতারবার্তা পাঠাবার এ-যন্ত্র এখানে এল কী করে?'

'তাই ভেবেই তো অবাক হচ্ছি। এ ঘরটায় বহুকাল ধরে কেউ পা দেয় না, এককালে শাবল কোদাল প্রভৃতি রাখা হত। আজকাল তাও হয় না। চলে যাবার আগে কোনো দরকারি জিনিস ফেলে যাচ্ছি কি না দেখবার জন্য নেহাত খেয়াল ভরেই ঢুকেছিলাম। ঢুকেই দেখি সামনে এই যন্ত্রটি!' —হিরোতার গলা তখনও উত্তেজনায় কাঁপছে।

'এখানে এরকম যন্ত্র লুকিয়ে রাখতে পারে কে? রাখার মানেই বা কী?'

হিরোতা গম্ভীর হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বলে, 'এ যন্ত্র রাখার মানেটা এখন কিছু বুঝতে পারছি না; কিন্তু কে যে রেখেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'তোমার কি ডিক্সন্‌কে সন্দেহ হয়?'

'নিশ্চয়! সে ছাড়া আর কে। আপনার মামাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। শুধু ডাকাতিই তার পেশা নয় বলে এখন মনে হচ্ছে। তার চেয়ে গভীর কোনো শয়তানির মধ্যে সে আছে। কিন্তু সেটা যে কী, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।'

pathagar.net

ওই পোর্টেবল ট্রান্সমিটারটি নিয়েই সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে হিরোতার কুঠির একটি ঘরে বসে আমাদের আলোচনা চলছিল। সারাদিন এই যন্ত্রটিই আমাদের উত্তেজনার খোরাক জুটিয়েছে। মামাবাবুকে যন্ত্রটি এনে দেখাবার পর তিনি মন্তব্য কিছু করেননি বটে, কিন্তু সেই থেকে যেরকম

গম্ভীর হয়ে গেছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় যে আপাতত রহস্যকে আরও জটিল করে তুললেও, আমাদের মতো তিনিও এই জিনিসটিকে অত্যন্ত মূল্যবান একটি সূত্র বলে মনে করেন।

সন্ধ্যার পরেই আমাদের প্রতিদিনকার মতো খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কুঠির সবচেয়ে প্রশস্ত ঘরটিতে একটি উজ্জ্বল লাইটের চারধারে বসে আমারা আলাপ করছিলাম। আলাপটা অবশ্য আমার ও হিরোতার মধ্যেই হচ্ছিল।

মামাবাবু আজ যেন অতিমাত্রায় নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন। আমাদের আলোচনায় একবারও যোগ দিতে তাঁকে দেখিনি।

কতকটা তাঁর এই মৌনব্রত ভাঙাবার জন্যেই আমি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, এই ট্রান্সমিটার সম্বন্ধে ডিক্‌সন্‌কে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন?'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'জিজ্ঞাসা করলেই কি সে সব বলে দেবে?'

কথাটা নেহাত নির্বোধের মতো বলে ফেলেছি বুঝে চুপ করে গেলাম। হিরোতা কিন্তু আমাকে সমর্থন করে বলল, 'সে বলতে হয়তো কিছুই চাইবে না, কিন্তু তবু হঠাৎ ট্রান্সমিটারের কথা তুললে মুখের ভাবে সে হয়তো ধরা দিতে পারে।'

'তাতেও আমাদের কী লাভ? ট্রান্সমিটারটি তারই, একথা জেনেও—'

মামাবাবু আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কথা আর তাঁর শেষ করা হল না। দরজা ঠেলে ঝড়ের মতো মংপো এসে ঘরে ঢুকে মামাবাবুর চেয়ারের পাশে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। তাঁর মুখচোখের অবস্থা দেখে আমরা সত্যি অবাক। নিদারুণ একটা আকস্মিক আতঙ্কে সে একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরোচ্ছে না! মামাবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে কী মংপো?

মংপোর শুকনো গলা দিয়ে অনেক কষ্টে যেন বেরোল, 'ড্র্যাগন।'

'ড্র্যাগন!—কোথায় ড্র্যাগন?' আমরা উত্তেজিতভাবে তখন দাঁড়িয়ে উঠেছি।

মংপো কিছু না বলে শুধু বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তিনজনে এবার সবেগে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায় ড্র্যাগন! এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রে তা দেখাই বা যাবে কী করে?

কুঠির বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই কথাই বলতে যাচ্ছি, এমন সময় হিরোতা আমার হাতে টান দিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে এসো। কোথায় মংপো ড্র্যাগন দেখেছে আমি জানি।'

তিনজনে হোঁচট খেতে খেতে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। একটা টর্চ পর্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে আনবার কথা মনে হয়নি।

হিরোতার সঙ্গে যেখানে এসে দাঁড়ালাম, সেটা উপত্যকার দ্বিতীয় ধাপের একপ্রান্তে। দিনের বেলায় এইখান থেকে সমস্ত নীচের উপত্যকাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এখন সব একাকার।

মংপো তখন নেহাত একা থাকবার ভয়েই বোধ হয় আমাদের পিছুপিছু এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। মামাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ভীতজড়িত গলায় সে জানাল যে, ডিক্‌সনের ঘরের কাছে পাহারা দিতে দিতে সে হঠাৎ দূরে নীচের উপত্যকায় যেন একটা আগুনের হলকা দেখতে পায়। কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে সে এই দিকে এগিয়ে আসে। তারপর অন্ধকারে দ্বিতীয় একটি আগুনের হলকার সঙ্গে সে নীচের উপত্যকায় স্পষ্ট এক বিরাট ড্র্যাগন দেখেছে।

ড্র্যাগনের ব্যাপারটা তখন গাঁজাখুরি বলেই আমার ধারণা। অন্ধ কুসংস্কারের বশে মংপো কী দেখতে কী দেখেছে মনে করে, আমি তাকে ধমকে বললাম, 'ড্র্যাগন দেখেছিস! ড্র্যাগন কাকে বলে তুই জানিস?'

মংপোকে আর উত্তর দিতে হল না।

সেই মুহূর্তে নীচের উপত্যাকার একটি জায়গা থেকে তীব্র আগুনের হল্‌কা যেন হঠাৎ বিরাট পিচকারির মুখ থেকে ছুটে এল এবং সেই হল্‌কার আলোয় যা দেখলাম, তাতে মনে হল আমার সমস্ত শরীর অবশ করে দিয়ে শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে একটা হিমশীতল ধারা নেমে যাচ্ছে!

এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে এমন ব্যাপার সম্ভব বলে মন কখনো মানতে চায় না, কিন্তু নিজের চোখকেই বা অবিশ্বাস করি কী করে!

নীচে যে প্রাণীটিকে দেখলাম, ড্র্যাগনের পুঁথিগত বর্ণনার সঙ্গে তা মেলে কি না জানি না, কিন্তু ভয়াবহতায় কাল্পনিক ড্র্যাগনের চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়। আকৃতিতে আদিম যুগের বিরাট সরীসৃপের সঙ্গে তার বোধ হয় খানিকটা মিল আছে। তেমনি বুকে হাঁটা, লম্বা, কদাকার, অতিকায় কুমিরের মতো তার চেহারা! শুধু তার সারা অঙ্গ মাছের আঁশের মতো উজ্জ্বল পাতে ঢাকা। সবচেয়ে ভয়ংকর তার মুখ এবং সেখানেই সরীসৃপ বা কোনো জানিত প্রাণীর সঙ্গেই তার মিল নেই। শিংওয়ালা শামুকের মুখ যদি কোনো রকমে হাজার গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এ মুখের বীভৎসতার খানিকটা আদল বোধ হয় তাতে আসে। সেই মুখ দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে যে আগুনের হলকার মতো নিশ্বাস বেরিয়ে আসছে—তাতেই প্রাণীটিকে সাধারণ বলে আর ভাবা যায় না, অলৌকিক কোনো বিভীষিকা বলে মনে হয়।

আগ্নেয় প্রশ্বাস ছেড়ে একবার আমাদের দেখা দিয়েই ড্র্যাগনটি তার কুৎসিত বিশাল দেহটি টেনে নীচের ছোট টিবির আড়ালে চলে গেল। আমরা তখন ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। মামাবাবুই প্রথম সে স্তব্ধতা ভেঙে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ডিক্‌সন্! ডিক্‌সন্! ডিক্‌সনের কাছে এখুনি যাওয়া দরকার!'

মামাবাবুকে এতখানি উত্তেজিত হতে সহজে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর এই অবান্তর কথায় অবাক হয়ে গেলাম, 'কী বলছেন, মামাবাবু? এখুনি ডিক্‌সনের কাছে যাওয়ার কী দরকার পড়ল?'

মামাবাবু ইতিমধ্যেই মংপোকে নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, সেখান থেকেই ব্যস্তভাবে ফিরে বললেন, 'না, না, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। আমায় যেতেই হবে এক্ষুনি। তোমরা পরে এসো।'

মামাবাবু ও মংপো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর, হিরোতা ও আমি হতভম্ব হয়েই খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মামাবাবুর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! ডিক্‌সন্‌কে এরকম একলা ছেড়ে আসা অন্যায় হয়েছে বটে কিন্তু সে তো একেবারে মুক্ত নয়। তা ছাড়া, যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে এখনও আমরা অভিভূত হয়ে আছি, তা থেকে হঠাৎ ডিক্‌সনের কথা মনে হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর নয় কি?

ব্যাপারটা যত অস্বাভাবিকই হোক, মামাবাবুর আশঙ্কা যে অমূলক নয় খানিক পরেই তার শোচনীয় প্রমাণ পাওয়া গেল।

ড্র্যাগনের দেখা আর একবার পাবার আশায় আমরা আরও মিনিট পনেরো বোধ হয় সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে নীচের সেই পাহাড়ের আড়ালে সেই যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর তার দেখা পাওয়া গেল না।

মামাবাবুর জন্যে খানিকটা উদ্বিগ্ন থাকার দরুন আর সেখানে অপেক্ষা করতে পারলাম না, কিন্তু কুঠিতে যখন ফিরলাম, তার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

কুঠিতে ঢুকেই দেখলাম, মামাবাবু গুরুতরভাবে আহত হয়ে বাইরের উঠানে পড়ে আছে। মংপো তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

pathagar.net

ব্যাকুল হয়ে দুজনে কাছে ছুটে গেলাম। মামাবাবুর জ্ঞান নেই। মংপো এলোমেলো ভাবে যা বলল তাতে শুধু এইটুকু বুঝলাম যে, ডিক্‌সন্ কেমন করে আগে থাকতেই হাতের বাঁধন খুলে ফেলে দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। মামাবাবুর সঙ্গে সে যখন কুঠিতে এসে পড়ে তখন ডিক্‌সন্ রেডিও-ট্রান্সমিটারটি নিয়ে পালাবার উপক্রম করেছে।

মামাবাবু তাকে বাধা দিতে গিয়েই এই দুর্দশা। মামাবাবুর মাথায় সজোরে একটি লোহার ডান্ডা মেরে সে ট্রান্সমিটারটি নিয়ে পালিয়েছে।

এই অন্ধকার রাত্রে তার অনুসরণ করা শুধু নিস্ফল নয়, বিপজ্জনক। মামাবাবুকে ধরাধরি করে আমরা তাঁর বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলাম। মাথার আঘাতটা অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়েছে বলেই মনে হল। মাথার পুরু ব্যান্ডেজ রক্তে লাল। কোনোরকম চেতনা তাঁর নেই।

একদিন একদিন করে তিনদিন কেটে যাবার পরেও যখন মামাবাবুর জ্ঞান হল না, তখন একসঙ্গে আমার আশঙ্কা ও আপশোসের সীমা রইল না। ডিক্‌সনের বাঁধন আরও শক্ত করার কথা মনে হলেও কেন আমি মামাবাবুকে তা জানাইনি? তাহলে তো এমন বিপদ ঘটতে পারত না।

মামাবাবুর চিকিৎসার ব্যবস্থাই বা কী করা যায়? এই সুদূর জঙ্গলে কোনো উপায়ই তো নেই! হিরোতার অনুচরেরা ফিরে এলে যেমন করে হোক মামাবাবুকে নান পর্যন্ত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু তাদের তো কোনো পাত্তাই নেই! শেষে এই অজানা পাহাড়ে মামাবাবুর কি বেঘোরে প্রাণ যাবে!

সারাদিন আমি হিরোতার সঙ্গে সেই নির্জন অভিশপ্ত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে হতাশ প্রতীক্ষায় কাটাই। দুঃখে, আপশোসে মামাবাবুর ঘর পর্যন্ত মাড়াতে আমার ইচ্ছে করে না। সেখানে যাবার উপায়ও নেই।

প্রভুভক্ত মংপো সারাদিন হিংস্র বাঘিনীর মতো সে-ঘরের পাহারায় থাকে। আমাদের মামাবাবুকে ছুঁতে পর্যন্ত সে দেয় না। সেদিন আমরা মামাবাবুর সঙ্গে ফিরে এলে এ বিপদ ঘটত না, এই বিশ্বাসেই সে বোধ হয় আমাদের উপর একেবারে আগুন হয়ে আছে! তার সেবা অবশ্যই একটা প্রশংসা করবার জিনিস। কী করে এই অজ্ঞান অসাড় রোগীকে সে যে খাওয়ায়, তা আমরা ভাবতেও পারি না। সে না থাকলে এইরকম রোগীর সেবা আমরা করতে পারতাম কি না সন্দেহ।

চতুর্থদিনেও যখন মামাবাবুর জ্ঞান হল না, তখন সত্যি একেবারে হতাশ হয়ে গেলাম। মংপোর কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হল মামাবাবুকে এক রাত্রের বেশি আর বোধ হয় রাখা যাবে না। হিরোতার অনুচরেরা এখন এসে পড়লেও আর কোনো লাভ নেই। মামাবাবুকে এ অবস্থায় কোথাও সরানো আর সম্ভব নয়। এইখানেই তাঁর শেষ শয্যা তৈরি করতে হবে।

মংপোর বাধা সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকে মামাবাবুর গায়ে হাত দিলাম। গা ঠান্ডা হয়ে আসছে। এ কয়দিন তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখিনি। বুঝলাম জ্বরের অসহ্য উত্তাপ এইবার মৃত্যুর শীতলতায় নেমে যাচ্ছে।

ধরা গলায় একবার ডাকলাম, 'মামাবাবু!'

কোনো সাড়া নেই।

কোনো রকমে কান্না চেপে একেবারে মরিয়া হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নিলাম। হিরোতা এতক্ষণ সঙ্গেই ছিল। সে অবাক হয়ে বলল, 'করছ কী?'

যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম, 'মামাবাবু আর বাঁচবেন না তা বুঝতে পারছি। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণ দিলেন, তা ব্যর্থ হতে আমি দেব না। এই উপত্যকার সমস্ত রহস্য আমি উদ্ধার না করে ফিরব না।'

pathagar.net

'কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'যেখানে সেদিন ড্রাগন অদৃশ্য হয়েছিল সেই পাহাড়ে!'

হিরোতা ব্যাকুলভাবে বলল, 'তুমি পাগল হয়েছ! এই তো সন্ধ্যা হয়-হয়! এমন সময় পাগল না হলে কেউ সেখানে যায়?'

'আমায় পাগলই তুমি ভাবতে পার'—বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। হিরোতা বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

পাহাড়ের পথে অনেক দূর নেমে যাবার পর হঠাৎ পিছনে দ্রুত পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম। দেখি, হিরোতা দূর থেকে ছুটে আসছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে আসবার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে বললাম, 'তুমি যে বড়ো এলে?'

হিরোতা বলল, 'তোমাকে একা ছেড়ে দিই কী করে বলো!'

'যাক, ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি ভেবেছিলাম ততটা সাহস তোমার হবে না।'

হিরোতা রুখে উঠে বলল, 'জাপানিদের তুমি ভীরু মনে করো?'

'না ভীরু মনে করব কেন? তবে অকারণ বিপদ কে-ই বা সাধ করে ঘাড়ে করতে চায়!'

হিরোতা হেসে ফেলে বলল, 'তোমার যদি কারণ থাকে তো আমারও থাকতে পারে।'

যে পাহাড়ের আড়ালে ড্রাগনকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলাম তার উত্তরদিক দিয়ে নীচের উপত্যকায় আমরা যখন নামলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অনেক ওপর থেকে ঠিক ধারণা করতে না পারলেও এখানে নেমে দেখলাম, এ-উপত্যকাটি বেশ বন্ধুর। উঁচু থেকে ছোটো ঢিবি বলে যা মনে হয়েছিল, সেগুলি দেখলাম বেশ বিরাট পাহাড়।

এই উঁচু-নিচু পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে ওঠা-নামা করতে করতে হঠাৎ একজায়গায় পৌঁছে একটি সোজা সমতল রাস্তা পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম! রাস্তাটির একটি বিশেষত্ব সবচেয়ে বিস্ময়কর। রাস্তার বদলে চওড়া একটি গভীর পরিখাই তাকে বলা যেতে পারে। যেন গোপন রাখবার জন্যই মাটি কেটে সেটি নিচু করে তৈরি হয়েছে।

রাস্তাটিতে নেমে অবাক হয়ে হিরোতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী! এখানে এরকম একটা রাস্তা আছে, জানতে?'

হিরোতা আমার মতোই বোধ হয় বিস্মিত হয়েছিল, ধীরে ধীরে বলল, 'এই পাঁচ বছরে তো কোনোদিন জানতে পারিনি।'

সন্ধ্যার আলোতেও আরেকটি ব্যাপার তৎক্ষণাৎ নজরে পড়ায় নিচু হয়ে বসে পড়ে উত্তেজিতভাবে বললাম, 'দেখেছ? স্পষ্ট মোটর টায়ারের দাগ। এ রাস্তা দিয়ে মোটর-লরি যাতায়াত করে! খুব সম্প্রতি করেছে।'

'দাগ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপার তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'হয়তো খানিক পরেই পারব'—বলে দুজনে এবার সেই রাস্তা ধরেই দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম। উত্তেজনায়, মুমূর্ষু মামাবাবুর কথাও তখন মন থেকে মুছে গেছে।

রাস্তাটি ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর খাদে নেমে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। সে পথে পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছোবার আগেই অন্ধকার নেমে এল। গভীর খাদের ভিতর সে অন্ধকার কালির মতো গাঢ়। টর্চ না জ্বেলে আর পথ দেখা যায় না।

হিরোতা হঠাৎ এক জায়গায় বসে পড়ে বলল, 'সত্যি কি তুমি আজ এ রাস্তার শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না?'

একটু বিরক্ত স্বরেই বললাম, 'বলো কী! এমন একটা রহস্যের সূত্র পেয়েও ফেলে চলে যাব! তোমার যদি ভয় করে তো ফিরে যেতে পারো।'

pathagar.net

হিরোতা আর কিছু না বলে মনে হল লজ্জিত হয়েই দ্রুতপদে এগিয়ে চলল। আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম, 'কিছু মনে কোরো না ভাই! নিজের জন্য নয়, মামাবাবুর সম্মানের জন্যই আজ আমার ফেরবার উপায় নেই।'

হিরোতা গম্ভীর মুখে বলল, 'বেশ! ফিরতে তোমার হবে না।'

বেশি দূর তারপর আর যেতে হল না। খাদের রাস্তাটি এইবার দেখা গেল দুটি ভাগ হয়ে গেছে। একটি সুড়ঙ্গপথে সোজা সেই পাহাড়ের ভিতরেই ঢুকে গেছে, আর একটি বাঁদিক দিয়ে পাহাড়টিকে প্রদক্ষিণ করেছে বলেই মনে হল। কোন পথটিতে আগে যাব ভাবছি, এমন সময় স্পষ্ট মোটর-লরির ভারী চাকার আওয়াজে চমকে উঠলাম। যেদিক থেকে আমরা এসেছি, সেই দিক থেকেই লরির আওয়াজ আসছে।

সেখানে পাহাড়ের একটি অন্ধকার ঘুপচি কোণ খুঁজে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দ্রুতবেগে তিনটি বিরাট লরি আমাদের সামনে দিয়ে পর পর সুড়ঙ্গপথে ঢুকে গেল। লরিগুলিতে আলো নেই বললেই হয়। যা দুটি আলো মিটমিট করে সামনে জ্বলছে, তারও উপর দিক ঢাকা যাতে উপরের কোথাও থেকে তা দেখা না যায়। এই সামান্য আলোতেও লরিগুলির আসল স্বরূপ আমি তখন বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। সাধারণ মাল-বওয়া লরি সেগুলি নয়, সেগুলি যুদ্ধের সশস্ত্র মোটর-যান!

হিরোতা আমার মতোই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাকে একটু ঠেলা দিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কী মনে হচ্ছে? এখন কী করবে বলো দেখি?'

'এখন?'—হিরোতা অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলল, 'এখন সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী?'

সুড়ঙ্গপথের ভিতরে কিন্তু আর পৌঁছোতে হল না। অন্ধকারে সন্তর্পণে তার মুখ পর্যন্ত এসেছি, এমন সময় পিঠে একটা শক্ত নলের খোঁচা অনুভব করার সঙ্গে রূঢ় গলায় শুনতে পেলাম, 'তোমার বন্দুকটা দাও।'

প্রথমটা একটু চমকে গেলেও হেসে বললাম, 'কী রসিকতা হচ্ছে, হিরোতা? এটা কি রসিকতার সময়?'

হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে হিরোতা বলল, 'আমাদের রসিকতা একটু বেয়াড়াই হয়ে থাকে। ওটাও আমাদের জাতের একটা দোষ!'

হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ায় ও তার গলার স্বরের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় এবার সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, 'কী , বলছ কী হিরোতা? তুমি তাহলে কি...'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই সে অবজ্ঞাভরে হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ঠিক নিরীহ চালের কুঠিওয়ালা নই। জাপানিরা এই-জঙ্গলের দেশে শুধু চালের কারবার করতে পড়ে থাকে না!'

'সেকথা আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম!'—অন্ধকারে যেন দৈববাণীর মতো কে বলে উঠল!

চমকে আমি অন্ধকারে চারদিকে তাকালাম। একী ভৌতিক ব্যাপার! মামাবাবুর কণ্ঠস্বর এখানে কেমন করে শোনা গেল?

হিরোতা আমারই মতো টর্চ জ্বেলে এবার চারদিকে ঘোরাতেই দেখা গেল, আমাদের অদূরে মংপোকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে মামাবাবু হাসছেন। কোথায় তাঁর সে অজ্ঞান মুমূর্ষু অবস্থা! মাথায় ব্যান্ডেজ দূরে থাক, কোনো আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও অবশ্য নেই, শুধু একটি ছোটো বাক্স।

হিরোতার টর্চের আলোতে তিনি এবার এগিয়ে এলেন।

pathagar.net

হিরোতা তাঁর দিকে তৎক্ষণাৎ পিস্তল তুলে বলল, 'সাবধান মিস্টার রায়, কোনো চালাকির চেষ্টা করবেন না।'

মামাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'চালাকি? না, বন্দুকের বিরুদ্ধে চালাকি করবার মতো আহাম্মক আমি নই। তা ছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছ, এই বাক্সটি ছাড়া কোনো অস্ত্র আমার নেই।'

হিরোতা তীক্ষ্ণ তিক্ত স্বরে বলে উঠল, 'এ ট্রান্সমিটার তাহলে আপনিই লুকিয়ে রেখেছিলেন? ডিক্‌সন্‌ নিয়ে পালায়নি।'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'না, বোধ হয় পালাবার আগ্রহে অত খেয়াল ছিল না।'

হিরোতা আবার বিদ্রুপের স্বরে বলল, 'মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে অজ্ঞান হয়ে থাকার ভান করে আমায় খুব ঠকিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না, মিস্টার রায়।'

'কেন বলুন তো।'—মামাবাবু অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এসে কিছু ভুল করেছি নাকি?'

'তা একটু করেছেন বই কী। এবার ড্রাগনের সুড়ঙ্গে আপনাকে ঢুকতে হবেই যে।'

'তা নয় ঢুকলাম।' মামাবাবু হেসে বললেন, 'এত কষ্ট করে গোপনে আপনারা এই দূর দুর্গম দেশে এত বড়ো গড় তৈরি করেছেন, এত যুদ্ধের মাল জড়ো করেছেন—এসব একবার দেখে যাওয়া উচিত নয় কি?'

'নিশ্চয় উচিত। কিন্তু এ দেখে আর যাওয়া যে কোথাও হবে না মিস্টার রায়! ড্রাগনের সুড়ঙ্গে একবার ঢুকলে যে আর বার হওয়া যায় না।'

'তাহলে আমাদের গিয়ে কাজ নেই'—মামাবাবু এমন ভঙ্গি করে বললেন যে, এই বিপদের মুহূর্তেও না হেসে পারলাম না।

হিরোতা হঠাৎ বিদ্রুপ ছেড়ে রূঢ় স্বরে বলে উঠল, 'যথেষ্ট রসিকতা হয়েছে, মিস্টার রায়! এবার চলুন।'

'যদি না যাই!'

'যদি না যান।'—হিরোতা হঠাৎ পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল্‌ বার করে তাতে ফুঁ দিল। পরমুহূর্তে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ হাজার বাতিতে একেবারে দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠল। তার গুপ্ত অসংখ্য দ্বার থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন প্রহরী বেরিয়ে এল সশস্ত্র।

হিরোতা কিছু বলবার আগেই মামাবাবু তাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার সসম্মানে যাওয়া যেতে পারে।'

সুড়ঙ্গপথের ভিতর দিয়ে কিছুদূর গিয়েই মাথার উপরে আকাশের তারা দেখে বুঝলাম খোলা কোনো জায়গায় এবার এসে পড়েছি। পেয়ালার তলার মতো জায়গাটি চারিদিকে খাড়া পাহাড় দিয়ে ঘেরা বলে বাইরে থেকে কিছুই তার দেখা যায় না। জায়গাটিতে আলোর অভাব নেই। কিন্তু প্রত্যেক আলোর মাথার দিক সযত্নে আবৃত। এই আলোয় যুদ্ধের উপকরণ-সংগ্রহ ও গড়-নির্মাণের যেটুকু আভাস পেলাম, তাতেই বিস্মিত হতে হয়। এই দূর দুর্গম প্রদেশে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে এত বড়ো আয়োজন করা সম্ভব করেছে, তাদের ক্ষমতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

ভিতরের পাহাড়ের গায়ে একটি বাড়ির বেশ প্রকাণ্ড একটি কুঠরিতে কয়েকজন প্রহরীর জিম্মায় আমাদের রেখে হিরোতা একটি দরজা দিয়ে কাকে যেন আহ্বান করতে গেল। মনে মনে বুঝলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা এখুনি এরা স্থির করে ফেলতে চায়। কিন্তু খানিক বাদে যে লোকটির সঙ্গে হিরোতা আবার ঘরে ঢুকল, তাকে সত্যি আমি এখানে দেখবার কল্পনাও করিনি।

pathagar.net

মামাবাবু কিন্তু নিতান্ত সহজভাবেই প্রথম তাকে সম্ভাষণ করে বললেন, 'এই যে অশ্বত্থামা! আপনাকেই আশা করছিলাম।'

'আমাকে আশা করছিলেন!'—অশ্বত্থামা আমারই মতো সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, তা করব না। আপনি যেরকম অতিরিক্ত উৎসাহ ভরে ড্র্যাগনের ভয় দেখিয়েছিলেন, তাতে ওরকম আশা করা স্বাভাবিক নয় কি? যাইহোক, দ্বিতীয়বার আপনার আতিথ্য গ্রহণ করে সুখী হলাম।'

'আমি কিন্তু হলাম না' অশ্বত্থামা গম্ভীরভাবে বলল, 'সেই জন্যেই আপনাদের গোড়া থেকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, অতিথি বেশি দিনের হলে তার সম্মান সব সময়ে রাখা যায় না!'

'বেশি দিনের!' মামাবাবু যেন আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'বেশিদিন কোথায়, আমাদের আট ঘণ্টার মধ্যেই এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে যে।'

অশ্বত্থামা ও হিরোতা দুজনেই এবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। অশ্বত্থামা বলল, 'আট ঘণ্টা কী বলছেন। আট বছরে এ গড় থেকে বেরোতে পারলে ধন্য মনে করবেন।'

'না, না, লাও-সর্দার' মামাবাবু গম্ভীর ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, 'তা কি হয়! ভোরের মধ্যে আমার লুয়ং প্রাবাং না পৌঁছোলেই নয়।'

অত্যন্ত রেগে উঠে অশ্বত্থাম এবার ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করুন মিস্টার রায়! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কোথায় আপনি আছেন!'

মামাবাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন, 'আপনারাও আমার হাতের বাক্সটার কথা যে ভুলে যাচ্ছেন।'

'হাতের বাক্স!'—হিরোতা হঠাৎ চমকে উঠল। তারপর ব্যাপারটা যেন উপলব্ধি করে রাগে চিৎকার করে বলল, 'শয়তান। তুমি বেতারে এই গড়ের কথা তাহলে কোথাও জানিয়েছ।'

'উঁহুঃ—উহুঃ—এত বোকা আমি নই, হিরোতা! আমার এখনও প্রাণের মায়া আছে। ইন্দোচায়না বা বর্মার গভর্নমেন্ট আমার কথায় এখানে এই গড়ের খোঁজ নিতে লোক পাঠালে আমার মাথাটা যে ধড়ে থাকবে না, এটা আমি বিলক্ষণ জানি। তাই আমি যন্ত্রটির সাহায্যে

pathagar.net

নিজেদের নিরাপদ করবার ব্যবস্থা করেছি। কোনো গোপন খবর এখনও জানাইনি।'

'কী আপনার ব্যবস্থা, শুনি।'—অশ্বত্থামা উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

মামাবাবু শান্তভাবে বললেন, 'আমি শুধু আনাম-সরকারকে আমার জন্যে মেকং নদীর ধারে লুয়ং প্রাবাং-এ একটি এরোপ্লেন কাল ভোর পর্যন্ত রাখতে বলেছি। আনামের সরকারি মহলে আমার কিছু সুনাম আছে। সুতরাং এরোপ্লেন একটি সেখানে থাকবে বলে বিশ্বাস করতে পারেন।'

'সে এরোপ্লেন বৃথাই আপনার জন্য অপেক্ষা করবে!' হিরোতা গর্জে উঠল।

মামাবাবু অবিচলিতভাবে বললেন, 'ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমার দেখা না পেলে তাদের এই উপত্যকায় আমায় খুঁজতে আসতেও বলে দিয়েছি।'

হিরোতা আবার রাগে উন্মত্ত হয়ে বলল, 'শয়তান! তাহলে তোমাদের গুলি করে মারব। কুকুর দিয়ে সকলকে খাওয়াব।'

'তাতে বিশেষ কোনো লাভ হবে কি? এধারে আমার খোঁজে ফরাসি প্লেন তাহলে আসবেই, এবং এ গড়ও তাদের কাছে লুকোনো থাকবে না। তার চেয়ে আমায় ভোরের আগে লুয়ং প্রাবাং পৌঁছে দেওয়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে সব দিক এখন রক্ষা হতে পারে।'—অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথাগুলি বলে মামাবাবু মৃদু হেসে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

হিরোতা ও অশ্বত্থামা এবার আর রেগে উঠতে পারল না। দুজনে দূরে সরে গিয়ে খানিক মৃদুস্বরে কী পরামর্শ করে এসে বলল, 'আপনাকে বিশ্বাস কী? আপনি একবার ছাড়া পেলে যে এ গড়ের কথা কাউকে পরে জানাবেন না, তা আমরা কী করে বিশ্বাস করব?'

'বিশ্বাস করবেন, আমি কথা দিচ্ছি বলে। তা ছাড়া, বিশ্বাস করা ছাড়া আপনাদের উপায় তো কিছু নেই। বিশ্বাস করলে হয়তো লাভ হতে পারে কিন্তু আমায় অবিশ্বাস করে ধরে রাখলে আপনাদের যে সমূহ বিপদ।'

হিরোতা রাগে কী একটা বলতে গিয়ে অশ্বত্থামার ইঙ্গিতে নিজেকে সামলে নিল। অশ্বত্থামা বলল, 'বিশ্বাস করলেও লুয়ং প্রাবাং-এ আপনাকে ভোরের আগে পৌঁছে দেওয়া যে অসম্ভব, তা কি ভেবে দেখেছেন?—ভোরের আর মাত্র ঘণ্টা আষ্টেক বাকি। এই আট ঘণ্টায় এখান থেকে আশি মাইল লুয়ং প্রাবাং কী করে যাওয়া যাবে? এখান থেকে লুয়ং প্রাবাং-এর দিকে কোনো রাস্তা যে নেই তা আপনি নিশ্চয় জানেন। রাস্তা থাকলে মোটর-লরিতে অনায়াসে অবশ্য যেতে পারতেন।'

'রাস্তা না থাকলেও এই আশি মাইল আট ঘণ্টায় অনায়াসে যাওয়া যাবে।'

'কী করে?—উড়ে নাকি?' হিরোতা আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

'না উড়ে নয়, ড্র্যাগনের পিঠে চড়ে।'

ড্র্যাগনের পিঠে চড়ে! শুধু হিরোতা আর অশ্বত্থামা নয়, আমরা পর্যন্ত মামাবাবুর কথায় তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

মামাবাবু আমাদের বিস্ময়টা একটু উপভোগ করেই ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ 'ড্র্যাগন' সাজিয়ে যাকে দিয়ে সমস্ত উপত্যকার লোককে আপনারা আতঙ্কে দেশছাড়া করেছেন, সেই যুদ্ধের ট্যাঙ্কটি, পথঘাট না থাকলেও অনায়াসে যেকোনো বন্ধুর মাঠের উপর দিয়ে ঘণ্টায় বিশ মাইল যেতে পারে।'

pathagar.net

পিঠে না হোক, ড্র্যাগনের মতো করে সাজানো একটি বিশাল ট্যাঙ্কের ভিতরে বসে তারপর সত্যিই আমরা লুয়ং প্রাবাং রওনা হলাম। ক্যাটারপিলার হুইল অর্থাৎ গুটিপোকার মতো ফিতে-চাকার দরুন এ ট্যাঙ্কের কাছে প্রায় কোনো স্থানই অগম্য নয়। ভোরের আগেই আশি মাইল

অনয়াসে পার হয়ে মেকং নদীর ধারে লুয়ং প্রাবাং-এর এপারে আমরা পৌঁছে গেলাম। পথে ট্যাঙ্ক থেকে তরল আগুনের পিচকারি ছুঁড়ে কেমন করে ড্রাগনের আগ্নেয় নিশ্বাস তৈরি হয়, তাও আমরা দেখলাম।

লুয়ং প্রাবাং-এ একটি এরোপ্লেন যথার্থই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে এরোপ্লেনে লি-সিনকে উপস্থিত থাকতে দেখে আমি তো অবাক! তার পোড়া ঘা তখনও ভালো করে সারেনি। কিন্তু আমাদের দেখতে পাওয়ার আনন্দে তাতে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

মামাবাবু আমার বিস্ময় লক্ষ করে হেসে বললেন, 'খুব অবাক হচ্ছিস না? কিন্তু কলকাতা থেকে আমি সবার আগে ওকেই লুয়ং প্রাবাং উপত্যকার রহস্যের সন্ধান নিতে তার করেছিলাম। আমরা যত দিনে কলকাতা থেকে জাহাজে ব্যাংকক্ পৌঁছেছি, ও তার মধ্যেই ড্রাগনের রহস্যের সন্ধান করে ফেলেছে। কিন্তু দুঃসাহস একটু বেশি দেখাতে গিয়ে তার আগুনের হল্‌কায় প্রাণটা প্রায় দিতে বসেছিল! নেহাত বেয়াড়াভাবে অশ্বত্থামার বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা হয় বলেই কোনো পরিচয় যে আমাদের আছে, তা না জানিয়ে আমি চলে যাই। অশ্বত্থামাকে তখন থেকেই আমি সন্দেহ করি। তবে লি-সিনের শুশ্রূষার অভাব যে হবে না তা জানতাম।'

এরোপ্লেনে সাইগনের পথে যেতে যেতে তারপর মামাবাবুর কাছে আগাগোড়া সব কিছুর ব্যাখ্যাই আমি শুনলাম। যাযাবর হাঁসের রহস্যটা তেমন কিছু গুরুতর না হলেও মিস্টার মরগ্যানকে অজানা আততায়ী আক্রমণ করা থেকে কেমন তাঁর প্রথম সন্দেহ জাগে, অশ্বত্থামার কাছে ড্রাগনের আজগুবি গল্প শুনে কী করে এই সন্দেহ আরও সুদৃঢ় হয় যে, এসব ব্যাপারের পিছনে গভীর কোনো চক্রান্ত আছে, হিরোতাকে গোড়ায় বিশ্বাস করলেও বেতার সেট্‌টি আবিষ্কারের পর থেকেই কী করে তিনি বুঝতে পারেন যে, ওই যন্ত্রটি তারই এবং এই যন্ত্রের দ্বারাই আমাদের ড্রাগন দেখিয়ে ভয় পাওয়াবার কথা সে তাদের গোপন গড়ের লোকদের জানায়, আমার কাছে সেই সময়ে ধরা পড়ে কীভাবে ডিক্‌সনের নামে দোষ চাপিয়ে সে সাধু সাজে এবং তারপর আমি নেহাত ড্রাগনের রহস্যসন্ধানে বদ্ধপরিকর জেনে সে কীভাবে আমায় বন্দি করবার জন্যেই আমার সঙ্গ নেয়, সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তুচ্ছ মনে হলেও যাযাবর হাঁসের রহস্যটা যে, সমস্ত অভিযানের মূল, এ-কথাও বুঝলাম। গোপন দুর্গ তৈরির দরুন মানুষ ও মোটরলরি প্রভৃতির আনাগোনায় হাঁসেরা এ উপত্যকা পরিত্যাগ না করলে মিস্টার মরগ্যান তাঁর শিকারের প্রবন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলতেন না এবং লুয়ং উপত্যকা এখনও সবার অজ্ঞাতে গোপন শত্রুর চক্রান্তে সত্যিই অভিশপ্ত হয়ে থাকত।

একটি প্রশ্নই এর পর আমার করবার ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি তোমার প্রতিশ্রুতি সত্যিই রাখবে? এই গোপন গড়ের কথা কাউকে জানাবে না?'

'কথা যখন দিয়েছি, তখন আর তা খেলাপ করি কী করে?'

'বলো কী! এত বড়ো একটা শয়তানি চক্রান্তের কথা জেনেও তুমি চুপ করে থাকবে? সায়াম, ইন্দো-চায়না এমনকী বর্মারও সর্বনাশের উদ্দেশ্যে জাপান নির্বিবাদে এই গোপন কেল্লা গড়ে তুলবে?'

'তা কেমন করে তুলবে? আমি ছাড়া আর কি বাধা দেবার লোক নেই?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে আবার আছে?'

মামাবাবু হেসে বললেন,— 'কেন ডিক্‌সন্? সে তো আর কাউকে কোনো কথা দেয়নি!'

'ডিক্‌সন্?'

'হ্যাঁ, ডিক্‌সন্! সে আমাদের ফরাসি সরকারের গুপ্তচর হিসেবে আমাদের আগেই এ উপত্যাকার রহস্য ভেদ করেছে। হিরোতা কীভাবে শেষ মুহূর্তে তার উপর সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে! নিরাপদে ফরাসি সীমান্তে পৌঁছোবার আগে পাছে হিরোতা মাঝ পথে তাকে বাধা দেয়, এই ভয়ে

pathagar.net

সে হিরোতাকে যখন তার কুঠিতে বেঁধে রেখে চলে যাবার উদ্যোগ করছে। সে সময়েই আমরা তাকে ভুল করে বন্দি করি। তারপর ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ জাগতে থাকে। আমি তার সঙ্গে ভাব করে সমস্ত কথা জেনে নিই এবং ড্র্যাগন যেদিন দেখা দেয় সেদিনই তার সমস্ত কথা সত্য বুঝে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে গিয়ে মুক্ত করে দিই। মাথায় আঘাতের ভান আমি তখন দুটো কারণে করেছিলাম। প্রথমত ডিক্সনকে যে আমিই ছেড়ে দিয়েছে, সে সন্দেহ নিবারণের জন্যে—দ্বিতীয়ত, হিরোতা আমায় মুমূর্ষু জেনে কী করে তাই দেখবার জন্যে। অবশ্য মংপোর সাহায্য না পেলে এ অভিনয় আমার সফল হত না।'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু ডিক্সন্ কী জন্যে হিরোতার কুঠির উঠোনে আগুন জ্বেলেছিল বলতে পারো?'

'আমি যতদূর জানি, গোটাকতক গোপন কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলবার জন্য, তবে ডিক্সন্‌কেই জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারিস।'

'ডিক্সন্! কোথায় সে?'

মামাবাবু উত্তর না দিয়ে প্লেনের 'স্পিকিং টিউব' অর্থাৎ কথা বলবার নলে এরোপ্লেন-চালককে কী যেন বললেন।

এরোপ্লেন-চালক আমাদের দিকে ফিরে হেসে তার চোখের গগ্‌লসটা একবার খুলে ফেলল।

চালক আর কেউ নয়—ডিক্সন্!

সাইগন থেকে জাহাজে কলকাতা ফেরার তিনদিন পরের কথা। কলকাতা এসেই একটা ক্রিকেট ম্যাচে বাইরে কদিন খেলতে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে বেলা প্রায় বারোটার সময় মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এই সময়টা সাধারণত তাঁকে লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়, কারণ এইটেই তাঁর প্রাতঃকাল।

কিন্তু কোথায় মামাবাবু! লাইব্রেরি ও বাইরের ঘর খুঁজে উপরে যাবার পথে মংপোর সঙ্গে দেখা। একগাদা জামাকাপড়ের বান্ডিল নিয়ে সে নীচে নামছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'মামাবাবু কোথায় রে? কী করছেন?'

'বাবু?' মংপো অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'বাবু গুম্!'

হতভম্ব হয়ে বললাম, 'গুম্ কীরে?'

মংপো আরও জোর দিয়ে বলল, 'হাঁ গুম্—গুম্ কাটা!'

গুম কাটা!—হঠাৎ আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠল। মংপোর অপরূপ বাংলায় গুম্ খুনই কি সে গুম্ কাটা বলে বোঝাতে চাইছে। লুয়ং উপত্যকার শত্রু কি তাহলে এতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে! এইভাবে কি তারা শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ নিল?

সভয়ে কম্পিত পদে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় সিঁড়ির ওপর থেকেই মামাবাবুর গলা পাওয়া গেল, 'মংপো! হতভাগা! ফের তুই বাংলা বলছিস—'

তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কী, মামাবাবু? গুম্ কাটা শুনে আমার তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল।'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'আর বলিস কেন। ব্যাটা হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরার শখ। উনি বাংলা 'ইডিয়ম' ব্যবহার করেছিলেন—'গুম্ কাটা' মানে হল, ঘুমিয়ে কাদা।'

অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তুমি সত্যি এই বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিলে?'

মামাবাবু অত্যন্ত সংকুচিতভাবে বললেন, 'আর কী করি বল!'

pathagar.net

সাদা ঘোড়ার সওয়ার

॥ ১ ॥

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

গাঙের জল আর তীর। তীরের জঙ্গল আর আকাশ সমস্ত একাকার হয়ে গেছে অন্ধকারে।

সেই অন্ধকারে বিশাল গাঙের মাঝখান দিয়ে একটি 'মাচোয়া' নৌকো চলেছে দ্রুতবেগে। দাঁড় যারা টানছে তাদের হাত এত পাকা যে জলের শব্দ পর্যন্ত নেই বললেই হয়। জল তো নয়, যেন তেলের ওপর দিয়ে 'মাচোয়া' পিছলে যাচ্ছে তালে তালে—দাঁড়ের টানে।

মাচোয়া-র একটি মাত্র কামরা। তারই দরজা খুলে একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে খানিক বাদে বেরিয়ে এল।

অন্ধকার অত গাঢ় না হলে ছেলেটিকে দেখে বুঝি খুশিই হওয়া যেত।

সুন্দর গড়ন, লম্বা একহারা চেহারা।

মালকোচা দিয়ে কাপড় পরা, গায়ে আঁটসাট মেরজাই, কোমরবন্ধে বাঁধা তলোয়ার।

মাথায় উষ্ণীষ। বয়স অল্প হলে কী হবে, মুখে এর মধ্যেই বেশ একটা দৃঢ়তার ছাপ পড়েছে।

কামরা থেকে বেরিয়ে হালির মাচায় উঠে ছেলেটি বলল, 'ধুমঘাট আর কতদূর, দাদু!'

মাচার ওপর হালির পাশে একটি বৃদ্ধ লোক তন্ময় হয়ে সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে ছিলেন। ছেলেটির চেহারা চমৎকার, কিন্তু বৃদ্ধের চেহারা অন্ধকারে দেখতে পেলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হত। বয়স বোধ হয় সত্তর পার হয়ে গেছে, মাথার চুল দুধের মতন সাদা; কিন্তু দীর্ঘ সুঠাম শরীর যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরি, তাতে বার্ধক্যের কোনো ছাপ পড়েনি। এবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে, শেখর। আর বেশি দূর নেই। মশালের আলো দেখতে পাচ্ছিস না?'

শেখর এবার সামনের দিকে ফিরে তাকাল। সত্যিই তো! দূরে অসংখ্য মশালের আলোয় অন্ধকার যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে নদীর কালো জল রক্তাক্ত করে তুলছে।

'এত মশাল!'—শেখর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'হবে না? ফিরিঙ্গি পেড্রো নিজে অন্তত দু-হাজার নৌকো নিয়ে ধুমঘাটে এসেছে। তাদের সবগুলোতে মশাল জ্বাললে তো রাত দিন হয়ে যেত!'

শেখর অবাক হয়ে খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থেকে বলল, 'দু-হাজার যুদ্ধের নৌকো! এত নৌকো আছে!'

এবার হালিই উত্তর দিল, 'দু-হাজার কী ছোটো কর্তা? ফিরিঙ্গি পেড্রোর তাঁবে পিয়ারা নৌকোই আছে অমন পাঁচ হাজার, তা ছাড়া পশত, গছাড়ি, ঘুরাব, কোশা, বালাম, পালওয়ার কত আছে তা কি আর গুণে শেষ করা যায়! অমন বিশ-ত্রিশ হাজার হবে সবসুদ্ধ—কী বলেন চৌধুরিমশাই!'

বৃদ্ধ এবার একটু হেসে বললেন, 'না, লোকে বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলে। তবে সবরকম নৌকো মিলে আট হাজার খুব হবে।'

'তবে যশোর কেন হারবে, দাদু? তুমিই তো বলতে, এ-দেশে জল যার, বল তার!'

বৃদ্ধ ম্লানভাবে একটু হাসলেন। সে ম্লান হাসি অন্ধকারে অবশ্য শেখর দেখতে পেল না, শুধু তাঁর গলার একটু কম্পন যেন সে টের পেল।

বৃদ্ধ বললেন, 'এখনও তো তাই বলি! এখন বলি এদেশের গাঙে নদীতে জল থাকতে যশোর

pathagar.net

কাকে ডরায়! আর ডাঙাতেই বা সে কম কীসে? কিন্তু তবু যশোর উচ্ছন্নে যাওয়া চাই! প্রতাপ রায়ের সর্বনাশ না দেখে আমি মরব না!' শেষ দিকে বৃদ্ধের গলা উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

হালি শিউরে উঠে বলল, 'চুপ চুপ, চৌধুরিমশাই! হাওয়ায় কথা ভেসে যায়, জলের তলার মাছেরাও সুখার চর; মহারাজের কানে একথা গেলে আর রক্ষা আছে!'

বৃদ্ধ চৌধুরিমশাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর জোরে হেসে উঠলেন, 'জলের মাছেরাও সুখার চর, না রে মধু! এমনি ভয়ই তোদের ধরিয়ে দিয়েছে! আর, তোরাও একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছিস!'

মধু চাপা গলায় বলল, 'ভয় কি সাধে পাই চৌধুরিমশাই, সুখা যে মহারাজের কত বড়ো ধূর্ত সর্দার, তার গুপ্তচরের জাল যে কতদূর পাতা—তা কি আপনি জানেন না?'

'সব জানি, মধু। কিন্তু অতি বড়ো মিহি জালেরও ফাঁক থাকে। অন্যায়ের—অধর্মের ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে সর্বনাশ আসবে গলে—আর দেরি নেই।'

বৃদ্ধ চুপ করলেন। মাচোয়া নৌকোটি এবার ধুমঘাটের কাছাকাছি এসে পড়েছে। আশপাশে পেড্রোর বহরের দু-একটা যুদ্ধের নৌকো যাতায়াত করছে।

একটি মহলগিরি নৌকো শেখরদের মাচোয়ার একেবারে সামনে এসে পড়েছিল। নৌকোটি বিশাল, মশালের আলোয় নৌকোর সামনে ও পাটাতনের দু-ধারে কামানগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। উপরে নৌসেনারা হল্লা করছে—তাদের বেশির ভাগই মগ ও হার্মাদ ফিরিঙ্গি। খাটো কোর্তা, ঢোলা ইজের পরা ফিরিঙ্গি কাপ্তেন হাঁক দিল—'কার মাচোয়া যায়!'

মধু মাঝি একটু কাঁপা গলায় উত্তর দিল, 'মুলাজোড়ের চৌধুরিদের।'

মহলগিরি বিনা বাক্যব্যয়ে এবার পাশ কাটিয়ে গেল। মধু হাঁফ ছেড়ে বলল, 'ইস, যা হাঁক দিয়েছিল, বুকটা একেবারে ধড়াস করে উঠেছিল—ধরলে বুঝি ভেবে!'

চৌধুরিমশাই একটু শুষ্ক হাসি হেসে বললেন, 'ধরা অত সোজা নয়, মধু! তবে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার এবার।'

চৌধুরিমশাই উঠে দাঁড়িয়ে শেখরের কাঁধে হাত গিয়ে আবার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শোনো শেখর, তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবার আর হয়তো সময় হবে না। আর একবার তোমায় তাই সব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যে চিঠি তোমার কাছে আছে, তার জোরে সুন্দর বেগের তিরন্দাজ দলে তোমার অনায়াসে জায়গা হবে। কেউ তোমায় অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু তোমার ব্রত তুমি ভুলো না, ভুলো না প্রতাপাদিত্যের হাতে মুলাজোড়ের চৌধুরিদের অপমানের কথা, ভুলো না প্রতাপের বন্ধু সূর্যকান্ত গুহের সঙ্গে লড়াইয়ে তোমার বাবার মৃত্যুর কথা...'

বলতে বলতে বৃদ্ধের গলা ধরে এল। একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'দশ বছর ধরে এই প্রতিশোধের জন্যে আমি নিঃশব্দে দিন গুনেছি, যশোররাজের কাছে মাথা নিচু করে থেকে মনের কথা মনেই চেপে রেখে দিয়েছি এই আশায় যে, একদিন তুমি চৌধুরিদের লাঞ্ছনার যতটুকু সম্ভব প্রতিশোধ নিতে পারবে। আজ সেই দিন এসেছে। এ শত্রুতায় ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই। ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক প্রতিশোধ নেওয়া চাই। বন্ধুর ছদ্মবেশেই শত্রুর সর্বনাশ করতে হবে। তিরন্দাজ দলে ঢুকে কেমন করে ভিতরের খবর সংগ্রহ করতে হবে, কেমন করে সে-খবর কার হাতে পাঠাতে হবে—সব তোমার জানা। চৌধুরিবংশের সম্মানের কথা মনে রেখে যতদূর সম্ভব সাবধানে কাজ কোরো। মনে রেখো, বিপদ তোমার পদে পদে। কিন্তু তবু এ বিপদের মধ্যে তোমায় না পাঠিয়ে উপায় নেই।'

বৃদ্ধের গলা আবার ধরে গেল। শেখরও কী বলতে গিয়ে আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় আর বলতে পারল না। নিচু হয়ে একাধারে পিতামহ ও গুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তাদের মাচোয়া তখন একেবারে ধুমঘাটের ধারে এসে পড়েছে। চারিধারে পেড্রোর বহরের রণতরীগুলির ভিড়। অসংখ্য মশালের আলোয়, অসংখ্য নৌকোর হট্টগোলে, নদীর সে এক অপরূপ রূপ খুলেছে।

মধু মাঝি নৌকোর ভিড়ের ভিতর দিয়ে সাবধানে হাল ধরে পথ করে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ ঘাটে বাঁধব চৌধুরিমশাই! এদিকে তো দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

'তবু এই ভিড়ের মধ্যেই নামতে হবে। এইখানেই কোথাও যেমন করে পার লাগাও।'

মধু মাঝি সেই বুঝেই হাল ঘুরোতে যাচ্ছিল, এমন সময় নীচে থেকে হাঁক শোনা গেল, 'কার মাচোয়া যায়?'

মধু মাঝি মাচার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখল—ছোট্ট একটি কোতোয়ালি ডিঙি তাদের পাশে এসে ভিড়েছে। বন্দরের দুই পাহারাদার তাতে দাঁড়িয়ে। দেখে বুকটা তার আবার ধড়াস করে উঠল ভয়ে। তবু সহজ স্বরে সে বলল, 'মুলাজোড়ের চৌধুরিদের।'

নীচে থেকে আবার প্রশ্ন এল, 'মুলাজোড়ের চৌধুরিদের কি একটি বই মাচোয়া নেই?'

এ প্রশ্নের জবাবও তৈরি ছিল আগে থাকতে। তবু মধু মাঝির গলা একটু কাঁপল বলবার সময়, 'না, আরও নৌকো পেছনে আসছে; মাঝরাস্তায় ঝড়ে পড়ে তারা পিছিয়ে পড়েছে।'

'বেশ, বেশ! কে আছেন এ মাচোয়ায়?'

মধু মাঝি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার হাত টিপে ইশারা করে চৌধুরিমশাই তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর চুপিচুপি কী বলে শেখরকে দিলেন ভিতরে পাঠিয়ে।

উত্তর দিতে দেরি হওয়ায় নীচে থেকে রুক্ষস্বরে এবার প্রশ্ন এল, 'কী হে, বোবা হয়ে গেলে যে মাঝির পো! জিভ টেনে কথা বার করতে হবে নাকি?'

মধু মাঝি আবার মাচা থেকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আজ্ঞে, কিছু জিজ্ঞেস করছেন নাকি? হট্টগোলে ভালো শুনতে পাচ্ছি না।'

পাহারাদার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, 'শুনতে পাও না? পাজি বজ্জাত, কানের ফুটো বড়ো করে দিচ্ছি এখনই গিয়ে! কে আছে মাচোয়ায়?'

মধু মাঝি এবার সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে, কে আর থাকবেন? স্বয়ং চৌধুরিমশাই আছেন, ডাকব তাঁকে?'

চৌধুরিমশাইয়ের নাম শুনে এক মুহূর্তে পাহারাদারের মুখের চেহারা এবং গলার স্বর বদলে গেল, 'আরে না না, আহাম্মুক কোথাকার! তাঁকে ডাকবার কথা বলেছি নাকি! আমাদের নমস্কার দিস তাঁকে!'

মধু মাঝি কপালের ঘাম মুছে বলল, 'ওরা যদি মাচোয়ায় উঠে আসত চৌধুরিমশাই?'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন, 'তাতে কী আর হত? ধরা-ছোঁয়ার মতন কিছুই তো পেত না। ধরা পড়তাম না, তবে আমাদের সব মতলব ভেস্তে যেত এই যা। নতুন করে মতলব ফাঁদতে হত আবার।'

'তাহলে খুব বাঁচা গেছে, কী বলেন! কিন্তু সন্দেহ কেন যে করেছিল বুঝতে পারছি না।'

বৃদ্ধ আবার হাসলেন, 'সন্দেহ এখন ওদের অবশ্য সকলকেই, আমাদের বেলা আলাদা কিছু নয়। ধুমঘাটে নতুন যে নাও আসবে তারই খবর নেওয়া ওদের দরকার। মোগলদের চর কোনটায় আছে কে জানে! কিন্তু শোনো, এখনও মনে হচ্ছে এ ভিড়ের ভিতর নৌকো লাগিয়ে কাজ নেই, এ বহর ছাড়িয়ে গিয়ে বরং আঘাটায় বাঁধাও ভালো।'

মধু জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, এখন আর ভয় আছে নাকি! পাহারাদারদের তো পার হয়ে এলাম।'

'তাহলেও সাবধানের বিনাশ নেই। আর, আমার কেমন যেন ভালো ঠেকছে না। পিছনে এই পালওয়ারটা অনেকক্ষণ ধরে জোঁকের মতো লেগে রয়েছে কেন বুঝতে পারছি না।'

চৌধুরিমশাইয়ের সন্দেহ যে অমূলক নয়, খানিক বাদেই তা বোঝা গেল।

'মাচোয়া ধুমঘাটের নৌকোর বহর তখন প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে, কিন্তু পালওয়ার নৌকোটি তখনও সমানভাবে পিছনে লেগে। এগিয়েও যায় না, পেছিয়েও পড়ে না।

চৌধুরিমশাই দু-ধারে পাঁচখানা করে দশখানা দাঁড় থামিয়ে দিতে হুকুম দিলেন। পালওয়ার নৌকোটি তাদের ছাড়িয়ে যায় কি না এবার দেখা যাক।

না, পালওয়ারের গতি মন্দ হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

চৌধুরিমশাই কামরার ভিতরে গিয়ে শেখরকে কী বলে এলেন। এসে, তারপর হুকুম দিলেন—মাচোয়া ধারে লাগাবার ব্যবস্থা করতে।

মধু মাঝি হাল ঘোরাল। কিন্তু মাচোয়া তীরের কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতে দেখা গেল পালওয়ার একেবারে ঝড়ের মতন বেগে এসে পাশে লেগেছে।

বজ্রস্বরে কে সেখান থেকে হুকুম দিল, 'মাচোয়া থামাও!'

মধু মাঝি চৌধুরিমশাইয়ের শেখানো কথা আওড়াল জবাবে, 'কার হুকুম?'

উত্তর এল, 'সুখাসর্দারের।'

সুখাসর্দার! শুনে চৌধুরিমশাইও বুঝি এবার বেশ একটু চমকে উঠলেন।

দুই নৌকো পাশাপাশি এসে লাগল। পালওয়ার থেকে মশাল নিয়ে স্বয়ং সুখাসর্দার চারজন অনুচর সঙ্গে করে মাচোয়ায় এসে উঠলেন। আর চৌধুরিমশাই পাথরের মূর্তির মতন নিশ্চল হয়ে পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

'আরে, এ যে মুলাজোড়ের চৌধুরিমশাই!' সুখাসর্দার একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

চৌধুরিমশাই কঠিন স্বরে বললেন, 'কেন, আপনি কি আর কেউ ভেবেছিলেন?'

সুখাসর্দার বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বললেন, 'আমি কী করে জানব, বলুন? আমি ভাবি বহরের ভিতর ঢুকে এমন গা-ঢাকা দিয়ে পালায় কে? তা, আপনি বন্দর ছেড়ে এমন আঘাটার দিকে চলেছেনই বা কেন?'

চৌধুরিমশাইয়ের দু-চোখ জ্বলে উঠল। তবু নিজেকে শান্ত করে বললেন, 'যা ভিড় আপনার বন্দরে! একটু নিরিবিলি নামবার জায়গা তাই খুঁজছিলাম।'

সুখাসর্দার হেসে উঠলেন। সে হাসির মানে বোঝা কঠিন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বেশ বেশ, কিন্তু মুলাজোড়ের চৌধুরির তো এমন একটি মাচোয়া নিয়ে ধুমঘাটে আসার কথা নয়!'

চৌধুরিমশাই বললেন, 'সে কৈফিয়ত তো আপনার পাহারাদারই আগে নিয়েছে।'

'তাই নাকি? পাহারাদাররা আপনাকে বিরক্ত করেছে নাকি? দেখুন দেখি, কী অন্যায়,' সুখাসর্দার যেন সত্যি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তারপর খুব মোলায়েমভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা একলাই এসেছেন নাকি, না আর কেউ আছে সঙ্গে?'

'আর কে থাকবে। আসুন না ভিতরে—'

সুখাসর্দার খানিকক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'তাই চলুন, বহুদিন আপনার সঙ্গে নিরিবিলি বসে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়নি।'

চৌধুরিমশাইয়ের সঙ্গে কামরার ভিতর ঢুকেই কিন্তু সুখাসর্দারের মুখের চেহারা বদলে গেল।

কামরায় সত্যিই কেউ কোথাও নেই।

চৌধুরিমশাই বিদ্রূপের সঙ্গে একটু শুষ্ক হাসি হেসে বললেন, 'তাহলে আলাপটা এখনই শুরু করা যাবে, না ঘাটে নৌকো লাগাবার পর করা যাবে ধীরেসুস্থে?'

pathagar.net

তেমনি বিদ্রূপের স্বরে সুখাসর্দার বললেন, 'ধীরেসুস্থে হওয়াই ভালো। মুলাজোড় থেকে গোমতি হয়ে আসবার পথে মোগলদের চরের সঙ্গে কী কী আলাপ করে এলেন, সে কি অত তাড়াতাড়ি বলবার বিষয়?'

সুখাসর্দার মাচোয়ার কামরায় ঢুকে কাউকে দেখতে পায়নি।

শেখর তাহলে গেল কোথায়?

সে কি মাচোয়ার কোনো গুপ্ত ঘরে তাহলে লুকিয়ে ছিল?

মোটেই না। যেখানেই লুকোক সুখাসর্দারের অনুচরেরা তাহলে নৌকো চিরে তাকে ঠিক বার করে আনত।

সুখাসর্দার চৌধুরিমশাইয়ের সঙ্গে যখন কথা বলছেন, তখনই তাদের একজন এসে সেলাম ঠুকে জানাল, 'সমস্ত মাচোয়া তল্লাস করা হয়েছে, মাচোয়ায় বিশজন দাঁড়ি, একজন হালি, একজন রাঁধুনি ও একজন চাকর ছাড়া আর কেউ নেই, অস্ত্রশস্ত্রও কিছু পাওয়া যায়নি।'

গম্ভীর মুখে অনুচরের কথা শুনে সুখাসর্দার তাকে বাইরে যেতে হুকুম দিলেন। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, চৌধুরিমশাইয়ের পাথরে খোদাই কঠিন মুখে ঈষৎ যেন বাঁকা হাসির আভাস।

সুখাসর্দার হাসলেন। হেসে বললেন, 'আপনার দাবার চাল ধরা পড়েছে চৌধুরিমশাই, কিন্তু কোথায় যেন ঘোড়ার আড়াই চাল একটা হাতে রেখেছেন মনে হচ্ছে।'

চৌধুরিমশাই তেমন দুর্বোধ হাসি হেসে বললেন, 'যদি তাই হয়, তাহলে সুখাসর্দারের মতন পাকা খেলোয়াড়কে কি সে চাল চিনিয়ে দিতে হবে?'

এবার সুখাসর্দার আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'না, সে চাল আপনি ধরা পড়বে। আড়াই চালের পথ রেখে সুখাসর্দার ঘুঁটি সাজায় না।'

॥ ২ ॥

সুখাসর্দারের সঙ্গে চৌধুরিমশাইয়ের যখন কথার লড়াই হচ্ছে তখন শেখর অন্ধকার গাঙের জলে নিঃশব্দে সাঁতার কেটে চলেছে।

সুখাসর্দারের পালওয়ার নৌকো মাচোয়ার পেছনে নাছোড় হয়ে লেগেছে বুঝতেই চৌধুরিমশাই কিছুক্ষণ আগে ভিতরের কামরায় ঢুকে শেখরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এই গাঙের জলেই তোমায় নেমে যেতে হবে শেখর। ঘাটে নেমে ভালো করে বিদায় নেওয়া আর তোমার হল না।'

পালওয়ার নৌকো তখনও অনেকটা দূরে। বৃদ্ধ পিতামহের পায়ের ধুলো নিয়ে কোমরবন্ধটা আঁট করে বেঁধে শেখর অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে জলে নেমে গিয়েছিল।

চৌধুরিমশাইয়ের চোখ তখন ছলছল করে উঠেছিল কি না কে জান, কিন্তু গলার স্বর তাঁর একবারও কাঁপেনি। নৌকোর একটি আংটায় একহাত রেখে জলে ভাসতে ভাসতে শেখর তাঁর শেষ কথাগুলি শুনেছিল, 'আজ থেকে তুমি একা। মনে রেখো, শুধু নিজের বুদ্ধি আর বাহুবলে এই দুরন্ত গাঙের চেয়ে অনেক দুরন্ত বিপদ তোমায় পার হতে হবে।'

তারপর আংটা ছেড়ে দিয়ে শেখর সাঁতার দিতে শুরু করেছিল তীরের দিকে। অবশ্য কৃষ্ণপক্ষের রাত অমন অন্ধকার না হলে জলে নেমে পড়েও সে সুখাসর্দারের দৃষ্টি এড়াতে পারত কি না সন্দেহ। তাদের মাচোয়াকে ধরবার জন্যে পালওয়ার নৌকো যখন পঞ্চাশখানা দাঁড়ের টানে ঝড়ের বেগে তাদের মাচোয়ার দিকে ছুটে চলেছে, তখনও সে বেশি দূর যেতে পারেনি।

আর একটু হলে সুখাসর্দারের পালওয়ারের একটা দাঁড়ের ঘা-ই বুঝি তার গায়ে লাগত।

কিন্তু সে-যাত্রা ধরা সে পড়ল না। দেখতে দেখতে পালওয়ার নৌকো দূরে মাচোয়ার কাছে গিয়ে ভিড়ল। সেদিকে চেয়ে বৃদ্ধ দাদুর অনিশ্চিত পরিণামের কথা ভেবে শেখরের বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিন্তু কোনোরকম ভাবের উচ্ছ্বাসে কাতর হয়ে থাকবার ছেলে সে নয়। চৌধুরিমশাইয়ের কাছে সেরকম শিক্ষা সে পায়নি। পরমুহূর্তেই সে মনকে শক্ত করে সবল হাতে অন্ধকার তীর লক্ষ্য করে সাঁতরাতে লাগল।

বর্ষা সবে শেষ হয়ে শরৎ কাল শুরু হয়েছে। ভরা গাঙের জল যেমন অকূল তেমনই প্রচণ্ড তার স্রোত। সে প্রচণ্ড স্রোত সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বহু দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে শেখরকে কূলে ওঠবার সুযোগ দিল।

যে জায়গাটায় সে উঠল সেখানটা একরকম জঙ্গল বললেই হয়। ধুমঘাটের লোকালয় তখন অনেক দূরে পড়ে আছে। ধুমঘাটের নৌবহরের মশালগুলো পর্যন্ত সেখান থেকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। মানুষের ভয় না থাকলেও বন্য পশুর ভয় যে এখানে আছে তা শেখর জানে। নামবার সময় কোমরবন্ধের তলোয়ারটি শুধু সে সঙ্গে নিয়েছিল। এখন সেই তলোয়ারই তার একমাত্র ভরসা। কিন্তু অন্ধকারে হিংস্র জন্তুর আক্রমণের বিরুদ্ধে শুধু তলোয়ার নিয়ে লড়া যায় না। তা ছাড়া বাকি রাতটা সেই ভয়ে খাড়া পাহারায় কাটাতেও সে রাজি নয়।

অন্ধকারের ভিতরেই একটা বড়ো গাছ খুঁজে নিয়ে শেখর তার উপরকার একটা মোটা ডালে গিয়ে উঠল, তারপর গায়ের মেরজাই ও কোমরবন্ধটা খুলে ডালের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বেঁধে সকাল পর্যন্ত একটু নিশ্চিন্তভাবে জিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করল।

শুধু জিরিয়ে নেওয়া নয়, সকাল হবার আগে অনেক কিছু ভেবে ঠিক করে নেওয়াও তার দরকার।

মাচোয়ার বাইরের কেউ তাকে দেখেনি।

সে যে মুলাজোড়ের চৌধুরির নাতি সে কথা ধুমঘাটে কারো জানবার কথা নয়।

মুলাজোড়ের কোনো লোক এখানে তাকে চিনতে পারলেও যে বোবা হয়ে থাকবে—এ বিশ্বাস তার আছে। তবু সুখাসর্দার সম্বন্ধে সে যতটুকু শুনেছে তাতে যেকোনো মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয় যে তার আছে একথা তার ভুললে চলবে না।

সুন্দর বেগের তিরন্দাজ দলে ছদ্মনামে ঢুকে ভিতরের খবর সংগ্রহ করা যে সাপের গর্তে মণির সন্ধান করার চেয়েও বিপজ্জনক একথা তার বোঝা দরকার। বিপদের সেই গুরুত্ব বুঝেই তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে আগে থাকতে।

অবশ্য একটি মস্ত বড়ো ভরসা তার চিঠি। সে চিঠি যার লেখা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে তার প্রতিপত্তির সীমা নেই। মহারাজের একান্ত বিশ্বাসী নলডাঙার রণবীর খাঁ যাকে স্বয়ং চিঠি লিখে সুপারিশ করে পাঠান, তাকে সন্দেহ করা বা বাধা দেওয়া স্বয়ং সুখাসর্দারের পক্ষেও শক্ত। নিজের অজান্তেই শেখর বুঝি একবার তার উষ্ণীষ ছুঁয়ে নিল। তার জীবনকাঠি তারই মধ্যে লুকোনো।

এমনি সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে শেখর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে নিজেই জানে না। হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। শেখর অবাক হয়ে দেখল, এরই মধ্যে ভোর হয়ে গেছে, জঙ্গলের অন্ধকারই যেন আলোয় ধুয়ে সাদা কুয়াশা হয়ে চারিদিক ছেয়ে আছে।

কিন্তু যে চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল সেটা কীসের?

ঘুমের মধ্যে সেটা এমন বিকট শুনিয়েছিল, যেন জঙ্গলেরই কোনো প্রেত পিশাচ তীক্ষ্ণ হুংকার দিয়ে উঠেছে। কিন্তু আপাতত গাছের ডালের উপর উঠে বসে চারিধারে চোখ ঘুরিয়েও সে কিছুই তেমন দেখতে পেল না। শুধু ভোরের আলোয় সে বুঝল রাত্রির অন্ধকারে জায়গাটাকে

pathagar.net

যেরকম মনে হয়েছিল সেরকম জঙ্গল সেটা নয়। জায়গাটাকে পুরোনো পরিত্যক্ত একটা দেবস্থান বলেই মনে হল। দূরে একটা ভাঙা মন্দির সতেজ একটি অশথগাছে বিদীর্ণ হয়েও এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই একটা ছোটো পুকুর; এককালে তার চারিধারে বাঁধানো ঘাট ছিল, কিন্তু এখন আগাছার জঙ্গলে তার চিহ্নই বুঝি আর দেখতে পাওয়া যায় না। শ্যাওলায় পুকুরটির অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু তবু পুকুরটির দিকে চাইলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

পুকুরটির এ শোভা তার জলের অসংখ্য পদ্মফুলের জন্যে। এত বড়ো, এত সুন্দর পদ্মফুল শেখর অন্তত আগে কখনো দেখেনি। এমন পদ্মফুল যেখানে ফোটে সে পুকুরের এমন দুরবস্থা কেন—শেখর সেই কথাই ভাবছে, এমন সময়ে আবার সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজে সে চমকে উঠল।

তারপর সেই শব্দ অনুসরণ করে নীচের দিকে চেয়ে একলা একলাই সে না হেসে পারল না।

দানব নয়, প্রেত নয়, পিশাচ নয়, তার আশ্রয়-করা ডালটির ঠিক নীচে একটি ঘোড়া। ঘোড়াটি অবশ্য অসাধারণ। মনে হয়—ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাই যেন শাপভ্রষ্ট হয়ে পাখা খসিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। যেমন তার সাগরে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের ফেনার মতন সাদা রং, তেমনি তেজি বনেদি ছাপ তার ঘাড়ের গড়নে। শেখর বুঝল—এই ঘোড়াটির ডাকই ঘুমের ঘোরে তার কানে এমন বিকট শুনিয়েছিল। একেবারে পায়ের নীচে থাকার দরুনই চারিদিকে চেয়েও প্রথমে সে ঘোড়াটিকে দেখতে পায়নি।

কিন্তু এমন আশ্চর্য ঘোড়া এই জনমানবহীন জায়গায় এল কী করে! যেমন-তেমন অখদ্দে ঘোড়াও নয় যে, অযত্নে অবহেলায় ছাড়া থাকবে! ঘোড়ার গায়ের সাজ দেখেই বোঝা যায় মালিকের কাছে কতখানি তার কদর।

ঘোড়ার রহস্য যাই থাক, আপাতত এ সুযোগ অবহেলা করা শেখরের উচিত মনে হল না। ধুমঘাট শহর এখান থেকে যে কতদূর তা সে আগের রাতেই জেনেছে। এতখানি পথ হেঁটে যাবার কথা ভাবতেই কষ্ট হয়। দৈব যখন এমন সুযোগ সামনে ধরে দিয়েছে। তখন নির্বোধের মতন হাত গুটিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। সুতরাং, ঘোড়া যারই হোক, আপাতত সেটা কিছুক্ষণের জন্য ধার নেওয়াই কর্তব্য বলে শেখর স্থির করে ফেলল।

যেমন মনে হওয়া তেমনি কাজ। মাথার উষ্ণীষ ঠিক করে নিয়ে, তলোয়ার-সমেত কোমরবন্ধটা ভালো করে এঁটে শেখর গাছের ডাল থেকেই ঘোড়ার পিঠের উপর ঝুলে পড়ল। তারপর এক লাফে পিঠে পড়ে লাগামটা বাগিয়ে ধরতে আর কতক্ষণ।

কিন্তু ব্যাপারটার এমন পরিণাম দাঁড়াবে কে জানত! শেখর যেমন-তেমন কাঁচা সওয়ার নয়, অনেক বুনো ঘোড়া তার হাতে বশ হয়েছে। অনেক বেয়াড়া ঘোড়া সে সিধে করেছে। কিন্তু সেগুলি যাই হোক আসলে ঘোড়া, এমন জীবন্ত তুফান নয়!

শেখর পিঠে চেপে বসতেই একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে, আকাশ-ফাটা হুংকার ছেড়ে এই ঘোড়ারূপী শয়তানটি চার পা তুলে এমন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল যে, তার উপর স্থির হয়ে বসে থাকে কার সাধ্য? গোরুর শিঙের উপরে সরষে রাখাও বুঝি তার চেয়ে সোজা!

শেখর অবশ্য সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, ঘোড়সওয়ারের সকল বিদ্যা প্রয়োগ করে সে অনেকক্ষণ এই জীবন্ত তুফানের পিঠে জোঁকের মতন লেগে ছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। কিছুক্ষণ বাদে এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে শেখরকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে শয়তান ঘোড়া একেবারে শান্তশিষ্টভাবে পাশে দাঁড়িয়ে ঘাস খেতে শুরু করে দিল। শেখরকে তাচ্ছিল্য দেখানোই যেন তার উদ্দেশ্য।

পড়ে গিয়ে শেখরের গায়ে যতটা না লেগেছিল তার চেয়ে বেশি লেগেছিল মানে। ঘোড়ার কাছে এ লাঞ্ছনার পর পিছনে হাসির শব্দ শুনে তার গা তাই আরও জ্বলে গেল। ঘোড়ার কাছে এভাবে হার মানার লজ্জা কোনো মানুষের চোখে পড়ে যাবে সে ভাবতে পারেনি।

pathagar.net

গায়ের ধুলো ঝেড়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সে দেখল ভিজে কাপড়ে, ডাঁটাসমতে একরাশ পদ্মফুল হাতে নিয়ে ভীমের মতো জোয়ান একটি লোক হাসছেন।

শেখর ভ্রূকুটি করে তাকাতেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পরের ঘোড়া চুরি করে পালাতে গেলে এইরকমই সাজা হয়, বুঝেছ বাপু?'

শেখর আবার ভ্রূকুটি করে বলল, 'ঘোড়া চুরি আমি করিনি, ঘোড়ার মালিক কোথাও নেই দেখে একটু চড়ে ধুমঘাটে যেতে চেয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছেই ছেড়ে দিতাম।'

'বটে! কিন্তু ঘুমঘাটে যেতে চাও কেন? ছেলে-ছোকরার জায়গা তো এখন সেটা নয়! জান না, সেখানে এখন শুধু যুদ্ধের হট্টগোল?'

শেখর মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বলল, 'আমি তো সেইজন্যেই যেতে চাই। সুন্দর বেগের দলে আমি তিরন্দাজ হব।'

'তাই নাকি? কিন্তু তুমি তিরন্দাজ হবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে যে! সুন্দর বেগের দলে তিরন্দাজ হতে চার বছর শাগরেদি করতে হয় তা জান? আর যাকে-তাকে শাগরেদও করা হয় না।'

শেখর গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার শাগরেদির দরকার হবে না, আমার...'

কথা শেষ করবার আগেই হঠাৎ উষ্ণীষের কথা খেয়াল হওয়ায় শেখরের মুখ ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গেল। ঘোড়ার পিঠে নাকাল হওয়ার সময় তার উষ্ণীষ কখন যে খুলে পড়ে গেছে সে জানতেই পারেনি। অথচ সেই উষ্ণীষের মধ্যেই রণবীর খাঁর চিঠি!

পাগলের মতন শেখর তৎক্ষণাৎ উষ্ণীষের খোঁজে ছুটল। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সেটা যদি বা পাওয়া গেল তার ভিতর চিঠির চিহ্ন নেই। এই অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে সেটা আর খুঁজে পাওয়ার আশাও বৃথা। ভয়ে, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে শেখরের তখন চোখ ফেটে জল বেরোতে চাইছে! বৃদ্ধ দাদুর সকল আশা শুরুতেই তার নির্বুদ্ধিতায় এমন করে ব্যর্থ হল, এ আপশোস যে রাখবার জায়গা নেই।

ভীমের মতন জোয়ান লোকটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শেখরের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। এবার কাছে এগিয়ে এসে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে তিনি হেসে বললেন, 'তিরন্দাজ হওয়া তোমার আর হল না দেখছি! কী করব বলো, তার বদলে ঘোড়া চুরির চেষ্টার জন্যে কোতোয়ালিতে তোমায় নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

তখনও শেখরের কোমরের খাপে তলোয়ার, আর ডান হাতের কবজিতে জোরের অভাব হয়নি। কোতোয়ালিতে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া সহজ হত না, সে যদি বাধা দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু বাধা সে দিল না। কেন যে দিল না তা ঠিক করে বলা শক্ত। বাহুতে বল থাকলেও মনে তার আর বল ছিল না বলেই বোধ হয় আর তার হাত উঠল না। তা ছাড়া, হাত কার বিরুদ্ধে ওঠাবে। জোয়ান লোকটির হাতে কোনো অস্ত্র নেই। যত বড়ো জোয়ানই হোক, নিরস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে তলোয়ার চালানো তার অভ্যাস নেই। আর বিনা অস্ত্রে এই ভীমের দোসরের সঙ্গে লড়বার চেষ্টা যে বৃথা, তা সে ভালোরকমই জানে।

ভিতরে ভিতরে অস্পষ্টভাবে অন্য মতলবও হয়তো তার ছিল। চিঠি হারাবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বেগের তিরন্দাজ দলে ভরতি হবার আশায় ছাই পড়েছে বটে, তবু ধুমঘাটে যাওয়া তার দরকার। এমনকী কোতোয়ালিতে আটক হবার জন্যেও সেখানে গেলে এমন কিছু ক্ষতি এখন নেই। একবার সেখানে পৌঁছোলে অবস্থা বুঝে যা হোক কিছু একটা করবার সুযোগ হয়তো মিলতেও পারে। অন্তত এখন থেকেই একেবারে হাল ছেড়ে দিতে সে রাজি নয়।

মুখে একটু মৃদু প্রতিবাদ মাত্র জানিয়ে শেখর তাই সহজেই লোকটির সঙ্গে কোতোয়ালিতে যেতে রাজি হয়ে গেল। পরে ভাগ্যে যাই থাক, আপাতত ঘোড়ায় চড়ে যেতে পাওয়াটা কম লাভ নয়।

pathagar.net

॥ ৩ ॥

শেখরকে পেছনে বসিয়ে জোয়ান লোকটি এক হাতে পদ্মফুলের গোছা ও এক হাতে রাশ ধরে যেভাবে সেই শয়তান ঘোড়াকে এখন চালিয়ে নিয়ে চললেন, তাতে কিন্তু শেখর অবাক! কে বলবে এই ঘোড়াই খানিক আগে এমন মূর্তি ধরেছিল! এ কি সওয়ারেরই হাতের গুণ, না ঘোড়ার নিজস্ব বদমায়েসি, শেখর বুঝতে পারল না।

পথে যেতে যেতে শেখর তার অচেনা সঙ্গী সম্বন্ধে ক্রমশই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল; বাহন ঘোড়াটির মতন সওয়ারেরও চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ লুকোবার নয়। যুদ্ধই যে তাঁর প্রধান কাজ, বজ্রের মতন শরীরের বাঁধুনি ও গায়ের নানানা জায়গায় অস্ত্র-লেখা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নির্মম যোদ্ধার মতন মুখের ভাবও তাঁর কঠিন, শুধু চোখের দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটা হাসির আভাস প্রচ্ছন্ন আছে। মনে হয় সৈনিকের কঠিন মুখোশের আড়ালে তিনি যেন আর একটা চরিত্র লুকিয়ে রেখেছেন। তাকে আপাতত বন্দি করে নিয়ে চললেও তাঁর ওপর শেখর তেমন যেন রাগ করতে পারছিল না।

তিনি কে, কেনই বা এই সকালে তাঁর মতন লোক এত দূরে শুধু পদ্মফুল সংগ্রহের জন্যে ঘোড়ায় চেপে এসেছেন, এই প্রশ্নই তার মনে জাগছিল। লজ্জায় কিন্তু সে স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না।

খানিক বাদে কিন্তু লোকটির প্রতি এমন ভালো মনোভাব আর শেখরের রইল না। না থাকবার কারণ লোকটির অজস্র প্রশ্ন, ও প্রশ্ন করার ধরন।

কিছুদূর গিয়েই তাঁর প্রশ্নের বাণ শুরু হল। প্রশ্নগুলি যেমন অস্বস্তিকর, তার ভিতরের প্রচ্ছন্ন সুর তেমনি শেখরের পক্ষে আপত্তিকর।

প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বন্ধু, যুদ্ধ করতে যে যাচ্ছিলে, তোমার বাপ-মাকে জানিয়ে এসেছ? না, পালিয়ে এসেছ কাউকে না বলে?'

'পালিয়ে আসব কেন?' শেখরের গলা বেশ চড়া।

'পালিয়ে আসনি! ভালো। কিন্তু তোমার বাপ-মা কী বলে তোমায় ছেড়ে দিলেন?'

'ছেড়ে আমায় কেউ দেয়নি, আমার বাপ-মা কেউ নেই।' এ প্রসঙ্গ শেষ করার জন্যেই শেখর সাফ জবাব দিল।

'বাপ-মা কেউ নেই!' এবার লোকটির গলার স্বর যেন একটু অন্যরকম শোনাল। সামনের দিকে থাকলে শেখর হয়তো তাঁর মুখের ভাবেরও পরিবর্তন দেখতে পেত।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কোথায় তোমার দেশ, কী তোমার নাম, কিছুই তো জানতে পারলাম না?'

'সেসব জেনে কী দরকার আপনার?' শেখর তার অস্বস্তিটা লুকোবার জন্যেই যেন একটু বেশি উদ্ধত হয়ে উঠল।

'বাঃ, দরকার নেই! কোতোয়ালিতে তোমায় ধরিয়ে দিতে হলে পরিচয় দিতে হবে না!'

পরিহাসের সুরে আরও চটে গিয়ে শেখর বলল, 'পরিচয় না দিয়েও ধরিয়ে দিতে অসুবিধে হবে না।'

'তা অবশ্য হবে না, কিন্তু একটা কিছু নাম তো জানা দরকার। বাপু, বাছা, বলে কতক্ষণ আর ডাকা যায়!'

নামটা গোপন করার কোনো প্রয়োজন না দেখে, শেখর গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার নাম শেখর।'

pathagar.net

'বাঃ, শেখর তো খাসা নাম!'

শেখর চুপ করে রইল। সে ইতিমধ্যে উত্যক্ত হয়ে উঠেছে। এসব বেয়াড়া প্রশ্নে পাছে বেফাঁস কিছু বেরিয়ে যায়, এই তার ভয় ও অস্বস্তির প্রধান কারণ।

ধুমঘাটে পৌঁছোনো পর্যন্ত আর কিন্তু লোকটি কোনো প্রশ্ন তাকে করলেন না। শেখরও খানিকক্ষণ স্বস্তি পেয়ে বাঁচল।

একটা বড়ো রকমের যুদ্ধ যে আসন্ন, ধুমঘাটে পৌঁছোবার আগেই রাস্তাঘাটের চেহারা দেখে তা বোঝা যায়। আগের রাত্রে জলপথে যেমন যুদ্ধ জাহাজের ভিড় দেখা দিয়েছিল, এখানে তেমনি ভিড় সৈন্যদের। দলবদ্ধভাবে নয়, স্বাধীনভাবে তারা নানাদিক থেকে যাতায়াত করছে। ধুমঘাট থেকে ক্রোশখানেক আগে থেকেই এই ভিড় শুরু হয়েছে। পদাতিক, সওয়ার সকল প্রকার সৈন্যই তাদের মধ্যে রয়েছে। মাঝে মাঝে ঝলমলে সাজ পরানো হাতিও দেখা যাচ্ছে। পদাতিক সৈন্যও নানারকমের। এক জাতের সৈন্যদের চেহারা দেখে তো শেখর অবাক। ধুমঘাটের বাইরে রাস্তার ধারে খোলা মাঠে তারা আস্তানা গেড়েছে। কোনোরকম ছাউনির ধার তারা ধারে না। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা জংলিগোছের চেহারা খাঁদা নাক, টেরছা চোখ, গায়ের রং তামাটে, কারুর কারুর আবার যেন ফরসা। পরনে তাদের লুঙ্গি, হাতে বর্শা ছাড়া কোনো অস্ত্র নেই।

এরকম অদ্ভুত চেহারার লোক শেখর আগে কখনো দেখেনি। কৌতূহল সে তাই আর চেপে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করে ফেলল সাহস করে, 'এরা আবার কোথাকার সৈন্য!'

'ওরা রঘুবীরের কুকি সৈন্য!'—বলে জোয়ান লোকটি হাসলেন, 'ভারী অদ্ভুত চেহারা, না? ওরা উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড় থেকে এসেছে।'

তারপর তিনি আরও নানা শ্রেণির সৈন্যের পরিচয় নিজে থেকেই দিতে দিতে চললেন। কারা মদন মল্লের তাঁবে, কারা কমল খোজার, কারা যশোররাজের খাস রক্ষী, কারা শঙ্কর চক্রবর্তীর বাছাই-করা বাহিনী, কী চিহ্ন দিয়ে তাদের চিনতে হয়, এসব শুনতে শুনতে শেখর উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। বৃদ্ধ দাদুর কাছে যশোরের সৈন্যবাহিনীর অনেক কাহিনি সে শুনেছে, কিন্তু স্বচক্ষে এসব দেখার একটা আলাদা উন্মাদনা আছে। সে যে যশোরের শত্রুতা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে, এই সমস্ত সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে যশোররাজের ধ্বংসই যে তার কাম্য, এ কথা খানিকক্ষণের জন্যে তার মনে রইল না। এমনকী ঘোড়া চুরির অপরাধে তাকে যে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে খেয়ালও তার তখন নেই। সে যেন এদেরই একজন, এইসব বীরদের সঙ্গে সে-ও যেন মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এখানে এসেছে!

এ মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কিন্তু খানিক বাদেই রূঢ় আঘাত পেয়ে তার কেটে গেল।

তার সঙ্গী লোকটি যে ধুমঘাটের নেহাত কেওকেটা নয়, এটা খানিক আগে থেকেই সে নানা ব্যাপারে বুঝতে পারছিল। পথের সৈন্যরা যেভাবে তার ঘোড়া দেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াচ্ছিল যেরকম শ্রদ্ধাভরে তাকে অনেক নমস্কার জানাচ্ছিল, তাতেই তার পদমর্যাদা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। এতক্ষণ কিন্তু সবাই দূর থেকে নমস্কার করেই সরে গেছে। ধুমঘাটের ভিতর ঢোকবার পর অপর দিক থেকে একজন সওয়ার তাকে দেখে ঘোড়া রুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। নতুন লোকটির বেশভূষা দেখে তাকেও উচ্চপদস্থ বলে মনে হয়। শেখরের সঙ্গীও তাকে দেখে ঘোড়া রুখেছিলেন। তিনিই প্রথম বললেন, 'এই যে নুরউল্লা, তোমাদের কাছেই যাব ঠিক করেছিলাম। দেখা হয়ে ভালোই হল।'

নুরউল্লার নাম তো শেখরের অজানা নয়! সওয়ার সৈন্যের নায়ক প্রতাপসিংহ দত্তের তিনি যে ডান হাত, একথা সে দাদুর মুখে শুনেছে। যশোরের নামজাদা একজন বীরকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার আনন্দে, খানিকক্ষণ তার আর কোনোদিকে খেয়ালই ছিল না। দুজনের গোড়ার দিকের

pathagar.net

কথাবার্তা তাই তার কানেও যায়নি। হঠাৎ তার সঙ্গীর মুখে নিজের নাম শুনে তার চমক ভাঙল। তার সঙ্গী তখন বলছিলেন, 'ইনি হচ্ছেন শেখর, আর কোনো পরিচয় ওঁর আপাতত নেই। যশোরের পক্ষে তিরন্দাজ হয়ে মানসিংহকে হারিয়ে দিতে এসেছিলেন, কিন্তু সুপারিশের চিঠিটা কেমন করে বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছেন। তিরন্দাজ হওয়া আর তাই ওঁর হল না। তিরন্দাজের বদলে সওয়ার-সৈন্য হওয়াই কিন্তু ওঁর উচিত। যেভাবে উনি আমার ঘোড়াকে বাগ মানিয়ে চম্পট দিচ্ছিলেন, দেখলে তুমি খুশি হতে। সেইজন্যেই তোমাদের কাছে ওকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখা হয়ে গেল; এখন তুমিই নিয়ে গিয়ে ওকে দলে ভরতি করে দিতে পার।'

তাকে নিয়ে এরকম ঠাট্টায় রাগে, অভিমানে শেখরের সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। সে একেবারে আগুন হয়ে উঠে বলল, 'কোনো দলে আমি ভরতি হতে চাই না। আপনার ঘোড়া চুরি করবার চেষ্টা করেছি, আমায় কোতোয়ালিতেই ধরিয়ে দিন। আপনার ঘোড়া থেকে পড়ে গেছি বলে অত ঠাট্টার কী দরকার!'

তার সঙ্গী ও নুরউল্লা দুজনেই এবার হেসে উঠলেন। তারপর নুরউল্লা বললেন, 'রাগ কোরো না ভাই, যশোরে থাকলে এ ঠাট্টার দাম একদিন বুঝতে পারবে! সূর্যকান্ত গুহ যাকে-তাকে এমন ঠাট্টা করে না।'

সূর্যকান্ত গুহ?

শেখর চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, তার মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেছে। মুলাজোড়ের পরম শত্রু, তার বাবার মৃত্যুর কারণ সূর্যকান্ত গুহের সঙ্গে ভাগ্য এইভাবে তার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে কে জানত!

এভাবে সঙ্গীর পরিচয় জানবার পর তারই পিছনে চুপ করে বসে থাকা আর শেখরের পক্ষে সম্ভব হল না। উত্তেজনায় তখন তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। মনের ভিতর বিস্ময়, রাগ, উত্তেজনার এমন একটা ঝড় বইছে যে, কথা বলতে গেলে নিজেকে সামলাতে সে পারত কি না সন্দেহ। যা-তা বলে নিজেকে হয়তো সে ধরা দিয়ে ফেলত। কোনো কথা না বলে তাই হঠাৎ সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে রাস্তার একদিকে ছুট দিল। সূর্যকান্ত গুহের সংশ্রব থেকে এখনই এই মুহূর্তে যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যাওয়া দরকার এইটুকু মাত্র তখন সে জানে।

সূর্যকান্ত ও নুরউল্লা তার এই ব্যবহারে কিন্তু একেবারে অবাক। হঠাৎ তার এরকম পালিয়ে যাওয়ার কোনো মানেই তাঁরা পেলেন না।

সূর্যকান্ত বারকয়েক পিছন থেকে ডাকলেন, 'শোনো, শোনো শেখর, শুনে যাও!'

কিন্তু কোথায় শেখর! সে তখন সদর রাস্তা ছেড়ে আঁকাবাঁকা গলির ভেতর ঢুকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নুরউল্লা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'দেখব নাকি, কোথায় গেল!'

সূর্যকান্ত বাধা দিয়ে বললেন, 'না দরকার নেই। কিন্তু ভারী আশ্চর্য, হঠাৎ এমন পালাবার কী হল? সামান্য টাট্টায় অমন রাগ করবে ভাবিনি।'

নুরউল্লা হেসে বললেন, 'শুধু তার জন্যে অমন করে পালাবার তো মানে হয় না।'

সূর্যকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, 'তাই তো ভাবছি।' তারপর ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে অগ্রসর হলেন। নুরউল্লা সঙ্গে যেতে যেতে বললেন, 'দ্বাদশ দেউলের দিঘির পদ্ম হাতে দেখছি, যশোরেশ্বরীর মন্দিরে চলেছেন নিশ্চয়?'

সূর্যকান্ত একটু বুঝি অন্যমনস্ক ছিলেন, নুরউল্লার কথায় কোনো উত্তর দিলেন না।

নুরউল্লা নিজের মনে একটু হেসে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটি আপনার কে হয়?'

'আমার?' সূর্যকান্তর যেন চমক ভাঙল, 'আমার কে হবে, আমার কেউ নয়। আজ সকালেই তো প্রথম পরিচয়। যশোরেশ্বরীর পুজোর জন্যে পদ্ম আনতে গিয়েছিলাম, যেমন যাই।

pathagar.net

ঘোড়া রেখে জলে নেমেছি, এমন সময় আকাশ-ফাটা হুংকার শুনে চমকে ফিরে দেখি—ওপরে তুমুল কাণ্ড বেধেছে। সে একটা দেখবার মতন জিনিস, বুঝলে! তুফানকে তো চেন, আমি ছাড়া আর কেউ চাপলেই নামেও তুফান, কাজেও তুফান। তুফানের সেই প্রলয়ংকরী মূর্তির কাছে হার মানলেও ছেলেটি যে সওয়ারগিরি ও কায়দা দেখাল তাতে আমি সত্যি তবাক!'

নুরউল্লা হেসে বললেন, 'আপনার দেখছি ছেলেটির ওপর মায়া পড়ে গেছে!'

সূর্যকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, 'তা একটু পড়েছে! এ বয়সে অমন সওয়ার কটা দেখা যায়!'

॥ ৪ ॥

শেখর বাঁকাচোরা গলিটার ভিতর অনেকখানি দৌড়ে গিয়ে থামল যখন পিছনে যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। অবশ্য অনুসরণ যে কেউ তাকে করবে না একথা সে যেন আগে থাকতেই জানত। ধরা পড়ার ভয়ে নয়, নিজের গরজেই তাকে সূর্যকান্তর সংসর্গ পরিত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু এখন তার কী করা উচিত।

ধুমঘাটে কোনোমতে সে ঢুকতে চেয়েছিল, সে ইচ্ছে তার সফল হয়েছে। কোতোয়ালিতে বন্দিও তাকে হতে হয়নি। সে এখনও স্বাধীন, কিন্তু তবু আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনো পথই যে কোনো দিকে দেখা যাচ্ছে না।

ধুমঘাট শহর তার অচেনা, এখানে কারো সঙ্গে তার পরিচয় নেই। যে সূত্রে পরিচয় করা যায়, তাও ব্যবহার করা চলবে না। সুতরাং কপর্দকহীন অসহায় অবস্থায় সে এখন কী করতে পারে! উদ্দেশ্যহীনভাবে এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে সুপারিশের চিঠি হারাবার আপশোসটা তার ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিল। সে চিঠি অমন আহাম্মকের মতন না হারালে কোনো হাঙ্গামাই তাকে করতে হত না। সেই চিঠির সাহায্যে এতক্ষণে সে তিরন্দাজদের দলে জায়গা পেয়ে গেছে!

চৌধুরিমশাইয়ের সুখাসর্দারের হাতে ধরা পড়ার খবর তো শেখর জানে না। সে তাই ভাবছিল তার বৃদ্ধ দাদু তার সম্বন্ধে এখনও নিশ্চয় আশ্বস্ত আছেন। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে তিরন্দাজ দলে তাকে না পেয়ে তাঁর কী পরিমাণ দুর্ভাবনা ও হতাশা হবে, তাই ভেবেই শেখরের সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছিল। তাঁর এতদিনের চেষ্টা, এতদিনের আশা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যাবে শুধু শেখরের আহাম্মকিতে—এটাই সবচেয়ে বড়ো আপশোসের কথা।

কিন্তু উপায় কি সত্যি একেবারে নেই!

ঘুরতে ঘুরতে শেখর তখন ধুমঘাটের যে অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটা শহরের একটা নামজাদা জায়গা। সেখানে রাস্তার ধারে ধারে বড়ো বড়ো সুঁদরি কাঠের স্তূপ। বিশাল পাহাড়প্রমাণ আটচালার তলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজের কাঠামো দেখে শেখর কাউকে না জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পেরেছিল—এই হচ্ছে ধুমঘাটের বিখ্যাত জাহাজঘাটা।

কিন্তু জাহাজঘাটা জাহাজ তৈরির কারখানা নয়, শেখরকে যা তখন আকৃষ্ট করছিল, তা হল রাস্তার ধারে এক সাপুড়ের সাপ খেলাবার গান।

লোকদের ভিড়ের ভিতর থেকে বেদেদের গলার সেই পরিচিত সুর শুনেই শেখরের হঠাৎ মনে হল, উপায় এখনও একটা থাকতে পারে!

রাস্তার ধারে বেদে তার ঝোলাঝুলি পেতে সাপ খেলাতে বসেছে। চারিদিকে ছেলে বুড়ো নানা বয়সের নানা লোকের ভিড়। মাঝিমাল্লা ও সৈনিকের সংখ্যাই তার মধ্যে বেশি। যুদ্ধে যাবার আগে তারা যেটুকু পারে ফুর্তি করে নিতে চায়। একটা কিছু হুজুগের ছুতো পেলেই হল। শেখর সেই ভিড়ের মধ্যে কোনোরকমে ঠেলেঠুলে গিয়ে ঢুকল। গান থামিয়ে বেদে তখন চুবড়ি খুলে

বড়ো বড়ো দুটি গোখরো বার করেছে। একটু খোঁচা দিতেই তার একটা ফণা ধরে ফোঁস করে উঠল। আর একটা কিন্তু একেবারে নিস্তেজ। মাথা তুলতে না তুলতে নেতিয়ে পড়ে।

একজন সৈনিক ঠাট্টা করে বলল, 'হ্যাঁগা বেদের পো, এ সাপটা কোথা থেকে ধরেছ?'

তার সাপের বদনাম কাটাবার জন্য বেদে তাড়াতাড়ি বলল, 'কোথা থেকে আবার, এ এখানকারই আসল জাত সাপ। সবে খোলস ছেড়ে একটু কাহিল হয়ে পড়েছে।'

'শুধু একটু নয়, বেশ কাহিল!' সেই সৈনিকটি আবার ঠাট্টা করে উঠল, 'আমার মনে হচ্ছে এ যেন মানসিংহের দেশের সাপ, যশোরে এসে তার মাথা তুলতে পারছে না!'

সবাই খুব খুশি হয়ে হো হো করে হেসে উঠল। বেদের পো ব্যবসার গতিক সুবিধের নয় বুঝে ঝাঁপি বন্ধ করে ঝোলাঝুলি গুটোবার উদ্যোগ করছে দেখে শেখর সাহস করে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'দু-মুখো সাপ আছে বেদের পো?'

বেদের ঝোলা গুটোনো আর হল না। শেখরের মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, 'আছে বই কী! বেদের ঘরে কোন সাপটা নেই আবার!' শেখর উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দু-মুখো সাপের কোথায় বিষ বলতে পার বেদের পো!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেখরের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বেদে হেসে বলল, 'আজ্ঞে, লেজে।'

সবাই সঙ্গে সঙ্গে আবার হেসে উঠল তার দিকে চেয়ে। কিন্তু শেখরের তখন সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের সৌভাগ্য যেন তখন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। এ ব্যাপারটা এমন সহজে, এমন তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। অনেক খোঁজাখুজি অনেক চেষ্টার পরও সফল হবে কি না সে বিষয়ে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তার বদলে কিনা একেবারে ভাগ্যের এই আশাতীত দয়া!

'দেখাও দেখি দু-মুখো সাপ!' উত্তেজনায় শেখরের গলা একটু বুঝি কাঁপল। বেদে ঝোলাঝুলি গুটোতে গুটোতে বলল, 'ডেরায় যেতে হবে বাছা, সে সাপ তো আর সঙ্গে নেই!'

আর সবাই ঠাট্টা ভেবে হেসে উঠল। শেখর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বলল, 'চলো তাহলে। কতদূর তোমার ডেরা?'

ঝোলাটা কাঁধে চাপিয়ে এগোতে এগোতে বেদে বলল, 'তা একটু দূর আছে বই কী! শহর ছাড়িয়ে ক্রোশ চারেক হবে।'

মজা দেখবার জন্যে যারা সঙ্গে যাবার উদ্যোগ করছিল তাদের এরপর আর বড়ো দেখা গেল না। চার-পাঁচটা রাস্তার মোড় ঘোরবার পর শহরের শেষাশেষি এসে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বেদে একটা অত্যন্ত সরু পথ ধরল। সেই পথের শেষে একটা প্রকাণ্ড পুরোনো পাঁচিল দেখা গেল। পাঁচিলটার আকার দেখেই বোঝা যায়, এককালে সেটি ছোটোখাটো একটি গড়ের অংশ ছিল। ধুমঘাট শহর নতুন। তার অধিকাংশ বাড়িঘরও নতুন। তার মধ্যে এই পুরোনো পাঁচিলটা দেখে বোঝা যায় ধুমঘাট জঙ্গল কেটে বসালেও, সে একেবারে আদিম জঙ্গল নয়। মানুষের পায়ের চিহ্ন সেখানে আগেও পড়েছিল। সুন্দরবন এমন অনেক চিহ্ন মুছে দিয়েছে বারবার। শেখর ভবিষ্যৎ গণনা করতে জানলে হয়তো বুঝতে পারত এ ভাঙা প্রাচীর শুধু অতীতের সঙ্গী নয়, ভবিষ্যতেরও আভাস। পাঁচিলটার নানা জায়গা ভাঙা। এইরকম একটা ভাঙা ফাটলের কাছে এসে চারিদিক লক্ষ করে বেদে বলল, 'তাড়াতাড়ি ঢুকে এসো, এ আস্তানা ওরা জেনে গেলে সব মাটি।'

বেদের পিছন পিছন ফাটল টপকে দেওয়ালের ওধারে পা দিয়ে শেখর চমকে উঠল—দু-দিক থেকে দুটি লোক বজ্রমুষ্টিতে তার হাত ধরেছে। শুধু সে একা ধরা পড়েনি, বেদের অবস্থাও তাই।

যারা তার হাত ধরেছে তাদের সংখ্যা, চেহারা ও পোশাক নীরবে লক্ষ করে শেখর বুঝল গায়ের জোরে এদের বাধা দিতে যাওয়া মূর্খতা, স্পষ্টই দেখা গেল তারা যশোরের প্রহরী।

সংখ্যাতেও তারা অনেক বেশি। বেদের আস্তানার কথা জেনে তারা যে অনেকক্ষণ থেকে তার জন্যে অপেক্ষা করছে তাও তদের কথায় বোঝা গেল। রাগটা তাদের বেদের ওপরেই বেশি। যেখান দিয়ে ঢুকেছিল সেখান দিয়েই তাদের টেনে বার করতে করতে একজন প্রহরী বলল, 'সারা সকালটা ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে! এখন চলো, দিনভোর সাপ খেলানো দেখাবে!' বেদে কোনো সাড়াশব্দ করল না। শেখর জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছ?'

'কোথায় আর, সুখাসর্দারের নেমন্তন্নে—' বলে একজন হেসে উঠল।

॥ ৫ ॥

শহরের মাঝখানে রাজপ্রাসাদের পাশেই বিরাট সরকারি মহল। সকালবেলার কাজের পালা সেখানে এখন শেষ হয়ে গেছে। অধিকাংশ লোকই ছুটি পেয়ে চলে গেছে—দুপুরের স্নানাহারের জন্যে। দু-একটি কামরায় দু-চারজনের মাত্র জটলা দেখা যায়। ভিড়ের কামাই নেই শুধু সুখাসর্দারের মহলে। যুদ্ধের বাজনা যেদিন থেকে বেজেছে, সেদিন থেকেই সুখাসর্দারের আর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। চারিদিকে হুঁশিয়ার দৃষ্টি রেখে, ঘরের শত্রু সামলানো তার বাইরের শত্রুর সন্ধান রাখা—সে তো তার সামান্য ব্যাপার নয়!

সুখাসর্দারের মহল একটু আলাদা। চারিধারে তার উঁচু পাঁচিল, ভিতরের ব্যাপার বাইরের থেকে জানবার উপায় নেই। প্রহরীরা শেখর আর বেদেকে এনে মহলের একদিকে একটি লোহার শিকের বেড়া-দেওয়া গারদের মধ্যে আটকে রেখেছিল। কী যে তাদের নিয়ে করা হবে, তা শেখর কিছুই জানে না। সারা পথে এবং তারপর এখানেও সাপুড়ের সঙ্গে কোনো কথা বলার সুযোগ তার মেলেনি। কী জবাবদিহি তারা দিতে পারে, তা নিয়ে কোনো পরামর্শ সুতরাং সে করতে পারেনি। আপাতত এই অনিশ্চয়তার মধ্যে অপেক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে খারাপ লাগছিল। ধরা যখন পড়েছে, তখন যা হয় একটা হয়ে গেলেই সে যেন নিশ্চিন্ত হয়। বাইরে তখনও যেরকম লোকের ভিড়, তাতে তাড়াতাড়ি তাদের একটা হেস্তনেস্ত যে হবে, তার আশা সে দেখতে পাচ্ছিল না।

কিন্তু তাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। খানিকক্ষণ বাদেই একজন প্রহরী গারদের দরজা খুলে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলল। প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও শেখরের বুক তখন কাঁপছে। জিভ শুকিয়ে যেন ভিতর দিকে টানছে—অজানা ভয়ে।

ভয় পাওয়া অবশ্য এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। সুখাসর্দারের বিষয়ে এমন সব অদ্ভুত গল্প সর্বত্র প্রচারিত। তার ক্ষমতা ও অসাধারণ কূটবুদ্ধি সম্বন্ধে সকলের মনে এমন একটা ভয়ংকর রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে যে, শেখরের চেয়ে অনেক বেশি বয়সের অত্যন্ত কড়া লোকও তার কাছে হাজিরা দিতে এর আগে কেঁপে উঠেছে।

রহস্যের একটা গভীর আবরণ সৃষ্টি করার জন্যে বাইরের আয়োজনও বড়ো কম নয়। সর্দারের খাসকামরায় পৌঁছোবার আগে অধিকাংশ লোক বেশ কাবু হয়ে পড়ে।

সোজাসুজি সুখাসর্দারের দেখা পাওয়া যায় না—তার খাসকামরায় যাওয়া বেশ একটু জটিল ব্যাপার। প্রথমেই নীচের সুড়ঙ্গের মতন একটি দীর্ঘ অন্ধকার পথ দিয়ে শেখরদের সঙ্গের প্রহরী তাদের নিয়ে চলল। দিনের বেলাতেও সেখানে আলোর রেখা নেই বললেই হয়। সেই সুড়ঙ্গ কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ মোড় ফিরতেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল, যমদূতের মতন একজন ভীষণ চেহারার হাবসি প্রহরী খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মোড় ফিরেই ওই ভয়ংকর মূর্তিকে হঠাৎ ঘাড়ের উপর দেখে চমকে না ওঠাই আশ্চর্য।

হাবসি প্রহরী কিন্তু ঠিক লোহার মূর্তির মতন অচল, নিস্পন্দ। তার সামনে কেউ আছে কি

pathagar.net

না সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও যেন তার নেই। এই অবিচলতার জন্যেই তাকে যেন আরও ভয়ংকর মনে হয়।

শেখরদের সঙ্গের প্রহরী অস্পষ্ট স্বরে কী একটা শব্দ উচ্চারণ করতে, সে লৌহমূর্তিতে যেন প্রাণের সঞ্চার দেখা গেল। কিন্তু তখনও তার চলাফেরা ঠিক যন্ত্রের মতন। গায়ের বর্ম তার ঝনঝন করে বেজে উঠল। দেখা গেল, পাশ ফিরে হাতের তলোয়ারটা সে তুলে ধরছে ওপরের দিকে।

আর কোনো কথা না বলে সঙ্গের প্রহরী এবার শেখরদের নিয়ে একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ঘোরালো সিঁড়িতে গিয়ে উঠল। সুড়ঙ্গ পথে যদি বা কিছু দেখা গিয়েছিল, এ সিঁড়ি একেবারে গাঢ় অমাবস্যার রাতের মতন অন্ধকার। পাশের দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শেখরের মাথা ক্রমশ ঘুরে উঠল। এ সিঁড়ির যেন শেষ নেই। বাইরের অন্ধকারের দরুন নয়, সে যেন অন্ধ হয়ে গেছে বলেই আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

ঘোরানো সিঁড়িও এক জায়গায় শেষ হল। শয়তানের মতন আর এক ভীষণমূর্তি প্রহরী সেখানে দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে সে একটা দরজা খুলে ধরে আছে দেখা গেল। ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা এসে তার বর্মে ও তলোয়ারে চকচক করছে।

শেখরের মাথার ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। কামরার ভিতর ঢুকেও তাই তার সমস্ত ঝাপসা মনে হল।

বাইরের আলো এ কামরাটিতেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। দুটি বাতিদান শুধু ঘরের দু-পাশে জ্বলছে। চারিধারে ভারী ভারী কালো কালো পরদা ঝুলিয়ে দেবার দরুন তার আলোও ভালো করে ফুটতে পারেনি। সমস্ত কামরাটি কেমন যেন থমথম করছে, আবছা আলো-আঁধারিতে।

এ আলো চোখে একটু সয়ে যাবার পর শেখর ঘরের প্রধান লোকটিকে দেখতে পেল। সামনের অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু বেদির উপর কালো মখমলের বালিশ ঠেসান দিয়ে তিনি বসে আছেন।

জলের মাছেরা পর্যন্ত যার চর, এই সেই সুখাসর্দার! আশ্চর্য! শেখর এই অসাধারণ লোকটির সম্বন্ধে মনে মনে যা ভাবছিল কিছুই তার মেলে না। বিশাল চেহারা, তীক্ষ্ম কুটিল মুখ, কিছুই এ লোকটির নেই।

মাথায় খাটো, গোলগাল, অত্যন্ত সাদাসিধে চেহারার একটি মানুষ, কিন্তু তবু লোকটির অসাধারণ বিশেষত্ব বুঝতে শেখরের এক মুহূর্ত দেরি হল না।

তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সুখাসর্দার একটু হাসলেন। ছোটো ছোটো চোখের সে ধারালো দৃষ্টি মনে হল যেন ছুরির ফলার মতন ভিতরে এসে বেঁধে। সে দুর্বোধ চাপা হাসির সামনে অতি বড়ো শক্ত লোকের মনের জোর ভেঙে খান খান হয়ে যায়। এখানে পৌঁছোবার অদ্ভুত ব্যবস্থা, ঘরটির থমথমে আবহাওয়া এবং এই অসাধারণ লোকটির প্রভাব, সব কিছুতে মিলে ভয়ে বিস্ময়ে উত্তেজনায় শেখরকে তখন এমন বিহ্বল করে দিয়েছে যে, সে-ঘরে উপস্থিত আরেকটি লোককে সে লক্ষই করল না। সুখাসর্দারের কাছেই তিনি বসে ছিলেন। শেখর ঘরে ঢোকামাত্র তিনি যে মড়ার মতন বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তা বোধ হয় সুখাসর্দার লক্ষ করেননি।

প্রথমে শেখরের সঙ্গী বেদের দিকে ফিরে সুখাসর্দার বললেন, 'কী গো বেদের পো, কী নাম তোমার?'

বেদের অবস্থা তখন শেখরের চেয়েও কাহিল। ঘেমে কেঁপে বারকয়েক শুকনো গলায় ঢোক গিলে সে বলল 'আজ্ঞে, সনাতন!'

'তারপর সনাতন! শুনি তুমি নাকি মস্ত গুণী, কিন্তু কালসাপ নিয়ে খেলা করলে একদিন না একদিন ছোবল খেতে হয়, তা কি জান না বাপু!'

pathagar.net

কোনোরকমে তখনও নিজেকে সামলে সনাতন বলল, 'আজ্ঞে, আমি গরিব সাপুড়ে হুজুর, জাত ব্যবসা না করলে পেট চলবে কীসে?'

'কিন্তু জাত ব্যবসা ছেড়ে বজ্জাতি ব্যবসা যে ধরেছ সনাতন! কোন সাপের গর্তে হাত বাড়াচ্ছ একটু খেয়াল রাখতে তো হয়!'—সুখাসর্দার আবার একটু হাসলেন।

সনাতন আর পারল না। হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে মাটিতে পড়ে, সুখাসর্দারের পা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে বলল, 'দোহাই হুজুর, গরিবের মা বাপ—আমায় মাপ করুন! শুধু পয়সার লোভে আমার এ সর্বনাশা বুদ্ধি হয়েছিল—ঘরে আমার কচি কচি দুধের বাছা আছে, হুজুর...'

হঠাৎ প্রচণ্ড ধমকে সমস্ত ঘর কেঁপে উঠল। সুখাসর্দারের সমস্ত চেহারাই এক মুহূর্তে বদলে গেছে। কোথায় সে ভালো মানুষের মতন মূর্তি! এ মুখ দেখলে বুকের রক্ত আপনি শুকিয়ে যায়; সনাতনের কথা তো তার গলাতেই আটকে গেল।

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বজ্রস্বরে সুখাসর্দার বললেন, 'ডালকুত্তা দিয়ে তোমায় খাওয়াব, শয়তান! বাচ্চাদের কথা গোড়ায় মনে পড়েনি? বল শিগ্‌গির, কে তোকে পাঠিয়েছে, কী খবর তুই পেয়েছিস এ পর্যন্ত ?'

বেদে সভয়ে ধরা গলায় বলল, 'মা মনসার দিব্যি, কোনো খবর এখনও পাইনি—এই পাঁচ দিন—'

আবার তাকে ধমক দিয়ে সুখাসর্দার বললেন, 'পাঁচ দিন কি সাত দিন আমি জানি—খবর কিছু কেউ দিয়েছে কি না!'

'আজ্ঞে না!'

'মিথ্যে বললে পিল দিয়ে পেযাব! আর কজন আছে তোর মতো?'

'আর কারো কথা জানি না, হুজুর!'

সুখাসর্দারের একথাটাও বোধ হয় বিশ্বাস হল না। ঘুরিয়ে তাই অন্য প্রশ্ন করলেন, 'খবর পেলে কোথায় নিয়ে যেতিস—কোথায় তোর ঘাঁটি?'

সনাতন একটু বুঝি ইতস্তত করছিল। সুখাসর্দার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বোবা হবার শখ হয়েছে দেখছি, জিভ এক্ষুনি কাটিয়ে দিচ্ছি তাহলে!'

সনাতনের জিভ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সচল হয়ে উঠল, শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে না। এই যে বলছি, যেতাম হুজুর নলডাঙা—'

সুখাসর্দারের মুখ আবার এক মুহূর্তে বদলে গেল, 'হুঁ, নলডাঙা!' মৃদু হেসে পাশের দিকে ফিরে তিনি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'শুনলেন চৌধুরিমশাই! সুতোগুলো কীভাবে গিঁট বাঁধছে?'

চৌধুরিমশাইয়ের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে শেখরের দৃষ্টি সেদিকে ফিরেছিল। বিস্ময়ের অস্ফুট একটা শব্দ আর একটু হলেই বুঝি বেরিয়ে এসেছিল তার গলা দিয়ে। অতি কষ্টে সেটা চেপে নিয়ে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দাদুকে এই ঘরে দেখবার কথা সে সত্যিই কল্পনা করেনি। দাদুকে দেখবার পর ঘরের অস্পষ্ট আলোটুকুও যেন চোখের ওপর মুছে যাচ্ছে বলে মনে হল।

চৌধুরিমশাইয়ের মুখ অনেক আগে থেকেই মড়ার মতন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আর কোনো ভাবান্তর লক্ষ করলেও কেউ টের পেত কি না সন্দেহ! শেখর তাঁর পরিচিত, তাঁর মুখ দেখে কে বলবে!

কিন্তু দুজনের এতখানি আত্মসংযমও ব্যর্থ হল! সুখাসর্দার এক হিসাবে শয়তানের চেয়ে ধূর্ত! শেখরের গলার শব্দ শোনা যায়নি, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টির সামনে চঞ্চলতাটুকু তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে কি না কে বলবে! সুখাসর্দারের পরের ব্যবহারে অন্তত কোনো আশ্বাসই পাওয়া গেল না।

এতক্ষণ বাদে হঠাৎ শেখরের দিকে আঙুল দেখিয়ে উগ্র স্বরে সুখাসর্দার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছেলেটি কে?'

প্রহরী সসংকোচে জানাল যে ছেলেটার পরিচয় সে জানে না, সাপুড়ে গুপ্তচরের সঙ্গে ছিল বলে তাকে ধরে আনা হয়েছে।

'বটে!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেখরকে খানিকক্ষণ লক্ষ করে সুখাসর্দার বেদেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সাকরেদটি কোথায় জোগাড় করলে হে, সনাতন! আজকাল এইরকম চেলা জুটছে নাকি?'

'আমার চেলা নয়, হুজুর!'

'চেলা নয় তা জানি, চরের পেছনে অনুচর, কেমন? কিন্তু এটিকে কোথায় জোটালে?' তারপর সনাতনের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে সুখাসর্দার শেখরকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নাম তোমার হে, কোথায় থাকো?'

এতক্ষণে শেখর বৃদ্ধ দাদুকে দেখেই বুঝি নতুন করে সাহস সংগ্রহ করেছে। সোজা সুখাসর্দারের চোখের দিকে চেয়ে সে বলল, 'সে উত্তর কি না দিলেই নয়?'

'বাঃ—বাহাদুর ছোকরা তো! কী বলেন চৌধুরিমশাই?'

চৌধুরিমশাই উত্তর দিলেন না। ঈষৎ হেসে শেখরের দিকে ফিরে সুখাসর্দার বলল, 'না দিলে মনে করব নিজের পরিচয় ভুলে গেছ।'

'তাই মনে করবেন।'

'কিন্তু তাহলে স্মরণশক্তি বাড়াবার ওষুধ দিতে হবে যে! পারবে সে ওষুধ সইতে?'

চৌধুরিমশাইকে এতক্ষণে প্রথম মুখ খুলতে দেখা গেল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে তিনি বললেন, 'যশোর আজকাল একটা বালকের ভয়েও ভীত হয় তাহলে?'

সুখাসর্দার মুখ ফিরিয়ে, খানিক অদ্ভুতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'এ বালক সম্বন্ধে আপনার যেন একটু মমতা জন্মেছে মনে হচ্ছে, চৌধুরিমশাই!'

'বালকের উপর অন্যায় অত্যাচার দেখলে মমতা না হওয়াই অস্বাভাবিক !'

অত্যন্ত কুটিলভাবে সুখাসর্দার বললেন, 'কিন্তু আপনাকে এরকম বিচলিত হতে আগে তো দেখিনি, চৌধুরিমশাই! ছেলেটির সঙ্গে আপনার নাতির কিছু সাদৃশ্য আছে নাকি?'

'আমার নাতির সঙ্গে সাদৃশ্য! কী বলেছেন আপনি?'—

'হ্যাঁ, আপনার নাতির সঙ্গে—গোমতি পর্যন্ত যাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর যার হঠাৎ পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।'

চৌধুরিমশাই এবার হেসে উঠলেন, 'আপনি কি তাই তাকে সনাক্ত করবার জন্যে আমায় এখানে ধরে রেখেছেন? আপনার কি ধারণা সাপুড়ের সাকরেদি করে ধরা পড়বার জন্যে তাকে আমি এইখানেই পাঠিয়েছি। আর তার যোগ্য স্থান কোথাও নেই।'

'তাহলে গোমতিতে তাকে ছেড়ে এসেছেন, বলছেন? স্বীকার করছেন যে, মুলাজোড়ের তলোয়ার মোগলের কাছে বিক্রি হয়েছে?' সুখাসর্দারের মুখের ভাব দুর্বোধ্য।

বৃদ্ধ চৌধুরিমশাই দৃপ্ত কঠিন স্বরে বললেন, 'বিক্রি নয়, ধার দিয়েছি—যশোরের সঙ্গে পুরোনো হিসেব চুকিয়ে ফেলবার জন্যে।'

সুখাসর্দার উৎসাহের চোটে এবার দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর মুখে দুর্লভ সাফল্যের তীব্র আনন্দ আর লুকোনো যাচ্ছে না, 'আপনি যা কষ্টটা দিলেন মিছিমিছি! এই কথাই যে আপনার মুখে সে রাত্রি থেকে শোনবার চেষ্টা করছি, চৌধুরিমশাই!'

চৌধুরিমশাই গুম হয়ে বসে রইলেন। সুখাসর্দার প্রহরীকে ডেকে বললেন, 'চৌধুরিমশাই ক্লান্ত হয়েছেন। তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করো গিয়ে—কোনো ব্যাঘাত যাতে না হয় সেজন্যে খাড়া পাহারায় থাকবে, বুঝেছ?'

pathagar.net

তারপর শেখরদের দিকে ফিরে বললেন, 'আর গুরু-শিষ্য এই দুই সাপুড়েকে কিছুদিন পাতাল কুঠরিতে আটকে রাখো, গুরুর বিষদাঁতটা যেন ভাঙে আর সেইসঙ্গে শিষ্যের স্মরণশক্তি বাড়ে।'

'কার স্মরণশক্তি বাড়াচ্ছ হে সর্দার—এদিকে আমাদের দৃষ্টিশক্তি যে গেল! তোমার এই বিদঘুটে প্যাঁচার মতন প্যাঁচটা ছাড়ো দেখি, নইলে ভদ্রলোক যে দেখা করতে আসতে পারে না।'

আর সকলের সঙ্গে চমকে ফিরে তাকিয়ে শেখর দেখল, নিচু দরজা দিয়ে মাথা নুইয়ে দীর্ঘাকার যে লোকটি ঘরে ঢুকছেন, তিনি আর কেউ নন,—স্বয়ং সূর্যকান্ত!

সুখাসর্দার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। হেসে বললেন, 'প্যাঁচালো লোক নিয়ে কারবার যে ভায়া, প্যাঁচা না হয়ে উপায় কী! কিন্তু অন্ধকারে সূর্যোদয় যে হঠাৎ!'

'দাঁড়াও বাপু একটু সামলে নিই। উদয় নয়, একেবারে গ্রহণ করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে—' চারিদিকে তাকিয়ে ঝাপসাভাবে শেখরদের দেখতে পেয়ে সূর্যকান্ত বললেন, 'তুমি অতিথি-সৎকার করছিলে যে দেখছি!'

'ও তো নিত্যনৈমিত্তিক আছেই। আমি ওদের বিদায় করে আসছি।' বলে সর্দার সেদিকে এগোতেই সূর্যকান্ত তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না না, তার দরকার নেই। আমার শুধু একটা কাজে আসা। এখুনি যেতে হবে।'

সূর্যকান্ত তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'তোমার দলের সেরা একটি চৌকস লোক আমার চাই—দিতে পার?'

সুখাসর্দার হাসলেন, 'সূর্যকান্তের আবার চৌকস অনুচরের অভাব হল কবে?'

'না হে, না,—' সূর্যকান্ত একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'সেরকম চৌকসের কথা হচ্ছে না। আমার অনুচরেরা মাথা নিতেই পারে, সে-বিষয়ে তারা কারো চেয়ে খাটো নয়। কিন্তু মাথা খাটানোটা তাদের তেমন আসে না। তলোয়ার আর বুদ্ধি যার সমান ধারালো, তার ওপর তোমার আখড়ার সব প্যাঁচ শিখেছে, এমন কোনো লোক হাতের কাছে আছে? এখুনি চাই।'

'এখুনি?' সুখাসর্দার একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু কী দরকারটা শুনতে পাই? কাজ বুঝে লোক দিতে হবে তো!'

'শোনো তাহলে। তোমার কাছে নইলে পার পাবার জো তো নেই!' সূর্যকান্ত গলাটা আরও নামিয়ে বললেন, 'আড়াইকাকি গড় আমাদের শত্রুদের হাতে গেছে—এইমাত্র উড়ো পায়রার খবর পাওয়া গেল। ভোর হবার আগে আমাদের একজন দূতের জরুরি খবর পৌঁছোতে গিয়ে সেখানে গিয়ে ধরা পড়া চাই।'

সুখাসর্দার চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু...'

তাঁর কথা শেষ না হতেই হেসে উঠে সূর্যকান্ত একটু-গর্বের সঙ্গেই বললেন, 'এই তো, সর্দার! কূটবুদ্ধির কৌটিল্য হয়েও এই সামান্য ফন্দিটা ধরতে পারলে না!'

সুখাসর্দার অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, 'তুমি হাসালে সূর্যকান্ত! তাঁতিকে এসেছ মাকু চেনাতে! তোমার ওই পাঁচকড়ার ফন্দি নিয়ে ফাঁপরে পড়িনি—দূত ছল করে ধরা পড়বে আর তার হাতে উলটো খবর পেয়ে ওদের চাল ভুল হবে,—এই তো আমাদের ফন্দি?'

সূর্যকান্ত সহাস্যে সর্দারের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তবে তোমার এত কিন্তু কিন্তু কীসের?'

'আমার কিন্তু হল আলাদা। তোমার বায়না তো কম নয়। তলোয়ারে ধার, বুদ্ধিতে ধার, আবার সেরা সওয়ার! এখান থেকে আজ এ বেলায় রওনা হয়ে ভোরের আগে আড়াইকাকি পৌঁছোনো তো চারটিখানি কথা নয়। আর সব গুণ যদি বা মেলে, এক রাতে তিন বেলার পথ সেরে দিতে পারে এরকম সওয়ার কোথা পাই!'

'তুমি না পেলে কি আমরা পাব! পেতেই হবে যে সর্দার। কাল ভোরের আগে না

পৌঁছোলে যে ফন্দিটা আগাগোড়া মাটি। বেশি দেরি হলে ওরাই যে সন্দেহ করবে ব্যাপারটা খাঁটি নয় বলে।'

সূর্যকান্ত আগ্রহের আতিশয্যে গলাটা একটু বুঝি চড়িয়ে ফেলেছিলেন। সুখাসর্দার তাঁকে হাত টিপে হুঁশ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি দাঁড়াও তাহলে একটু, আমি ঝামেলা মিটিয়ে এসে দেখছি কী করা যায়।'

সর্দারের শেষ আদেশের অপেক্ষায় প্রহরীরা তখনও চৌধুরিমশাই ও শেখরদের আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। সুখাসর্দার কাছে এসে হেসে শেখরকে বললেন, 'কী হে, তোমার স্মরণশক্তির কোনো উন্নতি বুঝছ, না পাতাল-কুঠরির চিকিৎসাই দরকার—'

সর্দার আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সূর্যকান্ত সর্দারের পিছু পিছু এসে শেখরকে দেখে চমকে বলে উঠলেন, 'একী, তুমি!'

সর্দার সবিস্ময়ে সূর্যকান্তের দিকে ফিরে বললেন, 'চেন নাকি একে?'

'চিনি বই কী! বেশ চিনি!' সূর্যকান্ত মুখ টিপে হাসলেন।

শেখর, রাগে কি লজ্জায় বলা যায় না—মুখ ফিরিয়ে রইল।

'তাহলে তো তোমার কাছেই এর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। কোন কুল উজ্জ্বল করে কোথা উনি উদয় হয়েছেন বলো তো!' সুখাসর্দার ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে বললেন।

সূর্যকান্ত হেসে উঠে বললেন, 'গাঙের পশ্চিম কূল উজ্জ্বল করে অশ্বপৃষ্ঠে উদয় হতেই তো আমি দেখেছি।'

সুখাসর্দার অর্থ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে?' সূর্যকান্ত হাসি থামিয়ে খানিক চুপ করে কী যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'মানেটা এখন আর তোমায় নাই বোঝালাম। তুমি এঁর পাত্তা কোথায় পেলে বলো তো?'

'ঠিক সাধু-সন্ন্যাসীদের ভেতর যে পাইনি তা এখানে নেমন্তন্ন করে আনা দেখেই বোধ হয় বুঝেছ!' সুখাসর্দার বললেন।

তাঁর ব্যঙ্গের স্বরের নকল করে সূর্যকান্ত বললেন, 'কিন্তু এঁকে এখন ছেড়ে দিলে যশোর রাতারাতি ধসে পড়বার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?'

সুখাসর্দার মুখে কিছু উত্তর না দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সূর্যকান্তের দিকে তাকালেন।

সূর্যকান্ত আবার বললেন 'সেরকম কোনো আশু বিপদ যদি না থাকে তাহলে কদিনের জন্যে ছেলেটিকে আমি ধার চাই।'

সুখাসর্দার এবার সত্যি অবাক হয়ে বললেন, 'বলো কী সূর্যকান্ত!'

'ঠিকই বলছি—' বলে সূর্যকান্ত হাসলেন, 'আমার জন্যে তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না। আমি উপযুক্ত লোকই পেয়েছি।'

বিমূঢ় হয়েই সুখাসর্দার খানিকক্ষণ বোধ হয় কথা বলতে পারলেন না। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে জানালেন, 'তা হয় না, সূর্যকান্ত। হতে পারে না। তোমার মতো আমারও তো মাথা খারাপ হয়নি!'

সূর্যকান্তের কণ্ঠস্বর একটু যেন কঠিন হয়ে উঠল, 'তা একটু হয়েছে বই কী! নইলে সূর্যকান্ত গুহের জামিনেও তোমার মন ওঠে না!'

সুখাসর্দার আর আপত্তি করলেন না বটে, তবে মুখটা তাঁর অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। খানিক বাদে বললেন, 'বেশ, জেদ করে নিয়ে যেতে চাও নিয়ে যাও। কিন্তু জেনো এতে আমার একদম মত নেই।'

সূর্যকান্ত এবার হেসে ফেললেন। সুখাসর্দারকে আবার কামরার অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে

pathagar.net

গলা নামিয়ে বললেন, 'জেদ নয়, সর্দার। তুমি ভুল করছ। তোমার সন্দেহ যদি সত্যও হয় তবু আমাদের লোকসান নেই, এ কথা বুঝছ না কেন?'

সুখাসর্দার তবু প্রসন্ন হলেন বলে মনে হল না। বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'আমার বুদ্ধি অতি অল্প, তবু তোমার বক্তব্যটা বোঝা বোধ হয় শক্ত নয়। শত্রুপক্ষের চর হলেও ওকে দিয়ে আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে, এই তো তুমি বলতে চাও?'

সোৎসাহে সায় দিয়ে সূর্যকান্ত বললেন, 'তাই তো চাই। আমাদের সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির যে মিথ্যে খবর আমরা পাঠাচ্ছি, শত্রুর হাতে সেটা পৌঁছোনো নিয়ে আমাদের কথা। অপর পক্ষের চর যদি ও হয় তাহলেও তো ওর হাতে এ খবর তাদের কাছেই পৌঁছোবে। পালিয়ে গেলে ও তো তাদের কাছেই যাবে?'

সূর্যকান্ত তাঁর কথা শেষ করবার আগেই সর্দার গম্ভীরভাবে বললেন, 'সেই পালিয়ে যেতে দিতেই আমি নারাজ। চুনোপুঁটি থেকে রুই-কাতলা, যে-ই হোক, সুখাসর্দারের জাল থেকে কোনো শত্রুর চর কোনোদিন গলে পালায়নি। আর তোমার এর ওপরই বা এত ঝোঁক কেন?'

সূর্যকান্ত হাসলেন, 'আড়াইকাকিতে কাল ভোরের আগে পৌঁছোবার মতো সওয়ার দুর্লভ বলে। তা ছাড়া, তোমার সন্দেহ যে ভুল তাও আমি প্রমাণ করতে চাই।'

'প্রমাণ হলে ভালো, কিন্তু না যদি হয় তখন আমি ওর নাগাল পাচ্ছি কোথায়?'

'প্রমাণ হবেই।' সূর্যকান্ত জোর দিয়ে বললেন, 'আমি জানি ও পালাবে না।'

'এত বড়ো বিশ্বাস কী থেকে হল?' সুখাসর্দার বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'সে তুমি বুঝবে না, সর্দার। মানুষকে অবিশ্বাস করা তোমার পেশা থেকে নেশায় দাঁড়িয়েছে।' বলে সূর্যকান্ত হেসে উঠলেন।

পরিহাসটা কিন্তু প্রসন্নভাবে সুখাসর্দার নিতে পারলেন না। গম্ভীর মুখে শেখরদের কাছে ফিরে গিয়ে বেশ একটু রূঢ়ভাবেই বললেন, 'এতদিনের নেশা সহজে ছাড়তে পারব না, সূর্যকান্ত। তোমার জামিনে আজ একে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বাঘে যে ছুঁয়েছে, সে কথাটা মনে রেখো।'

সূর্যকান্ত হেসে বললেন, 'সে কথা কি ভোলবার!'

কোথায় পাতাল-কুঠরিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দি থাকা, আর কোথায় যশোরের বিশ্বস্ত দূত হয়ে জরুরি খবর নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যাবার অবাধ স্বাধীনতা! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে লোকটির জন্য তার ভাগ্যের এই পরিবর্তন সম্ভব হল, তাঁর প্রতি শেখরের অবশ্য কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু নিজের মহলে নিয়ে গিয়ে সূর্যকান্ত তখন সমস্ত নির্দেশ দিয়ে তাকে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন, তখন শেখরের কথায় সে কৃতজ্ঞতার কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

সূর্যকান্ত সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে মানচিত্র খুলে তখন তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। শেখর এপর্যন্ত গম্ভীরভাবে চুপ করেই ছিল। হঠাৎ মানচিত্রটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'রাস্তা আমায় চেনাবার দরকার নেই, রাস্তা আমি চিনি।'

সূর্যকান্ত সহাস্যে মুখ তুলে বললেন, 'চেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনি, কিন্তু চিনলেই যে যেতে হবে তারও কোনো মানে নেই। আমি যদি না যাই?' শেখরের গলার স্বর বেশ উদ্ধত।

সূর্যকান্ত আবার হাসলেন। হাসিমুখেই বললেন, 'না গেলে আর উপায় কী?'

'অর্থাৎ আমাকে আবার পাতাল-কুঠরিতে বন্দি হতে হবে, এই তো? বেশ, তাই আমি হব। তবু আপনার কাছে আমার মুক্তির জন্যে আমি কৃতজ্ঞ থাকতে চাই না।'

'আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেই তো তোমার আপত্তি?' সূর্যকান্ত গাম্ভীর্যের ভান করে বললেন, 'কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু আছে কি? তার বদলে তুমি বরং প্রাণ খুলে আমায় অভিশাপ দিতে পার—সাক্ষাৎ যমের মুখে তোমায় ঠেলে দিচ্ছি বলে। এ কাজের কত বিপদ তা তো তুমি

pathagar.net

জান! পাতাল-কুঠরিতে তবু প্রাণে বেঁচে থাকতে, আর এ যাত্রা থেকে যে একেবারে না ফিরতেও পার!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেখরের মুখের ভাব লক্ষ করে, ওযুধ ধরছে বুঝে সূর্যকান্ত আবার বললেন, 'তবে তোমার যদি ভয় হয় তাহলে—'

শেখর আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠল, 'ভয় আমি করি না!'

সূর্যকান্ত গম্ভীর হয়েই বললেন, 'তবে?'

শেখর এবার যেন অস্থির হয়েই মনের কথাটা প্রকাশ করে ফেলল, 'আপনি এত বড়ো কাজের ভার আমায় বিশ্বাস করে দিচ্ছেন কী করে? আমি যে এ বিশ্বাসের যোগ্য তার ঠিক কী! এ বিশ্বাস যদি আমি না রাখি? আমি যদি সত্যিই শত্রুর চর হই?'

সূর্যকান্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শত্রুর মিত্র হতে কতক্ষণ লাগে?'

শেখরের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'কিন্তু সে শত্রুতা যদি রক্ত দিয়ে পাতানো হয়?'

'রক্তে পাতানো?' সূর্যকান্ত প্রথমে সত্যিই চমকে উঠলেন। তারপর খানিক সবিস্ময়ে শেখরের দিকে চেয়ে থেকে শান্ত স্বরে বললেন—'তবু রক্তের চেয়েও দুধের ঋণ বড়ো—মায়ের চেয়ে বড়ো যে মা, সেই দেশের দুধের ঋণ! সে যখন ডাক দেয় তখন আর সব ঋণের কথা ভুলে যেতে হয়।'

শেখরের গলা তখন কী কারণে বলা যায় না ধরে এসেছে। তবু সে যেন নিজের মনের বিরুদ্ধেই তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'না, ভোলা যায় না। ভোলবার নয়!'

সূর্যকান্ত কী বুঝলেন বলা যায় না, কিন্তু এবারে আর কোনো কথাই তিনি বললেন না। এ বয়সের ছেলের মনের রহস্য হয়তো তিনি বোঝেন। তিনি বোধ হয় জানেন যে, এ অবস্থায় তর্ক করে বোঝাতে গেলে উলটো ফলই হবে।

শেখর তখন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে মনের যে আবেগ সে চেপে রেখেছে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জলে তা আর গোপন নেই।

খানিকক্ষণ নীরবে তাকে লক্ষ করে সূর্যকান্ত নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুধু যাবার সময়ে দরজার কাছ থেকে হঠাৎ ফিরে বললেন, 'বাইরে একটা ঘোড়া সাজানো আছে। ইচ্ছে হলে সেটা ব্যবহার করতে পার।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'তা না করে যেখানে খুশি চলে গেলেও কেউ তোমায় বাধা দেবে না।'

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি চলে গেলেন।

খানিক বাদে যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন কুঠির বাইরে ঘোড়া নেই—ঘরের ভিতরে শেখরকেও দেখা যাচ্ছে না।

প্রহরী এসে তাঁকে কী বলতে যাচ্ছিল, সূর্যকান্ত বাধা দিয়ে হেসে বললেন, 'আমি জানি।'

pathagar.net

॥ ৬ ॥

কিন্তু সূর্যকান্ত গুহ ঠিক জানেন না। সূর্যকান্ত চলে যাবার পর শেখর হঠাৎ মনস্থির করে ঘোড়া নিয়ে আড়াইকাকি গড়ের উদ্দেশেই বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে পৌঁছোনো তার হল না।

সমস্ত বিকেল সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে, সন্ধের কাছাকাছি শেখর একটা ছোটো নদীর পারে

এসে তখন ঘোড়াসমেত নদী সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ পথের পাশের জঙ্গল থেকে তিনটি অশ্বারোহী সৈনিক মূর্তি বেরিয়ে এসে রুখে দাঁড়াল। শেখর এরকম ব্যাপারের জন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। একজন সৈনিককে তার ঘোড়াটা ধরে ফেলতে দেখে, সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এর মানে?'

আর দুজন সৈনিক তখন তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেলেছে। তারা হেসে উত্তর দিল, 'মানে এখুনি বুঝতে পারবে। এখন ভালোমানুষের মতো চিঠিটা বার করো দিকি!'

শেখর ততক্ষণে বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠেছে। সাবধান হয়ে সে বলল, 'চিঠি? কীসের চিঠি?'

সৈনিক ধমকে উঠল, 'কীসের চিঠি জান না? ন্যাকা! আড়াইকাকি গড়ে যে চিঠি নিয়ে চলেছিলে হে ছোকরা! বার করো শিগ্গির।'

শেখর সৈনিকদের পোশাকগুলি বিশেষভাবে লক্ষ করে গম্ভীর স্বরে বলল,'সে চিঠি যদি না দিই?'

'না দিলে কষ্ট করে আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। খেয়ে হজম করে যদি না ফেলে থাক, তাহলে গা-তল্লাসি করলে চিঠি পাওয়াও যাবে।' সৈনিকরা হেসে উঠল।

শেখর সে হাসি উপেক্ষা করে বলল, 'সে চিঠি কার কাছ থেকে যাচ্ছে, জান?'

'জানি বই কী! স্বয়ং সূর্যকান্ত গুহ চিঠি পাঠাচ্ছেন তা আর জানি না?'

'আর তোমরা যশোরের সৈনিক হয়ে সে চিঠি কেড়ে নিচ্ছ? এত বড়ো জরুরি কাজে বাধা দিচ্ছ?'

'কে বলল বাধা দিচ্ছি! সে চিঠি যাতে ঠিকমতো পৌঁছোয় তার জন্যেই তো এই ব্যবস্থা।'

'তার মানে?'

'তার মানে, তোমার মতো ছেলে-ছোকরাকে অত দূর দৌড় করিয়ে হয়রান করতে চাই না। ও কাজটা আমরাই করব।'

'আমায় তাহলে কী করতে হবে?'

'সুবোধ ছেলের মতো আমাদের সঙ্গে ফিরে চলো তো ভালোই, নইলে—'

'নইলে আমায় ধরে নিয়ে যাবে? এই কি স্বয়ং সূর্যকান্তের আদেশ?' শেখরের গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

এবার সৈনিকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে যেন একটু দ্বিধাভরে বলল, 'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কার?'

তাদের সে দ্বিধা শেখরে চোখে পড়ল কি না কে জানে। সে কিন্তু জ্বলে উঠে বলল, 'তিনি তাহলে শেষ পর্যন্ত আমায় বিশ্বাস করতে পারেননি।'

'তা পারলে আর আমাদের এ কর্মভোগ কেন?'

'বেশ। এই নাও চিঠি!'

শেখর জামার ভিতর থেকে চিঠি বার করে একজন সৈনিকের হাতে দিল। তারপর উদাসীনভাবে বলল, 'আমায় হাত পা বেঁধে নিয়ে যাওয়ার কোনোরকম হুকুম আছে কি?'

'সেইরকমই হুকুম, তবে তোমার মতো ছেলেমানুষের ওপর অতটা কড়া হবার দরকার বুঝছি না। আমাদের মতো দুজন জোয়ান সওয়ারের মাঝখান থেকে তুমি পালিয়ে যাবে—এতটা ভয় করি না।'

শেখর নিজের মনে বোধ হয় একটু হেসে বলল, 'এই তো বীরের মতো কথা।'

একজন সৈনিক তারপর সূর্যকান্তের চিঠি নিয়ে সত্যিই আড়াইকাকির দিকে রওনা হয়ে গেল। বাকি দুজন শেখরকে মাঝখানে নিয়ে ফিরে চলল ধুমঘাটের দিকে।

pathagar.net

দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ উঠে তখন চারিধার পরিষ্কার জোৎস্নায় ছেয়ে গেছে।

অন্ধকার গাঢ় হলে যেটুকু পালাবার আশা ছিল তাও সুতরাং নেই। শেখর দুই সৈনিক সওয়ারের মাঝে কেমন যেন মনমরা অবস্থাতেই নীরবে ঘোড়া চালাচ্ছিল।

খানিকবাদে বড়ো রাস্তা ছেড়ে খোলা একটা মাঠের মধ্যে পড়বার পর হঠাৎ যেন তার মেজাজ ভালো হয়ে উঠল।

এতক্ষণ কেউই কোনো কথা বলেনি। এবার নিজে থেকেই সে আলাপ শুরু করে দিল। সৈনিকদের মধ্যে যার চেহারাটা একটু সরল ভালোমানুষ গোছের, তাকে উদ্দেশ করে বলল, 'আচ্ছা, আপনাকে আমি যেন আগে কোথায় দেখেছি, মনে হচ্ছে!'

আপনি বলে সম্বোধন করায় সৈনিকটি খুশি হল কি না বলা যায় না, কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলল, 'তা হতে পারে।'

'না, হতে পারে নয়, নিশ্চয়ই!' শেখর রেশ উৎসাহের সঙ্গে জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই কোথায় দেখেছি। আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

শেখরের ডান ধারের অন্য সৈনিকটি একটু কাশল। কেউ কোনো উত্তর দিল না।

শেখর আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনার নামটা কী?'

'নামে কী দরকার!' সৈনিকটির গলা বেশ গম্ভীর।

'না, দরকার আর কী! তবে বললে ক্ষতিও তো নেই।'

'আমার নাম উদয়রাম।'

'উদয়রাম!' শেখর বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'না নামটা মনে করতে পারছি না তো!'

শেখরের ডান ধারের অপর সৈনিকটি কড়া গলায় বলল, 'ঘোড়া থামিয়ে মনে করবার এখন দরকার নেই। জোরে চলো দেখি। অনেক দূর যেতে হবে।'

শেখর একটু হেসে বলল, 'জোরে চালালে তো আপনাদেরই বিপদ!'

'আমাদের বিপদ!'

'তা ছাড়া কী! জোরে চালালে কি আর নাগাল পাবেন?'

তৎক্ষণাৎ দু-দিক থেকে দুটি হাত শেখরের ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলেছে দেখা গেল। শেখরের ডান ধারে সৈনিক রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'ও সব চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না ছোকরা। তাতে ভালো হবে না।'

শেখর এবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, 'আরে, আমি কি পালাবার চেষ্টা করছি? সে ইচ্ছে থাকলে তো আগেই করতে পারতাম। ওই তো আপনাদের বাজে ঘোড়া! কী আর করতেন?'

'আমাদের ঘোড়া বাজে! তুমি তো খুব ওস্তাদ ঘোড়ার জহুরি দেখছি!' দুজন সৈনিকই রীতিমতো চটে উঠল।

'আচ্ছা আচ্ছা, পক্ষীরাজের বাচ্চা বলেই মানলাম।' শেখর যেন হাসি চাপতে পারছে না।

উদয়রামই যেন এই তাচ্ছিল্যে অত্যন্ত বেশি আহত হয়েছে বলে মনে হল। রেগে উঠে বলল, 'পালাবার চেষ্টা করে একবার দেখোই না ছোকরা, পক্ষীরাজের বাচ্চা কি না বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

শেখর হেসে তার দিকে ফিরতেই অপর সৈনিক আবার তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে কঠিন স্বরে বলল, 'উঁহুঃ, যেমন যাচ্ছ তেমনি চলো। তোমার কাছে ঘোড়ার পরীক্ষা দিতে তো আমরা আসিনি! আমদের ঘোড়া বাজে হয় বাজেই সই।'

শেখর হতাশার ভঙ্গি করে এবার চুপ করে রইল।

pathagar.net

আবার খানিকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। উদয়রাম বুঝি শেষে আর না থাকতে পেরে বলল, 'বড়ো যে লাগাম ছেড়ে দিয়ে চলেছ, ছোকরা! পড়ে মরবার শখ হয়েছে বুঝি?'

শেখর সত্যিই খানিকক্ষণ থেকে লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছিল। হেসে বলল, 'মোটেই না। তা বলে বিছানায় লাগাম ধরে শুতে তো আর পারি না! যা জোরে আপনারা চলেছেন!'

শেখরের ডান ধারের সৈনিক এবার বিদ্রূপের সঙ্গে হেসে বলল, 'নিজেকে বড়ো বাহাদুর মনে করো, না?'

'তা একটু করি বই কী! আপনাদের বাহাদুরির নমুনা পেলে হয়তো করতাম না।'

ছেলেমানুষের কাছে এ অপমান বুঝি সওয়া যায় না। দু-ধারের দুই সৈনিকের পক্ষে এরপর লাগাম ধরে চলা কঠিন হয়ে উঠল। দুজনেই হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এই তো তোমার বাহাদুরি!'

উদয়রাম আরও কী টিপ্পনি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার সুযোগ পেল না। পরমুহূর্তে কী যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল, ঠিক বোঝা গেল না। শেখর বুঝি হঠাৎ দু-হাত বাড়িয়ে দুজনকে ঠেলে দিয়েছে। দেখা গেল, দুই সৈনিক নিজেদের ঘোড়া থেকে দু-ধারে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে আর তাদের মাঝখান থেকে শেখরের ঘোড়া তির বেগে মাঠের প্রান্তে ঘন গাছের সারির দিকে ছুটে চলেছে।

দুই সৈনিক ভূমিশয্যা থেকে উঠে আবার যখন নিজের নিজের ঘোড়ায় চেপে বসল, শেখরের তখন কোনো চিহ্নই নেই কোনো দিকে। কান পেতে খুব মন দিয়ে শুনলে শুধু বুঝি বহুদূরে অস্পষ্টভাবে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যায়।

সেই অস্পষ্ট ধ্বনি লক্ষ করেই দুই সৈনিক প্রাণপণে এবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

তারা জানে শেখরকে সঙ্গে নিয়ে না ফিরতে পারলে সুখাসর্দারের কাছে আর তাদের রক্ষা নেই।

॥ ৭ ॥

সওয়ার সৈনিকরা শেষ পর্যন্ত শেখরকে ধরতে পারেনি।

শেখর তাদের চেয়ে অনেক সেয়ানা। মাঠ পেরিয়ে যেখানে বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গল সেখানে পৌঁছেই শেখর কিছু দূরে সাবধানে গিয়ে আবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়েছিল। যতদূর নিঃসাড়ে সম্ভব উলটো দিকে বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়া চালিয়ে নেমে পড়েছিল তারপর। ঘোড়াটাকে হাতে ধরে নিয়ে একটা নাবাল জমিতে ঝড়ে-ওপড়ানো একটা গাছের মোটা ডালে বেঁধে হেঁটেই ফিরে এসেছিল জঙ্গলের প্রান্তে। সেখানে কিছুক্ষণ বাদে একটা বড়ো গাছের প্রায় মগডালে উঠেছিল সওয়ারদের লক্ষ করবার জন্যে।

সওয়ার সৈনিকরা তখন আরও অনেক এগিয়ে জঙ্গলের ভেতরই ঢুকছে। তারা তাকে প্রাণপণে খোঁজবার চেষ্টা করবে তা শেখর জানে।

কিন্তু জঙ্গল নেহাত ছোটোখাটো নয়। সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠলেও এই জঙ্গলের মধ্যে তার ক্ষীণ আলো আর অন্ধকার মিলে সব কিছু আরও ঝাপসা ধাঁধালো করে তুলছে। শেখর যে তাদের ফাঁকি দিয়ে উলটো দিকে ফিরেছে তা আন্দাজ করতে পারলেও এখন শেখরকে ধরা তাদের পক্ষে অসম্ভব বললেই হয়। নিঃশব্দে এখন গাছ থেকে নেমে ঘোড়া নিয়ে বিপরীত দিকে রওনা হলে এদের হাতে পড়বার কোনো ভয়ই নেই।

কিন্তু রওনা হয়ে যাবে কোথায়, তাই শেখরের ভাবনা। ধুমঘাটে কী অভ্যর্থনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে তার নমুনা সে তো যথেষ্টই পেয়েছে। সূর্যকান্ত তাকে একবার অতখানি বিশ্বাস করেও শেষ পর্যন্ত মত বদলেছেন। মত বদলানোটা একটু অবশ্য অদ্ভুত। তিনি তো তাকে

নিজের মর্জির ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাজানো ঘোড়া রেখে দিয়ে এমন কথাও বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে শেখর যেখানে খুশি যেতে পারে।

তার ওপর এতখানি বিশ্বাস দেখাবার পর হঠাৎ তাঁর মত বদলাল কীসে? এ তো তার সম্বন্ধে সামান্য একটু সন্দেহ হওয়া নয়, তার হাত থেকে চিঠি কেড়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম!

সূর্যকান্ত তাদের যত বড়ো শত্রুই হোন না কেন, এ ধরনের মানুষ বলে তো তাঁকে মনে হয়নি! তাঁর সেই একটা কথা এখনও যে শেখরের মনের মধ্যে বাজছে :

'রক্তের চেয়ে দুধের ঋণ বড়ো। মায়ের চেয়ে বড়ো যে মা, সেই দেশের দুধের ঋণ!'

একথা অমন সুরে একটা কপট কুটিল লোকের মুখ থেকে কি বার হতে পারে!

নিজের কাছে শেখর আর স্বীকার না করে পারে না যে, ওই কটা কথাই তার মনের ভেতর সবকিছু যেন ওলটপালট করে দিয়েছে। কে শত্রু কে মিত্র, কী ভালো কী মন্দ সব যেন দিয়েছে গুলিয়ে।

প্রায় জ্ঞান হওয়া থেকেই প্রতাপাদিত্য আর তাঁর রাজত্বের বিরুদ্ধে নানা কথা শুনে শুনে তার মন বিষিয়ে উঠেছে। তাদের মুলাজোড়কে প্রতাপাদিত্যের অধীনতা মেনে নিতে হয়েছে বাইরে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রতিহিংসার আগুন সমানে ধিকি ধিকি জ্বলছে। সে আগুনে ইন্ধন দিয়েছে প্রতাপাদিত্যের নানা অমানুষিক অত্যাচারের গল্প।

পিতার চেয়ে বেশি স্নেহ যাঁর কাছে প্রতাপাদিত্য পেয়েছেন সেই দেবতুল্য খুড়ো বসন্ত রায়কে তিনি হত্যা করেছেন, হত্যা করতে চেয়েছিলেন নিজের জামাইকে। হরি বণিককে তিনি নির্মমভাবে মারবার ব্যবস্থা করেছেন, অসহ্য অত্যাচারের ভয়ে তার বাড়ির লোকেরা জলে ডুবে নাকি আত্মহত্যা করেছে। এরকম আরও কত কাহিনি। এসব কাহিনির সত্য-মিথ্যা সে নিশ্চিত করে জানে না। তার দাদু চৌধুরিমশাই প্রতাপাদিত্যকে পরম শত্রু মনে করলেও এ ধরনের কুৎসার মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, কেঁদো বাঘের কেচ্ছা গাইতে লোকে চার পায়ে আটটা থাবাই বসায়।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অন্য গল্প শেখরের কানে আসেনি এমন নয়! কল্পতরু হয়ে বসে নিজের রানিকে পর্যন্ত এক ব্রাহ্মণের দাসী হওয়ার জন্যে তিনি যে দান করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, সে গল্পও শুনেছে। ব্রাহ্মণ অবশ্য তাঁকে শুধু পরীক্ষা করবার জন্যেই ওরকম দান চেয়েছিল। প্রতাপাদিত্যের অসাধারণ শক্তি আর সাহসের কথা সে শুনেছে, শুনেছে তাঁর বীর সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা, যাদের জোরে এ দেশে এমন রাজ্য তিনি গড়ে তুলেছেন, দিল্লিকে পর্যন্ত যা ভাবিয়ে তুলেছে।

আর এই অল্পদিন আগে সেই প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণও মুলাজোড়ে গিয়ে পৌঁছেছে। দিল্লি থেকে মোগল সেনাপতি মানসিংহ এসে প্রতাপাদিত্যের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। দূতের সঙ্গে ছিল একটি তলোয়ার আর একটি বেড়ি। মানসিংহের হয়ে দূত প্রতাপাদিত্যের সামনে সেই তলোয়ার আর বেড়ি রেখে দিয়ে বেছে নিতে বলেছিল। প্রতাপাদিত্য হাসতে হাসতে তলোয়ারটা তুলে নিয়ে যা বলেছিলেন নকীব কেশবভট্ট তাই মেঘগর্জনে ঘোষণা করেছিল :

'নিয়ে যাও বেড়ি। এ বেড়ি মানসিংহ যেন তার মনিবের পায়ে পরায়!'

মাথা হেঁট করে ফিরে গিয়েছিল মানসিংহের দূত। তারপর থেকেই এই যুদ্ধ শুরু।

মুলাজোড়ের সভাঘরে দাদুর পাশে বসে এ বর্ণনা শুনতে শুনতেই শেখরের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল সে নিজেই ঠিক বুঝতে পারেনি। কীরকম উত্তেজনার কী ঢেউ যেন বয়ে গিয়েছিল শরীরে।

এ বৃত্তান্ত যে শুনিয়েছিল সে অবশ্য যতখানি পারে ঠাট্টা আর ঘৃণা মাখিয়েছিল তার গলায়। ঠোঁট বেঁকিয়ে চৌধুরিমশাইকেই খুশি করবার আশায় বলেছিল, 'বাদাবনের কুচো চিংড়ির

boighar.net

তড়বড়ানিটা একবার দেখুন, গেছে দিল্লির সঙ্গে ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করতে! আরে সে যে ভাম ভোঁদড় নয়...'

খোশামুদেদের মধ্যে কেউ কেউ হেসেছিল। কিন্তু চৌধুরিমশাই হাসেননি। বরং গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'বাদাবনে কুমিরও থাকে হে। মুলাজোড়ের সঙ্গে অমন দুশমনি না করলে ওই কুমিরের পাশেই দাঁড়িয়ে দেখতাম দিল্লির সিংহের জারিজুরি কত!'

সেদিন বুকের মধ্যে যে অদ্ভুত দোলা লেগেছিল, সূর্যকান্তের কথায় তাই যেন তুমুল হয়ে উঠেছিল আরও। যশোরের বিরুদ্ধে মুলাজোড়ের যে বিদ্বেষের বিষ তার রক্তে ছড়ানো তা যেন ধুয়ে গিয়েছিল আরেক আবেগের ঢেউয়ে। তারই উন্মাদনায় সে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল সূর্যকান্তের রেখে-যাওয়া ঘোড়ায় চড়ে।

সূর্যকান্ত কি তাহলে তার সঙ্গে নিষ্ঠুর তামাশা করেছেন? তাঁর গলার স্বর আর এইসব কথা কি শুধু ভান।

শেখর ভেবে যেন কূল পায় না। একবার মনে হয়, সূর্যকান্ত অত ছোটো, নীচ মানুষ হতেই পারেন না। আবার সন্দেহ হয়, সে নিজেই তাঁকে চিনতে ভুল করেছে কি না। মুলাজোড়ের এই পরম শত্রু প্রতাপাদিত্যেরই তো সঙ্গী, কুটিল কুচক্রী সুখাসর্দারেরই তো বন্ধু। কে জানে কী মতলবে শেখরের কাছে অত ভালোমানুষ সেজেছেন! তাঁর কথায় গলে গিয়ে নিজের সংকল্প ভুলে যাওয়াই হয়তো অন্যায় হয়েছে।

তাহলে এখন সে কী করবে? এই জঙ্গলের মধ্যে গাছের মাথায় রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায় না এমন নয়। কিন্তু তারপর তো সকাল হবে। তখন একটা কোনো পথ তাকে নিতেই হবে বেছে।

যে পথই নিক তা ধুমঘাট ছাড়া অন্যদিকের অবশ্য হতে পারে না। সেখানে তাকে ফিরে যেতেই হবে। দাদু সেখানে সুখাসর্দারের হাতে। তাঁকে মুক্ত করবার জন্যে জীবনপণ চেষ্টাই এখন তার প্রধান কাজ।

সূর্যকান্তের উদ্দীপনায় যশোরের হয়ে এই দুঃসাহসিক দায়িত্ব নেবার সময় অস্পষ্টভাবে তার মনের পেছনে একটা আশা বোধ হয় ছিল। এত বড়ো একটা কাজ যদি সে হাসিল করতে পারে তাহলে তার দাদুর কোনো অনিষ্ট সূর্যকান্ত হতে দেবেন না, এই আশা।

সে আশার কোনো দামই তো আর নেই। সুখাসর্দার আর সূর্যকান্ত দুজনেই তার কাছে এখন সমান। এদের নজর এড়িয়েই ধুমঘাটে গিয়ে যা চেষ্টা করবার তাকে করতে হবে।

কিন্তু এদের চর-অনুচর তো সারা ধুমঘাটে ছড়ানো। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সেখানে ঘোরাফেরা কি সম্ভব?'

সুখাসর্দারের কাছে ভোর না হতেই সব খবর পৌঁছে যাবে। সূর্যকান্তেরও জানতে বাকি থাকবে না যে তাঁর পাঠানো সেপাইদের বোকা বানিয়ে শেখর পালিয়েছে। সমস্ত ধুমঘাটে হাজার জোড়া চোখ তার সন্ধানে সজাগ থাকবে তারপর।

তবু ধুমঘাটে লুকিয়ে ঢোকবার একটা ফন্দি তার না বার করলে নয়।

ছদ্মবেশের কথা তার মনে হল। কিন্তু ছদ্মবেশ এখানে সে পাচ্ছে কোথায়! সতেরো বছরের ছেলে হিসেবে তার যা গড়ন তাতে নকল গোঁফ দাঁড়ি পরেও বয়স কি চেহারা ভাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেহারা ও গড়নের সঙ্গে মানিয়ে যায় এমন কোনো ছদ্মবেশ চাই।

ঘোড়াটা দূরে বনের মধ্যে একটু ডাক না ছাড়লে ছদ্মবেশের অমন একটা বুদ্ধি তার মাথায় বোধ হয় আসত না।

ঘোড়াটা ডাক ছাড়ায় প্রথমে সে চমকে উঠেছিল। বুকটাও উঠেছিল ছ্যাঁৎ করে। সওয়ার সেপাইদের কানে এ ডাক পৌঁছোলেই তো বিপদ! কিন্তু সে ভয় আর নেই। তারা এদিকে এলে

শেখর তার গাছের মাথার আসন থেকে একটু আভাস পেতই। তারা অন্য দিকেই সম্ভবত চলে গেছে। ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে এইবেলা বেরিয়ে পড়াই উচিত।

শেখর গাছের ওপর থেকে নামল। একটা গাঢ় মেঘে ঢাকা পড়ে চাঁদের আলো এখন নিতান্ত ম্লান হয়ে এসেছে। জঙ্গলে একটু সাবধানে চলাফেরা দরকার। এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব না থাক সাপখোপের ভয় আছে। তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে তার উলটো পিঠ দিয়ে নীচের ঝোপগুলোয় ঘা দিতে দিতে শেখর নাবাল জমিটায় পৌঁছে ঘোড়াটা খুলে চড়ে বসল। ঘোড়াটাও যেভাবে নাকের শব্দ করল তাতে মনে হল শেখরকে পিঠে চড়িয়ে সে খুশি। এতক্ষণ অন্ধকার জঙ্গলে একলা বাঁধা থাকাটা তার পছন্দ হয়নি।

সাবধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শেখর ধুমঘাটের দিকেই ঘোড়ার মুখ ফেরাল। খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে গেলে রাস্তা অনেকটা কম পড়ত। কিন্তু জঙ্গলের ধার ঘেঁষেই শেখর তার ঘোড়া চালাল, বিপদের সম্ভাবনা দেখলে যাতে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে।

ধুমঘাট পর্যন্ত অবশ্য এ ঘোড়ায় চড়ে সে যাবে না। দু-দণ্ডের পথ একটি চাষিদের গ্রামই তার লক্ষ্য। আসবার পথে দেখেছে গ্রামের চারিধারের মাঠে বেশ কয়েকজন ছেলে-বুড়ো বুনো ঘাস কেটে স্তূপাকার করছে। জিজ্ঞেস করে জেনেছিল যে এসব ঘাসের বোঝা তারা পরের দিন ভোরে ধুমঘাটে নিয়ে যাবে। সেখানে প্রতাপাদিত্যের সওয়ার বাহিনীর অগুণতি ঘোড়ার খোরাক চাই। ঘাসের বোঝা সেখানে তাই আর গেলে পড়তে পায় না। সবজির দরে বিকোয়। জঙ্গলের ভেতর ঘোড়ার ডাক থেকে তার দানাপানি আর সেই সূত্রে এই ঘেসুড়েদের কথাই তার মনে হয়েছিল। তাই থেকে বুদ্ধি মাথায় এসেছিল জুতসই ছদ্মবেশের। এই ঘেসুড়ে সেজেই সে ধুমঘাটে ঢুকবে, তখনই ঠিক করে ফেলেছে। তার পোশাকের বদলে ঘেসুড়ে ছেলের খাটো ধুতি জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত হবে না বোধ হয়। ধুলো-কাদা মাখা আলুথালু চেহারার সঙ্গে মাথায় ঘাসের বোঝা থাকলে তাকে চেনা সহজ হবে না।

॥ ৮ ॥

ঘেসুড়েদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই কিন্তু শেখরকে তখনকার মতো আগের মতলব ছাড়তে হল।

কিছুক্ষণ আগেই একটা মজা দিঘির ধারের পোড়ো একটা ভাঙা মন্দির পেরিয়ে এসেছে। মেঘলা আকাশের মরা জ্যোৎস্নায় চুড়ো-ধসা মন্দিরটা আর তার আশপাশের দালানগুলো যেন ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল। ঘোড়ার জিনটা একটু বুঝি সরে গিয়েছিল। সেটা ঠিক করতে একবার পেছন ফিরে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেল। সেই পোড়ো ভুতুড়ে মন্দিরের একজায়গায় ক্ষীণ একটা আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে।

পার হয়ে আসবার সময় ওখানে জনমানবের অস্তিত্ব শেখর টের পায়নি! এরকম পোড়ো মন্দিরে কারো থাকবার কথা তো এসময়ে নয়। যুদ্ধের ব্যাপারে সমস্ত অঞ্চল এখন সন্ত্রস্ত। সাধারণ মানুষ রাত হলে নিজেদের ঘরদোরে খিল এঁটেও স্বস্তি পায় না। মরে গেলেও এমন জায়গায় তারা আসবে না। ওখানে এরকম আলোর মানেটা তাহলে কী? মনের ভেতর একটু ভয়ের কাঁপুনি একবার না জেগেছে এমন নয়। ভূতপ্রেতের গল্প ছেলেবেলায় কে না শোনে! সে-ধরনের ভয় মনে উঁকি দিতেই কিন্তু সে ঝেড়ে ফেলেছে। ব্যাপারটার একটু খোঁজ নিতেই হবে। ভৌতিক কিছু যদি হয় তাহলেও পেছপাও হবে কেন?

ওখানে যেই থাক শেখরের ঘোড়ায় চড়ে চলে যাওয়াটা লক্ষ করেছে বলেই মনে হয়। তার ঘোড়ার খুরের শব্দেই হয়তো তখন আলো নিভিয়ে রেখেছিল। এখন অনেক দূরে চলে গেছে মনে করে আবার জ্বেলেছে সাহস করে।

সংকল্প স্থির করে ফেলে শেখর ঘোড়া চালিয়ে আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়। তারপর বনের মধ্যে একটুখানি ঢুকে ঘোড়াটাকে একজায়গায় বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটেই জঙ্গলের ধার ঘেঁষে পোড়ো মন্দির লক্ষ করে চলতে থাকে। বেশ সন্তর্পণে হাঁটার দরুন প্রায় আধঘণ্টাটাক বাদে মন্দিরের কাছাকাছি যখন পৌঁছোয় তখন কালো মেঘটা সরে যাওয়ায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারদিক আবার হাসছে।

চিতার মতো নিঃশব্দে পোড়ো মন্দিরের ভাঙা দেওয়ালের ছায়ায় ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে তাই তাকে এগোতে হয়।

আলোটা ভৌতিক কিছু নয়। মন্দিরের গায়ে লাগানো ওরই মধ্যে অল্প একটু মজবুত একটা কুঠুরির ভেতর থেকেই বন্ধ করা ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে সেটা দেখা যাচ্ছে।

দরজার দিকটা এড়িয়ে শেখর সাবধানে কুঠুরির একপাশে গিয়ে থামে। ওপরে হাওয়া চলাচলের বেশ কটা সরু ঘুলঘুলি রয়েছে। ইট খসে পড়ে একটা ঘুলঘুলির ফাঁক বেশ বড়ো। সেখানে কোনোরকমে উঠতে পারলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখা যায়। ভেতরে যা কথা হচ্ছে তাও শোনা যায় আরও স্পষ্টভাবে।

দুটি মানুষের গলা সে পাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছায়াও দেখছে দুজনের।

এমন পোড়ো মন্দিরে এই রাত্রে পরামর্শের জন্যে যাদের আসতে হয়, কে তারা?

একটা লতানে গাছের গিঁট-বাঁধা কাছির মতো শেকড় কুঠুরিটার গা বেয়ে নেমে এসেছে। এই শেকড় বেয়ে ঘুলঘুলির কাছ পর্যন্ত পৌঁছোনো যায়। কিন্তু পা রাখবার একটু ভুলে সামান্য একটু শব্দ হলেই বিপদ।

সেই বিপদই হয়। শেকড় ধরে ওঠবার চেষ্টায় আলগা একটা ইটের টুকরো খসে পড়ে মোটা লতাটাও নড়ে ওঠে। ভেতরকার আলাপ থেমে যায়। একজন তীব্রস্বরে বলে, 'শুনলে শব্দটা? ব্যাপার কী?'

মরিয়া হয়ে শেখর তার শেষ বুদ্ধি এবার খাটায়। ভেতর থেকে আরেকজনের গলা আর হাসি শোনা যায়, 'তুমি বড়ো আটাশে হে! শুনছ না! প্যাঁচা এসে বসেছিল পোকামাকড় কি পাখি ধরতে। এখন উড়ে গেল।'

শেখর নিরুপায় হয়ে প্যাঁচার ডাকই নকল করে লতাটা আরেকবার নাড়াবার শব্দ করেছিল। এ ফন্দিতে কাজ না হলে কী যে সে করত তা জানে না।

ভেতরের দুজন আশ্বস্ত হয়ে আবার তাদের পরামর্শ শুরু করে। শেখর এবার সাবধানে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখে ভেতরে ভেতরে আবার চমকে ওঠে।

একটি লোক তার চেনা। লুকিয়ে গোমতি হয়ে আসবার সময় কচু রায়ের এই অনুচরই তার দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাদের নৌকোয়। লোকটার নাম রূপরাম।

রূপরাম এ পোড়ো মন্দিরে কি ষড়যন্ত্র করতে এসেছে?

যাই করুক সে তো মুলাজোড়েরই দলের লোক। ইচ্ছে করলে শেখর এখন তাদের সামনে গিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়াতেও তো পারে। কিন্তু তা না করে রূপরাম ও তার সঙ্গীর কথাগুলোই আগে শোনা উচিত বলে তার মনে হয়।

শেখর নিঃশব্দে কান পেতে থাকে।

প্যাঁচার ডাক শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে রূপরাম আর তার সঙ্গী আর এখন তত সাবধান নেই। আগের চেয়ে সহজভাবেই কথা বলছে।

পরামর্শ যা হবার শেষ হয়ে গেছে বলেই মনে হল। এখন শুধু সমস্ত ফন্দিটা আর একবার ঝালিয়ে নিয়ে কার কী কাজ সেটা ঠিক করে নেওয়া।

'তুমি জাহাজ ঘাটাতেই থাকবে তাহলে, যারা দেখতে আসবে তাদের ভিড়ে।' রূপরাম বলে, 'ধুলিয়ান বেগের তিরন্দাজদের একজন সেজে।'

pathagar.net

'আর তুমি কোশা ঠেলে জলে নামাবার দলেই থাকা ভালো মনে করছ?' রূপরামের সঙ্গী বলে, 'এখনও একটু ভেবে দেখো।'

'না ভেবে আমি কিছু করি না সদানন্দ।' রূপরাম একটু গর্বের হাসি হেসে বলে, 'ওই জাঁকজমক ঘটার মাঝখানে আর যেখানেই হোক গায়ে-কাদামাখা কোশা নৌকো ঠেলবার মুনিষের দিকে কেউ নজর দেবে না। তা ছাড়া এ কোশা নৌকোর কিছু একটা কারসাজি আছে। সেটাও আমি জানতে চাই।'

সদানন্দ এবার হাসে। বলে, 'তুমি তো নৌকো ঠেলবে গাঙের কাদায় পা ডুবিয়ে, নৌকোর ভেতরে কী আছে বুঝবে কী করে?'

'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে তা জান তো?' রূপরাম ভারিক্কি চালে বলে, 'সারা জন্ম নৌকো তৈরির ব্যবসা করলাম, আর নৌকোর চেহারা গড়ন দেখে তার প্যাঁচ আঁচ করতে পারব না? যশোরের ধুমঘাটে আজ যারা বড়ো কারিগর, তাদের কত জনের আমার কাছে হাতে খড়ি হয়েছে তা জান? আমারই কারখানার তৈরি ঘুরাব, গছাড়ি, পশত নৌকো যশোরের বহরে কত আছে, গুনে তুমি শেষ করতে পারবে না।'

'ভালো! ভালো!' সদানন্দ রূপরামকে থামিয়ে বলে, 'কিন্তু তোমার নৌকো যশোরের বহরে যায় কেন?'

'কেন? তা জান না!' রূপরাম একটু গরম হয়ে ওঠে, 'যশোর থেকে সওয়ার বাহিনীর খোদ সর্দার প্রতাপ দত্ত নৌবহরের ফ্রেডরিক ডুডলিকে নিয়ে কুশদহে গিয়ে কেড়ে আনল না সব। মুখে বলে এসেছে যুদ্ধের জন্যে ধার। কিন্তু সে ধার মানে যে কী তা কি বুঝিয়ে দিতে হবে। কুশদহ বিষদহ হয়ে উঠেছে প্রতাপ রায়ের বিরুদ্ধে কি অমনি?'

'রাঘব সিদ্ধান্ত তো কুশদহ থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে মানসিংহের ছাউনিতেই আশ্রয় নিয়েছেন শুনেছি।' সদানন্দ এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বলে।

'হ্যাঁ। ওঁকে সেখানে পাঠিয়েই আমি এখানে এসেছি। মতলব যদি ভেস্তে না যায় তাহলে আর যুদ্ধের দরকার হবে না।' রূপরাম জোর দিয়ে বলে।

'তা ঠিক বলেছ।' সদানন্দের গলাটা একটু উদ্বিগ্ন শোনায়, 'শুধু একটা ভয় হচ্ছে।'

'কীসের ভয় আবার?' রূপরাম যেন ধমকে ওঠে।

'ধরো সুন্দর কি ধুলিয়ান বেগের তিরন্দাজ যারা ওখানে যাবে তারা যদি ছাড়া ছাড়া আলাদা হয়ে না গিয়ে দল বেঁধে কুচকাওয়াজ করেই যায়। তাহলে তো ওদের দলে আমি থাকতে পারব না। একা একা থাকলেও নজরে পড়ে যাব।'

'সেসব খোঁজ খবর না নিয়েই কি মতলব ফেঁদেছি!' রূপরাম গর্ব করে বলে, 'রূপরাম অত কাঁচা কাজ করে না। নতুন কোশা ভাসানোর উৎসবে সাজগোজ করে দল বেঁধে আসছে শুধু নৌবহরের সেনারা। যশোররাজের সঙ্গে হোমরাচোমরা সেনাপতিরা আর তাঁর নিজের রক্ষীরাও অবশ্য থাকবে ধড়াচুড়ো পরে। বাকি সবাই যে যার খুশিমতো যাবে। তিরন্দাজ গোলন্দাজ ঢালিরা সব থাকবে ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে। তুমিও থাকবে তাই। শুধু খেয়াল রেখো তিরন্দাজদের কারোর খুব কাছাকাছি না হও। হলেও অবশ্য এমন কিছু ভয় নেই। তিরন্দাজ তো আর দু'টো-পাঁচটা নয় যে, সবাই সবাইকে চেনে।'

সদানন্দ আশ্বস্ত হয় কি না বোঝা যায় না, কিন্তু সে এবার অন্য প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, সামান্য কটা কোশা ভাসানোর জন্যে এত ঘটা কেন তাই বুঝতে পারছি না।'

'বললাম তো, এ কোশার মধ্যে কারসাজি আছে। আমার সন্দেহ তা যদি সত্যি হয় তাহলে ওই এক-একটি কোশা সর্বনাশা।'

'কীরকম?'

'কীরকম তা ঠিক জানি না। তবে হার্মাদ ডুডলি একটা সাংঘাতিক গোছের ফিরিঙ্গি প্যাঁচ কষেছে বলে আমার সন্দেহ। গোলন্দাজদের কামান ছোঁড়া দেখেছ তো। সেই কামানের গোলা যে বারুদে ছোটে, তা দিয়ে ওই কোশাগুলোর খোলের মধ্যে নল-টল গোছের কিছু ঠাসা থাকবে বলে মনে করছি। খবরও পেয়েছি যে বেদকাশী থেকে বেশ কিছু সিসের মোটা নল এসেছে ধুমঘাটায়।'

'সিসের নলে কী হবে?'

'সেইটেই তো ভাববার। সিসের নলে তো কামান হয় না। কোশা নৌকোয় সিসের নল লাগিয়ে তাতে বারুদ ঠাসার মানে কী? শয়তানি কিছু একটা তো নিশ্চয়ই! কোশা ঠেলে নামাবার মুনিষদের মধ্যে থেকে তাই কিছু হদিস পেতে চাই।'

শেকড়ের গাঁটে পা রেখে আধ-ঝোলা অবস্থায় শেখরের তখন হাতে পায়ে খিল ধরবার জোগাড়। বিরক্তিও লাগছে এইসব অবান্তর কথার মধ্যে আসল ষড়যন্ত্রটা কী তা না জানতে পেরে।

এখনও ইচ্ছে করলে সাড়া দিয়ে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হতে পারে। ষড়যন্ত্রটা কী, এখুনি তাহলে জানতে পারবে। হয়তো তাকে অংশও নিতে হবে তার মধ্যে।

কিন্তু কেন বলা যায় না শেখর মনটা স্থির করে ফেলতে পারে না। খানিক দোটানায় পড়ে শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকাটাই আপাতত সঙ্গত বলে সাব্যস্ত করে।

রূপরাম তখন সদানন্দের কী একটা কথার উত্তরে বলেছে, 'হ্যাঁ, যুদ্ধে যশোরের জিত তো হতেই পারে। আর হলে শুধু তোমার আমার আর কুশদহের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশেরই সর্বনাশ হবে না। আমাদের সঙ্গে মুলাজোড় চাঁচড়া নলডাঙা কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ডুববে। সোজাসুজি হোক গোপনে হোক, মোগলের হয়ে যে যা কিছু করেছে ওই সুখাসর্দারই সব খুঁড়ে বার করবে। যুদ্ধের ওপর খুব ভরসা তাই কুশদহের আমরা কেউ অন্তত রাখতে পারছি না। যশোরের বাহান্ন হাজার ঢালি আর ষোলো হাজার হাতির কথা তো ভুললে চলবেনা! তার ওপর পেড্রো, ডুডলি, রডার মতো ফিরিঙ্গিদের বল বিক্রম বুদ্ধি আর কমপক্ষে দশ হাজার হরেক মাপ আর জাতের নৌবহর। খরার দেশের মানসিংহ জলার দেশের লড়াইয়ে কতখানি বাহাদুরি দেখাবে আমাদের সন্দেহ আছে। একেবারে গোড়াতেই তাই কোপ দিতে চাই। কিন্তু তার সময় নেই। একটু শুধু গড়িয়ে নাও। ভোরের আগেই যাতে ধুমঘাটে পৌঁছোতে পারি খানিক বাদেই গাড়ি খুলে তাই রওনা হতে হবে।'

শেখর আসল ষড়যন্ত্রটা কী, লুকিয়ে জানবার আশা তখন ছেড়েই দিয়েছে। এখন হয় নেমে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বাঁধা ঘোড়া খুলে আগের মতলবমতো চাষিদের গ্রামে গিয়ে ওঠা, নয় রূপরাম আর সদানন্দের সামনে হাজির হওয়া।

কিন্তু সে বিষয়ে মনস্থির করবার দরকার হয় না। বিশ্রাম করতে গিয়েও সদানন্দ তার আসল দুর্ভাবনাটা প্রকাশ করে ফেলে আর তাতেই চক্রান্তটা যে কী এবং কত সাংঘাতিক তা বুঝতে শেখরের বাকি থাকে না।

শেখর লতানে গাছের শেকড় ধরে নামবার উপক্রম করেছে এমন সময়ে সদানন্দের উদ্বিগ্ন গলা শোনা যায়, 'আচ্ছা আমার কাজ ধরো আমি হাসিল করলাম। ধরো কেন, হাসিল আমি করবই। তারপর? তারপর যদি পালাতে না পারি তাহলে সমস্ত ধুমঘাট খেপে গিয়ে আমায় তো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।'

রূপরাম একটু বিরক্ত হয়েই বলে, 'ফের সেই এক কথা। বলছি না, পালাবার এমন ফন্দি করে রেখেছি যে ধরা তুমি পড়বে না।'

'সেই ফন্দিটা আমায় বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সব কিছু জানিয়ে ওইটুকুই বা বাদ রাখছ কেন?'

pathagar.net

রূপরাম হাসে এবার। বলে, 'বাদ রেখেছি, এখন থেকেই পালাবার কথা ভাবলে পাছে আসল তাগ ফসকায় তাই।'

'তাগ আমার ফসকায় না তা তুমি জান।' সদানন্দকে বেশ ক্ষুণ্ণ বলে মনে হয়।

'আহা, জানি বলেই তো সারা দক্ষিণ মুলুক থেকে বাছাই করে তোমায় নিয়েছি। ফন্দিটা ধুমঘাট পৌঁছেই তোমায় বলতাম। আমার ওপর বিশ্বাস যখন রাখতে পারছ না তখন শোনো। আমাদের বলদ গাড়িটা ভালো করে দেখেছ তো?'

'ভালো করে আর দেখব কী! হায়দারগড়ের কিল্লাদারের গাড়ি চুরি করে আনছি। বাহারে গাড়ি, টপ্পরে, চাকায় নকশা কাজ, কাচকড়ার কুচি আর রংবেরঙের পুঁতি লাগানো পরদা-ঝালর।'

'ঠিকই দেখেছ। কিন্তু এত কষ্ট করে ওই গাড়িই বা জোগাড় করতে গেলাম কেন? বুঝেছ কিছু? ও হল পরদানশীন বিবিদের বইবার গাড়ি। হায়দারগড়ের কিল্লাদার ব্যায়রামে পড়েছে। ধুমঘাটের কোশা ভাসানো দেখতে আসতে পারবে না। তাই, ঠিক চুরি করে নয়, কিল্লাদারের এক নফরকে ঘুস দিয়ে ও-গাড়ি হাত করেছি। ও-গাড়িতে কিল্লাদার যেন বিবিকে নিয়ে ধুমঘাটে আসছে। চারিদিকে পরদা ঢাকা হয়েই ও গাড়ি ঘাটের একজায়গায় থাকবে। তোমার তিরে যশোররাজ খতম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে হইচই পড়বে চারিদিকে, তার মধ্যে ছুটে গিয়ে একবার তোমার ওই গাড়িতে গিয়ে ঢুকতে পারলেই হল। গাড়ির ভেতরেই বোরখা আছে। একবার তাই চাপিয়ে বসলে স্বয়ং সুখাসর্দারও ও গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে দেখতে চাইবে না। যশোরে দেশের ধর্মের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসতে দেওয়া হয় না এই আমাদের সুবিধে। কিন্তু দেখো যেন ভড়কে গিয়ে আগে থাকতেই ও গাড়িতে ঢুকে বোরখা চাপিয়ে বোসো না।'

'সদানন্দ কথার খেলাপ করে না। কিন্তু তির ছুঁড়তে কেউ না কেউ তো দেখবেই। তাদের ধোঁকা গিয়ে পালাব কী করে? তারা যদি পেছনে ছোটে?'

'যাতে না ছোটে সে ব্যবস্থাও ভেবেছি।' রূপরাম আশ্বাস দেয়, 'প্রতাপ রায় কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হইচই তো বাধবেই, সেই মুহূর্তেই একটা অন্তত কোশা নৌকোয় লন্ডভন্ড কাণ্ড হবে। কোশা নৌকোর সিসের নল যে বারুদ ঠাসা থাকবে এ বিষয়ে ভুল নেই বলেই আমার বিশ্বাস। সেই বারুদে হঠাৎ আগুন লেগে ঘাটেই তুমুল কাণ্ড ঘটবে। সে গোলমালে তোমার আমার দিকে নজর দেবার অবস্থা কারোর থাকবে না।'

'বারুদে আগুন লাগবে কেন?'

'লাগবে, আমি লাগাব বলে! তার জন্যেই তৈরি হয়ে যাচ্ছি। তামাক খাবার ছুতোয় ধরানো হুঁকো কলকে পুঁতে রাখব গাঙের পাড়ে। তারই জ্বলন্ত টিকে সময় বুঝে দেব নলের ফুটোয় চালিয়ে। বারুদে আগুন লেগে নরক গুলজার হতে তারপর কতক্ষণ!'

'কিন্তু—' সদানন্দ তবু একটু সুর টানতেই রূপরাম এবার ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।

'কিন্তু-টিন্তু আর নেই। কেঁদো বাঘের ডেরায় ঢুকে তাকে সাবাড় করতে যাচ্ছি, তার থাবায় অক্কা পাবার ঝক্কি নিতেই হবে। নইলে নিজের পালঙ্কে শুয়েই কাজ হাসিল করে জাইগির ইনাম পাবার খোয়াব দেখছিলে নাকি?'

সদানন্দ এবার চুপ করে।

শেখর সন্তর্পণে যেন আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো নীচে নেমে দাঁড়ায়। নিজের মনের ভেতর সব কিছু যেন তার গুলিয়ে গেছে।

যশোররাজকে গুপ্তহত্যা করবার কথা শোনামাত্র নিজের অজান্তেই সে শিউরে উঠেছিল। তারপর সমস্ত চক্রান্তটা শুনে ও বুঝে তার ভাববার ক্ষমতাই যেন অসাড় হয়ে গেছে।

যশোরের সর্বনাশের উদ্দেশ্য নিয়েই তার দাদু মুলাজোড় থেকে তাকে নিয়ে এখানে এসেছেন। তার নিজের মনের ভেতর ইতিমধ্যে উলটোপালটা অনেক ঝড় বয়ে গেছে বটে, কিন্তু

pathagar.net

pathagar.net

যশোরের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ শত্রুতার শপথ নিয়ে যিনি বেঁচে আছেন, এ চক্রান্তের কথা জেনে তিনিই কি খুশি হতেন?

কী কর্তব্যের নির্দেশ তিনি দিতেন শেখরকে?

॥ ৯ ॥

ধুমঘাট নাম আজ সার্থক।

সত্যিই সেখানে ধুম লেগেছে উৎসবের। গাঙের পাড়ে অন্তত ক্রোশখানেক ধরে লোকে লোকারণ্য।

ধুমঘাট যশোররাজ্যের রাজধানী। এমনিতেই সারা বছর মানুষজন, ডুলি-পালকি, গোরুর গাড়ি, ঘোড়সওয়ারে গমগম করে। কত মুলুকের কতরকম মানুষ আর পোশাকই সেখানে না দেখা যায়! গরিব বড়োলোক দেশি মানুষ তো আছেই, তার ওপর আছে রাজপুত, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গি, হাবসি। তাদের যেমন নানান ধরনের চেহারা তেমনি নানা রকমারি পোশাকের বাহার।

কিন্তু সাধারণ অবস্থায় রাজধানীতে যত লোকই থাক তারা সবাই জড়ো হয়েও এমন ভিড় জমাতে পারত না। এ ভিড় যুদ্ধের তোড়জোড়ে দূরদূরান্তের সৈন্য আর মানুষ ধুমঘাটে এসে জড়ো হওয়ায় জমেছে।

গাঙের পাড়ে সত্যিই যেন মেলা বসে গেছে। শহরের লোক তো বটেই, কাছাকাছি সব গাঁয়ের লোকও শুধু মজা দেখতে আসেনি। কেউ কেউ ওরই মধ্যে দু-চার পয়সা কামিয়ে নেবার ব্যবস্থাও করেছে। কেউ মুড়িমুড়কি, মোয়া মঠা তালপাতার চাটাইয়ে ঢেলে বেচছে, কেউ সুবিধেমতো জায়গা বেছে নিয়ে তেলেভাজার কড়া চাপিয়েছে কাঠের আগুনে। সবচেয়ে বুদ্ধি করেছে বুঝি একজন ফেরিওয়ালা। বাঁকারির তলোয়ার তৈরি করে তার ডগায় শোলা দিয়ে সে একটা মুন্ডু গোছের বানিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। তলোয়ারের ডগার দিকে একটু লাল রং লাগানো, আর শোলার টুকরোটা খুব কল্পনা খাটালে মোগল সেপাই-এর মুন্ডু বলে ভাবা যায়।

বিক্রি হোক না হোক ভিড় এই ফেরিওয়ালার চারিধারেই বেশি।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে একজন তিরন্দাজ ধমক দিয়ে কাকে যেন ঠেলে দিয়ে বলে, 'তুই ব্যাটা ঘেসুড়ে এখানে কী দেখছিস! এ ঘাস কাটা নয়, মাথা কাটার খেলা!'

কাছাকাছি কজন হেসে ওঠে। মাথায় ঘাসের বোঝা বওয়া ঘেসুড়ে ছোকরা যেন অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়ায় একটু। কিন্তু বেশি দূরে সে যায় না।

যে তাকে ধমক দিয়েছে তেমন হুঁশিয়ার থাকলেও বোধ হয় সে তিরন্দাজ বুঝতে পারত না যে, ঘাসের বোঝায় মুখটা প্রায় ঢাকা-পড়া, খাটো, হাঁটু অবধি ময়লা কাপড়-পরা, ধুলো-কাদা-মাখা এক ছোকরা ধুমঘাটে আসা অবধি সারাক্ষণ তার আশেপাশেই ঘুরছে। তিরন্দাজের হুঁশিয়ারি অবশ্য কিছু কম ছিল না, কিন্তু সে অন্য দিকে। আর কোনো তিরন্দাজের কাছাকাছি না গিয়ে পড়ে এইটুকুই শুধু তার লক্ষ্য। সে-লক্ষ্য নিয়েই এদিক-ওদিক সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিছু খেয়াল করবার কথা তার মাথাতেই আসেনি।

এ তিরন্দাজ অবশ্য আর কেউ নয়, সেই সদানন্দ—ভাঙা মন্দিরে শেখর রূপরামের সঙ্গে যার ষড়যন্ত্রের আলাপ শুনেছিল।

ছোকরা ঘেসুড়ে যে স্বয়ং শেখর তা বোধ হয় আর বলে দেবার দরকার নেই।

শেখর শেষ পর্যন্ত তার আগের ফন্দি অনুসারে ঘেসুড়ে সেজেই ধুমঘাটে ঢুকেছে। ভাঙা মন্দিরের গা-বেয়ে-ওঠা সেই লতানে শেকড় ধরে সন্তর্পণে নেমে সে প্রথমে জঙ্গলের ধারে গিয়ে বাঁধা ঘোড়াটাকে খুলেছিল। কিন্তু তখুনি তাতে না চড়ে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বনের ভেতর দিয়েই

pathagar.net

ঘোড়াটাকে যথাসম্ভব নিঃশব্দে নিয়ে গিয়েছিল হাঁটিয়ে। বন থেকে বেরিয়ে এবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে ঘেসুড়েদের গাঁয়ের দিকেই রওনা হয়েছিল। সেখানে যখন পৌঁছেছিল তখনও ভোর হতে কিছু দেরি আছে। গরিব চাষিদের গাঁ। গোলপাতা আর খড়ে-ছাওয়া কয়েকটা মাটির কুঁড়ে মাত্র। গাঁয়ের বাইরের মাঠে নানা জায়গায় কাটা ঘাসের গাদা। দু-একটা ঘাসের বোঝা জংলা লতা দিয়ে একেবারে বেঁধেছেঁদে তৈরি করে রাখা। চাষিরা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ভোরে উঠে তারা ওই ঘাসের বোঝা নিয়ে ধুমঘাটে রওনা হবে নিশ্চয়। শেখর কিন্তু তাদের জাগাবার অপেক্ষায় বসে থাকেনি। সুবিধেমতো একটা জায়গায় তার পোশাক-আশাক লুকিয়ে রেখে, পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে ছোটো করে পরেছে। তারপর তাতে ধুলো কাদা লাগিয়ে ময়লা করে বাঁধাছাঁদা একটা ঘাসের বোঝা বেছে নিয়ে নিজের পেছনে ঘোড়াটার পিঠেই চাপিয়ে ধুমঘাটের কাছাকাছি এসে থেমেছে। সেখানে ঘোড়াটাকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে সে পুরোপুরি ঘেসুড়ে সেজে পা চালিয়েছে ধুমঘাটের দিকে, মনের ভেতর তখন একটা শুধু তার আপশোস। যে-বেচারার কষ্ট করে কাটা ঘাসের বোঝা সে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পয়সাকড়ি কিছু দিয়ে আসতে সে পারেনি। তার কাছে দেবার মতো কিছু ছিল না এমন নয়। তার উষ্ণীষের মধ্যে কয়েকটা আশরফি তখনও লুকোনো ছিল। কিন্তু সে-আশরফির একটা ঘাসের দাম হিসেবে রেখে এলে ঘেসুড়ের উপকারের বদলে সর্বনাশই হয়তো করা হবে বলে তার মনে হয়েছে। আশরফি কোথা থেকে পেল সে-কৈফিয়ত দিতেই ঘেসুড়ে চাষির হয়তো প্রাণান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত তলোয়ার বাঁধবার চামড়ার কোমরবন্ধটা সে ঘাসের জায়গায় অনেক ভেবেচিন্তে রেখে এসেছে। কোমরবন্ধটা দামি কিছু নয়। সাদাসিধে ধরনের, ধুমঘাটে কারোর চোখে পড়বার মতো পোশাক-আশাক নিয়ে তো সে আসেনি। কোমরবন্ধটাও সেই সাধারণ পোশাকের সঙ্গে মানানসই। এ কোমরবন্ধটা কারোর কাছে বিক্রি করে ঘেসুড়ে কিছু দাম হয়তো পেতে পারে। একটা সাধারণ কোমরবন্ধের জন্যে এমন কিছু জবাবদিহি তাকে দিতে হবে না নিশ্চয়।

ঘেসুড়ে সেজে তলোয়ার নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব নয় বলেই কোমরবন্ধটা খুলে ওইভাবে রেখে আসবার কথা অবশ্য তার মনে হয়েছিল। এই সামান্য একটা কোমরবন্ধ যে আবার অমনভাবে সে ফেরত পাবে তখন ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু সে পরের কথা।

ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রথমে শেখর ধুমঘাটে ঢোকবার একটি রাস্তার ধারে এসে একটা ভাঙা কুঁড়ের আড়ালে অপেক্ষা করেছে। সদানন্দ আর রূপরামের এই রাস্তা দিয়েই আসবার কথা।

অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে বেশ কিছুক্ষণ। তাদের বাহারে গোরুর গাড়ি নিয়ে রূপরাম আর সদানন্দ বেশ একটু বেলাতেই এসে পৌঁছেছে। কোশা ভাসানোর তখনও অবশ্য দেরি আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই গাঙের ধারে লোকজন জড়ো হয়েছে প্রচুর।

গোরুর গাড়িটা চালিয়ে এনেছে রূপরাম নিজে। সনাতন তিরন্দাজের সাজে ছিল ভেতরে। রাস্তার ধারে নির্জন গোছের জায়গা দেখে রূপরাম গাড়িটা একবার থামাবার পরেই সদানন্দ পেছনের জরি-মখমলের পরদা সরিয়ে নেমে পড়ে গোরুর গাড়ির আগে আগে শহরের ভেতর ঢুকেছে।

আড়াল থেকে সব লক্ষ করে শেখরও ঘাসের বোঝা নিয়ে তার পিছু নিয়েছে তখুনি। সেই থেকে সদানন্দকে নজরে নজরে রেখেই সে কাছেপিঠে ঘুরছে। ঘোরাফেরার মধ্যে বাহারে গোরুর গাড়িটা রূপরাম কোথায় রেখে কোশা-ঠেলা মুনিষদের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে তাও সে দেখে রাখতে ভোলেনি।

pathagar.net

ফেরিওয়ালার কাছের ভিড় থেকে ঠেলা খেয়ে শেখর একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাকে বলে এক চোখ সদানন্দের ওপরে রেখে আর চোখে আশপাশের ব্যাপারও লক্ষ করে।

যশোররাজ আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের আসতে বোধ হয় বেশি দেরি নেই। বল্লম হাতে একদল সৈনিক গাঙ পর্যন্ত একটা রাস্তার ভিড় দু-দিকে সরাচ্ছে। তাদের পেছন থেকে খোলা তলোয়ার হাতে নৌসেনার দল আসছে ঘাটের দিকে।

চারদিকের লোকজনের এলোমেলো গোলমাল হঠাৎ যেন জড়ো হয়ে আকাশ কাঁপানো জয়ধ্বনি হয়ে উঠে :

জয় যশোরেশ্বরীর জয়! জয় মহারাজের জয়!

হ্যাঁ, ওই তো যশোরের নিশান দূরের রাস্তায় ভিড়ের মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে। মহারাজের খোলা রথের ওপরকার রাজছত্রও দেখা যায় তারপর।

মহারাজের রথের দু-ধারে ঘোড়ায় চড়ে যাঁরা আসছেন তাঁদের সোজা করে ধরা বল্লমের ডগাগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে সোনালি রোদে।

মাথার ঘাসের বোঝাটা নামালে শেখর আরেকটু ভালো করে দেখতে পারে। কিন্তু সাহস হয় না বোঝা নামাতে। যদি কেউ চিনে ফেলে!

কাছ থেকে সদানন্দের ওপর লুকিয়ে নজর রাখবার জন্যেও বোঝাটা মাথায় রাখা দরকার।

যশোরেশ্বরী আর যশোররাজের জয়ধ্বনি শুনেই সদানন্দ ব্যগ্র হয়ে উঠে ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

শেখরও যতখানি সম্ভব তার কাছাকাছি থাকে।

কী করবে এবার সদানন্দ?

মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে ঘাটের দিকে যাবার পথেই কি সে তির ছুঁড়ে মারবে, না অপেক্ষা করবে তাঁর ঘাটে পৌঁছে কোশা ভাসাতে নামা পর্যন্ত?

শেখর নিজে কী করবে তা সে ঠিক করেছে কি?

কোন সংকল্প নিয়ে সে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে ছায়ার মতো সদানন্দের কাছাকাছি ফিরছে? রূপরাম ও সদানন্দের ভয়ংকর চক্রান্ত কীভাবে কতখানি সফল হয় তাই দেখবার জন্যে কি?

ঘাটে যাবার পথেই যশোররাজের ওপর তির ছোঁড়া বোধ হয় সদানন্দের উদ্দেশ্য নয়।

কোশা ভাসাবার ঘাটের দিকেই ভিড়ের মধ্যে মিশে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেখর হাজির আছে তার পেছনে পেছনে।

এবার গাঙের পাড়ের কাছাকাছি এসে গেছে। মানুষের ভিড়ে নদীর কাছের পাড় ভালো করে দেখা যায় না। কিন্তু কিছু দূরে ভরা গাঙের জলে নানা জাতের নানা সাজের নৌবহরের যেন গাঁদি লেগে গেছে মনে হয়। সুলুপ, ঘুরাব, মাচোয়া, গছাড়ি, পশত, কোনো জাতের নৌকোরই সেখানে অভাব নেই। থেকে থেকে অনেক নৌকো থেকে ফিরিঙ্গি নাবিকরা গাদা-বন্দুক ছুঁড়ে তাদের উল্লাস জানাচ্ছে।

কাছের পাড়টাও এবার কিছু কিছু দেখা যায়। এক-আধটা নয়, সার সার অনেক কোশা সেখানে পাড়ের কাছে সাজানো।

সদানন্দ জমাট ভিড় থেকে একটু সরে এসে এবার একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন ভালো করে দেখার জন্যে। ভিড়টা সেখানে একটু হালকা।

শেখর তার পেছন দিয়ে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে একটু এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে কড়া গলায় হুকুম শোনে, 'এই হতভাগা, কোথা যাচ্ছিস? নামা তোর ঘাসের বোঝা!'

চকিতে একবার পেছন ফিরেই শেখর শিউরে ওঠে।

pathagar.net

কোতোয়ালির একজন পাহারাদারই কিছু দূর থেকে হাঁক দিয়ে তার দিকে আসছে।

ব্যাপারটা হয়তো ভয়ের কিছু নয়। এই এতজনের ভিড়ের মাঝখানে সামান্য একজন ঘেসুড়ে ছেলেকে পাহারাদার কোনোরকম সন্দেহ করবেই বা কেন? হয়তো কোনো সওয়ারের জন্যে ঘাস কেনবার উদ্দেশ্যেই পাহারাদার তাকে দাঁড়াতে হুকুম করেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসব কথা ভেবে নিলেও অনুমান ঠিক কি বেঠিক যাচাই করবার জন্যে অপেক্ষা করতে শেখরের সাহস হয় না।

এক ঝটকায় বোঝাটা ছুঁড়ে ফেলে সে উলটো দিকে দৌড় দেয়। ভিড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে ছুটে দম প্রায় ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত আর ফিরে তাকায় না।

না, সে পাহারাদার আর ধারেকাছে কোথাও নেই। শেখরের পেছনে সে ধাওয়া করবার চেষ্টা করেছিল কি না তাও সঠিক বলা যায় না।

বিপদ কিছু থাক বা না থাক শেখর এখন নিশ্চিন্ত হতে পারে একটু।

কিন্তু সত্যি তাও পারছে কি?

সদানন্দ যেখানে গাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সেখান থেকে অনেক দূরে সে চলে এসেছে।

যশোররাজ আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা এতক্ষণে কোশা ভাসাবার ঘাটের কাছেই প্রায় পৌঁছে গেছেন নিশ্চয়। আর খানিক বাদেই রাজপুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে অনুষ্ঠান শুরু করবেন।

সদানন্দ ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি?

সে উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ তার কখনো ফসকায় না।

শেখর আবার সেই গাছের গুঁড়িটার দিকেই ছুটতে শুরু করে। কিন্তু সদানন্দ তার অব্যর্থ তির ছোঁড়বার আগেই সেখানে সে পৌঁছোতে পারবে কি?

॥ ১০ ॥

সূর্যকান্ত একা একাই ভিড়ের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে কোশা ভাসানোর ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন।

যশোররাজের মিছিলের সঙ্গীদলে ইচ্ছা করেই তিনি যোগ দেননি। সত্যি কথা বলতে গেলে কোশা ভাসানো নিয়ে এই ঘটা করায় তাঁর আপত্তিই ছিল। তাঁর আপত্তির কথা তিনি যশোররাজ্যের প্রধান সভাসদদের জানিয়েও দিয়েছিলেন।

নতুন কোশার রহস্য গোপনই রাখা উচিত, এই তাঁর মত। গোপন অস্ত্র হিসেবে মানসিংহের বিরুদ্ধে যা ব্যবহার করা হবে, আগে থাকতে তার পরিচয় ঘটা করে জানানো যুদ্ধের চাল হিসাবে ভুল, এই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন যে শত্রুর চর কেউ-না-কেউ ধুমঘাটে আছেই। কোশার আসল প্যাঁচ না জানতে পারুক, তা কী ধরনের অস্ত্র, এ খবরটা মানসিংহকে তো চরেরা দিতে পারবে। সে সুযোগ যশোর দেবে কেন?

সভাসদদের মধ্যে এক সুখাসর্দার ছাড়া আর কেউ কিন্তু তাঁকে সমর্থন করেনি।

ফিরিঙ্গি নৌসেনাপতিরা তো সূর্যকান্তের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।

রডা বলেছে, 'মানসিংহ এ কোশার খবর পেলে আমরা তো খুশিই হব। কোন্ হাটে ছুঁচ বেচতে এসেছে তাহলে বুঝবে।'

পেড্রো আর ডুডলি বলেছে, 'এ কোশার খবর পেলেও তার প্যাঁচ বুঝতে ওদের সাত জন্ম কেটে যাবে। ওদের জারিজুরি যদি কিছু থাকে তো ডাঙায়। এই জলের ভেলকির কথা শুনেই একেবারে কুপোকাত হবে।'

'তবু দেখা সাপের ছোবল ভোঁতা। যুদ্ধের একটা বড়ো প্যাঁচ হল শত্রুকে হকচকিয়ে

pathagar.net

দেওয়া।' সুখাসর্দার সূর্যকান্তের পক্ষ নিয়ে বলেছে, 'আচমকা এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারলে ওদের যেরকম দিশেহারা করা যেত, আগে থেকে জানতে দিলে তা কি আর হবে?'

'আগে থাকতে জানবেই বা কেন?' তর্ক করেছে ডুডলি, 'সুখা সর্দারের তো জানি বাজপাখির চোখ। সে চোখে কি ছানি পড়েছে যে, মানসিংহের নেংটিচরেরা ধুমঘাটের খবর নিয়ে তার নজর এড়িয়ে পালাবে।'

কথার মধ্যে যে বিদ্রূপটুকু ছিল তাতে সুখাসর্দার জ্বলে উঠেছে। বলেছে, 'সুখাসর্দারের চোখের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, ডুডলি। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। ধুমঘাট থেকে একটা বেইমান পিঁপড়েও, সুখাসর্দারের পাহারার ফুটো দিয়ে গলতে পারবে না এইটুকু শুধু বিশ্বাস করতে পার।'

'তবে আর ভাবনাটা কী?' পেড্রো আর রডা হো হো করে হেসে উঠে সুখাসর্দারের পিঠে চাপড় দিয়ে ডুডলিকে বলেছে, 'বড়ো বেফাঁস কথা বলে ফেলেছ হে। সুখাসর্দারের যে আঙুলে কড়া সেইটেই মাড়িয়ে ফেলেছ। সুখাসর্দারের বাপান্ত করলেও সে সইবে, কিন্তু তার দপ্তর নিয়ে একটু খোঁচা দিয়েছ কি সে ফোঁস কেউটে।'

'আমি মাপ চাচ্ছি।' হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ডুডলি।

হাসাহাসির মধ্যেই আলোচনাটা থেমে গেছে। কোশা ভাসানোর উৎসব বন্ধ করার প্রস্তাবটা চাপা পড়ে গেছে ওইখানেই।

সূর্যকান্ত আর কিছু বলেননি, তবে সেজেগুজে সমারোহতে যোগ দিতে না চাইলেও উৎসবটা লক্ষ করবার জন্যে একা একাই মেলার মধ্যে নিজের খেয়ালমতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অনুষ্ঠান শুরু হবার আর দেরি নেই। যশোররাজের দলবল প্রায় ঘাটের কাছে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ একটা তুমুল হট্টগোলের শব্দে সূর্যকান্ত চমকে ওঠেন। যশোররাজের রথের কাছে কী যেন একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। চারদিক থেকে সেখানকার জটলার দিকে লোকজন চিৎকার করতে করতে ছুটছে।

হতভম্ব হয়ে সেদিকে যেতে যেতেই সূর্যকান্তকে শিউরে উঠে থেমে যেতে হয়। সমস্ত গোলমালের ভয়ংকর কারণটা যশোররাজের রথের চূড়ার গায়েই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। রথের শীর্ষদণ্ডে গভীরভাবে বেঁধা একটা তির তখনও কাঁপছে।

যশোররাজকে হত্যা করবার জন্যেই ও তির ছোঁড়া হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু যশোরের বুকের ওপর, এই ধুমঘাটের মেলায় স্বয়ং মহারাজকে হত্যার চেষ্টা করবে, এত বড়ো দুঃসাহস হতে পারে কার?

ঠিক সেই মুহূর্তেই কিছু দূরের অদ্ভুত ঘটনাটা সূর্যকান্তের চোখে পড়ে।

চারদিকে ভীত উত্তেজিত লোকজনের ছোটাছুটি। তারই মধ্যে একজন তিরন্দাজ সৈনিকের সঙ্গে চাষাভুষো গোছের একটা মানুষের প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি চলছে। ভালো করে একটু নজর দিয়ে অত্যন্ত অবাক হতে হয়। তিরন্দাজ সৈনিকের সঙ্গে যার হাতাহাতি চলেছে সে নেহাত অল্পবয়সি একটা ছেলে। কাছে পড়ে থাকা ঘাসের বোঝা দেখে ঘেসুড়ে ছেলে বলেই মনে হয়। তিরন্দাজের ধনুকটা নিয়েই কিন্তু দুজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলেছে।

একটা ঘেসুড়ে ছেলের এরকম আস্পর্ধার কথা সূর্যকান্ত ভাবতেই পারেন না। ব্যাপারটার মধ্যে যে রহস্যই থাক, তা যে গুরুতর এবং এইমাত্র যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটেছে তার সঙ্গে এ ব্যাপারের যোগ কিছু থাকা সম্ভব অনুমান করে সূর্যকান্ত সেদিকে ছুটে যান।

তিনি পৌঁছোবার আগেই দেখা যায়, তিরন্দাজ সৈনিকের একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘেসুড়ে ছেলেটা মুখ থুবড়ে মাটির ওপর পড়ে গেছে। তিরন্দাজের ধনুকটা কিন্তু তখন সেই ঘেসুড়ে ছেলেটারই হাতে।

boiGhar.net

সূর্যকান্ত সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পরেই ছেলেটা মাটি থেকে উঠে বসে। কপালের খানিকটা থেঁতলে কেটে গিয়ে তার মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। একবার ছেলেটার, একবার তিরন্দাজ সৈনিকের দিকে চেয়ে সূর্যকান্ত কড়া গলায় তিরন্দাজকেই আগে ধমকে দেন।

'কী হচ্ছে কী তোমাদের! তিরন্দাজ হয়ে একটা ঘেসুড়ে ছেলের সঙ্গে মারমারি করছ তুমি! কেন?'

তিরন্দাজ সূর্যকান্তকে সম্ভবত চিনতে পেরেই প্রথমটা থতমত খেলেও তারপর উত্তেজিতভাবে বলতে শুরু করে, 'কেন মারামারি করছি জিজ্ঞেস করছেন? জানেন ও কী করেছে? যাকে ঘেসুড়ে ছেলে ভাবছেন সে ঘেসুড়ে নয়, মোগলদের শয়তান চর!'

সূর্যকান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'মোগলদের চর?'

'হ্যাঁ, চর, চোরা কালসাপ!' তিরন্দাজ উত্তেজিতভাবে বলতে থাকে, 'আগে ওকে ধরুন। পালাতে দেবেন না। এইমাত্র মহারাজকে মারতে ও তির ছুঁড়েছে।'

'তির ছুঁড়েছে এই ঘেসুড়ে ছোকরা!' সূর্যকান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'এ ধনুক তো তোমার। ও তির ছুঁড়বে কী করে!'

'আজ্ঞে দোষ এক হিসেবে আমারই।' অনুতপ্ত অপরাধীর মতো অত্যন্ত কাতরভাবে বলে যায় তিরন্দাজ, 'মহারাজের শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে আমি একটু অসাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। কখন যে এই ঘেসুড়ে-সাজা ছেলেটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কখন আমার পিঠের তূণ থেকে কটা তির খুলে নিয়েছে টেরও পাইনি। তারপর হঠাৎ একসময়ে আমার কাঁধ থেকে ধনুকটা টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। টের পেয়েই ছুটে আমি ওর পিছু নিয়ে ওকে ধরে ফেলি। কিন্তু তার আগেই ও একটা তির ছুঁড়ে দিয়েছে। তির ছোঁড়ার মুখেই গিয়ে বাধা না দিলে মহারাজ রক্ষা পেতেন না।'

'কী বলছ তুমি!' সূর্যকান্ত বিমূঢ়ভাবে বলেন, 'মহারাজকে মারবার এতখানি ফন্দি করেছে ওই ঘেসুড়ে!'

'আজ্ঞে বিশ্বাস করুন আমার কথা। ও ঘেসুড়ে নয়।' তিরন্দাজ আবার উত্তেজিতভাবে বলে, 'ওকে ধরে ভালো করে একবার চেয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝবেন ও সত্যি ঘেসুড়ে না মিথ্যে সেজে এসেছে। ঘেসুড়ে ছেলে হলে অমন ধনুক ছুঁড়তে পারে, না আমার মতো তিরন্দাজের সঙ্গে লড়তে সাহস পায়!'

ছেলেটা এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তিরন্দাজের কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সূর্যকান্ত দু-পা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার একটা হাত ধরে ফেলেন। তারপর খানিক তার দিকে চেয়ে থেকে তীব্রস্বরে বলে ওঠেন, 'শেখর! তুমি!'

সে স্বরে যতখানি বিস্ময় তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা ও রাগের জ্বালা।

সেই দুঃসহ রাগেই শেখরের দুটো কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে সূর্যকান্ত আবার জ্বলন্ত স্বরে বলেন, 'একটা কালসাপকে আমি এতখানি ভালোবেসে বিশ্বাস করেছিলাম! আর সে বিশ্বাস দু-পায়ে থেঁতলে তুমি এখানে ঘেসুড়ে সেজে এসেছ মহারাজকে মারতে!'

শেষের দিকে সূর্যকান্তের গলায় রাগ ও ঘৃণার সঙ্গে একটা হতাশ বেদনার সুরও যেন মিশে যায়।

শেখরের রক্তমাখা মুখের ঠোঁট দুটো একটু বুঝি কেঁপে ওঠে। তার রুদ্ধকণ্ঠে বলবার কথাগুলো যেন আটকে যাচ্ছে। অতিকষ্টে সে অস্ফুট ধরা গলায় কোনোরকমে বলে, 'আপনি ওর কথাই বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ, করি।' গর্জন করে ওঠেন সূর্যকান্ত, 'যশোরের তিরন্দাজ বাহিনীর কেউ এত বড়ো মিথ্যে কথা বলতে পারে না।'

pathagar.net

'আমার কথা তাহলে শুনবেন না?' এবার শেখরের স্বর স্পষ্ট ও একটু কঠিন।

'না, শোনবার কিছু নেই!' সূর্যকান্ত ঘৃণাতিক্ত কণ্ঠে বলেন,'অত বড়ো বিশ্বাসের অপমান করে তুমি যে ঘেসুড়ে সেজে লুকিয়ে ধুমঘাটে এসেছ, তোমার বিরুদ্ধে এই প্রমাণই যথেষ্ট। চলো, তোমার যোগ্য ব্যবস্থাই এবার করব।'

শেখর তীব্র দৃষ্টিতে সূর্যকান্তের দিকে একবার চেয়ে কী বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে। সূর্যকান্ত তাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে এগিয়ে যেতে গিয়ে একটু থামেন। পিছন ফিরে তিরন্দাজকে বলেন, 'তুমিও সঙ্গে এসো, কী নাম তোমার?'

'আজ্ঞে সদানন্দ!' নিরর্থক বলেই সদানন্দ বোধ হয় নিজের নামটা গোপন করে না। যেভাবে প্রথম বিপদ সে কাটিয়েছে তেমনই কোনো উপস্থিত বুদ্ধির কৌশলে সূর্যকান্তের খপ্পর থেকে অবিলম্বে পালাতে না পারলে, আসল বা ছদ্মনাম দুই-ই যে সমান হবে তা সে ভালো করেই জানে।

সেই সুযোগই যে অমন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মুহূর্তেই মিলবে তা সে আশা করতে পারেনি।

এতক্ষণ সূর্যকান্তকে মিথ্যে অভিনয়ে ভোলাবার চেষ্টার মধ্যেও মনে মনে সে রূপরামের ওপর গজরেছে। রূপরাম তাকে মিথ্যে স্তোক দিয়েছে, এই তার সন্দেহ।

কিন্তু দেরি একটু করলেও রূপরাম যে কথার খেলাপ করেনি, সেই মুহূর্তে তার ভয়ংকর প্রমাণ হঠাৎ কোশা ভাসানোর ঘাটে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ওঠে।

ধুমঘাটের গাঙের পাড়ের সমস্ত লোক স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জগদ্দল কামানের গর্জনের মতো শব্দে হঠাৎ সেইদিন দুপুরের আলোতেই আতসবাজির একটা পাহাড় যেন গাঙের জলের ওপর ফেটে গিয়ে জ্বলে ওঠে বলে মনে হয়। তারপর যেমন গাঙের জলের ওপর জাহাজে নৌকোয়, তেমনি পাড়ের জনতার মাঝখানে শুরু হয় ভীত উত্তেজিত চিৎকার আর ঠেলাঠেলি।

সূর্যকান্ত সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে ও গাঙের জলের ওপর লাফিয়ে-ওঠা আগুনের হলকায় বিহ্বলভাবে চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। নিজের অজান্তেই শেখরের হাতটা যে তখন তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সে খেয়াল তাঁর ছিল না।

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে ব্যাপারটা একটু অনুমান করার পর সে খেয়াল তাঁর হয়। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পাশে তাকিয়ে বুঝতে পারেন ভাবনার তাঁর কোনো কারণ নেই। হয়তো আর সকলের মতো বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েই সুযোগ পেয়েও শেখর পালাবার চেষ্টা করতে পারেনি। নীরবে কঠিন মুখে তাঁর পাশেই সে দাঁড়িয়ে আছে। এমন একটা অভূতপূর্ব ঘটনায় তেমন কোনো বিস্ময়ের ছাপ তার মুখে যে দেখা যায় না, এইটুকুই যা আশ্চর্য।

শেখরের হাতটা আবার শক্ত করে ধরে ফেলে সূর্যকান্ত এবার পিছন দিকে তাকান। চারদিকে উত্তেজিত সন্ত্রস্ত মানুষের ছোটাছুটি। তার মধ্যে সদানন্দকে কোথাও দেখা যায় না।

pathagar.net

॥ ১১ ॥

সমুদ্রে যেন তুফান উঠেছে।

এ সমুদ্র কিন্তু জলের নয়, মানুষের।

কোশা ভাসানোর উৎসবের জন্যে যে মেলা বসেছিল, তা গাঙের জলে সেই ভয়ংকর আচমকা বিস্ফোরণের পর তছনছ ছত্রভঙ্গ হয়ে যেন একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানুষের দিশেহারা সব স্রোত বইছে উন্মত্তভাবে, ধাক্কা খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে, বিমূঢ় কোলাহল তুলে আবার পাক খেয়ে ফিরছে।

এই অস্থির উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝখানে একজায়গায় যেন একটা ঘূর্ণি। আর সেই ঘূর্ণির কেন্দ্রটা দূর থেকে দেখলে মনে হয় স্থির, শান্ত।

ঘূর্ণির সে কেন্দ্র হল মেলায় সুখাসর্দারের অস্থায়ী শিবির।

চারধারের উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার মাঝখানে সেইখানেই যেন কোনো চাঞ্চল্য নেই।

সুখাসর্দার বুঝি অন্ধকারই ভালোবাসেন। উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে এই শিবিরেরও দুই মহল। প্রথম বাইরের শিবিরের প্রহরীদের পার হয়ে দ্বিতীয় শিবিরে ঢুকতে হয়। এ শিবির আয়তনে বেশ সংকীর্ণ। চারদিকে মোটা কাপাড়ের পরদা ফেলে রাখার দরুন দিনের বেলাতেও সেখানে আলো অত্যন্ত কম।

সেই আবছা আলোয় সুখাসর্দারকে যেন একটা প্রাচীন মন্দিরের ভেতরকার অদ্ভুত পাথরের মূর্তির মতো দেখায়। পাথরের মূর্তির মতোই প্রায় নিস্পন্দ নিথর হয়ে তিনি বসে আছেন। কিন্তু এই অচল নিস্পন্দতা যে বাহ্যিক তা বোঝা যায় সেখানকার অন্য ব্যস্ততায়।

প্রতি মুহূর্তে একজন দু-জন সেখানে সসম্ভ্রমে এসে দাঁড়াচ্ছে। তাদের কেউ প্রহরী, কেউ সৈনিক, কেউ-বা সাধারণ পোশাকে সজ্জিত সুখাসর্দারের চর।

তারা এসে নিজেদের সংবাদ দিয়ে ও দরকার হলে আদেশ নিয়ে যেন কলের পুতুলের মতো চলে যাচ্ছে।

তাদের খবর দেওয়ায় যেমন উচ্ছ্বাস উত্তেজনা নেই, সুখাসর্দারের মাঝে মাঝে একটা-দুটো জিজ্ঞাসা বা আদেশ দেওয়াতেও তেমনই। শুধু তাঁর জলদগম্ভীর স্বর যেন বিস্ফোরণের আগেকার কোনো আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে উঠছে।

'কোশা ভাসানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, হুজুর। পেড্রো আর ডুডলির নৌবহর গাঙের দু-মুখ বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে'—একজন বলে গেল।

পরমুহূর্তেই আর দুজন ঢুকল। একজন যশোররাজের খাসরক্ষী প্রহরী আর একজন তিরন্দাজ।

'মহারাজ রথ বদলে প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছেন হুজুর! শংকর চক্রবর্তী তাঁর বাহিনী নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছেন,' জানাল প্রহরী ; 'আপনি এখন দেখা করবেন কি না জানতে চাইলেন।'

'না, দেখা করবার সময় এখনও হয়নি।' সুখাসর্দার রক্ষীপ্রহরীকে হাত নেড়ে বিদায় করে তিরন্দাজের দিকে ফিরলেন, 'শিঙা বাজিয়ে ডাকা হয়েছে সমস্ত তিরন্দাজদের?'

'হ্যাঁ, হুজুর। জাহাজঘাটের উত্তরে তারা জড়ো হচ্ছে। সুন্দরবেগ, ধুলিয়ানবেগ দুজনেই সেখানে হাজির আছেন।'

'সুন্দরবেগকে আমার সেলাম দাও। এখুনি যেন একবার এখানে আসেন।'

তিরন্দাজ সেলাম করে চলে যাওয়ার আগেই আর একজন শিবিরে এসে ঢুকে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ পোশাক দেখে বোঝা গেল, সে সর্দারের গুপ্ত অনুচরদের একজন।

তিরন্দাজ চলে যেতেই সে বলল, 'ধুমঘাট থেকে বাইরে যাবার সমস্ত রাস্তাতেই পাহারা বসে গেছে, হুজুর। নজর রাখছে সকলের ওপর।'

'হ্যাঁ নজর রাখবে শুধু। বাধা দেবে না কাউকে। শুধু ঘেসুড়ে কাউকে দেখলেই ধরে আনবে এখানে।'

'যে আজ্ঞে!' বলে গুপ্তচর চলে যাবার জন্য পিছু ফিরতেই সুখাসর্দার আবার তাকে ডাকলেন, 'দাঁড়াও। ঘেসুড়ে শুধু নয়, অচেনা ছোকরা বয়সের যে কেউ যে পোশাকেই থাক, সবাইকে ধরে আনতে হবে, এই হুকুম জানিয়ে দাও সকলকে।'

অনুচর চলে যাবার পর সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে বস্ত্রাবাস খালি হতেই সুখাসর্দারের যেন আরেক চেহারা দেখা গেল। স্থাণু পাষাণ মূর্তি আর নয়, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে হিংস্র বাঘের মতো

boiRboi.net

তিনি সংকীর্ণ তাঁবুর ভেতর কয়েকবার যেভাবে পায়চারি করে ফিরলেন, তাতে বোঝা গেল কী কঠিন চেষ্টায় এই প্রচণ্ড অস্থিরতা বাইরে সকলের কাছে তিনি দমন করে রেখেছিলেন।

পায়চারি করতে করতেই শিবিরের এক কোণে রাখা একটি ছোটো চৌকির কাছে গিয়ে তিনি একবার থামলেন। তারপর তার ওপর থেকে যা তুলে নিলেন, তা ধনুকের একটি তির।

আবছা আলোতেই সেই তিরটি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন এমন সময় এক অনুচর এসে জানাল, নৌসেনাপতি রডা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

সুখাসর্দারের মুখে একটু বুঝি ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। পরমুহূর্তেই সেটা মুছে ফেলে তিনি অনুমতি দিলেন রডাকে ভেতরে নিয়ে আসবার।

কিন্তু সে অনুমতির আর দরকার ছিল না।

ধৈর্য ধরতে না পেরে রডা ইতিমধ্যেই ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুখাসর্দারের হাতের তিরটার দিকে একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে রীতিমতো গরম মেজাজে তিনি বললেন, 'আপনি কোশা ভাসানো অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হুকুম দিয়েছেন!'

'হুকুম আমি দিইনি।' সুখাসর্দার একটু চিবিয়ে চিবিয়েই বললেন, 'হুকুম একমাত্র যিনি দিতে পারেন সেই যশোররাজই দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, দিয়েছেন!' রডা চড়া গলাতেই বললেন, 'কিন্তু আপনার পরামর্শে।'

'তা হতে পারে।' সুখাসর্দার খোঁচাটা ধারালো করবার জন্যেই গলাটা যেন বেশি মোলায়েম করলেন, 'কিন্তু পরামর্শ দেওয়াই তো আমাদের কাজ। পরামর্শটা খুব খারাপ দিয়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'খারাপ মনে হচ্ছে না!' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রডা, 'এটা কত বড়ো লজ্জা আর অপমানের ব্যাপার তা আপনার মাথায় এল না!'

'মাথাটা আপনার মতো অত সূক্ষ্ম আমার নয়, স্বীকার করছি।' সুখাসর্দার এবার একটু হাসলেন, 'লজ্জা আর অপমানটা এর ভেতর কোথায় তা সত্যিই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি, শুনুন। কোশা ভাসানোর উৎসব করতে গিয়ে এরকম একটা কেলেঙ্কারি হয়েছে, সে খবর মানসিংহের কাছে পৌঁছোবে না ভেবেছেন?' রডা এবার সুখাসর্দারকে বোঝাতে ব্যস্ত হলেন,'কী হাসাহাসি মোগলেরা এই নিয়ে করবে সেইটে শুধু ভেবে দেখুন।'

'ভেবে দেখতে হবে কেন? এ খবর পৌঁছোলে হাসাহাসি যে করবে এ বিষয়ে তো সন্দেহই নেই কোনো।' সুখাসর্দার বেশ যেন একটু গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করলেন 'এই হাসাহাসির লজ্জা আর অপমানটাই শুধু আপনার বাজছে!'

'নিশ্চয়ই।' রডা উত্তেজিতভাবে দুবার দ্রুত পায়চারি করে নিয়ে বললেন, 'আর এই লজ্জা আর অপমান সেধে নেবার পরামর্শই আপনি যশোররাজকে দিলেন।'

'আপনার পরামর্শটা তাহলে কী হত?' সুখাসর্দার যেন সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কেলেঙ্কারির পর ঠিকমতো একটা কোশা ভাসিয়ে তার কেরামতি দেখাতে পারলেই সব লজ্জা অপমান মুছে যেত—এই তো?'

'তা ছাড়া কী?' রডা উৎসাহ ভরে জানালেন, 'কেলেঙ্কারিতে হাসতে গিয়ে মুখ শুকোবার মতো খবরটাও তাহলে তারা পেত।'

'রডাসাহেব!' হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠে সুখাসর্দার বললেন, 'বোম্বেটেগিরি ছেড়ে যশোররাজের তাঁবেদার হয়েছেন কত দিন?'

'এ কথার মানে?' রডার চোখ প্রায় লাল, হাত প্রায় তলোয়ারের হাতলে।

'আহা, চটলেন নাকি?'

রডার হাতটার ওপর একটা বাঘের থাবাই যেন এসে পড়ল। সে থাবার চাপটা কিন্তু

pathagar.net

কৌতুকের সঙ্গে আদরের। সুখাসর্দার রডার হাতটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে হেসে বললেন, 'ও কথার মানে শুধু এই যে, যুদ্ধ ব্যাপারটা স্রেফ বন্দুক, তলোয়ারের খেলা, গায়ের জোর আর বেপরোয়া সাহস নয়, তার পেছনে আরও কিছু আছে। সেটা হল কূটবুদ্ধির প্যাঁচ। আপনি মোগলদের লজ্জা আর অপমান দেখছেন। কিন্তু সে তো প্রথম কিস্তির হাসাহাসি। শেষ কিস্তিতে যে হাসবে সে-ই বাহাদুর। তার জন্যে প্রথম কিস্তির লজ্জা অপমান যেচে নেওয়াতে লাভ।'

'বুঝলাম না আপনার কথা।' রডা সোজাসুজি স্বীকার করলেন গজরানির সুরে।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝবেন।' সুখাসর্দার বললেন, 'কোশা ভাসানোর ব্যাপারটাতে গোড়া থেকেই আমার আর সূর্যকান্তের আপত্তি ছিল। আপনাদের কজনের জেদে সে আপত্তি চেপে রেখেছিলাম। কিন্তু কেলেঙ্কারি যাকে বলছি সেই দুর্ঘটনাই আমাদের বাঁচিয়েছে। মানসিংহের কাছে খবর যদি কিছু পৌঁছোয় তাহলে এই কেলেঙ্কারির খবরই পৌঁছোবে। হাসাহাসি মোগলরা করবে ঠিকই, কিন্তু সেই কারণেই এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার কি হুঁশিয়ার থাকার দরকার বোধ করবে না। আমাদের গোপন অস্ত্র গোপনই থাকবে যথাসময়ে আচমকা ওদের দিশাহারা করবার জন্যে।'

রডা যুক্তিটা বুঝলেন ও মানলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু এবার প্রতিবাদ করলেন অন্য দিক থেকে।

অসন্তোষের সঙ্গেই বললেন, 'কূটবুদ্ধির বড়াই তো যথেষ্ট শুনলাম, কিন্তু সুখাসর্দারের সব জারিজুরি ওই একটা তিরই যে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। আপনার বাজপাখির চোখ এড়িয়ে যশোররাজ্যে একটা পিঁপড়ে নাকি নড়তেচড়তে পারে না। যশোরের বুকের ওপর এ তির স্বয়ং মহারাজের বিরুদ্ধে তাহলে ছোঁড়া হল কী করে!'

সুখাসর্দারের সমস্ত মুখটা সত্যি থমথমে হয়ে উঠল রাগে ক্ষোভে লজ্জায়। দু-চোখে যেন গুমরানো আগুনের আঁচ। তিক্ত তীক্ষ্ণ গলায় তিনি বললেন, 'এ অপমান আজ আপনি আমায় করতে পারেন, রডাসাহেব। সমস্ত যশোর আজ আমার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিতে পারে। তাই আমারও প্রতিজ্ঞা, রডাসাহেব, যশোরের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রের মূল পর্যন্ত খুঁড়ে বার করে যদি না উপড়ে ফেলতে পারি, তাহলে নিজে তুষানল জ্বেলে আমি তাতে নিজের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

সুখাসর্দারের সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয় হলেও তাঁর এ চেহারা ও গলার স্বর রডা আগে কখনো দেখেননি। তিনি বেশ একটু অপ্রস্তুতভাবে অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'আমায় মাপ করুন, সর্দার! আমি মনের জ্বালায় যেসব কথা বলেছি তাতে আপনাকে অপমান করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।'

'না থাকলে থাকা উচিত ছিল!' সুখাসর্দার বিরসভাবে একটু হেসে বললেন, 'আপনারা করলেও আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না, রডাসাহেব। হাড়-চামড়া ভেদ করে সব মানুষের ভেতরটা আমি দেখতে পাই, আমার চোখে কেউ ধুলো দিতে পারে না, এই আমার গর্ব ছিল। সেই অহংকারেই বোধ হয় আমার এই দুর্দশা! মানুষ চিনতে ভুল করেছি বলেই এত বড়ো লজ্জা অপমান আমায় মাথা পেতে নিতে হল!'

'মানুষ চিনতে আমিও ভুল করেছিলাম, সর্দার। চাক্ষুষ প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে সেই সর্বনাশা ভুলই স্বীকার করতে এসেছি।'

সুখাসর্দার ও রডা সবিস্ময়ে পেছন ফিরে দেখলেন চাষিগোছের একটি ছেলের হাত শক্ত করে সূর্যকান্ত গুহ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

সূর্যকান্তকে কী বলতে গিয়ে চাষি ছেলেটির দিকে আর একবার নজর পড়তেই সুখাসর্দার থেমে গেলেন।

pathagar.net

তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলেটিকে লক্ষ করে তিনি বেশ একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'এ তো শেখর দেখছি! তুমিই ধরে আনলে নাকি সূর্যকান্ত?'

'হ্যাঁ, আমিই আনলাম।' সূর্যকান্ত যেন নিজেকেই ধিক্কার দিলেন।

॥ ১২ ॥

আত্মগ্লানি যে তাঁর কত তীব্র সূর্যকান্তের পরের কথাতেই তা বোঝা গেল।

'শুধু ওকেই ধরে আনিনি সর্দার,' অনুশোচনার অসহ্য জ্বালা গলায় নিয়ে বলে গেলেন সূর্যকান্ত, 'নিজেকে আমি ধরা দিতে এসেছি। এক ভয়ংকর পরিণাম থেকে যশোর আজ রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সে চরম সর্বনাশ যে হয়নি, শয়তানের তির যে মাত্র দু-আঙুলের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, সে নেহাত দৈবের দয়া। নিজেকে তাই আমি ক্ষমা করতে পারব না। এ ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

'তোমার!' সুখাসর্দারের গলায় বিস্ময় ছাড়া আরও কিছু যেন ফুটল।

'হ্যাঁ আমার।' জোর দিয়ে বললেন সূর্যকান্ত, 'আজ অতি অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যে তির যশোররাজের রথে বিঁধে আছে তা আমারই ছোঁড়া আমি মনে করি। তুমি আমায় বাধা দিয়েছিলে সর্দার, কিন্তু তোমার কথা না মেনে এই সাপটাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। সেদিন নিজেই জামিন হয়ে ছাড়িয়ে না নিয়ে গেলে আজ এতবড়ো শয়তানি বিশ্বাসঘাতকতা করবার সুযোগ ও পেত না।'

একটু থেমে গাঢ় বিষণ্ণ গলায় আবার বললেন সূর্যকান্ত, 'এইটুকু আমার ভাগ্য যে, শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ওকে আমি ধরে আনতে পেরেছি। এখন ওর সঙ্গে নিজের অপরাধেরও শাস্তি আমি চাই।'

'হুঁ,' সুখাসর্দারকে একটু যেন অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর দেখাল, 'শাস্তি তো তুমি চাও, কিন্তু তার আগে একটা বাহবা যে তোমার পাওনা।'

'বাহবা?' কথাটা বিদ্রূপের কি না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুখাসর্দারের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চাইলেন সূর্যকান্ত। কিন্তু সেরকম আভাস সুখাসর্দারের মুখে পাওয়া গেল না। তার বদলে কেমন একটা দুর্বোধ দৃষ্টিতে সূর্যকান্তের দিকে তাকিয়ে সুখাসর্দার আগের মতোই গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ বাহবা। বাহবা আমাদের হয়ে একটা মস্তবড়ো কাজ করবার জন্যে। যাকে তুমি ধরে এনেছ, আমরাও অস্থির হয়ে তাকে খুঁজছিলাম।'

'তোমরাও খুঁজছিলে?' সূর্যকান্ত সত্যিই রীতিমতো অবাক ও উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুঁজছিলে শেখরকে? কখন থেকে? যশোররাজের ওপর তির ছোঁড়বার পর? ওর কীর্তি তাহলে তোমরা জান?'

'তা না জানলে আর এত করে খুঁজি!' সুখাসর্দারের মুখে ক্ষীণ একটু দুর্বোধ হাসির আভাস এবার যেন দেখা গেল। গলাটা কিন্তু আগের মতোই গম্ভীর, 'এ কীর্তিমানকে ঘোড়ায় চড়িয়ে তোমার কাছে পাঠাবার পর তুমি তো এই মেলাতেই প্রথম দেখলে। এর মাঝেকার আর কোনো কীর্তির খবর তো জান না।'

'তুমি জান?' একটু সন্দিগ্ধ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন সূর্যকান্ত।

'তা একটু জানি বই কী।' বলে সুখাসর্দার হঠাৎ হাতে একবার তালি বাজালেন।

তালি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক অনুচর এসে হাজির।

সুখাসর্দার সংক্ষেপে একবার শুধু বললেন, 'কোমরবন্ধ।'

রডা এতক্ষণ সুখাসর্দারের শিবিরের এ নাটকীয় দৃশ্যের নীরব দর্শক হয়েই ছিলেন।

pathagar.net

সুখাসর্দারের হুকুম নিয়ে অনুচর ফিরে যাবার পর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না, 'ব্যাপারটা কী সর্দার? সব যেন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। হঠাৎ এখন কোমরবন্ধের কী দরকার পড়ল?'

'দেখো না কী দরকার।' বলে একটু রহস্যজনকভাবে হাসলেন সুখাসর্দার।

অনুচর তখন একটি ছোটো পুঁটলি, আর একটা চামড়ার কোমরবন্ধ নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার হাত থেকে কোমরবন্ধটা নিয়ে সুখাসর্দার শেখরের দিকেই ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি! জিনিসটা চেনা মনে হচ্ছে?'

অনুচর ফিরে আসবার পর তার হাতের কোমরবন্ধটা দেখে শেখর এর আগেই মনে মনে চমকে উঠেছিল। মুখে সে-বিস্ময়ের কোনো আভাস ফুটতে না দেবার চেষ্টা করে সে এখন চুপ করেই রইল।

'এ কোমরবন্ধ তাহলে শেখরের?' সূর্যকান্ত এবার উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথায় পেলে?'

'কোথায় পেলাম, তুমিই বলবে নাকি শেখর?' সুখাসর্দার একটু হেসে শেখরের দিকে চাইলেন।

শেখর এবার আর চুপ করে রইল না। দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ তীব্র গলায় বলল, 'হাতের মুঠোয় যখন পেয়েছেন তখন এসব তামাশার কী দরকার? যা করতে চান তাড়াতাড়ি করে ফেলুন।'

'ঠিকই বলেছ।' শেখরের স্পর্ধায় জ্বলে ওঠার বদলে কেমন একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সুখাসর্দার বললেন, 'যা করবার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই উচিত।'

যেন তা সারতেই এবার সূর্যকান্তের দিকে ফিরে একটু বেশিরকম গম্ভীর মুখে বললেন সুখাসর্দার, 'শোনো তাহলে সূর্যকান্ত, বিবরণটা। সংক্ষেপেই সারছি। এই কোমরবন্ধটি পাওয়া গেছে ধুমঘাটের বাইরে এক চাষি-গাঁয়ের মাঠে। সেখানে ঘেসুড়েদের কাটা ঘাসের গাদা আর ভাগ করা সব বোঝার কাছে এটি রাখা ছিল। শুধু কোমরবন্ধটি নয়—কাছাকাছি একটা ঝোপে এগুলিও পাওয়া গেছে।'

অনুচরের হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে সুখাসর্দার খুলে দেখালেন।

খোলা পুঁটলির দিকে চেয়ে কঠিন ভ্রূকুটি ফুটে উঠল সূর্যকান্তের মুখে। কঠিন স্বরে বললেন, 'এ পোশাক তা শেখরের।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন সুখাসর্দার, 'পোশাক-আশাক লুকিয়ে চাষিদের ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে ওইখান থেকেই আমাদের শেখর-বাহাদুর ঘেসুড়ে সেজে ধুমঘাটে ঢুকেছিলেন।'

'কিন্তু পোশাক-আশাক লুকিয়েও কোমরবন্ধটা কাটা ঘাসের মাঠে অমন খোলা জায়গায় ফেলে এসেছিল কেন?' এবার প্রশ্নটা রডার।

'সেটা বোধ হয় শেখর বাহাদুরের মহত্ত্ব।' এবার মুখটেপা হাসিটা বিশেষ লুকোবার চেষ্টা না করেই বললেন সুখাসর্দার—'গরিব ঘেসুড়েদের ঘাসের বোঝা চুরি করার বদলে তার দামটা ওই কোমরবন্ধ দিয়ে শোধ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওইটেই যে ওর হদিস বাতলে দেবে এইটেই শুধু ভাবতে পারেনি। সূর্যকান্তের দেওয়া ওঁর ছেড়ে-আসা ঘোড়াটা অবশ্য আমরা কাছাকাছি পেয়েছি।'

'ঘোড়া, পোশাক, কোমরবন্ধ সবই যখন পেয়েছ,' সূর্যকান্ত একটু ক্ষুব্ধস্বরেই বললেন, 'তখন শেখরের ওপর তোমাদের কড়া নজর তো বরাবরই ছিল বোঝা যাচ্ছে। তবু এতবড়ো একটা সর্বনাশ ঠেকাবার ব্যবস্থা করনি?'

pathagar.net

'তোমার শেখরকে আগেই কেন ধরিনি, এই কথা বলছ তো?' এবার সুখাসর্দারের মুখের হাসিটা স্পষ্টই বেশ একটু বাঁকা দেখায়, 'ওকে ধরে রাখতে পারলে এ সর্বনাশের সম্ভাবনাই থাকত না, এই তো বলতে চাও? অমন একটা বিচার করে ফেলবার আগে আমার সব কথাগুলো একটু মন দিয়ে শুনে নাও তাহলে।'

একটু থেমে ধীরে ধীরে যেন প্রতি কথাটিতে দাগ দিয়ে সুখাসর্দার বলে গেলেন, 'নিজে জামিন হয়ে শেখরকে তুমি ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু আমি তবু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকিনি সূর্যকান্ত। তোমরা আমার মহল ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই বিশ্বাসী তিনজন সওয়ার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আগে থেকেই মাঝপথে শেখরের জন্যে ওত পেতে থাকবার জন্যে। তাদের একজনের ওপর ভার ছিল শেখরের কাছ থেকে তোমার দেওয়া চিঠি কেড়ে নিয়ে আড়াইকাকি পৌঁছে দেবার, আর বাকি দুজন শেখরকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এই ছিল ব্যবস্থা। আড়াইকাকিতে চিঠি যার নিয়ে যাবার সে ঠিকই চিঠি নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাকি দুজন শেখরকে ধরে আনতে পারেনি।'

'তার মানে শেখর তাদের হাত থেকে পালায়?' অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন সূর্যকান্ত।

'হ্যাঁ,'—গম্ভীর হয়ে বললেন সুখাসর্দার, 'আমার সওয়ার সেপাইদের ফাঁকি দিয়ে পালাবার পর শেখর কোথায় কী করেছে কিছু জানা যায়নি। অনেক পরে তার প্রথম পাত্তা মেলে এক চাষি গাঁয়ের কাছাকাছি তোমার ঘোড়াটা দেখতে পাওয়ায়। সে তল্লাট আতিপাতি করে খুঁজে তার কোমরবন্ধ আর লুকোনো পোশাক খুঁজে বার করতে তারপর দেরি হয়নি। চাষিদের লোপাট একটা ঘাসের বোঝার হদিস থেকে সারা ধুমঘাটের মেলায় এক ঘেসুড়ে ছেলের তক্কে থাকবার হুকুম দেওয়া হয়। ঘেসুড়ে সাজা শেখরের খোঁজ পাওয়া তারপর শক্ত হয়নি। তার ওপর সারাক্ষণ গোপনে নজর রাখবার ব্যবস্থাও হয়েছে। নজর যে রেখেছিল যথাসময়ে শেখরকে আমার কাছে হাজির করতে তার ভুল হত না। কিন্তু যশোররাজের রথে তির বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে কোশা ভাসানোর ঘাটে বারুদ ফাটার কেলেঙ্কারির দরুন বাধ্য হয়ে তাকে অন্য ধান্দায় আগে ছুটতে হয়। কাজ সেরে ফেরবার পর তার খবরে সারা ধুমঘাটে শেখরকে খোঁজবার জন্যে আমরা লোক লাগিয়েছি। তুমি না আনলে তারা ওকে খুঁজে আনতই।'

সুখাসর্দারের এ দীর্ঘ কৈফিয়তে শুধু সূর্যকান্ত নয় রডাকেও সন্তুষ্ট মনে হল না।

'মাপ করো সর্দার।' একটু বাঁকা সুরেই বললেন রডা, 'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম। তোমার শান দেওয়া ক্ষুরের কাছে আমি ভোঁতা একটা কাটারির বেশি কিছু নয়। খোঁজ পাবার পরও ঘাটের মেলায় এ ছোকরাকে কেন গ্রেপ্তার করনি, তাই বোধ হয় বুঝতে পারছি না।'

রডার মোটা বিদ্রূপটা গায়ে না মেখে সুখাসর্দার একটু হেসে বুঝিয়ে দিলেন, 'ওকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কেন ধরিনি জান? ধরিনি, ওর মারফত পালের আসল গোদাদের সন্ধান কিছু মেলে কি না তাই দেখবার জন্যে। তা ছাড়া ওর সম্বলের মধ্যেও শুধু মাথার ওই ঘাসের বোঝাটা। সেটা সর্বনাশা বলে ভাবিনি।'

'কিন্তু সর্বনাশা ব্যাপারই তো শেষ পর্যন্ত ঘটল।' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন সূর্যকান্ত, 'আর সারাক্ষণ নজরে রেখেও তোমার চর তির ছোঁড়াটা কেন ঠেকাতে পারল না?'

'হ্যাঁ, সে প্রশ্ন তুমি করতে পার সূর্যকান্ত।' সুখাসর্দারের চোখ দুটো নিমেষের জন্যে যেন জ্বলে উঠল, 'আমার সব হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও দুশমনের তির যে আজ ছুটেছে, তা-ই আমার সব চেয়ে বড়ো লজ্জা। আর ঘেসুড়ে সাজা এই ছোকরাকে প্রথমেই যে ধরার হুকুম দিইনি সেটা আমার ভাগ্য।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সূর্যকান্ত।

pathagar.net

অবাক হবার তাঁর তখনও অনেক অবশ্য বাকি।

তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসলেও কথার জবাব না দিয়ে সুখাসর্দার তখন তালি দিয়ে এক অনুচরকে ডাকলেন।

অনুচর এসে দাঁড়াবার পর সুখাসর্দার সংক্ষেপে শুধু জানালেন, 'চৌধুরিমশাই।'

চৌধুরিমশাই মানে যে শেখরের পিতামহ তা বুঝতে সূর্যকান্তের দেরি হল না। কিন্তু তাঁকে হঠাৎ এখানে ডাকবার প্রয়োজনটা বুঝতে পারলেন না।

শেখরের দাদু চৌধুরিমশাইকে বোধ হয় আগে থাকতেই আনিয়ে শিবিরের আর কোথাও বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁর উপস্থিত হতে দেরি হল না।

অনুচরের সঙ্গে এসে ঢোকবার পর সুখাসর্দার তাঁকে রীতিমতো অভ্যর্থনাই করলেন।

'আসুন চৌধুরিমশাই। বসতে আজ্ঞা হয়।'

শিবিরের এ অংশ একটিমাত্রই বসবার আসন। চৌধুরিমশাই তাতে বসলেন না। কামরার মধ্যে উপস্থিত আর সকলের সঙ্গে একবার শেখরের ওপর যেন নির্বিকারভাবে চোখ বুলিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, 'বসবার দরকার নেই। কেন ডেকেছেন বলুন। এই বুড়ো হাড়েও আপনার সব লাঞ্ছনা দাঁড়িয়েই সইতে পারব।'

'লাঞ্ছনা দিতে নয় চৌধুরিমশাই,' সুখাসর্দার তাঁর পক্ষে প্রায় অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনাকে ডেকেছি মুক্তি দিতে।'

'মুক্তি দিতে?'

স্তম্ভিত সূর্যকান্ত আর চৌধুরিমশাইয়ের বিমূঢ় প্রশ্নটা রডার গলাতেই শোনা গেল।

চৌধুরিমশাই তারপর ক্লান্ত তিক্ত স্বরে বললেন, 'ডাকিয়ে আনিয়ে এ বিদ্রূপটুকু না করলেই কি চলত না?'

'বিদ্রূপ করছি না চৌধুরিমশাই।' সুখাসর্দার আগের মতোই শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'সত্যিই আপনি মুক্ত। আপনার মাচোয়া নৌকো পালঘাটে বাঁধা আছে। এই মুহূর্তে আপনার নাতিকে নিয়ে তাতে আপনি মুলাজোড়ে ফিরে যেতে পারেন। যশোররাজের পাঞ্জা আপনাকে দিচ্ছি। কেউ কোথাও আপনাকে আটকাবে না।'

'কী, বলছ কী তুমি সর্দার!' সূর্যকান্তের আগে রডাই চিৎকার করে উঠলেন, 'ঠাট্টা যদি না হয় তাহলে কী বুঝব, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ছেড়ে দেবে বলছ এই বিচ্ছু শয়তানকে?'

'আজগুবি মনে হচ্ছে কথাটা?' সুখাসর্দার একটু হেসে বললেন, 'মানেটা এখনও বুঝতে পারছ না?'

'না, পারছি না।' ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন এবার সূর্যকান্ত, 'মাথা খারাপ না হলে এমন কথা তুমি বলতে পার? যাকে তুমি এত খাতির করে ছেড়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত, নিজের চোখে তাকে আমি এক তিরন্দাজের সঙ্গে ধনুক নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে দেখেছি। তারই ধনুক কেড়ে নিয়ে যশোর-রাজকে লক্ষ করে ও তির ছুঁড়েছে।'

'তাই নাকি!' গম্ভীর গলাতেই বললেন সুখাসর্দার, 'তা তোমার সে তিরন্দাজ গেল কোথায়? তাকে একবার পেলে ভালো হত না?'

'তা হত নিশ্চয়।' সূর্যকান্ত অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু ঘাটে বাবুদের কোশা ফাটবার গোলমালের মধ্যে তাকে আর খুঁজে পাইনি।'

'তুমি না পেলেও আমি পেয়েছি।' বলে সুখাসর্দার যা করলেন তাতে তাঁর মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহটা বাড়বারই কথা।

আগের মতোই তালি দিয়ে এক অনুচরকে ডেকে তিনি হুকুম দিলেন, 'বিবিসাহেব।'

pathagar.net

হুকুম মতো কজন অনুচরকে সত্যই এক বোরখা-পরা বিবিসাহেবকে তলোয়ারের ডগার আগে হাজির করতে দেখে রডা আর সূর্যকান্ত দুজনেই একেবারে হতভম্ব।

বেশিক্ষণ ধোঁকার মধ্যে অবশ্য তাঁদের থাকতে হল না।

তাঁদের চমকে দিয়ে সুখাসর্দার হঠাৎ বিবিসাহেবের বোরখায় টান দিয়ে বললেন, 'বিবিসাহেবের সুরতটা একবার তাহলে দেখা যাক।'

বোরখার ঢাকনা খুলে গিয়ে যে মূর্তিটিকে এবার দেখা গেল তাকে দেখে আর সবাই যখন বিস্ময়ে নির্বাক, তখন উত্তেজিত শেখরের গলা থেকে আপনা থেকেই চিৎকারটা বেরিয়ে এল, 'এই! এই তো সদানন্দ।'

'হ্যাঁ, এই সদানন্দ।' সুখাসর্দার তীব্র জ্বালা-মেশানো গলায় সায় দিয়ে বলে গেলেন, 'দক্ষিণ মুলুকের সেরা তিরন্দাজ হয়েও উনি খানিক আগে হায়দারগড়ের কিল্লাদারের গাড়িতে তাঁর বোরখা-পরা বিবি সেজে লুকিয়ে ছিলেন। কিল্লাদারের কঠিন অসুখ জেনে তার শৌখিন গাড়ি হাতিয়ে উনি ধুমঘাটের মেলায় এসেছেন। আর তাও একা নয়।'

সুখাসর্দার একটু থামলেন। তার নির্দেশে অনুচরেরা আর এক মূর্তিকেও তখন সেখানে হাজির করেছে।

তার দিকে আঙুল দেখিয়ে শেখরকেই জিজ্ঞাসা করলেন সুখাসর্দার, 'কি? চিনতে পার একে?'

'হ্যাঁ,' ভেতরের উত্তেজনাটা যথাসাধ্য গলায় ফুটতে না দেবার চেষ্টা করে শেখর বললে, 'ওর নাম রূপরাম। নৌকো বানাবার বড়ো কারিগর।'

'ঠিকই বলেছ।' সুখাসর্দার মাথা হেলালেন, 'দুজনেই ওঁরা গুণী। একজন তিরধনুকে আর একজন নৌকোর কারিগরিতে। শুধু তাই নয়, রাঘব সিদ্ধান্ত আর কচু রায়ের মতো মহাপুরুষেরা এঁদের মুরুব্বি। মোগলের টাকা খেয়ে এমন গুণীরা নলডাঙা কুশদহ চাঁচড়ার হয়ে চুরি-করা কিল্লাদারের গাড়িতে বেগম সেজে শুধু মেলা দেখতে এসেছেন বলে মনে হয় কি?'

'তার মানে, তুমি বলছ...'

সূর্যকান্তকে তাঁর কথাটা শেষ করতে দিলেন না সুখসর্দার। গভীর একটা যেন যন্ত্রণা নিয়ে বললেন, 'যশোরের বিরুদ্ধে এদের সব চক্রান্ত সম্বন্ধে সারাক্ষণ সজাগ থেকেও এই শয়তানি চালটা আমি গোড়াতেই কোপ দিয়ে শেষ করে দিতে পারিনি। হায়দারগড়ের কিল্লাদার অসুখের জন্যে এ মেলায় যে আসতে পারছেন না, তাঁর সে মাপ-চাওয়া চিঠি আমার হাতে পৌঁছেছে অনেক দেরিতে। চিঠি পাবার পরই হুঁশিয়ার যখন হয়েছি তার আগেই শয়তানরা মেলার ভিড়ে গা-ঢাকা দেবার সুযোগ পেয়েছে। সেই সুযোগেই ওই সদানন্দ সুন্দরবেগের দলের তিরন্দাজ সেজে যশোররাজকে লক্ষ করে গোপনে তির ছুঁড়েছে। আর গাঙের ধারে কোশা ঠেলবার মজুর সেজে ওই রূপরাম জ্বলন্ত টিকে গুঁজে দিয়ে বারুদ-ঠাসা কোশা ফাটিয়ে অগ্নিকাণ্ড বাধাতে পেরেছে।'

একটু থামলেন সুখাসর্দার। তারপর আরও গাঢ় গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, 'তোমার ওই শেখর একেবারে শেষ মুহূর্তে সদানন্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার লক্ষ্য যদি না নড়িয়ে দিত তাহলে কী যে হত তা নিশ্চয় বোঝাবার দরকার নেই। শেখরের ওপর নজর রাখতে গিয়ে আমার চর আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই চাক্ষুষ দেখেছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে গিয়ে সত্য ঘটনাটা জানাবার সময় সে পায়নি। সেই মুহূর্তে গাঙের ঘাটে হঠাৎ বিস্ফোরণের দরুন তুমুল গণ্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। তারই সুযোগ নিয়ে আসল দুশমন তিরন্দাজকে পালাতে দেখে আগে তারই পিছু নিতে হয়েছে আমার চরকে। তিরন্দাজকে সে কিল্লাদারের বাহারে গাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে। তারপর প্রথমে সদানন্দ আর তার কিছু পরে রূপরামকে সে গাড়িতে ঢুকতে

pathagar.net

দেখে। গাড়িটা পাহারায় রাখবার ব্যবস্থা করে সে আমায় এসে খবর দেয়। তার কাছে খবর পেয়েই এ দুই শয়তানকে বন্দি করবার হুকুম দিয়ে শেখরকে খোঁজবার জন্যে আমি লোক লাগাই। তুমি সঙ্গে করে না নিয়ে এলে তারা কেউ এতক্ষণে ওর খোঁজ নিশ্চয়ই পেত।'

সুখাসর্দার থামলেন।

কয়েক মুহূর্ত কারোর মুখে আর কোনো কথা নেই।

এই নীরবতার মধ্যে চৌধুরিমশাইয়ের গলাই প্রথম শোনা গেল, 'শেখর যা করেছে তার জন্যেই আমাদের স্বাধীনভাবে মুলাজোড়ে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে তাহলে?'

'তা ছাড়া কী, চৌধুরিমশাই!' একটু হেসে বললেন সুখাসর্দার, 'আপনি যশোরের শত্রু। মুলাজোড়ে ফিরে গিয়ে মোগলদের সঙ্গেই হাত মেলাবেন জানি। তবু আপনার নাতির কাছে সমস্ত দেশ আজ একান্তভাবে ঋণী বলে একটু কৃতজ্ঞতা যশোর না জানিয়ে পারছে না।'

'কিন্তু এ কৃতজ্ঞতার দান যদি না নিতে চাই?' কঠিন মুখে বললেন চৌধুরিমশাই, 'যদি বলি আমাকে বন্দি করেই রাখুন আপনাদের কারাগারে? মুক্তি আমি চাই না।'

'তাহলে সে কথা শুনতে পারব না চৌধুরিমশাই!' সুখাসর্দারের গলাটা শান্তই শোনাল, 'আপনাদের যশোর ছেড়ে যেতেই হবে। আপনার মাচোয়া তৈরি। যুদ্ধের অবস্থা যেকোনো মুহূর্তে সঙ্গিন হয়ে উঠতে পারে। ভালোয় ভালোয় পৌঁছোবার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হওয়াই উচিত।'

'তার মানে না চাইলেও জোর করে আমাদের পাঠিয়ে দেবেন?' জ্বলন্ত স্বরে বললেন চৌধুরিমশাই।

'ঠিকই বুঝেছেন।' সুখাসর্দার আবার হাসলেন, 'এখানে বন্দি করে আর যখন রাখতে পারব না তখন আপনাদের মুলাজোড়ে ফেরত পাঠানো ছাড়া উপায় কী? বাইরে আপনাদের জন্যে শিবিকা প্রস্তুত। আমার অনুচর আপনাদের নিয়ে পালঘাটের মাচোয়ায় তুলে দিয়ে আসবে।'

আবার কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা।

সূর্যকান্তের গলার স্বরেই তা ভাঙল।

'তুমিও তাহলে যাচ্ছ শেখর?' সূর্যকান্তের গলার ব্যাকুলতাটা খুব অস্পষ্ট নয়।

কোনো উত্তর কিন্তু শেখরের কাছে পাওয়া গেল না। নীরবে একবার সূর্যকান্তের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে চৌধুরিমশাইয়ের পিছুপিছুই সে শিবির থেকে সুখাসর্দারের অনুচরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রডা বিদায় নিতে গেলেন তারপর।

রডাকে বিদায় দিয়ে, সদানন্দ আর রূপরামকে বন্দিশালায় পাঠাবার ব্যবস্থা করার পর সুখাসর্দার যখন সূর্যকান্তের দিকে ফিরলেন তখনও তিনি যেন পাথরের মূর্তির মতো একভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন সেই শেখর চলে যাওয়ার পর থেকেই।

'একটু দুঃখ পেলে, না সূর্যকান্ত?' সহানুভূতির স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন সুখাসর্দার।

'দুঃখ! কই না তো!' সূর্যকান্তের যেন চমক ভাঙল!

'তাহলে অমন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ভাবছিলে কী?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুখাসর্দার।

'ভাবছিলাম,' একটু হেসে বললেন সূর্যকান্ত, 'প্রতাপ সিং দত্তকে এখানেই একবার ডাকব কি না।'

'প্রতাপ সিং দত্ত, মানে আমাদের সওয়ার সেনাপতিকে?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুখাসর্দার, 'তাকে হঠাৎ এখুনি কী দরকার পড়ল?'

pathagar.net

'দরকার পড়ল,' সূর্যকান্ত আবার হেসে বললেন, 'আমার সাদা ঘোড়াটা সমেত একজন সওয়ার সেনাকে তার দলে ভরতি করাতে চাই বলে।'

সুখাসর্দার বেশিক্ষণ ধোঁকার মধ্যে থাকার মানুষ নন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একটু অবিশ্বাসের সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি শেখরের কথা ভাবছ? তাকে প্রতাপ সিং দত্তের সওয়ার-বাহিনীতে ভরতি করাতে চাও? আবার তোমার সাদা ঘোড়াটা দিয়ে?'

'হ্যাঁ,' এবার গম্ভীর স্বরেই বললেন সূর্যকান্ত, 'দেবার মতো ওর চেয়ে দামি আর আদরের জিনিস আর কিছু আমার নেই। সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে ও-ঘোড়া প্রাপ্যও তার।'

'তুমি যে জেগে স্বপ্ন দেখছ!' এবার হেসে ফেললেন সুখাসর্দার, 'সবচেয়ে পেয়ারের সাদা ঘোড়া দিয়ে সওয়ার-বাহিনীতে যাকে ভরতি করতে চাও, তাকে পাচ্ছ কোথায়? চৌধুরিমশাইয়ের সঙ্গে মুলাজোড়ে না গিয়ে, সে তাদের চিরশত্রু যশোরের হয়ে লড়তে ফিরে আসবে ভাবছ?'

'হ্যাঁ, ফিরে সে আসবেই।' দৃঢ়স্বরে বললেন সূর্যকান্ত।

'এতখানি তোমার বিশ্বাস!' রীতিমতো অবাকই হলেন সুখাসর্দার, 'এ বিশ্বাস হচ্ছে কী থেকে? শুধু শত্রুর তিরন্দাজকে ঝোঁকের মাথায় একবার বাধা দিয়েছে বলে?'

'না।' শান্ত দৃঢ়স্বরে বললেন সূর্যকান্ত, 'নেহাত ঝোঁকের মাথায় সে এ কাজ করেনি। করেছে যে সারসত্য প্রাণের মাঝে বুঝে, তাই তাকে ফিরিয়ে আনবে।'

'কী সে সারসত্য?' জিজ্ঞাসা করলেন সুখাসর্দার।

'সে সত্য হল এই যে, 'গাঢ়স্বরে বললেন সূর্যকান্ত, 'রক্তের চেয়ে দুধের ঋণ বড়ো। মায়ের চেয়ে বড়ো যে মা—সেই দেশের দুধের ঋণের কাছে আর সব তুচ্ছ।'

একটু চুপ করে রইলেন সুখাসর্দার। তারপর একটু যেন বিষণ্ণ স্বরেই বললেন, 'তোমার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার আশাও মিলিয়ে দিতে চাই সূর্যকান্ত। কিন্তু মনে হচ্ছে তা পূর্ণ হবার জন্যে বড়ো বেশি অপেক্ষা করতে হবে।'

তা কিন্তু হয় না।

অন্য দরকারি কয়েকটা কথা সেরে সুখাসর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখেই সূর্যকান্তকে থমকে দাঁড়াতে হয়।

শেখর তখন শিবিরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে।

সূর্যকান্ত ও সুখাসর্দার পরস্পরের মুখের দিকে তাকান; কিছুক্ষণ কারোর মুখেই কোনো কথা নেই।

'তুমি তাহলে যাওনি শেখর।' আবহাওয়াটা সহজ করবার জন্যে নেহাত অনাবশ্যক মন্তব্য করেন সূর্যকান্ত।

শেখর নীরব।

'চৌধুরিমশাই একটু ব্যথা পেলেন বোধ হয়।' বলেন সুখাসর্দার, 'তাঁকে জানিয়ে এসেছ তো?'

'জানাতে হয়নি।' এবার উজ্জ্বল মুখ তুলে তাঁদের দুজনের দিকে তাকিয়ে শেখর গর্বভরে বলে, 'ফিরে এসেছি তাঁরই আদেশে।'

pathagar.net

খুনেপাহাড়

এক

পা-টা একটু হড়কাতেই পাশের গাছের একটা ডাল ধরে ফেলেছিলাম।

কিন্তু সেটা অমন পলকা ভাবতে পারিনি। ধরার পর টান পড়া মাত্র মট করে ভেঙে গেল।

প্রায় খাড়া ঢাল দিয়ে তখন সোজা নীচের দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করেছি। দিশাহারা হয়ে হাতের সামনে যা পেলাম তাই ধরলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা একটা মোটা জংলা লতা।

লতা ছিঁড়ল না। কিন্তু রুখতেও পারল না আমার পতন। আমারই দেহের ভারে আলগা দড়ির মতো পাহাড়ের গা থেকে খুলে আসতে লাগল।

তখন আর চোখ মেলে নীচে চেয়ে দেখবার দরকার নেই। পাহাড়ের এইদিকের খাড়াই কোথায় গিয়ে যে শেষ হয়েছে তা আমার ভালো করেই জানা। ওপরের পিক্ ভিউ থেকে সাবধানে ঝুঁকে বহুবার নীচের প্রায় অতল খাদের দৃশ্য দেখেছি। দেখতে গিয়ে গা-টা শিউরে উঠেছে প্রতিবারই! এটা লুকোবার জন্যে ঠাট্টার ছলে বলেছি,—হ্যাঁ ডুবঝাঁপ দেবার একটা জুতসই জায়গা বটে, সোজা একেবারে সাড়ে তিন হাজার ফুট!

সেই সোজা সাড়ে তিন হাজার ফুট ডুবঝাঁপ আচমকা একদিন আমাকেই দিতে হবে তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম!

পারলে ওই পিক্ ভিউ-এর ধারেকাছে নিশ্চয় যেতাম না, অন্তত এমন ঝড়বাদলের দিনে কখনো নয়।

মনে মনে ইষ্টনাম জপ না করলেও মনশ্চক্ষে নিজের পরিণামটা তখন আমি ভালো করে দেখতে পেয়েছি। মুঠোয় ধরা জংলা লতাটা খাড়াইয়ের গা থেকে চড়চড় করে খুলে আসছে। সেটা যে কোথাও আটকাবে এমন কোনো আশাই আর দেখছি না।

আর যদি কোথাও আটকেও যায়, তাতেই বা কী লাভ হবে?

পাহাড়ের গা বেয়ে আমার গড়িয়ে পড়ার গতিবেগ ক্রমশই বাড়ছে। প্রাণপণে ধরে থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাতের মুঠোও ক্রমশ অবশ আর শিথিল হয়ে আসছে উদ্বেগে আতঙ্কে। জংলা লতার পাহাড়ের গা থেকে এই খুলে পড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে দুর্বল অসাড় আমার হাতের মুঠি সে প্রচণ্ড ঝাঁকানি কোনো রকমেই সামলাতে পারবে না।

যেরকমভাবে লিখলাম পিক্ ভিউ থেকে তিন হাজার ফুট নীচে অনিবার্য গতিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এরকম সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে ভাবনা চিন্তাগুলো অবশ্য আসেনি। কথাগুলো ওই পর্যন্ত লিখতে যতক্ষণ লেগেছে তার অনেক আগেই হাজার দেড়েক ফুট নেমে যাওয়ার মধ্যে মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে গিয়ে চরম আতঙ্কের একটা নিরুপায় হতাশা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শেষ যা পরিণাম তার আর দেরি নেই, শুধু এইটুকু হুঁশই তখন আছে।

এ বিবরণটুকু যখন দিতে পারছি, তখন পিক্ ভিউ থেকে সেদিনকার পতন চরম অপঘাতে যে শেষ হয়নি এটুকু না বললেও বোধ হয় চলবে।

পরিণামটা কী হয়েছিল তা জানাবার আগে কেমন করে এমন একটা অপ্রত্যাশিত নিদারুণ দুর্ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়লাম, সেইটেই বোধ হয় বোঝানো দরকার। তা বোঝাতে গেলে এ কাহিনির আদি পর্বেই পিছিয়ে যেতে হয়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে।

pathagar.net

প্রবাদটা যে কতখানি সত্য তা এ কয়দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি।

কত আশা নিয়েই না এ জায়গাটায় এসেছিলাম। কলকাতায় কিছুদিন ধরে সব কিছু যেন জোলো লাগছিল। জোলো লাগবার আর অপরাধ কী? কয়েক বছর বাদে এইবারই কলকাতার সত্যিকার কড়া গোছের শীত পড়েছিল। দশ সেন্টিগ্রেড থেকে নয় আট এমনকী সাতও ছুঁই ছুঁই করছে ব্যারোমিটারের পারা। আর দু-চারদিন এমন চললে সাত সেন্টিগ্রেডের রেকর্ডও যে ভাঙবে না তা কে বলতে পারে!

এমন মজাদার শীতের মরশুম অথচ এইবারই কলকাতায় একটা পয়লা নম্বর ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা নেই! এম. সি. সি. আসবে আসবে করে শেষ পর্যন্ত ফরেন এক্সচেঞ্জের সমস্যায় আসতে পারছে না, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কথাবার্তা খানিক দূর এগিয়ে কেন যে থমকে আছে, তা কর্তারাই জানেন! এদিকে আমাদের বিস্বাদ দিনগুলো কাটাতে টাকনা দেবার মতোও কিছু জুটছে না।

দেশে সমস্যার নাকি অন্ত নেই। কিন্তু রাস্তায় ঘাটে বড়োদিনের উৎসবের লোভে উপচে-পড়া ভিড়ে চলাফেরা দায়। এই অবস্থায় অত্যন্ত মনমরা হয়ে যখন দিন কাটছে, তখন মেঘ না চাইতে জলের মতো আশাতীতভাবে একটা সুযোগ মিলে গেছে।

সেদিন আর কিছু না পেয়ে দুটো অখদ্দে লোক্যাল টিমের এলেবেলে ম্যাচ দেখে বিরক্ত হয়ে মামাবাবুর বাড়িতে গেছলাম, পৃথিবীর অদ্বিতীয় পাচক মহাভারতখ্যাত বিরাটরাজার রন্ধনশালার 'ইন-চার্জ' স্বয়ং ভীমসেনেরই মন্ত্রশিষ্য বলে যাকে মনে হয়, সেই মংপোর হাতের তৈরি কোনো অমৃতভোজ্য চা সহযোগে খেয়ে মনটাকে একটু চাঙ্গা করব বলে।

আমার মামাবাবু আর তাঁর পেয়ারের অনুচর মংপোর কথা অনেকেই বোধ হয় অল্পবিস্তর জানেন। প্রায় অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী মংপোকে নিয়ে মামাবাবুর বিচিত্র বিস্ময়কর সব অভিযানের কয়েকটিতে আমার নিজেরও অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছে। 'কুহকের দেশ', 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস', 'মামাবাবু ফিরেছেন' ইত্যাদি লেখায় সেগুলির সাধ্যমতো বিবরণ দেবার চেষ্টা আমি করেছি।

মামাবাবু শেষ কাজের জায়গা ছিল বর্মার উত্তরে মিচিনা শহর। সেখান থেকে কাজে ইস্তফা দেবার পর বেশ কিছুদিন হল কলকাতার অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন পাড়ায় তাঁর নিজের খেয়ালি চরিত্রের মতো সৃষ্টিছাড়া একটি বাড়ি বানিয়ে তিনি সেখানে আছেন।

নামে বাড়ি হলেও আসলে সেটি মিউজিয়ম, লাইব্রেরি আর ল্যাবরেটরির একটি সন্নিপাত। একতলা, দোতলায় বই-কাগজ, নুড়িপাথর, কীটপতঙ্গ, বিরল জন্তুজানোয়ার ইত্যাদি জাদুঘরের সংগ্রহে আর গবেষণাগারের সাজসরঞ্জামে মামাবাবুর নিজেরই থাকবার জায়গা যেন জোটে না। তিনি নিজে দোতালার ল্যাবরেটরির পাশে একটি ছোটো কামরায় রাত্রে শোন আর মংপো থাকে ল্যাবরেটরির অন্য পাশের একটি কুঠরিতে।

অন্য কিছু করি না করি এ বাড়িতে প্রায় নিত্য হাজিরা না দিলে যেন ঘুমই আসে না রাত্রে। আকর্ষণটা মামাবাবুর সঙ্গসুখের শুধু নয়, মংপোর পাচক হিসাবে নানা কেরামতিও যে বটে তা অস্বীকার করতে পারব না! মামাবাবু তো পেটুক দূরে থাক ভোজন বিলাসী যাকে বলে তাও নন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যাঁর অত টনটনে তাঁর রসনা প্রায় যেন অসাড়। রান্নার তারতম্য বোঝবার কোনো ধার তিনি ধারেন না। শিককাবাব আর সামিকাবাবের তফাত নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। খিদের সময়ে নেহাত বিস্বাদ কিছু না হলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

মংপোর মতো রান্নার কালোয়াতের সেইটেই একমাত্র দুঃখ। সে দুঃখ কিছুটা সে আমার জন্যে এটা সেটা তৈরি করে ভোলবার চেষ্টা করে।

মামাবাবুর বাড়িতে গেলে নতুন কিছু চাখার ব্যাপারে সাধারণত হতাশ হতে হয় না। সেদিনও তা হয়নি। চায়ের সঙ্গে সংগত রাখতে অনবদ্য 'ওয়েলস্ রেয়ারবিট্' খাইয়ে প্রাণ তর্ করে দিয়েছে মংপো।

pathagar.net

বদমেজাজ কেটে গিয়ে দিনটা সার্থক মনে হয়েছে 'রেয়ারবিট্'-এর স্বাদের গুণেই নয় আর একটি কারণে।

সে কারণ হল শ্রীলোকনাথ মহান্তির সঙ্গে দেখা, আলাপ আর তাঁর নিমন্ত্রণ।

শ্রী মহান্তি বয়সে মামাবাবুর চেয়ে অনেক ছোটো। মামাবাবু যখন মিচিনা থেকে তখনকার জিওলজিক্যাল সারভের কাজ ছেড়ে আসেন, তার মাত্র কিছুকাল আগে মহান্তি সেই বিভাগেই কাজ পেয়ে মিচিনায় গেছলেন। মাত্র বছরখানেক একসঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু তাইতেই বয়সের তফাত সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে একটা সত্যিকার প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

মামাবাবু মিচিনা ছেড়ে আসার পর গঙ্গা আর মহানদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বর্মা আলাদা হয়েছে, দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। শ্রী মহান্তিও অনেক আগে বর্মা ও সেই সঙ্গে সরকারি কাজ ছেড়ে দেশে এসে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ শুরু করেছেন। এদেশের খনিজ সম্পদের সন্ধান ও তার নিষ্কাশন নিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েই তাঁর কাজ।

বর্মা থেকে ফেরার পর সাক্ষাৎভাবে সব সময়ে না পারলেও মহান্তি চিঠিপত্রে মামাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি যে খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অজানা একটি অঞ্চলে কাজ করছেন, তা আগেই মামাবাবুর কাছ থেকে তাঁর চিঠিপত্র থেকে জেনেছিলাম। সেসব চিঠিতে তিনি বার কয়েক তাঁর নতুন কাজের জায়গায় মামাবাবুকে একবার ঘুরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

এবার সে নিমন্ত্রণ জানাতে তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহান্তির কাছে তাঁর নতুন কাজের জায়গার বিবরণ শুনে আমি তো তখনই নেচে উঠেছি যাবার জন্যে। মামাবাবুকেও দুবার সাধতে হয়নি।

পরেরদিন বিকেলেই চেষ্টাচরিত্র করে বার্থ জোগাড় করে মহান্তির সঙ্গে আমরা মামা-ভাগনে কল্পনার অরণ্য-স্বর্গে কটা স্বপ্নের দিন কাটাবার লোভে রওনা হয়েছি।

জায়গাটা কোথায় সঠিক জানাবার এখন বাধা আছে। ধরে নেওয়া যাক অঞ্চলটার নাম লোধমা। ঘণ্টা চোদ্দো বড়ো লাইনের ট্রেন যাত্রার পর একটা মিটার গেজের লাইনে টিকি টিকি ঘণ্টা চারেক কাটিয়ে বাঙ্গুরকেলা বা গগনপোষ স্টেশনে নেমে মহান্তির প্রসপেক্টিং কোম্পানি কি বনবিভাগের জিপে চড়ে গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছোটো-বড়ো যেন সব পাহাড়ের ঢেউ, কোথাও ডিঙিয়ে কোথাও ফুঁড়ে সেখানে পৌঁছোতে হয়।

যাওয়ার ধকল আছে যথেষ্ট। কিন্তু গিয়ে একবার পৌঁছোবার পর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, এখানে স্বপ্নের মতো বনবাসের কোনো আশাই অপূর্ণ থাকবে না। কলকাতার সেই শহুরে আড়ষ্ট জীবন কদিনের জন্যে একেবারে ভুলে থাকব। আশ মিটিয়ে খুশিমতো ঘুরে বেড়াব এখানকার পাহাড়-জঙ্গলে। মন চাইলে একটু-আধটু হরিণ, খরগোশ, বনমোরগ, তিতির ইত্যাদি শিকার করব, মাছ ধরব এখানকার অজানা সব পাহাড়ি হ্রদে, সেই সঙ্গে এখানকার সব দূরদূরান্তরে লুকোনো অজানা পার্বত্য উপত্যকায় যুগ যুগ ধরে প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে যারা কাটিয়ে এসেছে সেই সব অধিবাসীদের অদ্ভুত বিচিত্র জীবনযাত্রার রীতিনীতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেব—এই ছিল পরিকল্পনা।

সে কল্পনা ব্যর্থ হবার কোনো কারণও ছিল না। লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের কর্তা হিসাবে যতদূর দৃষ্টি যায় এই আদিম কানন-গিরিরাজ্যের ওপর মহান্তির প্রায় অবাধ অধিকার। এই পাহাড়ে জঙ্গলের দেশে এতদিন সভ্য শিক্ষিত জগতের মানুষের পায়ের ধুলো পড়েনি বললেই হয় ; বহুকাল আগে বৃটিশ আমলে হেলায়ফেলায় ভাসাভাসা একটু জরিপ এ অঞ্চলের হয়েছিল। তারপর কখনো-সখনো এক-আধজন ইংরেজ রাজপুরুষ নেহাত খেয়ালবশে এদিকে শিকার-টিকার করতে এসেছেন। শৌখিন শিকারি হয়ে এলেও সে কালের ইংরেজ রাজপুরুষদের

চোখকান খোলা থাকত। তাদেরই একজন এ অঞ্চলের আদিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা নিজের দেশের কাগজে আর এখানকার সরকারি গেজেটিয়ারে প্রকাশ করেছেন, আর একজন এ অঞ্চলের পাহাড়ি মাটি লোহা-মেশানো বলে আগেকার সরকারি জরিপের অস্পষ্ট বিবরণে সায় দিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদ সন্ধানের উৎসাহ প্রবল হয়েছে। এখানকার পাহাড়ে মাটিতে লোহা যে আছে এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। শুধু তার পরিমাণ কোথায় কত আর তা থেকে ইস্পাত তৈরির মজুরি কীরকম পোষায় তাই নতুন করে সমস্ত অঞ্চল জরিপ করে জানতে শ্রীলোকনাথ মহান্তির কোম্পানি এখানে ঘাঁটি পেতেছে।

মহান্তির লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেট এখানে পুরোপুরি একেশ্বর হয়তো নয়, কিন্তু আর যে দু-চারটে ছোটোখাটো দল অন্য খুচরো ফরমাস নিয়ে আছে তারা কাগজেকলমে না হলেও আসলে লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের তাঁবেদার হয়ে তার ছত্রছায়ায় কাজ করে।

অঞ্চলটার নাম লোধমা বলেছি। তারই একটা ঈষৎ ন্যাড়া গোছের ডুংরির সবচেয়ে সমতল জায়গায় একটা বারোমেসে পাহাড়ি ঝরনার কাছে মহান্তির কোম্পানির ছাউনি। কাঠ আর ক্যাম্বিসে তৈরি হলেও সেসব তাঁবু ঘরে সুবিধার কোনো অভাব নেই বললেই হয়। মামাবাবুর সঙ্গে আমার আর মংপোর জন্যে আলাদা দুটি লাগাও তাঁবুর ব্যবস্থা মহান্তি করে দিয়েছেন। মহান্তির নিজের তাঁবু আমাদের কাছেই। সেটা শুধু তাঁর শোবার ঘর নয়, অফিসও তিনি সেখান থেকে চালান।

প্রথম দিন লোধমার ছাউনিতে পৌঁছোতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছল। সেদিন চারিপাশের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু ঘুরে দেখবার সময় সেদিন আর ছিল না বলে আফশোস হয়েছে।

পরেরদিন ভোর না হতেই সে আফশোস মেটাতে বেরিয়ে পড়েছি পাখি-মারা বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে।

মামাবাবু তখনও যে তাঁর ক্যাম্পখাটে কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন, তা বলাই বাহুল্য। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছাউনির অন্য কাউকেও দেখিনি। শুধু মংপো যে আমার আগে উঠেছে, বেরোবার মুখেই গরম চায়ের কাপ নিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে তার প্রমাণ পেয়েছি।

অজানা জায়গা। কিন্তু পথ চেনাবার জন্যে সঙ্গে কাউকে নেওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয়নি। পথ ভুল করলেও ছাউনির ন্যাড়া পাহাড়টা চিনে আসতে পারব বলেই বিশ্বাস হয়েছে।

সন্ধ্যায় চারিধারের যে দৃশ্য দেখেছিলাম ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় তা আরও মুগ্ধ বিস্মিত করেছে। যে দিকেই চাই শুধু নিবিড় অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড়। ভাবতে ইচ্ছা করছে আদি শৈশবের তরল পৃথিবীর তরঙ্গভঙ্গ যেন কোনো রোমাঞ্চিত শিহরণে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাহাড়ের পর পাহাড় যেন সেই হঠাৎ জমে-যাওয়া সব ঢেউ আর নিবিড় অরণ্য আবরণে সেই রোমাঞ্চের প্রকাশ।

কাঁধে বন্দুক থাকলেও পাখি মারবার চেষ্টা করিনি। মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পাহাড় থেকে নেমে অরণ্যের পথে কিন্তু অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম।

বেলা বেশ হয়েছে বুঝে ফিরতে গিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছি। বনের ভেতরে কোনো নির্দিষ্ট পথ ধরে তো আসিনি। খেয়ালখুশিমতো চলে এসে যেখানে তখন পৌঁছেছি, সেখান থেকে আমাদের ছাউনির ন্যাড়া পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে না।

পাহাড়টা দেখবার জন্যে একটা উঁচু জায়গায় ওঠা দরকার। কিছু দূরেই আরেকটা পাহাড় দেখে তার ওপর উঠব বলে এগিয়ে গেছি। সে পাহাড়ে খানিকটা ওঠবার পর হঠাৎ চমকে থেমে যেতে হয়েছে।

নীচে থেকে কে যেন চিৎকার করে কী বলছে!

Pathagar.net

ফিরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম একজন আদিবাসীকে দেখেছি। সে খুব উত্তেজিত ভাবে হাত পা নেড়ে কী যেন আমায় উচ্চৈস্বরে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

তার ভাষা কিছুই বুঝতে না পারলেও ওপর থেকে নেমে এসেছি তার কাছে। কাছে এসেও তার কথা অবশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু তার আকারে ইঙ্গিতে এইটুকু বোঝা গেছে যে, আমায় পাহাড়ে উঠতে সে প্রবলভাবে মানা করছে।

কিন্তু কেন?

ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে মি. নাগাপ্পা না এসে পড়লে তা জানতে পারতাম না। মি. নাগাপ্পা এখানে অন্য একটি দলের নেতা হিসাবে এসেছেন। গতকাল রাত্রে খাবার সময় মহান্তি এই নাগাপ্পা ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মি. নাগাপ্পার কাছেই জেনেছি আদিবাসীদের কাছে এটা অতি পবিত্র পাহাড়। বিশেষ পরবের দিনে ছাড়া এ পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ। উঠলে সর্বনাশ নাকি অনিবার্য।

আদিবাসী পাহাড়টা সম্বন্ধে যে শব্দটা উচ্চারণ করেছে তা আমার কানে কতকটা 'এঞ্জা' গোছের শুনিয়েছে। শব্দটা যাই হোক বাংলায় তার মানেটা করালী বললে কিছুটা বোঝানো যায়। আদিবাসীদের এই পবিত্র পাহাড়ের নাম হল করালী!

মি. নাগাপ্পা সঙ্গে থাকায় নিজেদের আস্তানা খুঁজে ফিরতে তারপর আর কোনো অসুবিধা হয়নি। বেশ অমায়িক মিশুক লোক। এক সঙ্গে আসতে আসতে এ অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার গল্প বলেছেন। তাঁর নিজেরও শিকার ও মাছ ধরার শখ আছে। এ পাহাড়-জঙ্গলের দেশে কোথায় কী শিকারের সুবিধে সে বিষয়ে বেশ কিছু খোঁজখবর ইতিমধ্যে নিয়েছেন। এসব শখের ব্যাপারে আমায় সঙ্গী পেলে খুশি হবেন জানিয়েছেন বারবার।

মি. নাগাপ্পা মহীশূরের লোক। একটা বড়ো বিদেশি কোম্পানির হয়ে তিনিও এ অঞ্চলে প্রাথমিক একধরনের জরিপের কাজ করতে এসেছেন। তবে তাঁর সন্ধান লোহা-টোহা নয়। এদিকে লোহার খনির কাজ শুরু হলে যে প্রচুর জলের দরকার হবে তা কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব তারই খোঁজ নিতে তাঁর কোম্পানি তাঁকে পাঠিয়েছে।

নাগাপ্পার সঙ্গে দলবল নেই বললেই হয়। জন তিনেক মাত্র সহকারী নিয়ে ন্যাড়া পাহাড়ের বসতিতেই একটি মাঝারি তাঁবুতে থাকেন।

এখানে আসার পর মহান্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি হয়েছে। খাওয়াদাওয়াটা তাঁর মহান্তির তাঁবুতেই হয়। সেই জন্যেই কাল রাত্রে এখানকার অন্য অনেকের আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।

নাগাপ্পার সঙ্গে আস্তানায় ফিরতে সেদিন বেশ একটু বেলাই হয়ে গেছল। আমাদের ন্যাড়া ডুংরিতে আমায় উঠিয়ে দিয়ে নাগাপ্পা নিজের কাজে চলে গিয়েছিলেন। বাকি পথটুকু যেতে যেতে সকালের ভ্রমণকাহিনি শুনিয়ে মামাবাবুকে তাঁর কুঁড়েমির জন্য কীভাবে লজ্জা দেব তাই ভেবেছিলাম! কিন্তু তাঁবুতে গিয়ে দেখি বেশ হুলস্থুল ব্যাপার! আর তার মূল হলাম আমি!

আমাকে তাঁবুতে না পেয়ে আর এতক্ষণ পর্যন্ত ফিরতে না দেখে সবাই একেবারে অস্থির। চারদিকে জন পাঁচেক লোক নাকি আমায় খুঁজতে বেরিয়ে গেছে।

সব শুনে অবাক যতটা হলাম তার চেয়ে চটলাম বেশি।

'কেন, আমি কি কচি খোকা যে দু-দণ্ড কোথাও একলা ছাড়া পাবার উপযুক্ত নই? সকালে একটু বেড়াতে বেড়িয়েছি তাতে ভয়ে ভাবনায় দিশাহারা হবার মতো সাংঘাতিক ব্যাপার কী হয়েছে! আমায় কি একলা পেলে ছেলেধরা ধরে নেবে!'

কথাগুলো মামাবাবুকেই শোনাচ্ছিলাম। পাশে মহান্তিকে একটু মুখ টিপে যেন হাসতে দেখে এবার তাঁর ওপরও খাপ্পা না হয়ে পারলাম না।

pathagar.net

'মামাবাবুর কাণ্ডজ্ঞান নেই জানি। কিন্তু আপনি কী বলে ওঁর সঙ্গে তাল দিয়ে এসব পাগলামি ওঁকে করতে দিলেন? আপনি তো ওঁকে থামাতে পারতেন!'

'ওঁকে থামাব কী করে?'—মহান্তি এবার স্পষ্টভাবেই হেসে বলেছেন, 'পাগলামি যদি বলো, তাহলে উনি তো নয় সব আমিই করেছি। অস্থির হয়ে চারিদিকের পাহাড়জঙ্গলে তোমায় খুঁজতে পাঠিয়েছি আমিই।'

'আপনি!'—সত্যিই হতভম্ব হয়ে বললাম, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি তো অনেক আশা-টাশা দিয়েছিলেন এখানে আসবার আগে। এখন কি বলতে চান, আপনার এই তাঁবুর চৌহদ্দির বাইরে যাওয়াই বারণ?'

'এখন অন্তত তাই।' আমার বিদ্রূপের খোঁচাটা যেন উপভোগ করে বলেছেন মহান্তি, 'অত সকালেই তুমি যে বেরিয়ে যাবে তা তো ভাবিনি, তাই তোমাকে সাবধান করা আর হয়ে ওঠেনি!'

'সাবধান! কীসের সাবধান?' বিরক্তিটা এবার বিস্মিত কৌতূহল হয়ে উঠেছে।

মহান্তির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা তারপর শুনেছি।

গতকাল আমরা শুতে যাবার পর গভীর রাত্রে দূর এক পাহাড়ি গ্রামের এক আদিবাসী একটা অত্যন্ত খারাপ খবর দিতে মহান্তির ছাউনিতে ছুটে এসেছে।

তাদের এলাকায় হঠাৎ একটা খ্যাপা হাতির উপদ্রব দারুণ বেড়েছে। দিন-দুপুরে কাল তাদের গাঁয়ের একজন লোককে বনের পথে শুঁড়ে জড়িয়ে পায়ে থেঁতলে মেরে ফেলেছে।

এ হাতির ভয়ে তাদের গাঁ ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারা জঙ্গলের মানুষ। জঙ্গলে না বার হলে তাদের দিন চলে না। কিন্তু হাতির ভয়ে কেউ বসতির বাইরে যেতে সাহস করছে না। খ্যাপা হাতিটা কোথায় ওত পেতে আছে কে জানে! তেমন মরজি হলে তাদের নেহাত খেলাঘরের মতো লতাপাতার কুঁড়ের ওপর চড়াও হতেই বা তার কতক্ষণ।

হাতিটার চালচলন সব যেন সাক্ষাৎ শয়তানের। কখন যে সে কোথায় যেতে পারে কিছুর ঠিক নেই। কিছুকাল আগে মহাবুয়াং বলে এক জায়গায় এক খ্যাপা হাতির উপদ্রবের কথা শোনা গেছল। মহাবুয়াং কিন্তু অনেক দূরের চার চারটে বড়ো বড়ো পাহাড়ের ওপারের জঙ্গল। সেখান থেকে হঠাৎ এত দূরে ক্ষ্যাপা হাতিটা হানা দিতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। হাতিটা সম্বন্ধে আতঙ্ক তাই এত বেশি।

কাছে-দূরের সমস্ত আদিবাসী মহান্তিকে তাদের পরম সহায় বলে মানতে শিখেছে গত ক-বছরের ভেতর। খ্যাপা হাতির কবল থেকে বাঁচবার জন্যে তাই তারা শরণ নিতে এসেছে মহান্তির।

মহান্তির কাছে আসবার আর একটা কারণ তাদের আছে। যে লোকটা হাতির উপদ্রবে মারা গেছে সে মহান্তির ছাউনিরই একজন খিদমতগার। গাঁ থেকে ন্যাড়া পাহাড়ে মহান্তির ছাউনিতেই আসছিল।

খ্যাপা হাতি মানেই একটা ভয়ংকর কিছু। তার ওপর এ হাতিটা একটু যেন বেয়াড়া ধরনের বলে লোধমা অঞ্চলে একটু বেশিরকম সাবধান হওয়া প্রয়োজন মনে হয়েছে।

ন্যাড়া পাহাড়ের সব কটা ছাউনিতে কাল রাত্রেই খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করেছেন মহান্তি। হাতিটা কখন কোথায় উদয় হবে তার তো কোনো ঠিক নেই! তার সঠিক পাত্তা না পাওয়া পর্যন্ত তাই লোধমার ন্যাড়া পাহাড় থেকে কোথাও কাউকে যেতেই মানা করা হয়েছে।

খুব ভোরে উঠে চলে যাবার দরুন সে নিষেধ শোনবার সুযোগ আমার হয়নি। তাঁবুতে বা কাছাকাছি পাহাড়ে আমায় কোথাও সকাল থেকেই না দেখতে পেয়ে মহান্তি ও মামাবাবু ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে চারিদিকে আমার খোঁজে লোকজন পাঠিয়েছেন।

শুধু আমার জন্যেই নয়, খ্যাপা মস্তি হাতিটার সন্ধান নেবার জন্যেও পাহাড় জঙ্গলে নানাদিকে লোক পাঠানো হয়েছে।

pathagar.net

হাতির খবর পাওয়া গেলেই মামাবাবু আর মহান্তি সেটা শিকার করতে বার হবেন এইরকম ব্যবস্থা হয়ে আছে।

হাতির খবর তখনও অবশ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাওয়া গেলেও তখনও রওনা হতে পারবেন কি না, আমি সুস্থ শরীরে না ফেরা পর্যন্ত তাঁরা ঠিক করতে পারছিলেন না।

ছাউনির খাবার ঘরে সকালের চা জলখাবার খেতে খেতেই এসব বিবরণ শুনছিলাম।

শিকার-টিকারের লোভেই কলকাতা ছেড়ে এই পাহাড়-জঙ্গলের অজানা রাজ্যে এসেছি। কিন্তু আসার পর এক রাত না কাটতে কাটতে ভাগ্যের এতটা অনুগ্রহে একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

শিকার করতে চেয়েছি বলে প্রথমেই একেবারে খ্যাপা হাতি জুটিয়ে দেওয়া!

মামাবাবুর কথা জানি না, কিন্তু আমি হাতি শিকারের কথা নেহাত বইয়েই পড়েছি। শিকারের জন্যে ছোটো-বড়ো জঙ্গলে অনেকবার গেছি বটে, কেঁদো না হলেও হরিণ-টরিন ছাড়া চিতা কি ভালুকও একটু-আধটু চোখে পড়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে স্বাধীন বুনো হাতি চাক্ষুষ সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কোথাও কখনো হয়নি।

এ হাতিটা আবার শুধু স্বাধীন বুনোই নয়, উপরন্তু খ্যাপা খুনে, আর শয়তানের মতো চালাক।

অস্বীকার করে লাভ নেই, উত্তেজনা যতটা অনুভব করছিলাম তার চেয়ে ভয় আর উদ্বেগের কাঁপুনি খুব কম নয়।

সেদিন অন্তত ভয় উদ্বেগ উত্তেজনার বাজে খরচই হল। সারাদিনের মধ্যে কোনো দিক থেকে কোনো খবরই পাওয়া গেল না। ও তল্লাটে হাতিটার কোথাও কোনো চিহ্নই নেই। শুধু ওই একটা মানুষের নিয়তি হয়েই যেন সে এসেছিল। তাকে শেষ করে ভোজবাজিতে গায়েব হয়ে গেছে।

পরেরদিন যা খবর পাওয়া গেল তা আরও অদ্ভুত। এ অঞ্চলে নয়, খ্যাপা হাতিটাকে আবার তার পুরোনো জায়গা মহাবুয়াং-এর জঙ্গলেই নাকি দেখা গেছে।

এ খবর সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করবার মতো অবশ্য নয়। চার চারটে পাহাড় যে হাতি যখন খুশি পেরিয়ে যেতে পারে, হঠাৎ খেয়ালে কালই সে ফিরে আসবে না তার ঠিক কী!

ইচ্ছেমতো নিজের খেয়ালে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোরা তাই বন্ধই রইল তখনকার মতো। মহাবুয়াং-এ একজন সরকারি শিকারি নাকি খ্যাপা হাতিটার খোঁজে আছে। তার হাতে হাতির সদগতির খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আর স্বস্তি নেই।

যে আশায় আসা তাতেই ছাই পড়ায় আমি যখন ভাগ্যের ওপর গজরাচ্ছি, মামাবাবু তখন কিন্তু দিব্যি খোসমেজাজে আছেন।

মহান্তির ছাউনিতে তাঁর নিজের কাজ চালাবার মতো ছোটো একটা ল্যাবরেটরি আছে। মামাবাবু দিন-রাত্তির পরমানন্দে সেখানেই এমনভাবে কাটান যে মনে হয়, কলকাতা ছেড়ে এই জন্যেই তিনি জঙ্গলের দেশে এসেছেন।

আমার কিন্তু সময় কাটানই দায় হয়ে উঠেছে। পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল নিয়ে যাদের কারবার তাদের ছাউনিতে পড়বার মতো বইয়ের লাইব্রেরি আর কোথায় পাব! আর বইপত্তর থাকলেও এখানে এসে তাই পড়ে সময় কাটাতে মন চায়?

করবার আর কিছু না পেয়ে লোধমার ন্যাড়া পাহাড়টা আমি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি।

গাছপালা অন্য সব পাহাড়ের তুলনায় একটু কম হলেও পাহাড়টা সত্যি একেবারে ন্যাড়া নয়। যেদিক থেকে ঝরনাটা বেরিয়েছে সেদিকে তো পাহাড়টা খাড়া দেওয়ালের মতো অনেকখানি সোজা উঠে গিয়ে রীতিমতো ঘন জঙ্গলে শেষ হয়েছে।

pathagar.net

একদিন সাহস করে বেশ দুর্গম একটা চড়াইয়ের পথ ধরে খাড়া পাহাড়ের সেই ঝাঁকড়া মাথায় গিয়ে উঠেছি। দূরদূরান্তরে যাবার সুবিধে নেই বলে দূরবিনটা সব সময়ে কাঁধে ঝোলানোই থাকে। তাই দিয়ে দুধের সাধ খানিকটা ঘোলে মেটানো যায়।

পাহাড়ের মাথায় একটা সুবিধেমতো জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরবিনটা চোখে তুললাম।

এ কদিন খোঁজ খবর নিয়ে কাছাকাছি চারিধারের পাহাড়গুলো অল্পবিস্তর চিনে ফেলেছি। পাহাড়ের মাথা থেকে আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ের চূড়াটা চিনতে পেরে সেদিকেই দূরবিনটা ফোকাস করলাম।

আদিবাসীরা এ পাহাড়কে পবিত্র মনে করে করালী নাম যে দিয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পাহাড়ের চূড়ার চোহারাটা সত্যিই ভয়-ভক্তি জাগাবার মতো। প্রকৃতির নিজের খেয়ালে পাহাড়ের মাথার পাথরগুলো ঠিক যেন বিরাট বীভৎস একটা কুমির গোছের প্রাণীর হাঁ করা মুখ বলে মনে হয়। কটা যেন দাঁতও সে হিংস্র মুখের ভিতর থেকে উঁচিয়ে আছে।

প্রথম দিন না জেনে ওই পাহাড়ের ওপর উঠতে যাবার সময় চূড়ার এ চেহারা ঠিক দেখতে পাইনি। নীচে থেকে দেখাও যায় না ভালো করে।

প্রায় সমান উঁচু আরেক পাহাড়ের মাথা থেকে করালী পাহাড়ের যথার্থ চেহারা এই প্রথম দেখতে পেলাম।

কিন্তু পাহাড়ের গায়ের একটা সরু সুতোর মতো পথে ওটা কি দেখা যাচ্ছে?

জন্তুজানোয়ার নয়, মানুষ।

কিন্তু আদিবাসী তো নয়!

আমার দূরবিন বেশ জোরালো। তাতে যা দেখছি তা তো প্যান্টসার্ট-পরা সভ্য মানুষের চেহারা!

দুই

আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ে সার্টপ্যান্ট-পরা মানুষ!

কেমন করে তা সম্ভব?

সেদিন যা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাতে বুঝেছি নেহাত নতুন বাইরের লোক না হলে এ পাহাড়ে ওঠবার কথা এ অঞ্চলে কেউ কল্পনাও করবে না।

আর বাইরের লোক কেউ এলে আমাদের এই ন্যাড়া লোধমা পাহাড়ে না এসে যাবে কোথায়? চারিধারে অমন দুশো মাইলের মধ্যে আদিবাসীদের কয়েকটা জংলা পাহাড়ি গ্রাম ছাড়া সার্টপ্যান্ট যেখানে চলে এমন সভ্য মানুষের কোনো আস্তানা কোথাও নেই। জরিপের তাঁবু-টাবু দূরদূরান্তে যদি বা একটা-আধটা আগে থেকে পত্তন করা হয়ে থাকে, খ্যাপা হাতির এই বিভীষিকা শুরু হবার পর সেখান থেকে কেউ এক পাও বাড়াবে না।

খ্যাপা হাতির ভয় আর আদিবাসীদের ধর্মের নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাদেরই মধ্যেকার সার্টপ্যান্ট-পরা কে তাহলে ওই অভিশপ্ত 'এঙ্কা' অর্থাৎ করালী পাহাড়ে আজ সকালে গিয়ে উঠতে পারে?

ওঠাটা তা হালকা খেয়াল বলা যায় না, রীতিমতো তান্যায় গোঁয়ার্তুমি।

লোধমা পাহাড়ের কটি ছাউনিতে যারা আছে তারা সবাই কাজের ধান্দায় এখানে এসেছে, এরকম নিরর্থক গোয়ার্তুমি তাদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

করালী পাহাড়ের সরু আঁকাবাঁকা চড়াইয়ের পথটা কোথাও কোথাও কয়েকটা চূড়ার পেছনে ঢাকা পড়েছে। লোকটা এমনি একটা জায়গায় অদৃশ্য হয়ে গেছল। পাহাড়ের আড়াল

pathagar.net

থেকে বেরিয়ে আসতেই দূরবিনটা চোখে তুলে একটু ভালো করে লক্ষ করবার চেষ্টা করলাম, চেনবার মতো কোনো কিছু পাই কি না দেখতে।

তা অবশ্য দুরাশা। জোরালো দুরবিনেও এত দূর থেকে পোশাকটা কীরকম শুধু তাই ছাড়া মুখের চেহারার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। আর আভাস একটু পেলেই বিশেষ সুবিধে হত কি!

এখানে এ কয়দিনে সকলকেই আমি চিনে ফেলেছি বলতে পারব না। আর, একটু-আধটু দেখে থাকলেও মুখগুলো মুখস্থ নিশ্চয় আমার হয়ে যায়নি। সুতরাং মুখের চেহারার আঁচ সামান্য একটু পেলেও তা দিয়ে কাউকে শনাক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

কিন্তু...? মানুষটাকে ঠিকমতো চেনার কোনো সুবিধে হবে না বলে দুরবিনটা নামিয়ে ফেলেছিলাম। নতুন মোচড়টা বুদ্ধিতে লাগতেই আবার দূরবিনটা ব্যাকুলভাবে চোখে তুললাম।

দেখবার সুযোগ তখন আর বেশি নেই। পাহাড়ের মাথার দিকে পথটা একটা চূড়ার আড়াল থেকে একটু উঁকি দিয়েই একেবারে অদৃশ্য হয়ে উলটো পিঠেই বোধ হয় চলে গেছে।

দূরবিনে কয়েক সেকেন্ড মাত্র মানুষটাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু মনে হল এ দেখাটা একেবারে বৃথা নাও হতে পারে।

খাড়া শিখর থেকে নেমে নিজেদের ছাউনির দিকে যেতে যেতে করালী পাহাড়ে খানিক আগে যা দেখেছি তা মামাবাবু ও মহান্তিকে তখনই জানাব কি না ভাবছিলাম।

জানানো উচিত বুঝলেও সত্যি কথা বলতে গেলে এরকম একটা বাহাদুরির সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। দারুণ কিছু অবশ্য নয়, কিন্তু ব্যাপারটায় একটু রহস্যের ছোঁয়া যে আছে এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। খ্যাপা হাতির কথা শোনবার পর থেকে মামাবাবু সেই যে ল্যাবরেটরিতে সেঁধিয়েছেন আর তো বেরোবার নাম করছেন না। তাঁকে একটু নাড়া দেওয়া দরকার। করালী পাহাড়ে আজ যাকে চড়তে দেখেছি তার যথার্থ পরিচয় খুঁজে বার করে ব্যাপারটা নাটকীয় ভাবে সাজিয়ে মামাবাবুকে তাই একটু চমকে দিতে চাই।

এ রহস্য-ভেদের জন্যে কী করতে হবে তা তখনই প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। ছোটো-বড়ো মিলে পাঁচটি আলাদা কোম্পানির ঘাঁটি আছে এই লোধমা পাহাড়ে। কিন্তু লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেট বাদে অন্য কোম্পানিগুলি নেহাত নগণ্য। কাজের দিক দিয়ে যেমন লোকবলের দিক দিয়েও তেমনি তাদের গর্ব করবার কিছু নেই। সাধারণ শ্রমিক বাদে সব কটি কোম্পানিতে প্যান্টসার্ট পরবার মতো ওপরওয়ালা কর্মচারীর সংখ্যা বেশি কিছু নয়। একটু চেষ্টা করলে সাধারণ আলাপ করবার ছুতোতেই আজ সকালে ফোন কোম্পানির কোন অফিসারকে নিজের ছাউনিতে দেখা যায়নি তা জেনে নেওয়া খুব বোধ হয় শক্ত হবে না।

মেঘ না চাইতেই জলের মতো এধরনের খবর দেবার মানুষ শুধু নয়, একেবারে আসল খবরটাই নিজেদের ছাউনিতে পৌঁছোবার আগেই পেয়ে যাব তা ভাবিনি।

পাহাড়ের রাস্তায় একটা জংলা গাছের ডালে নতুন ধরনের একটা পাখি দেখে সেটা দূরবিনে ভালো করে লক্ষ করবার জন্যে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

ছোটোবাবু!

হঠাৎ মেয়েলি নাকি গলায় ডাকটা শুনে চমকে উঠলাম প্রথমে।

এই নির্জন জায়গায় ওই সরু নাকি গলায় 'ছোটো বাবু!' বলে কে ডাকতে পারে! ব্যাপারটা ভূতুড়ে নাকি?

রহস্যটা পর মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল। যে গাছটার ডালের পাখি আমি লক্ষ করছিলাম তারই গুঁড়ির ওপাশ থেকে সরু সিড়িঙ্গে বকের মতো চেহারার যে লোকটি কাঁচুমাচু মুখ করে বেরিয়ে এল তাকে দেখে হাসি চাপতে পারলাম না।

pathagar.net

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বঙ্কুবাবু আপনি এখানে! কী করছিলেন?'

'আজ্ঞে কিছু না।' বঙ্কুবাবু সকাতরে আমায় বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলেন, 'সত্যি এইখানে একটু নিরিবিলিতে এসে বসেছিলাম!'

এবার গলা একটু গম্ভীর করতে হল, 'শুধু শুধু নিরিবিলিতে এসে বসেছিলেন? এখন তো মুখটা ভালো করে মুছতে পারেননি! ঠোঁটের পাশে কী খাবারের গুঁড়ো লেগে আছে! লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসে কী খাচ্ছিলেন?'

বঙ্কুবাবু এবার একেবারে অধোবদন। ধরা পড়ে মুখে আর রা নেই।

অতি কষ্টে হাসি চেপে গলাটায় একটু ভর্ৎসনার সুর এনে বললাম, 'সরকার সাহেব কী সাধে আপনাকে অত বকাজখা করেন! আপনি তো সত্যিই......'

কথাটা আমায় আর শেষ করতে হল না। সরকার সাহেবের নাম করতেই বঙ্কুবাবু একেবারে অন্য মূর্তি। ওই সিড়িঙ্গে যেন আগুন ধরানো হাউই কাঠি হয়ে উঠল এক নিমেষে। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে একটা খারাপ গালাগালই দিয়ে ফেলে বললেন, 'ওই সরকার...! ওর কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? তা তো করবেন-ই। ও হল সাহেব মানুষ গ্যাডম্যাড করে ইংরেজি বলে, দাঁতে পাইপ চেপে তামাক খায়, আর আমি ছেঁড়া কোটপ্যান্ট আর ক্যাম্বিশের জুতো পরে বিড়ি খেয়ে দিন কাটাই। আপনারা নিজের জাতভাইয়েরই তো পোঁ ধরবেন। কিন্তু ও আমায় উপোস করিয়ে মারতে চায় তা জানেন! ও একটা ছুঁচো, ও একটা গিরগিটি, একটা গন্ধ গোকুল একটা...'

বঙ্কুবাবু পশুজগতে আরও উদাহরণ খোঁজার জন্যে একটু থামতেই গম্ভীর হয়ে সহানুভূতির স্বরে বললাম, 'আপনার সব কথাই মানছি। আপনার অফিসার সরকার সাহেব একটা যাচ্ছেতাই লোক। কিন্তু, আপনার খাওয়ার লোভ একটু বেশি, ডাক্তারের মানা সত্ত্বেও আপনি লুকিয়ে চুরিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য একটু বেশি খান তা তো স্বীকার করবেন!'

সহানুভূতির স্বরটুকুতেই বঙ্কুবাবু এক নিমেষে একবারে গলে জল হয়ে গেলেন। করুণ স্বরে নিজের দুর্বলতাটুকু স্বীকার করে বললেন, 'তা সত্যি খাই! কিন্তু খাব নাই বা কেন বলতে পারেন? ক-দিন আর বাঁচব! ডাক্তার যা-ই বলুক, যে কটা দিন বাঁচি আত্মাপুরুষকে দুঃখ দিতে চাই না, বুঝেছেন ছোটোবাবু!'

বঙ্কুবাবুর ভোজন বিলাসের এ যুক্তির প্রতিবাদ চলে না। হেসে ফেলে তাই বললাম, 'আত্মাপুরুষের দোহাই যখন দিয়েছেন তখন বুঝেছি! কিন্তু আমি হঠাৎ ছোটোবাবু হলাম কী করে সেইটেই বুঝতে পারছি না।'

'বাঃ, আপনি ছোটোবাবু হবেন না তো আর কে হবে!' বঙ্কুবাবু যেন অবাক হলেন আমার বুদ্ধির স্থূলতায়, 'আপনি হলেন মহান্তি সাহেবের ছোটো ভাই, সে হিসেবে ছোটোসাহেবও অবশ্য হতে পারতেন!'

'না, না ছোটোবাবুই ভালো!—সাহেব ঠেকাতে আমার সম্বন্ধে বঙ্কুবাবুর ভুল ধারণাটা সংশোধন না করেই কথাটা অন্য রাস্তায় ঘোরাবার জন্যে হালকা সুরে বললাম, 'কিন্তু হঠাৎ ছোটোবাবু বলে ডেকে কী লোকসানই এই মাত্র করলেন তা জানেন?'

'লোকসান!' বঙ্কুবাবুর মুখে বেশ একটু ভয় যেন ফুটে উঠল—'কী লোকসান করলাম?'

'পাখিটা উড়িয়ে দিলেন!'

এবার আমার গলার গাম্ভীর্য আর বঙ্কুবাবুকে ভড়কাতে পারল না। আমার মুখের ভাবটা ঠিকমতো পড়ে ফেলে তাঁর সরু নাকি গলায় বেয়াড়া সুরে হাসতে হাসতে বললেন, 'ওঃ আপনি পাখি দেখছিলেন বুঝি! আমি কি তা বুঝতে পেরেছি! ওইজন্যেই বুঝি গলায় ওই দূরবিনটা ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরেন?'

আমি একটু হেসে তাঁর অনুমানটাতেই সায় দেবার পর বঙ্কুবাবু একটু যেন চিন্তায় পড়ে যে প্রশ্নটা করলেন তা আমার পক্ষে প্রথম একটু বেয়াড়াই হয়ে দাঁড়াল।

বঙ্কুবাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'তা ওই পাহাড়ের ওপর থেকে পুব দিকে তাকিয়ে কী পাখি দেখছিলেন? ওদিকের সব পাহাড় তো অনেক দূর! অত দূরের পাহাড়ের পাখিও দূরবিনে দেখা যায়!

কী জবাব এখন দেওয়া যায় বঙ্কুবাবুকে, ভাবতে গিয়ে বেশ একটু ফাঁপরেই পড়লাম। বঙ্কুবাবু এখানে লুকিয়ে বসে ছাউনির ক্যান্টিন থেকে চুরি করে আনা নিষিদ্ধ খাবার খেতে খেতে আমায় ভালো করেই লক্ষ করেছেন বোঝা গেল। 'এমনি পাহাড় দেখছিলাম।' বললে একটু সন্দেহের খোঁচা ওঠবারই সুতরাং সুবিধে দেওয়া হবে। দুবার-তিনবার চোখে দূরবিন তুলে অমন তন্ময় হয়ে ঠিক একদিকেই লক্ষ রাখাকে ঠিক উদ্দেশ্যহীন এমনি দেখা বলে চালানো যায় না! অতদূরে পাহাড়ে কোনো পাখি দেখছিলাম বললে আমার দূরবিনের শক্তিটা একটু আজগুবিরকম বাড়াতে হয়। বঙ্কুবাবু দূরবিন সম্বন্ধে অজ্ঞ আনাড়ি হলেও এ মিথ্যেটা হয়তো ধরে ফেলতে পারেন।

সরল সত্য কথাটা তাঁকে জানালেই অবশ্য সব সমস্যা চুকে যায়। কিন্তু তাহলে আমার গোয়েন্দাগিরির প্ল্যান গোড়াতেই একটু ভেস্তে যায় যে! মামাবাবু বা মহান্তির কাছে নাটকীয়ভাবে রহস্যভেদের মজাটা তাহলে আর হয় না।

এতগুলো ভাবনা এক নিমেষেই মাথার মধ্যে পাক খায়নি। বঙ্কুবাবুর বেয়াড়া প্রশ্নটার উত্তর ভাববার সময় নেবার জন্যেই একটু থেমে ও ধরনের অবস্থায় সবাই যা করে সেই মতো প্রশ্নটাকেই প্রথম আবার আউড়ে বলেছি, 'অতদূরে পাখি দেখা যায় কি না জিজ্ঞাসা করছেন? কিন্তু পাখি তো আমি দেখছিলাম না!'

উত্তরটা এই পর্যন্ত দিতে না দিতেই বঙ্কুবাবুর বেয়াড়া প্রশ্নটা থেকে নিজের সমস্যার সমাধানের সুবিধে করে নেবার কথাটা মাথায় এসে গেল।

'কী দেখছিলেন তাহলে?' এ প্রশ্ন বঙ্কুবাবুকে আর করবার সময় না দিয়ে সত্যটা অর্ধেক গোপন করে বললাম, 'দেখছিলাম, ওই 'এক্কা' না কী বলে, আদিবাসীদের সেই পবিত্র পাহাড়ের চুড়োটা। ভাবছি, আজ একবার পাহাড়টায় যাব।'

যা আঁচ করেছিলাম ঠিক সেই ফলই ফলল। বঙ্কুবাবু একেবারে আঁতকে উঠে বললেন, 'ও পাহাড়ে যাবেন কী মশাই, ও পাহাড়ে ওঠাই মানা। তা ছাড়া এখন তো কোথাও যাবার কথাই ওঠে না। মহাবুয়াং-এর খ্যাপা হাতির কথা ভুলে যাচ্ছেন? লোধমা পাহাড় ছেড়ে কারোর যাবার হুকুমই নেই!

'সবাই সে হুকুম মেনে চলছে বলতে চান?' বঙ্কুবাবুকে যেন হালকাভাবেই প্রশ্নটা করলাম।

বঙ্কুবাবু কিন্তু আমার দিকে প্রথম একটু অবাক হয়ে চেয়ে তারপর যেন আক্রোশটা চাপতে না পেরে বলে ফেললেন, 'মানছে না শুধু একজন। ওই সরকার সাহেব!'

তিন

নিজেদের ছাউনিতে ফেরার পর বঙ্কুবাবুর কথাটাই সবিস্ময়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছিলাম।

মামাবাবু আর মহান্তিকে ব্যাপারটা তখন জানানো হয়নি। সুযোগই ছিল না জানাবার। মহান্তি তাঁর অফিস ঘরে ওখানকার অন্য সব কোম্পানির কয়েকজন মাথার সঙ্গে একটা জরুরি পরামর্শ সভায় বসেছেন, আর মামাবাবু তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকে একেবারে কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন তাঁকে কোনোরকমে বিরক্ত না করবার।

pathagar.net

আমাদের ছাউনির খাস বেয়ারা রামস্বরূপের কাছে এসব খবর পেয়ে স্নানটা সেরে নেবার জন্যে বাথরুমে ঢুকেই কথাটা ভাবছিলাম।

বঙ্কুবাবু আক্রোশের বশে যে কথাটা চাপতে পারেননি তার মানেটা তলিয়ে দেখতে গেলে বেশ একটু গোলমালে পড়তে হয়।

সবাই যে মেনে চলছে একমাত্র সরকার সাহেবই তা অগ্রাহ্য করে খুশিমতো যেখানে-সেখানে যান। খ্যাপা হাতির ভয় তাঁকে ঠেকিয়ে রাখে না, আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ের ধর্মের মানাও নয়।

সকালে করালী পাহাড়ে সার্টপ্যান্ট-পরা যে মূর্তি দূরবিনে দেখেছি তা যে সরকার সাহেবের, বঙ্কুবাবু নাম না করেও স্পষ্টই তা জানিয়ে দিয়েছেন। সরকার সাহেবের এ অদ্ভুত কাজটা কী ধরনের খেয়াল বা গোঁয়ার্তুমি? নিছক খেয়াল বা গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কী গরজ থাকতে পারে এরকম বেয়াড়া আচরণের?

সরকার সাহেবের সঙ্গে এ কয়দিনে সামান্য একটু চেনাশোনা হয়েছে মাত্র। বিশেষ কিছুই তাঁর সম্বন্ধে জানি না। লোধমা পাহাড়ে যে কটি কোম্পানি এসে খুঁটি গেড়েছে তার মধ্যে সরকার সাহেবের কোম্পানিই সবচেয়ে নগণ্য সন্দেহ নেই। কোম্পানি বলতে তিনি, বঙ্কুবাবু আর একজন ফাইফরমাস খাটার এদেশি আদিবাসী বেয়ারা।

কোম্পানির নামটা একটু জমকালো গোছের, আই. ডব্লিউ. এস.—অর্থাৎ ইন্টারন্যাশন্যাল ওয়াটার সাপ্লায়ার্স। কাজটা আসলে এই—নতুন কোথাও কারখানা কি খনি-টনির জন্যে বসতি গড়ে ওঠার ব্যবস্থা হয়ে সেখানে জল সরবরাহের কল-টল বসাবার অর্ডার জোগাড় করা। এ উমেদারি যাতে সার্থক হয়, তার জন্যে আগে আগে থেকে একটু-আধটু লোক দেখানো জরিপও চালাতে হয়। লোধমা পাহাড়ের অঞ্চলে জল পাবার সুযোগ কোথায় কোথায় আছে তাই খোঁজবার নামে সরকার সাহেব তাঁর কোম্পানির হয়ে এখানে একটা ঘাঁটি খুলেছেন।

কাজ কতদূর কী করছেন জানি না, তবে পোশাক-আশাকে আর চালচলনে সত্যিই বঙ্কুবাবু যা বলেছেন তাই—দাঁতে পাইপ চাপা, গ্যাডম্যাড করে ইংরেজি বলা পাক্কা সাহেব।

এই সাহেবি ভড়ংয়ের জন্যে তাঁকে গোড়াতেই একটু লক্ষ করেছি। বিশেষ করে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের জন্যে নজরটা একটু বেশি পড়েছে।

বঙ্কুবাবু একটু খ্যাপাটে গোছের বোকা-সোকা মানুষ সন্দেহ নেই। সিড়িঙ্গে বকের মতো চেহারা আর সরু মেয়েলি গলার জন্য তাঁকে আরও হাস্যস্পদ লাগে। এখানকার সবাই অল্পবিস্তর তাঁর পেছনে লাগে মজা করবার জন্যে। বিশেষ করে বঙ্কুবাবুর পেটুকপনাটা লোধমা পাহাড়ের সব ছাউনিতেই একটা নিত্যকার তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সবাই বঙ্কুবাবুকে নাচিয়ে একটু নির্দোষ হাসি তামাশাই করে, কিন্তু সরকার সাহেব যা করেন তা আমার অন্তত বেশ একটু নিষ্ঠুরই মনে হয়েছে।

জরিপের কাজে সরকার সাহেব বেশিরভাগ বঙ্কুবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। শুনলাম, বঙ্কুবাবুর কাছে যা সবচেয়ে কষ্টকর জরিপের টহলে বেরিয়ে সরকার সাহেব তাঁকে সেই শাস্তি দিয়ে মজা করেন। ডাক্তারের বারণ বলে বঙ্কুবাবুকে প্রায় উপোস করিয়ে রেখে তাঁকে দিয়েই বওয়ানো টিফিন কেরিয়ার তাঁর সামনে খুলে সরকার সাহেব দেখিয়ে দেখিয়ে তার উপাদেয় লাঞ্চ খান।

আমরা আসার পর থেকেই খ্যাপা হাতির ভয়ে জরিপ-টরিপ সব বন্ধ। নিজে তাই চাক্ষুষ দেখিনি, বঙ্কুবাবুর এ শাস্তির গল্প রসালো করে সরকার সাহেবই শুনিয়েছেন। নিজের চোখে বঙ্কুবাবুকে নিয়ে সরকার সাহেবের তামাশার যে নমুনা দেখেছি তাও আমার খুব ভালো লাগেনি।

বঙ্কুবাবু যে এই ন্যাড়া পাহাড়ের নীরস কাজসর্বস্ব জীবনে হাসির খোরাক জোগান তা

pathagar.net

দু-একদিন এখানে থেকেই বুঝে নিয়েছিলাম। যাঁরা তাঁকে নিয়ে মজা করেন তাঁদেরও খুব দোষ দিইনি। বঙ্কুবাবুর নিজের দোষও আছে। তাঁর নিজের বোকামিতে সবাইকে, এমনকী বেয়ারা-চাপরাসিদেরও বঙ্কুবাবু তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করবার সুযোগ দেন।

কদিন আগে বিকেলে খ্যাপা হাতির ব্যাপারটা আলোচনার জন্যেই লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের ছাউনিতে একটা চায়ের আসর বসেছিল। এক নাগাপ্পা বাদে সব কোম্পানির বড়ো কর্তারাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহান্তির অতিথি হিসেবে মামাবাবুর সঙ্গে আমিও থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

খ্যাপা হাতির সমস্যা সমাধানের কোনো মোক্ষম উপায় কেউ বাতলাতে পারেনি। হাতির দৌরাত্ম্যে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে থাকায় কী ক্ষতি যে হচ্ছে সেই আলোচনাই হয়েছিল বেশি। খনির কাজ সরকারিভাবে শুরু করার জন্যে তার যন্ত্রপাতি জোগাবার ভার যে কোম্পানি পেয়েছে সেই এম. এম. অর্থাৎ 'মাইনিং মেশিনারিজ'-এর প্রতিনিধি মি. মানুচিই সব চেয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। খ্যাপা হাতি মারবার জন্যে যা ব্যবস্থা হয়েছে তা যথেষ্ট নয় বলে তাঁর ধারণা। তা ছাড়া খ্যাপা হাতি সম্বন্ধে ভয়টাও তাঁর মতে একটু মাত্রা ছাড়ানো। হাতিটা মহাবুয়াং থেকে আশ্চর্যভাবে হানা দিয়ে এদিকের পাহাড়ে একজন মানুষ মেরেছে ঠিকই। কিন্তু ওই একজনকে মারবার পর এ অঞ্চলে তার মারাত্মক উপদ্রবের আর কোনো খবর পাওয়া গেছে কি? পাগলামির খেয়ালে একবার এদিকে এসে পড়লেও সে এ তল্লাট একেবারে ছেড়ে গেছে এমনও তো হতে পারে। আর সম্পূর্ণ ছেড়ে যাক বা না যাক নতুন কোনো উপদ্রব যখন এ পর্যন্ত করেনি, তখন লোধমা এলাকায় সকলের ওপর একেবারে ঘরে বন্ধ থাকার হুকুম একটু আলগা করা যেতে পারে। খ্যাপা হাতির কথাটা উড়িয়ে দিয়ে নয়, তার সম্বন্ধে সাবধান থেকে কাজকর্ম আবার শুরু করা উচিত, এই হল মানুচির মত। যে পাহাড়ি রাস্তায় মহান্তির কোম্পানির আদিবাসী আরদালিকে হাতিটা মেরেছে, সে জায়গাটা থেকেও একটা সন্ধান চালাবার প্রয়োজনের কথা তুলেছেন মানুচি। ঠিকমতো সন্ধান নিতে পারলে হাতিটা ওই অঞ্চলে কোথা দিয়ে এসেছে ও কোন দিকে গেছে বোঝা অসম্ভব হবে না বলে মানুচির ধারণা।

মানুচি হয়তো তাঁর মতের স্বপক্ষে আরও কিছু যুক্তি খাড়া করতেন, কিন্তু সেই সময়ে আমাদের সভাঘরের দরজায় বঙ্কুবাবুকে একবার উঁকি দিতে দেখা গেছে। আর তাঁকে দেখেই সরকার সাহেব মজা করবার উৎসাহ আর চাপতে পারেননি। চোখ-মুখ পাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দিয়ে ডেকেছেন, 'বঙ্কুবিহারী!'

ধমক শুনেই বঙ্কুবাবুর অবস্থা কাহিল। ভয়ে ভয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন কাঠগড়ার আসামির মতো।

'কী করতে এখানে এসেছ?' বজ্রস্বরে জানতে চেয়েছেন সরকার সাহেব।

মনে পাপ থাকার দরুন কি না বলা শক্ত, বঙ্কুবাবু এ জেরায় একেবারে থতমত। ভয়ের চোটেই আরও সরু হয়ে-যাওয়া গলায় দু-চারবার 'আজ্ঞে-আজ্ঞে' বলে একেবারে বোবা হয়ে গেছেন।

এখানে আমাদের চায়ের আসর বসেছে।—সরকার সাহেব যেন হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে বলেছেন, 'ভালো-মন্দ কিছু না কিছু খাবার আয়োজন হয়েছেই নিশ্চয় ক্যান্টিন থেকে। তারই লোভে ছোঁকছোঁক করে ঠিক এসে হাজির হয়েছ বেহায়ার মতো কেমন? বলো সেই লোভে লোভে এসেছ কি না?'

বঙ্কুবাবু করুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। তারপর তাঁর প্রাণের দুঃখ বোঝবার কেউ নেই মনে করে নিরুপায় হয়ে স্বীকার করেছেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তাঁর সে মিহি মেয়েলি গলার করুণ স্বীকারোক্তি শুনে আর সকলের সঙ্গে না হেসে উঠে পারিনি।

pathagar.net

সরকার সাহেব শুধু এই স্বীকারটুকু করিয়েই ছাড়েননি। মজাটা আর একটু টেনে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টিনের হেড রাঁধিয়ে ছোটোলালকে ডেকে বলে দিয়েছেন, 'বঙ্কুবিহারীকে চা জলখাবার আমাদের যা দিয়েছ সব দাও প্লেট ভরতি করে।'

এ আশাতীত অনুগ্রহে বঙ্কুবাবু চোখ জ্বলজ্বল করে উঠতে না উঠতে সরকার সাহেব তাঁর শেষ হুকুম ছেড়েছেন, 'বঙ্কুবিহারীর রাতের খাওয়া কিন্তু আজ বন্ধ মনে রেখো।'

বঙ্কুবাবু ছটফটিয়ে উঠে মিহি নাকি সুরে বৃথাই তাঁর প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেছেন।

সকলের সঙ্গে তামাশাটা উপভোগ করছি, ঠিকই, কিন্তু বেশ একটু খারাপও লেগেছে। সরকার সাহেবের তামাশাটা ঠিক নির্দোষ যেন নয়। তার মধ্যে যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে।

এ তামাশার পর সেদিনকার আলোচনা সভা অবশ্য ভেঙে গিয়েছিল।

বঙ্কুবাবুকে নিয়ে সরকার সাহেবের একটু নিষ্ঠুর মজা করার ধরনটা তারপর কয়েকবার চোখে পড়েছে। সরকার সাহেব মানুষটাকে তাতে খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারিনি। বঙ্কুবাবুর কাছে নতুন খবরটা পাবার পর বিরূপতার সঙ্গে মনের মধ্যে একটু বিমূঢ়তাও মিশেছে এখন।

বিমূঢ়তাটা অবশ্য নিরর্থক হতে পারে। সরকার সাহেব মানুষটার মধ্যে দয়ামায়ার হয়তো একটু অভাব আছে, সেইসঙ্গে লুকিয়ে নিয়ম ভাঙার একটা বেয়াড়াপনা, যেটা আসলে খামখেয়ালি ছাড়া আর কিছু নয়।

এই ব্যাখ্যাটা সঠিক হোক বা না হোক সরকার সাহেবের ওপর এখন থেকে গোপনে একটু নজর রাখবার সংকল্প নিয়েই স্নান সেরে বার হলাম।

মহান্তির কনফারেন্স তখন শেষ হয়েছে। মামাবাবুই শুধু ল্যাবরেটরি থেকে বার হননি।

নিজে থেকে না বেরিয়ে এলে তাঁকে ডাকার হুকুমও নেই বলে তাঁকে বাদ দিয়েই মহান্তির সঙ্গে খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে হল।

মামাবাবু কদিন ধরে যেরকম নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাতে মনের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ জমে ছিল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে তাই জিজ্ঞাসা করলাম মহান্তিকে, 'আপনার এই ক্যাম্বিসের ল্যাবরেটরিতে কী এমন যুগান্তকারী গবেষণা মামাবাবু করছেন বলুন তো!'

'আমি-ই কি জানি যে বলব?' মহান্তি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখছ না ল্যাবরেটরিতে আমারও প্রবেশ নিষেধ।'

'বাঃ চমৎকার ব্যাপার তো!' আমি অবাক হয়েই বললাম, 'আপনার ল্যাবরেটরিতে কী গবেষণা হচ্ছে, আপনিই জানেন না! ঢোকাও আপনার বারণ!'

'সত্যিই কী আর বারণ!' এবার মহান্তি হেসে ফেললেন, 'তবে ডা. সেনকে তো আজ নতুন দেখছি না। কোনোকিছুর মধ্যে যখন এইরকম ডুবে থাকেন, তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যান। নিজে থেকে না ডাকলে সে সময়ে ওঁর কাছে যাওয়া উচিত মনে করি না।'

মহান্তি যা বললেন, তা কি আমার অজানা? কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত জংলা পাহাড়ের ছেলেখেলার এই ল্যাবরেটরিতে ডুবে যাবার মতো হঠাৎ এমন কী পেলেন মামাবাবু? সবাই যখন খ্যাপা হাতির সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তখন মামাবাবু কি ল্যাবরেটরিতে তার মুশকিল আসান খুঁজতে ঢুকেছেন!

ঠিক ওই ভাষায় না হলেও পরিহাসের সুরে মহান্তিকে যা প্রশ্ন করলাম, তার মধ্যে ওই ক্ষোভটা একেবারে প্রচ্ছন্ন রইল না।

বললাম, 'মামাবাবু কি ল্যাবরেটরিতে বসেই খ্যাপা হাতি তাড়াচ্ছেন নাকি?'

উত্তরটা আর পাওয়া গেল না।

মহান্তির চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

pathagar.net

মামাবাবু ল্যাবরেটরির জন্যে বরাদ্দ তাঁবুঘর থেকে বেরিয়ে ছাউনির বাইরের দিকে চলে যাচ্ছেন।

মামাবাবু একা নয়, তাঁর সঙ্গে আর একজন আছেন। মামাবাবুকে দেখে নয়, হতভম্ব হয়েছি মামাবাবুর সেই সঙ্গীটিকে দেখে।

সঙ্গীটি আর কেউ নয়, সরকার সাহেব। মামাবাবু তাঁর সঙ্গেই নিচু গলায় কী যেন আলাপ করতে করতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

সরকার সাহেবের মামাবাবুর সঙ্গে থাকা তো আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি কি মামাবাবুর ল্যাবরেটরিতেই ছিলেন?

উত্তেজিতভাবে সেই প্রশ্নই করলাম মহান্তিকে। মহান্তি সায় দেওয়ায় অবাক হয়ে বললাম, 'তবে যে আপনি বললেন, উনি কাজে ডুবে আছেন। নিজে থেকে না ডাকলে আপনি পর্যন্ত কাছে যাওয়া উচিত মনে করেন না!'

'তা তো করি-ই না।' মহান্তির চোখে একটু বুঝি কৌতুকের ঝিলিক দেখা গেল, 'কিন্তু নিজে থেকে যাকে ডাকেন, তার যাওয়ায় তো দোষ নেই?'

'তার মানে?' আরও বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'মামাবাবু গবেষণা নিয়ে তন্ময় হওয়ার মধ্যে ওই সরকার সাহেবকে নিজে থেকে ডেকেছেন? কেন?'

'গবেষণার ব্যাপারেই নিশ্চয়।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন মহান্তি।

'গবেষণার ব্যাপারে আপনি থাকতে সরকার সাহেবকে?' আমি ঝাঁঝালো গলাতেই বললাম, 'উনি কি আপনার চেয়ে বড়ো খনিজবিশেষজ্ঞ?'

'তা হওয়া অসম্ভব কিছুতো নয়।'—মহান্তি যেন একটু দুঃখের হাসি হাসলেন, 'ডা. সেন নইলে ওঁকেই ডেকেছেন কেন?'

কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে বসে থেকে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটা করলাম, 'সরকার সাহেব কখন থেকে ল্যাবরেটরিতে আছেন, জানেন?'

'তা জানি বই কি।' মহান্তি হেসে বললেন, 'সেই সকাল থেকেই আছেন!'

'সকাল থেকেই! সকাল থেকেই!'—মহান্তিকে বেশ একটু অবাক করে বিস্ময়টা সরবে প্রকাশ করেই ফেললাম।

'কী হল কী?' জিজ্ঞাসা করলেন মহান্তি। 'সরকার সাহেবের সকাল থেকে ল্যাবরেটরিতে থাকাটায় আশ্চর্য হবার কী আছে?'

চার

কী যে আছে তা মহান্তিকে তখন বলতে পারিনি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেইদিনই বিকেলে বঙ্কুবাবুকে একটু নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে, 'আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন?'

থতমত খেয়ে বঙ্কুবাবু কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিলেন, 'মিথ্যে কথা! কই? কী বলেছি?'

এরপর বঙ্কুবাবুকে বেশ একটু কড়া করেই ধমক দিয়েছিলাম।

'কী মিথ্যে বলেছেন জানেন না! সকালে কী বলেছিলেন আমায়?'

ভান কি না জানি না, কিন্তু বঙ্কুবাবু বেশ যেন একটু ভড়কে গিয়ে সকালের কথা ভাবতে চেষ্টা করছেন মনে হয়েছিল।

অনেক ভেবেচিন্তে কাতরভাবে যা জানিয়েছিলেন তাতে হাসি পাবারই কথা। তবে মেজাজটা তখন রীতিমতো খারাপ ছিল বলে কৌতুকের বদলে বিরক্তিই বোধ করেছিলাম।

pathagar.net

বঙ্কুবাবু আমার অভিযোগ কাটাবার জন্যে করুণভাবে বলেছিলেন, 'আজ্ঞে সকালে গোড়ায় একটু লজ্জা হয়েছিল। তারপর সত্যি কথা তো স্বীকার করেছিলাম। কেন অমন করে লুকিয়ে খাই তাও বলেছিলাম আপনাকে।'

'আপনার চুরি করে খাওয়ার কথা হচ্ছে না!'—রুক্ষ স্বরে বলেছিলাম, 'রাতদিন আপনার শুধু খাওয়ার চিন্তা বলে ওই কথাই ভাবছেন। আর কী তখন বলেছিলেন মনে পড়ছে না? কী বলেছিলেন সরকার সাহেবের সম্বন্ধে?'

'সরকার সাহেবের সম্বন্ধে!' বঙ্কুবাবু এবার কিন্তু আর থতমত খাননি। আমায় অবাক করে দিয়ে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই বলেছিলেন, 'সরকার সাহেব সম্বন্ধে মিথ্যে তো কিছু বলিনি!'

'মিথ্যে বলেননি!' আমি মেজাজটা কড়াই রেখেছি, 'বলেছিলেন না যে, সরকার সাহেব আজ সকালে আদিবাসীদের এঞ্চা পাহাড়ে গেছেন!'

এবার আমারই প্রথমে হতভম্ব তারপর অপ্রস্তুত হবার পালা। কাঁদুনে মিহি গলায় হলেও বঙ্কুবাবু রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'আজ্ঞে, সেরকম কোনো কথাই তো বলিনি। আমি শুধু বলেছিলাম, লোধমা পাহাড় ছেড়ে কোথাও যাওয়া বারণ হলেও সরকার সাহেব তা মানেন না। মনে করে দেখুন, আজকের সকালে যাওয়ার কথা কি এঞ্চা পাহাড়ের নাম উচ্চারণও করিনি।'

সকালের কথাগুলো ভালো করে স্মরণ করে মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়েছিলাম। সত্যিই সরকার সাহেব সেদিন সকালেই এঞ্চা পাহাড়ে গেছেন এমন কোনো কথা তো বঙ্কুবাবু বলেননি। লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাবার নিষেধ একমাত্র সরকার সাহেবই মানেন না শুনে আমি খবরটার নিজের মতো মানে করে নিয়ে আমার মনগড়া সন্দেহগুলো সরকার সাহেবের ওপর চাপিয়ে বসে আছি।

ভেতরে ভেতরে যে লজ্জা পেয়েছিলাম বাইরে তা প্রকাশ করিনি অবশ্য। তার বদলে সে লজ্জা ঢাকতে বেশ গলা চড়িয়ে অভিযোগটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আজকের সকালে এঞ্চা পাহাড়ের নাম না হয় করেননি, কিন্তু সরকার সাহেব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা-ই তো মিথ্যে। শুধু আপনার আক্রোশ মেটাতে ও কথা তো বানিয়ে বলেছেন!'

'আক্রোশ মেটাতে বানিয়ে বলেছি!'—বঙ্কুবাবু একেবারে যেন মিহি গলায় ডুকরে উঠেছিলেন, 'বেশ, আজ হোক কাল হোক আমি আপনাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাব।'

'কী, দেখাবেন কী? সরকার সাহেব লোধমা পাহাড় ছেড়ে বাইরে যান, এই?' গলাটা কড়া রেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'শুধু তাই কেন! আরও কিছু!' বঙ্কুবাবু এবার গলায় হঠাৎ রহস্যের ছোঁয়া লাগিয়ে বলেছিলেন, 'চুপিচুপি ডাকব কিন্তু। কাউকে কিছু জানাবেন না। চুপিচুপি ডাকলে আসবেন তো?'

বঙ্কুবাবুর ভঙ্গি দেখে এবার না হেসে পারিনি। 'চুপিচুপি বা চেঁচিয়ে যেমন করেই ডাকুন আসব' বলে কথা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম!

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে আলাপটা হালকাভাবেই শেষ করে এসেছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভেতর সংশয় সন্দেহের অস্বস্তিটা আরও বেড়েই গেল তারপর। হেঁয়ালিটা আরও তো গভীর হয়েই উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

বঙ্কুবাবুর কথা আমি না হয় ভুল বুঝেছি, কিন্তু সেদিন সকালে বারণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যে লোধমা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এঞ্চা পাহাড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।

সে কে হতে পারে তা তো নতুন করে সন্ধান নিতে হয়। অমন করে সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে ও পাহাড়ে সাতসকালে ওঠবার গরজই বা কার এবং কেন?

সরকার সাহেব সম্বন্ধে সেদিনকার সন্দেহটা অমূলক বলে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাঁর

pathagar.net

বিষয়ে মনের মধ্যে একটু খোঁচা যেন থেকে যায়। বঙ্কুবাবু শুধু আক্রোশের বশে তাঁর সম্বন্ধে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছেন বলে তো মনে হয় না। সরকার সাহেব চেহারা-চালচলনেই কেমন যেন একটু বেয়াড়া গোছের মানুষ। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এ কদিনের মধ্যে লোধমা পাহাড় থেকে কখনো কখনো যে বেরিয়ে গেছেন বঙ্কুবাবুর এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভাবা যায় কি?

সমস্ত ব্যাপারটা এক হিসেবে এমন কিছু মাথা ঘামাবার হয়তো নয়। একটা খুনে খ্যাপা হাতির ভয়ে কিছুদিনের জন্যে এ অঞ্চলে খুশিমতো ঘোরাফেরা বারণ করা হয়েছে, আর তা সত্ত্বেও দু-একজন সে বারণ অগ্রাহ্য করছে, আসলে এই তো ব্যাপার! এর সঙ্গে আদিবাসীদের পবিত্র এগ্গা পাহাড়ে ওঠার ঘটনাটা ধরলেও তেমন কিছু রহস্য সব কিছুকে জড়িয়ে আছে ভাবাই হয়তো আমার কল্পনাবিলাস।

মনকে এইভাবে বোঝাবার চেষ্টা যে করিনি তা নয়, কিন্তু খুব সফল হয়েছি বলতে পারব না। ওপর থেকে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও কী যেন একটা অস্বাভাবিক অশুভ কিছু সব কটা ঘটনাকে জড়িয়ে আছে বলে সন্দেহটা মন থেকে দূর হতে চায়নি।

আমার সন্দেহ যে একেবারে কাল্পনিক নয় পরের দিনই তার অমন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে তা অবশ্য ভাবতে পারি না।

প্রমাণটার কথা জানা গেল আবার স্বয়ং মামাবাবুর কাছ থেকে।

আগের দিন মামাবাবুকে একবারও সুবিধেমতো ধরতে পারিনি। দুপুর পর্যন্ত তিনি তো সরকার সাহেবের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতেই কাটিয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে খাবারঘরে আসবেন জেনে সেখানে অপেক্ষা করাও বৃথা হয়েছে। আমাদের খাওয়া শেষ হবার পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও মামাবাবুকে আসতে না দেখে মহান্তিই রামস্বরূপকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। রামস্বরূপ ফিরে এসে যা খবর দিয়েছে তাতে মহান্তি আমারই মতো অবাক। মামাবাবু নাকি এ বেলার মতো ছাউনিতে আর ফিরবেন না। সরকার সাহেবের সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সারবেন। ক্যান্টিনের হেড কুক ছোটেলালকে আগে থেকেই নাকি সেখানে খাবার পাঠাবার কথা বলে দেওয়া হয়েছে।

ব্যবস্থাটা মহান্তির কাছেও যে অপ্রত্যাশিত তা তাঁর মুখ দেখে বুঝেছিলাম। মামাবাবুর ওপর তাঁর অন্ধ ভক্তি। তবু সরকার সাহেবের সঙ্গে মামাবাবুর হঠাৎ এতটা মাখামাখি তাঁকে যে বেশ বিস্মিত করেছে মহান্তি সেটা লুকোতে পারেননি।

শুধু বিস্ময় নয়, সরকার সাহেবকে নিয়ে এই বাড়াবাড়িতে আমার একটু রাগই হয়েছিল। একটু তেতো গলাতেই আমি মন্তব্য করেছিলাম, 'সরকার সাহেবের মধ্যে মামাবাবু তো নতুন নিউটন আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন মনে হচ্ছে!'

মহান্তি কিন্তু মামাবাবুর বিষয়ে এটুকু ঠাট্টাও সহ্য করেননি। হেসে বলেছিলেন, 'তোমার মামাবাবুকে এখনও ঠিক চেনো না মনে হচ্ছে!'

এরপর মামাবাবুর বিষয়ে আর কোনো কথা তোলা উচিত মনে করিনি। বিকেলে বঙ্কুবাবুকে বকুনি দিতে যাওয়ার ফল যা দাঁড়িয়েছে তা আগেই জানিয়েছি।

রাত্রেও মামাবাবু আমাদের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে যোগ দেননি। বঙ্কুবাবুর মারফতই খবর পাঠিয়েছেন যে, তাঁর জন্যে অপেক্ষা যেন আমরা না করি। রাতের খাওয়াটাও তিনি সরকার সাহেবের তাঁবুতেই সারবেন।

শুধু রাতের খাওয়াটাই সেখানে সারেননি, মামাবাবু সেখান থেকে ফিরেছেন প্রায় মাঝ রাতে।

বিছানায় শুয়ে তাঁর আসাটা টের পেয়েছি, কিন্তু মনের ক্ষোভ রাগ কৌতূহল তখনকার মতো চেপে রাখতে হয়েছে।

pathagar.net

সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমটা অবাক যেমন হয়েছি তেমনি হতাশও। মামাবাবুর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ আজকেও বোধ হয় মিলবে না।

মামাবাবু তাঁর বিছানায় নেই। উঠে খোঁজ করে জেনেছি ভোর না হতে উঠে রামস্বরূপকে নিয়ে লোধমা পাহাড় থেকেই নেমে গেছেন।

আমার কাছে হলেও মামাবাবুর এদিনের ভোরের এই অন্তর্ধান মহান্তির কাছে অপ্রত্যাশিত নয় বলেই মনে হয়েছে।

আমি উদ্বেগ-উত্তেজনা নিয়েই মহান্তিকে খবরটা দিতে গিয়েছিলাম। যেরকম আশা করেছিলাম মহান্তিকে সেরকম বিচলিত না দেখে অবাক হয়েছি। একটু সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'মামাবাবুর আজ ভোরে বেরিয়ে যাবার কথা আপনি জানতেন নাকি?'

'ঠিক জানতাম না।' মহান্তি গম্ভীরভাবেই বলেছেন, 'তবে এইরকম আরও অনেক কিছুর জন্যে কাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছি। সেনবাবু কাল রাত্রে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন।'

মহান্তির কাছে মামাবাবু কখনো 'মি. সেন', কখনো 'সেনবাবু কখনো আবার শুধু 'আপনার মামাবাবু' কেন হন সেটা একটা গবেষণার বিষয়। মহান্তির মন মেজাজের সঙ্গে সম্বোধন পালটে যাবার কোনো সম্পর্ক হয়তো আছে। তখন অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবস্থা নয়। 'সেনবাবু' শুনে একটু চমকালেও বিস্মিত প্রশ্নটাই করেছি, 'আপনার সঙ্গে কাল রাত্রে মামাবাবুর কথা হয়েছিল? তিনি তো রাত প্রায় একটায় শুতে এসেছিলেন!'

'হাঁ,' মহান্তি স্বীকার করলেন, 'তার আগে আমাকে ছাউনির বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করেন। আজই গুরুতর কিছু একটা ব্যাপারের হদিস পাওয়া যাবে বলে তখনই ইঙ্গিত করেছিলেন।'

আমাকে একেবারে বাদ দিয়ে মহান্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপন আলাপ করার খবর শুনে ক্ষুণ্ণ বেশ একটু হয়েছি। কৌতূহলের সঙ্গে সেই জ্বালাটা পরের প্রশ্নে সম্পূর্ণ লুকোতে পারিনি।

একটু তেতো গলাতেই বলেছি, 'গুরুতর কিছুর হদিস সরকার সাহেবের দৌলতেই পাওয়া যাচ্ছে নাকি? তাঁর সঙ্গে হঠাৎ এত দহরম মহরম এই জন্যে?'

'তা হতে পারে।' আমার মেজাজ দেখে মহান্তি এবার হেসে ফেলেছেন।

পাঁচ

মামাবাবু গত দু-দিন যে রহস্য নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে আছেন সেটা যে কত বড়ো গুরুতর ও তার হদিস পাওয়ার ব্যাপারে সরকার সাহেবের ভূমিকা যে কতখানি, সেইদিন দুপুরেই তা জানা গেল।

মামাবাবু ফিরলেন বেশ বেলায়। সঙ্গে যেমন সন্দেহ করেছিলাম—সেই সরকার সাহেব। তাঁকে নিয়েই ভোরবেলায় মামাবাবু বেরিয়েছেন।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যাওয়ায় মহান্তির সঙ্গে আমি বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই মামাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মামাবাবু কোথায় গেছেন বলে যাননি। এখানকার নিষেধ নিজেই প্রথম ভেঙে লোধমা পাহাড় ছেড়ে তিনি নেমে গেছেন এটুকু শুধু জানা গেছে।

মুখে কিছু না বললেও মহান্তি যে খুব নির্বিকার নিশ্চিন্ত তা মনে হয়নি। লোধমা পাহাড় থেকে নামা-ওঠার সাধারণ রাস্তায় একটু এগিয়ে গিয়ে খোঁজ করবার কথা তুলতেই মহান্তি রাজি হয়ে গেছে।

পাহাড় থেকে উতরাই যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে একটা ঢিবির পাশে বড়ো একটা গাম্ভারি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে বৃথাই কিন্তু চারিদিক ব্যাকুলভাবে লক্ষ করেছি। বেশ

pathagar.net

একটু ভাবিত হয়ে নীচে খোঁজ করতে যাওয়ার জন্যে যখন তৈরি হয়েছি তখন ছাউনি থেকে রামস্বরূপ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়েছে যে সরকার সাহেবের সঙ্গে মামাবাবু এইমাত্র ফিরে এসে আমাদেরই ডাকছেন।

সাধারণ রাস্তা ছেড়ে মামাবাবু তাহলে কোন চড়াই ভেঙে লোধমা পাহাড়ে উঠলেন? গেছলেনই বা তিনি কোথায়?

সেসব কথা জিজ্ঞাসা করবার ফুরসত মিলল না।

ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামাবাবু মহান্তিকে প্রায় যেন আদেশই দিলেন, 'এখনই সকলকে জানিয়ে দাও যে, লোধমা পাহাড় থেকে বাইরে যাওয়ার আর মানা নেই।'

'তার মানে?' সবিস্ময়ে প্রশ্নটা না করে পারলাম না, 'সে খ্যাপা হাতিটা মারা পড়েছে, না এ তল্লাট ছেড়ে গেছে?'

'মারা পড়েছে কি না এখনও জানি না,' মামাবাবু একটু তীক্ষ্ণস্বরে জানালেন, 'কিন্তু এ তল্লাটে কোনোদিন সে আসেইনি। মহান্তির আদিবাসী চাপরাশি যেদিন জঙ্গলের পথে মারা পড়ে সেদিন অন্তত নয়।'

'সে কী!' মহান্তি বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাপরাশি তাহলে মারা গেল কী করে? তার হাতির পায়ে থেঁতলানো লাশই তো পাওয়া গেছল।'

'তা যে গেছল সে তো শোনা কথা মাত্র', 'মামাবাবু বললেন, 'নিজের চোখে তো কেউ আমরা দেখিনি। বাঙ্গুরকেলা থেকে পুলিশের একজন লোক এসে লাশ পোড়াবার অনুমতি দেওয়ার কথা। খ্যাপা হাতির ভয়ে কেউ আসেনি। ওখান থেকেই হুকুম ছেড়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু চাপরাশি মরা পড়বার দিন খ্যাপা হাতিটা যে এ তল্লাটে আসেনি সেটা অমন নিশ্চিত জানলেন কী করে?' বেশ সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম!

'জানলাম, মহাবুয়াং-এর একজন শিকারির সঙ্গে কথা বলে।' সরকার সাহেব এবার জবাব দিলেন, 'তিনি ওইদিনই মহাবুয়াং-এর জঙ্গলে হাতিটার পেছনে অনেক ছোটাছুটি করেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে নীচের পাহাড়ি রাস্তায় আজই সকালে দেখা—মহাবুয়াং থেকে মি. নাগাপ্পার কাছে আসছেন।

নাগাপ্পার নামটা শুনে নিজের অজান্তেই কেন চমকে উঠলাম প্রথমে বুঝতে পারলাম না।

মামাবাবু যে খবরটা দিলেন তাতে লোধমা অঞ্চলের খ্যাপা হাতির ভয়টা ঘুচল বটে, কিন্তু আরেকটা রহস্য গভীর শুধু নয় ভয়ংকর হয়ে দেখা দিল।

মহাবুয়াং থেকে খ্যাপা হাতিটা পাহাড় ডিঙিয়ে এদিকে আসেইনি। অন্তত আদিবাসী পিয়নটি যেদিন মারা গেছে সেদিন মহাবুয়াং-এর জঙ্গলেই সেটা যে ছিল, তার চাক্ষুষ প্রমাণ আছে।

আদিবাসী পিয়নটি তাহলে মারা গেল কীসে?

খ্যাপা হাতি তাকে পায়ে থেঁতলে মেরেছে এ খবরটাই বা রটল কেমন করে?

এ খবর লোধমা পাহাড়ে মহান্তির কাছে যে নিয়ে এসেছিল সেই আদিবাসী দূতের পক্ষে মিথ্যে করে এমন একটা খবর বানানো তো সম্ভব নয়!

সম্ভব হলেও তাতে তার স্বার্থ কী?

মহান্তির পিয়ন তার পাহাড়ি বসতি থেকে লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে কাজে যোগ দিতে আসছিল। গরিব পাহাড়ি আদিবাসী। কেড়েকুড়ে নেবার মতো পয়সাকড়ি তার কাছে ছিল না নিশ্চয়। কোনো সময়েই তা থাকে না। তাহলে তাকে নির্জন বনের রাস্তায় এমনভাবে কে কী উদ্দেশ্যে মারতে পারে?

এ খুনটা কী তাদের নিজেদের গাঁয়েরই কোনোরকম আকচা-আকচি কি ঝগড়াঝাটির পরিণাম?

pdfbagar.net

তা হওয়া প্রায় অসম্ভব। সভ্য মানুষের সংস্পর্শে বেশিদিন আসেনি বলে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা এখনও তাদের নির্মল সরলতা হারায়নি। ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশেও এমন লুকিয়ে-চুরিয়ে খুন তারা করতে যাবে না। সে খুনকে খ্যাপা হাতির কাজ বলে সাজাবার মতো প্যাঁচালো বুদ্ধিও তাদের নেই।

মামাবাবু বলেছেন যে হাতির পায়ে থেঁতলানো লাশের কথা আমরা কানে শুনেছি মাত্র। তার চাক্ষুষ প্রমাণ নেই।

তা না থাকলেও, যে আদিবাসী দূত খবরটা এনেছিল, সে অন্তত চেহারা দেখেছে, শোনা কথার ওপর নির্ভর করে আসেনি। সে স্বচক্ষে মৃতদেহের যে চেহারা দেখেছে, তা নিশ্চয় হাতির পায়ে থেঁতলানো বলে ভুল হতে পারে। মৃত পিয়নটির লাশের ওইরকম পেষা দলা অবস্থা কেমন করে হল সেটাও একটা দুর্ভেদ্য রহস্য।

নিজের মনে এসব তোলাপাড়া করতে করতে সরেজমিনে ব্যাপারটার তদন্ত করে আসা একান্ত দরকার বলে মনে হল।

পিয়নের মৃতদেহ সেখানে অবশ্য পড়ে নেই। অন্য চিহ্নটিহ্নও কিছু এতদিন বাদে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবু জায়গাটা স্বচক্ষে দেখে ও আদিবাসীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে হয়তো রহস্যের কোনো খেই পাওয়াও যেতে পারে।

এ ছাড়া এ রহস্যভেদের আর কোনো উপায় তো আমি দেখতে পেলাম না।

আমার মাথায় যে বুদ্ধি এসেছে মামাবাবুর সঙ্গে সেটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁকে পাচ্ছি কোথায়?

পেলেও এসব কথা শোনবার তাঁর সময় কই?

সেদিন দুপুরে খ্যাপা হাতির এ অঞ্চলে উপদ্রবের গুজবটা মিথ্যে বলে জানিয়ে দেবার পর মামাবাবু আসল রহস্যভেদের কী রাস্তা নিয়েছেন, তা বোঝা আমার অসাধ্য।

দুপুরের স্নানাহার কোনোরকমে নম নম করে সেরেই তিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছেন। এবারে অবশ্য সেখানে প্রবেশ নিষেধ নয়। সরকার সাহেব ছাড়া মহান্তিকেও এবার ডেকে নিয়ে গেছেন।

মামাবাবু আর মহান্তিকে না জানিয়ে শুধু নিজের মতলবে আদিবাসীদের বসতিতে খোঁজ করতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে মরিয়া হয়েই বিকেলবেলা মামাবাবুর ল্যাবরেটরির তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম।

আমার অনাহূত আবির্ভাবে কারোর আপত্তি যেমন দেখা গেল না, তেমনি কোনো অভ্যর্থনাও নয়। সরকার সাহেব ও মহান্তি তবু একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলে, মামাবাবু সেটুকু ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

তাঁরা তখন সামনে কটা ছেঁড়াখোঁড়া কাগজ রেখে তারই আলোচনায় তন্ময়।

আলোচনাটা আমার কাছে গোপন করবার কোনো চেষ্টা দেখলাম না, কিন্তু খানিকক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থেকে যেটুকু বুঝলাম, তাতে তা নিয়ে অত উত্তেজিত আলোচনা অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকল।

কাগজ কটা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িরই উপযুক্ত। সেরকম কোনো জঞ্জালের জায়গা থেকেই সেগুলো কুড়িয়ে আনা হয়েছে। এনেছেন সরকার সাহেব।

টেবিলের ওপর যেটা রাখা ছিল সেটা তুলে নিয়ে একবার দেখলাম। কাগজটা দুমড়ে দলা পাকিয়ে কেউ ফেলে দিয়েছিল। সেটা এখন একটু-আধটু টেনেটুনে পাত করবার চেষ্টা হয়েছে। কেন যে হয়েছে, তা বোঝা আমার অসাধ্য। তাড়াতাড়িতে এটা-ওটা টোকবার জন্যে ব্যবহার করে তারপর কাজ হয়ে গেলে আজেবাজে কাগজ হিসাবে যা ফেলে দেওয়া হয়, এগুলো তার বেশি কিছু নয়।

pathagar.net

আমি যেটা হাতে পেয়েছিলাম তাতে পেনসিলে এক কোণে অস্পষ্টভাবে শুধু লেখা, 'মেটাল বুলেটিন ১৯৩৮ ৭৮ নম্বর, এক আউন্স,—ছত্রিশ ডলার।'

অন্য কাগজ কটায় সেই ধরনেরই আরও কিছু হয়তো আছে। লেখা যা আছে তা খনিজ সম্বন্ধে টুকিটাকি তথ্য বলেই মনে হয়। খবর হিসেবে হয়তো দামি, কিন্তু তথ্যের চেয়ে কাগজগুলোই বেশি উত্তেজনা জাগিয়েছে দেখলাম।

মামাবাবু তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সরকার সাহেবের কাছে কাগজগুলো কোথায় কীভাবে পাওয়া গেছে জেনে নিচ্ছিলেন।

'প্রথম কাগজটা তো ক্যান্টিনে যাবার রাস্তার ধারেই পেয়েছিলেন বললেন।' মামাবাবু সরকার সাহেবের স্মৃতিটা যেন উসকে দেবার চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু ওরকম একটা দলা পাকানো কাগজ রাস্তার ধারের ঝোপ থেকে তুলতে ইচ্ছে হল কেন?'

সরকার সাহেব সবিস্তারে তাঁর কাগজ পাওয়ার ইতিহাস এবার বলতে বসলেন।

কাগজগুলো পাওয়ার জন্যে জুতোজোড়ার কাছে নাকি তিনি ঋণী। নতুন কেনা জুতো। গোড়ালির দিকটায় এখন একটু লাগে। সেদিন ক্যান্টিন থেকে ফেরবার সময় একটু বেশি লাগছিল বলে শুকতলার গোড়ালির দিকটা সামান্য উঁচু করবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে গিয়ে রাস্তার ধারে ঝোপের গায়ে দলা পাকানো কাগজের ডেলাটা দেখতে পান। তখনকার মতো কাজে লাগিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে কাগজের ডেলাটা ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ কী খেয়ালে সেটা খুলে দেখেন। খুলে ওই টুকিটাকি লেখাগুলোর কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে বলে প্রথম বুঝতে পারেননি...

সরকার সাহেব যেভাবে তাঁর বিবরণ ফেঁদেছেন, তাতে কতক্ষণে তা শেষ হবে কে জানে!

বেশিক্ষণ আর ধৈর্য ধরতে না পেরে তাঁর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বললাম, 'আমার সামান্য একটু কথা বলবার ছিল—কথাও ঠিক নয়, আসলে একটু অনুমতি চাইতে...'

'না, না অনুমতি চাইবার কী আছে!' মামাবাবু আমাকে শেষ করতেই দিলেন না। আমার কথাটার সম্পূর্ণ ভুল মানে করে কোনোরকমে নিজেদের আলোচনায় ফিরে যাবার তাড়ায় বললেন, 'তুমিও খোঁজো না। সেরকম কাগজপত্র কিছু পেলে তক্ষুনি আমাদের দেখাতে কিন্তু ভুলো না!'

হতভম্ব হয়ে খানিক মামাবাবুদের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। তাঁরা ইতিমধ্যে ছেঁড়া কাগজের দলার আলোচনায় ফিরে গিয়েছেন। আমি রইলাম কি গেলাম, সে খেয়ালও বোধ হয় নেই।

এরপর ভেতরে ভেতরে গজরাতে গজরাতে নিঃশব্দে চলে যাওয়া ছাড়া আর কী করা যেতে পারে!

তাই গেলাম। এবং ল্যাবরেটরির তাঁবু থেকে বেরিয়েই বঙ্কুবাবুকে কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখে হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।

বঙ্কুবাবু আমায় বার হতে দেখে অপরাধীর মতো সরে পড়বার চেষ্টায় ছিলেন। আমিই তাঁকে ডেকে থামালাম, 'শুনুন শুনুন বঙ্কুবাবু! পালাচ্ছেন কেন!'

বঙ্কুবাবু আমার ডাকটায় অভিযোগের গন্ধ কোথায় পেলেন জানি না, কিন্তু এবারে কাঁদুনে গলায় তাঁর এখানে উপস্থিত থাকার কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'আমার কী দোষ বলুন তো!'—বঙ্কুবাবু আমাকেই সালিশি মানলেন, 'জরুরি বলে যে চিঠিগুলো টাইপ করে পাঠাতে হুকুম দিয়ে এলেন সেগুলো সই ছাড়াই যাবে? এই আসেন এই আসেন ভেবে সেই বিকেল তিনটে থেকে অপিসে বসে আছি। হঠাৎ এসে পড়ে অফিসে না পেলেই তো কুরুক্ষেত্র বাধাবেন! বিকেলের চা জলখাবারটা পর্যন্ত ক্যান্টিনে খেতে যেতে পারিনি...'

pathagar.net

এইটেই আসল দুঃখের কারণ বুঝে বললাম, 'চা জলখাবারটা অফিসেই তো আনিয়ে খেতে পারতেন বঙ্কুবাবু।'

'আনিয়ে খেতে পারতাম!' আমার কথা শেষ হতে না হতে বঙ্কুবাবু চিড়বিড়িয়ে উঠলেন, ক্যান্টিনে সকলের ওপর কী হুকুম হয়ে গেছে জানেন? অফিসে আমাকে একটা বিস্কুটের টুকরোও কেউ যেন না এনে দেয়। আপনাদের সরকার সাহেব আমায় মানুষ বলে গণ্য করেন না, জানেন ছোটোবাবু? আমি ওঁর কাছে একটা কুকুর বেড়ালের অধম। এই যে সই করাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ এ ভোগান্তি হবে বলুন তো!'

'আর ভোগান্তির দরকার নেই।' আমি হেসে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনি অনায়াসে আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে আসতে পারেন।'

'ক্যান্টিনে যাব, আপনার সঙ্গে!' বঙ্কুবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেই, আবার যেন অন্ধকার হয়ে গেল, 'কিন্তু সরকার সাহেব!'

'সরকার সাহেবের জন্যে কোনো ভাবনা নেই।' আমি বেশ জোর দিয়ে জানালাম, 'ওঁরা যে গবেষণায় ডুবেছেন তা থেকে আজ রাত পর্যন্ত উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'ঠিক বলছেন?' বঙ্কুবাবু উৎসুক ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে মনের ভাবটা যেন বোঝবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমায় বকুনি খাওয়াবার ফিকির করছেন না তো?'

'না, না!' একটু ধমকের সুরেই এবার বললাম, 'আপনাকে মিছিমিছি বকুনি খাইয়ে আমার লাভ কী? বকুনির চেয়ে ভালো কিছু খাওয়াবার জন্যেই ক্যান্টিনে নিয়ে যাচ্ছি।'

বঙ্কুবাবুর মুখ দেখে মনে হল, পারলে সিড়িঙ্গে বকের মতো চেহারা নিয়েই তিনি নৃত্য করতেন। তার বদলে গলাটা আরও তীক্ষ্ণ করে তাঁর উল্লাসটা প্রকাশ করে বললেন, 'ব্যাস! রাত পর্যন্ত যদি খোঁজ করবার সময় না পায় তাহলে কাল আমাকে পাচ্ছো কোথায়?'

'কেন বলুন তো?' একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

'বাঃ কাল ছুটির দিন না!' বঙ্কুবাবু সরকার সাহেবের ওপর যেন এক হাত নেওয়ার মতো করে জানালেন, 'সরকার সাহেবের ত্রিসীমানায় আমি থাকব মনে করছেন?'

'কাল আপনার ছুটির দিন!' এ খবরটায় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'তাহলে আমার সঙ্গে একটা কাজে আপনাকে থাকতে হবে।'

'কী কাজ?' বঙ্কুবাবু একটু যেন সন্দিগ্ধ হয়ে রাস্তার ওপর থেমে পড়লেন। ক্যান্টিনে খাওয়াতে চাওয়াটা কী ধরনের টোপ তাই বোধ হয় তখন তিনি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

'শক্ত কিছু নয়।' তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'চলুন ক্যান্টিনে বসেই বলব।'

ছয়

pathagar.net

ক্যান্টিনে বসে খাওয়াতে খাওয়াতেই বঙ্কুবাবুকে আমার মতলবটা জানালাম।

বঙ্কুবাবু ও সেইসঙ্গে আমার, দুজনেরই ভাগ্য সেদিন ভালো। এ কদিন খ্যাপা হাতির ভয়ে দূরের রেলঘাঁটি গগনপোষ থেকে জিনিসপত্র আমদানি বন্ধ থাকায় ক্যান্টিনে একটু টানাটানি করে চালাতে হচ্ছিল। কতদিন হাতির উপদ্রবে রাস্তাঘাট বন্ধ থাকবে তার তো ঠিক নেই! মালপত্র একবার ফুরোলে মাথা খুঁড়লেও আর পাওয়া যাবে না। যতদিন যাচ্ছিল, ক্যান্টিনের কর্তা ছোটেলাল তাই ততই খাবারদাবারের বেলা হাত গুটিয়ে নিচ্ছিল বাধ্য হয়ে।

সেদিন খ্যাপা হাতির ভয় ঘুচে যাবার দরুন ছোটেলাল একেবারে দরজা হাতে অনেক কিছু খাবার বানিয়ে ফেলেছে।

বঙ্কুবাবুকে চায়ের সঙ্গে প্লেট ভরতি করে সিঙাড়া কচুরি পানতুয়া শুধু নয়, তার সঙ্গে টিন খুলিয়ে সসেজও ভাজিয়ে দিয়েছি।

এইসব চর্বচোষ্যের সদ্ব্যবহার করতে করতে আমার প্রস্তাবটা শুনে বঙ্কুবাবু প্রথমটা কেমন একটু বিমূঢ়ই হলেন মনে হল। যার জন্যে এত ঘুস, সে কাজটা বেশ গোলমেলে কিছু বলে তিনি নিশ্চয় আশঙ্কা করেছিলেন।

তার বদলে আমার সঙ্গে শুধু একটু আদিবাসীদের দূরের পাহাড়ি গাঁয়ে টহল দিতে যাওয়া! সে যাওয়াও আবার নিতান্ত নীরস বেকার হয়রানি নয়। সঙ্গে রসদ হিসেবে ছোটেলালকে স্যান্ডউইচ সসেজ ইত্যাদি যে পরিমাণ প্যাক করে রাখতে বললাম, তাতে বঙ্কুবাবু ব্যাপারটা সামান্য একটু দেরিতে বুঝে বিস্ফারিত চোখে আমার জয়ধ্বনিটা কোনোরকমে যেন গলায় চেপে রাখলেন।

তাঁর রাজি হওয়াটা মুখের ভাষায় আর আমায় জানতে হল না।

আদিবাসী পিয়নটি যেখানে মারা গেছে, দূরের সেই জংলা পাহাড়ে পরের দিন যখন পৌঁছোলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। ভোর পাঁচটার আগে লোধমা থেকে বেরিয়ে মাঝে আধঘণ্টা শুধু সঙ্গের ফ্লাস্ক ও ঝোলার চা জলখাবার খাওয়ার জন্যে এক জায়গায় বিশ্রাম করেছি। তার মানে পাক্কা সাড়ে চার ঘণ্টা সমানে আমাদের হাঁটতে হয়েছে। সময়টা কম নয়, কিন্তু সঙ্গে পথ দেখাবার জন্যে বঙ্কুবাবু না থাকলে এর ডবল হেঁটেও জায়গাটায় এসে পৌঁছোতে পারতাম কি না সন্দেহ।

বঙ্কুবাবুকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যে কত বড়ো সৌভাগ্য, রওনা হবার পরেই বুঝতে পেরেছি। এ অঞ্চলে ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে বেড়ানোই বঙ্কুবাবুর কাজ শুধু নয়, বাতিকও। এ বেয়াড়া বেপোট পাহাড় জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি আদিবাসীরাও তাঁর মতো জানে কি না সন্দেহ। গোড়াতেই সোজা জানা রাস্তায় না গিয়ে যে পথ ধরে তিনি লোধমা পাহাড় থেকে আমায় নামালেন, সেটা কোনোরকম রাস্তাই নয়। প্রায় অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা গোরু ছাগলের পায়ে গড়ে ওঠা একটা টানা দাগ মাত্র। কিন্তু প্রায় পাঁচ মাইল ঘুর বাঁচাবার এটাই নাকি একটা অজানা পাকদণ্ডী।

এরকম 'সর্টকাট' বঙ্কুবাবুর পুঁজিতে আরও অনেক আছে। এই বিশেষ গুণপনার কথা জানা না থাকলেও আগের দিন বিকেলে মামাবাবুর ল্যাবরেটরির তাঁবু থেকে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে সামনেই যখন বঙ্কুবাবুকে দেখি, তখনই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাঁকে একেবারে আদর্শ সহায় বলে বুঝতে পেরেছিলাম। যে কাজ আমি করতে যাচ্ছি, তার জন্যে মন্ত্রগুপ্তিটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সে দিক দিয়ে বঙ্কুবাবুর মতো নিরাপদ নির্বোধ অথচ আমার যেটুকু দরকার সেদিক দিয়ে তুখোড় লোক সমস্ত লোধমা পাহাড়ে আর কাকে পেতাম!

শুধু এ অঞ্চলের ওয়াকিফহাল পথের দিশারি হিসেবেই বঙ্কুবাবুর সঙ্গ মূল্যবান নয়, তাঁর একটা বিশেষ 'পয়'ও আছে দেখলাম।

আদিবাসী পিয়নের খুন হবার জায়গাটা একবার স্বচক্ষে দেখে যেতে এসে সেদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কিছু একটা দেখবার ও জানবার সুযোগ হল, এ ধান্দায় আসার সময় যা সত্যি কল্পনাও করতে পারিনি।

দেখালেন আবার বঙ্কুবাবুই।

বেশ একটু বেয়াড়া চড়াই ভেঙে তখন আদিবাসীদের বসতির জংলা পাহাড়ের মাথার উপত্যকাটায় পৌঁছেছি। চারিদিকে অত্যন্ত ঘন শাল শিশু কেন্দু বহেড়ার বন।

তারই ভেতর দিয়ে বড়ো বড়ো পাথুরে ঢিবির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বঙ্কুবাবু সামনে থেমে গিয়ে হাত নেড়ে আমায় পা বাড়াতে নিষেধ করেছেন।

তারপর উত্তেজিত চাপা গলায় পিছু ফিরে বলেছেন, 'ওই ঢিবিটার আড়ালে থেকে দেখুন।'

pathagar.net

সন্তর্পণে টিবিটার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার আড়াল থেকে দেখে সত্যিই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেছি।

যেখানে পাথুরে টিবির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে দূরের পাহাড়ি-প্রান্তরে একটা লোককে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। মানুষটি মাটির ওপর উবু হয়ে বসে কী যেন করছে। কী করছে এতদূর থেকে তা বোঝা না গেলেও মানুষটাকে নিজের কাজে তন্ময় বলেই মনে হল।

লোকটি আমাদের দিকে পিছু ফিরেই বসেছিল, কিন্তু তাতেও তাকে চেনবার জন্যে চোখে দূরবিন তোলবার দরকার হল না।

চেহারা পোশাকের আদল থেকেই লোকটির পরিচয় তখন আমি নির্ভুলভাবে বুঝে ফেলেছি। বোঝবার বিশেষ কারণ এই যে, আগের দিন মামাবাবুর কাছে কটি অদ্ভুত খবর শোনবার পর থেকে এই লোকটির কথাই সারাক্ষণ ভাবছিলাম।

হ্যাঁ, মামাবাবুর কাছে যার নাম শুনে অজান্তেই চমকে ওঠবার কারণটা গতকাল প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, ইনি সেই নাগাপ্পা।

পুরো একটা দিন মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে নাগাপ্পা সম্বন্ধে বেশ কিছু রহস্যের খেই তখন পেয়ে গেছি।

লোধমা পাহাড় থেকে দূরবিনে আদিবাসীদের করালী পাহাড়ে সেদিন যে এই নাগাপ্পাকেই উঠতে দেখেছিলাম এ বিষয়ে আমার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

শুধু এই একটা ব্যাপারই নয়, নাগাপ্পার গতিবিধির মধ্যে সন্দেহজনক আরও কিছু আছে।

প্রথম দিন করালী পাহাড়ে তার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই তো অদ্ভুত। আমি না হয় খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার দরুন খ্যাপা হাতির খবর আর লোধমা পাহাড় থেকে কোথাও যাবার নিষেধের কথা জানতে পারিনি, কিন্তু নাগাপ্পা তো এ খবর আগের রাত্রেই পেয়েছেন। মহান্তি লোধমার সব ছাউনিতেই তো ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

নাগাপ্পা সে নিষেধ অমান্য করে পরের দিন সকালেই তাহলে বার হয়েছিলেন কেন?

তাঁর সঙ্গে সেদিন যখন দেখা হয় তখন তিনি নিজের ছাউনিতে ফিরছেন। তার মানে আমার চেয়েও ভোরে তিনি লোধমা পাহাড় থেকে বেরিয়েছিলেন। মহান্তির নিষেধ এভাবে অমান্য করে অত ভোরে বেরিয়ে যাবার কারণটা কী!

দেখা হবার পর তাঁর আর একটা ব্যবহারও অদ্ভুত। তিনি আদিবাসীদের 'এঞ্জা' পাহাড়ের পরিচয় দিয়ে সেখানে ওঠা সম্বন্ধে আমায় সাবধান করেছিলেন, কিন্তু খ্যাপা হাতির ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও তো আমায় জানাননি!

নাগাপ্পা সম্বন্ধে এত কথা সে মুহূর্তে অবশ্য ভাবিনি।

অত তন্ময় হয়ে নাগাপ্পা কী করছেন সেইটেই তখন গভীর কৌতূহলের বিষয়।

আমাদের এখন কী করা উচিত সেটাও ঠিক করতে পারছিলাম না।

সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে নাগাপ্পার সামনে হাজির হবার বাধা কিছু নেই।

নাগাপ্পা যদি আসতে পেরে থাকেন তাহলে আমরাই বা এ পাহাড়ে টহল দিতে আসতে পারব না কেন? সোজা গিয়ে দেখা দিয়ে নাগাপ্পা কী করছেন জিজ্ঞাসাও করা যায়।

নাগাপ্পা তাহলে কী করবেন?

যা তিনি করছেন তা খুব প্রাণ খুলে জানাবার কাজ নিশ্চয় নয়। সুতরাং আমাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশি বোধ হয় তিনি হবেন না।

কিন্তু অসন্তোষটা কী চেহারা নেবে তারপর?

pathagar.net

pathagar.net

বেশ একটু অসুবিধেয় পড়লেও একটা কিছু ঝুটো কৈফিয়ত দিয়ে তিনি ব্যাপারটা নির্দোষ বলে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন কি? তা করা-ই সম্ভব।

তা যদি করেন তাহলে লোকসান কিছু নেই। তাঁর কৈফিয়তটা মেনে নেবার ভান করে আমরা আসল রহস্যটা তারপর সন্ধান করবার চেষ্টা করতে পারি।

কিন্তু নাগাপ্পার প্রতিক্রিয়াটা গোড়াতেই সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

ছোটোখাটো অপরাধ নয়, রীতিমতো একটা মানুষ খুনের ব্যাপার। সে ভয়ংকর ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে একটা দৈব দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার যে কৌশল করা হয়েছে তার ভেতরেও দারুণ শয়তানি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এসব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে নাগাপ্পার সত্যিই যদি গোপন সংশ্রব থাকে তাহলে তিনি এ জায়গায় আমাদের হঠাৎ উদয় হতে দেখে শুধু একটু মিথ্যে কৈফিয়ত দিয়ে সাধু সাজবার চেষ্টা নাও করতে পারেন।

এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর অবশ্য আর নেই। এ সময়ে এখানে তাঁর লুকিয়ে আসা-ই তার প্রমাণ।

এ অবস্থায় তাঁর গোপন কাণ্ডকারখানার অবাঞ্ছিত সাক্ষী হিসেবে আমাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থার কথা তাঁর মনে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

আমরা গুনতিতে দুজন। কিন্তু দুজনেই নিরস্ত্র, তার ওপর বন্ধুবাবু তো যাকে বলে একেবারে শূন্য,—সহায়ের বদলে দায়।

নাগাপ্পার মতো মানুষ এখানে শুধু হাতে নিশ্চয় আসেননি। তা ছাড়া হাতে একবার খুনের রক্ত যার লাগে, দ্বিতীয়বার সে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলেই জানি। আদিবাসী চাপরাশির থেঁতলানো দেহটা যেখানে পাওয়া গেছে তারই কাছাকাছি আর দুটো লাশ রেখে দিয়ে যেতে নাগাপ্পার মতো মানুষের দ্বিধা সংকোচ খুব বেশি সুতরাং হবে না।

আমাদের মতো দুটো বেয়াড়া সাক্ষীর মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করে দেওয়ার এমন সুযোগই বা নাগাপ্পা ছাড়বেন কেন?

এই নির্জন পাহাড়ে কোথায় কী হচ্ছে কেউ দেখবার নেই। পিস্তল ছুঁড়ে যদি কেউ আমাদের খতম করে তার শব্দটা পর্যন্ত পাহাড়ের এ ঢাল ছাড়িয়ে ওদিকের আদিবাসীদের গ্রামটা পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

মনে মনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই এতগুলো যুক্তি সাজিয়েও নিজেকে সামলানো শক্ত হয়ে উঠল।

এত বড়ো একটা সুযোগ পেয়েও নাগাপ্পাকে শুধু দূর থেকে লক্ষ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। সামনাসামনি গিয়ে উপস্থিত না হই, নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কী করছেন আরও একটু কাছে গিয়ে লুকিয়ে না দেখাটা লজ্জাকর কাপুরুষতা বলে মনে হল।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বন্ধুবাবুকে নীরব থাকবার ইশারা করে পাথুরে ঢিবিগুলোর পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে দু-পায়ের বেশি কিন্তু এগোতে পারলাম না। পেছন থেকে লম্বা সিড়িঙ্গে হাত বাড়িয়ে বন্ধুবাবু আমার একটা পা তখন ধরে ফেলেছেন। চমকে ফিরে তাকিয়ে তাঁর মুখে চোখের যে চেহারা দেখলাম তো ভোলবার নয়!

সেখানে করুণ মিনতি, না হতাশ আতঙ্ক, না আমার আহম্মকিতে অক্ষম রাগ, কোনটা ফুটে উঠেছে বোঝা শক্ত। সব কটা ভাবই বোধ হয় একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বন্ধুবাবু অমন করে ধরে ফেলায় চমকে ওঠার সঙ্গে বেশ একটু গরমই প্রথমে হয়ে উঠেছিলাম। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই তিনি কত বড়ো উপকার যে করেছেন তা টের পেলাম।

pathagar.net

পাথুরে ঢিবির আড়ালেই তখনও দুজনে আছি। বঙ্কুবাবুর ধরা, আর আমার দু-পা গিয়ে ফিরে দাঁড়ানোতে নীচের শুকনো ঝরা পাতায় শব্দ যা হয়েছে তা নামমাত্রই বলা উচিত।

কিন্তু নাগাপ্পা শয়তান গোছের মানুষ বলেই বোধ হয় তাঁর কান শিকারির মতো সজাগ।

দুটো বড়ো পাথুরে ঢিবি আর তার সামনের একটা চারা শাল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নাগাপ্পাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম ওই সামান্য শব্দেই তিনি হুঁশিয়ার হয়ে ফিরে বসেছেন। শুধু ফিরে বসেননি, ডান হাতটাও তাঁর আমাদের এই পাথুরে ঢিবিগুলোর দিকেই তোলা। ভালো করে এত দূর থেকে দেখা না গেলেও তাতে একটা পিস্তলই ধরা আছে বুঝলাম।

পাথুরে ঢিবি দুটোর আড়ালে সামনের ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে আমাদের দেখতে পাওয়া নাগাপ্পার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তিনি শুধু শুকনো পাতার ওপর আমাদের ক্ষণিকের নড়াচড়ার শব্দই পেয়েছেন, কিন্তু তাহলে অতটা অস্থির হয়ে তাঁর পিস্তল উঁচিয়ে ধরাটাই বেশ একটু অস্বাভাবিক নিশ্চয়। শুধু বন্য কোনো জন্তুর ভয়েই কি এই উত্তেজিত হুঁশিয়ারি? যেকথা বিশ্বাস করা শক্ত। এসব অঞ্চলে হিংস্র শ্বাপদ নেই এমন নয়। কেঁদো না হোক চিতা আর ভালুকের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এখন সব কিছু উলটে গেলেও প্রথমে সেই শিকারের লোভেই এখানে এসেছিলাম।

কিন্তু সেসব শিকারের জানোয়ারের তো এই দুপুরবেলায় এরকম পাহাড়ের মাথায় হানা দিতে আসা প্রায় অসম্ভব। নাগাপ্পার অমন সজাগ সতর্কতার লক্ষ্য অন্য কিছু বলেই তাই মনে হল।

অনুমানে যে ভুল হয়নি তৎক্ষণাৎ তার অস্বস্তিকর প্রমাণ পেলাম। নাগাপ্পা হঠাৎ উঠে পড়ে হিংস্র শ্বাপদের তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়েই সন্তর্পণে এক-পা এক-পা করে আমাদের ঢিবিটার দিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। পিস্তলটা ডান হাতে আগের মতোই উঁচানো।

আমাদের অবস্থা তখন যে কী তা বোঝানো শক্ত। কী যে করা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে অস্থির যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে তখন অসহ্য হয়ে উঠছে।

যেভাবে নাগাপ্পা এগিয়ে আসছেন তাতে মিনিট পাঁচেক বাদেই তো আমাদের ঢিবিটার কাছে পৌঁছে যাবেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে এখানে লুকিয়ে থাকব, না ছুটে পালাব এখনই?

পিস্তলের লক্ষ্যভেদ খুব শক্ত বলে জানি। সেই ভরসায় এখনই ছুটে পালালে হয়তো গুলি খেয়ে মরার পরিণামটা এড়াতে পারি।

কিন্তু সত্যিই কি নাগাপ্পা আমাদের মারতে পিস্তল ছুঁড়বেন? সভ্য জগতের মানুষ হয়ে সে কথাটা মন সহজে বিশ্বাস করতেই চায় না। ছুটে পালানো বা চুপ করে লুকিয়ে থাকার বদলে এখনই উঠে দাঁড়িয়ে নাগাপ্পাকে দেখা দেবার কথাও তাই একবার মনে হল। বঙ্কুবাবুর দিকে ফিরে তাঁর মনের অবস্থাটা অনুমান করবার চেষ্টা করলাম। চোখের আর হাতের ইশারায়, উঠে দাঁড়িয়ে দেখা দেবার প্রস্তাবটাও চাইলাম তাঁকে বোঝাতে।

বুঝতে পারুন বা না পারুন তিনি হাত নাড়ার ইঙ্গিতে অত্যন্ত কড়া ভাবে যেমন আছি তেমনি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতেই বললেন বলে মনে হয়।

বোকাসোকা পেটুক ভালোমানুষ হলে কী হয় বঙ্কুবাবুর ভেতরের চোখ যে আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পেলাম। তাঁর বারণ না মানলে এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত সেদিনই হয়ে যেত এটুকু এখন বলতে পারি।

উঠে দেখা দেওয়া বা ছুটে পালানো, দুটোর কোনোটাই না করে পাথুরে ঢিবির ফাঁক দিয়ে তখন নাগাপ্পাকে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ করছি।

নাগাপ্পা আরও কয়েকটা পা এগিয়ে এলেই আমাদের দেখতে পাবেন এইটেই তখন ভয়।

pathagar.net

কিন্তু নাগাপ্পা আচমকা যা করে বসলেন সেইটেই অপ্রত্যাশিত। এগিয়ে আসতে আসতে নাগাপ্পা হঠাৎ পিস্তলটা ছুঁড়ে বসবেন এটা সত্যিই ভাবতে পারিনি।

একবার নয় দু-দুবার নাগাপ্পা সামনের দিকে আমাদের ঢিবিটার মাথা ডিঙিয়েই পিস্তল ছুঁড়লেন। গুলিগুলো বৃথাই অবশ্য খরচ হল।

যা ভেবেছিলাম সেই মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দেখা দিলে কী যে হত তা ভালো ভাবেই অনুমান করে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তখন নাগাপ্পার পরের গুলির জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাগাপ্পা কিন্তু আর গুলি ছুঁড়লেন না, এগিয়েও এলেন না আর আমাদের দিকে। যেভাবে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে তিনি আবার আগেকার জায়গায় ফিরে গেলেন তাতে আগের সন্দেহটা ভুল বলেই তিনি বুঝেছেন বলে মনে হল।

নাগাপ্পা ফিরে যাওয়ায় তখনকার মতো হাফ ছেড়ে অবশ্য বাঁচলাম কিন্তু সেদিনকার বিপদ সবে যে তখন শুরু তা কি জানি!

নাগাপ্পা ফিরে গিয়ে আর সে জায়গায় বসলেন না। মাটিতে যে একটা ঝোলা গোছের পড়ে ছিল, এতক্ষণ তা দেখতে পাইনি। সেটার মধ্যে নীচে থেকে কী যেন দু একটা জিনিস ভরে নিয়ে ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নাগাপ্পা সামনের দিকে জংলা পাহাড়ের উলটো দিকের আদিবাসীদের গাঁয়ের পথই ধরলেন।

নাগাপ্পা পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে অন্যদিকের ঢালে একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত একেবারে নিস্পন্দ নীরব হয়ে রইলাম।

চলে যাবার সময় একটিবারও আমাদের দিকে ফিরে না তাকানোতে নাগাপ্পার মনের সন্দেহ দূর হয়ে গেছে বলে বুঝেছিলাম, তবু সাবধানের মার নেই। নাগাপ্পা পাহাড়ের ওপিঠে নেমে যাবার পরও বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে তারপর সন্তর্পণে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কী করছিলেন সেইটেই জানবার চেষ্টা করতে হবে।

জায়গাটায় পৌঁছে কিন্তু হতাশই হলাম! পাহাড়ি মেঠো জমি বেশ শক্ত মাটির ওপর এখানে-সেখানে শাল কেঁদু, বয়ড়া বা অন্য বুনো কাঁটা গাছের চারার ছোটোখাটো সব ঝোপ। খানিকটা দূরেই পাহাড়তলির রাস্তার সেই জায়গাটা যেখানে আদিবাসীর থেঁতলানো লাশ পাওয়া গেছে। আদিবাসীদের সেখানে পোঁতা একটা লম্বা খুঁটির গায়ে বিদঘুটে মুখ-আঁকা একটা মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখার দরুনই জায়গাটা চিনতে পারলাম। বিদঘুটে মুখ-আঁকা হাঁড়িটা ঝোলানো হয়েছে ভূতপ্রেত তাড়াবার জন্যে। উপদ্রবটা খ্যাপা হাতির বা যারই হোক তার পেছনে ভূত-প্রেতের হাত থাকতে বাধ্য এই তাদের বিশ্বাস।

বিদঘুটে মুখ-আঁকা হাঁড়িটা যেখানে ঝোলানো সেখানকার বদলে এ জায়গায় নাগাপ্পা কী করছিলেন প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর শক্ত লালচে মাটির ওপর একটু যেন কী ঘষার দাগ পেলাম। মাটির ওপর থেকে কোনো কিছু চেঁছে নিলে যেরকম দাগ পড়ে অনেকটা সেইরকম।

বঙ্কুবাবুই সে দাগটা প্রথম লক্ষ্য করে দেখিয়ে দিলেন। উৎসাহভরে আমার পাশেই বসে পড়ে বললেন, 'নাগাপ্পা কী করছিলেন, বুঝেছেন এবার? কী একটা এখান থেকে চেঁছে তুলছিলেন। এইতো ঘষার দাগ।'

'তা তো বুঝলাম!' গোয়েন্দাগিরিতে বঙ্কুবাবুর কাছে হার মেনে আপনা থেকেই একটু রুক্ষস্বরে বললাম, 'কিন্তু চেঁছে তুলছিলেন কী? লোকটা মরল ওই রাস্তায়, এখানে তার কী প্রমাণ ছিল যে সরাচ্ছিলেন!'

কী সরাচ্ছিলেন তাও বঙ্কুবাবুরই প্রথম চোখে পড়ল। একটা কাঁটা গাছের তলায় ছোটো একটা যেন গোবরের ঢেলা পড়েছিল আগে দেখতে পাইনি। বঙ্কুবাবু সেইটে একটা কাঠি দিয়ে টেনে এনে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'এই জিনিস নয় তো?'

boiRboi.net

'জিনিসটা কী?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গোবরের মতো দেখাচ্ছে?'

'না গোবর নয়!' বঙ্কুবাবু এবার জোর দিয়ে বললেন, 'তবে অন্য কোনো জানোয়ারের বিষ্ঠাই মনে হচ্ছে। একটা টুকরো শুধু পড়ে আছে।

'নাগাপ্পা এই জিনিস অত তন্ময় হয়ে চেঁছে তুলছিলেন?' আমি অবাক হয়ে বঙ্কুবাবুর দিকে তাকালাম, 'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।'

'বিশ্বাস তো আমারও হচ্ছে না।' বঙ্কুবাবু আমার কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না, 'কিন্তু এখানে তো যত্ন করে নেবার মতো আর কিছুই দেখছি না।'

'এখন আর দেখবেন কী করে!' আমি ঠাট্টার সুরে বললাম, যা ছিল তা তো নাগাপ্পা তুলে নিয়ে গেছেন। তবে জায়গাটা ভালো করে একটু খুঁজে দেখা দরকার।'

খোঁজ করতে গিয়ে ওরকম একটা মোক্ষম নিদর্শন পেয়ে যাব তা অবশ্য কল্পনাও করিনি।

এবারে আর বঙ্কুবাবু নয়, আবিষ্কর্তা আমি নিজেই।

প্রথমে নাগাপ্পা যে জায়গাটায় বসেছিলেন সেখানটা বেশ তন্ন তন্ন করে দেখে আদিবাসী পিয়নের লাশ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়ি রাস্তার সেই অংশটাও পরীক্ষা করেছিলাম।

কয়েকদিন আগের ঘটনা। পাহাড়ি ডাঙায় বা রাস্তায় সে বীভৎস ব্যাপারের কোনো চিহ্নই এখন আর নেই। পাহাড়ের ওপর বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদে ঝলমল করছে চারিদিক, তারই সঙ্গে চারিদিকের বনে যে হাওয়ার মর্মর শোনা যাচ্ছে তা মিলে এমন একটা শান্ত মধুর পরিবেশ গড়ে তুলেছে যে এ পবিত্র জায়গায় অমন একটা পৈশাচিক ব্যাপার কখনো ঘটতে পারে বলেই বিশ্বাস হয় না।

খুনের জায়গাটা দেখবার পর থেকেই বঙ্কুবাবু বাড়ি ফেরার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলেন। দুপুরের খ্যাঁটটার দেরি হয়ে যাবার দুর্ভাবনাতেই তাঁর এই তাড়া বুঝেছি। তাড়ার আসল কারণটা ওই হলেও তাঁর যুক্তিটা খুব অগ্রাহ্য করবার নয়।

'যা দেখবার তা তো দেখলেন,' বেশ একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছেন বঙ্কুবাবু, 'খুনের খেই পেতে সারা জঙ্গলটাই খুঁজতে হবে নাকি!'

মুখে কিছু জবাব না দিয়ে প্রায় সেই আজগুবি কাণ্ডটাই করেছি, আর তাইতেই পেয়ে গেছি সেই আশাতীত খেইটা। পেয়েছি অবশ্য একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায়।

সাত

বঙ্কুবাবুকে বিরক্তমুখে পাহাড়ি রাস্তাটার ধারেই বসিয়ে রেখে আশপাশের জঙ্গলটা অকারণেই ঘুরে দেখছিলাম। কাজটা যে আহাম্মুকের মতো হচ্ছে সেটা যে একেবারে বুঝিনি তা নয়। কিন্তু বনের ভেতরে ঢুকে পড়ে পা দুটো যেন আপনা থেকেই সামনে চলে যাচ্ছিল।

বেশ কিছুটা ওইভাবে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখবার মতো কিছুই অবশ্য পাইনি। আর দেরি করলে বঙ্কুবাবু হয়তো খিদের জ্বালায় রাগ করে একলাই রওনা দেবেন ভেবে ফিরতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে একটা গর্তের মধ্যেই পড়ে গেলাম।

এখানটা জঙ্গল বেশ গভীর। তলায় শুকনো পাতা এমন ঘন হয়ে জমে আছে যে মাটি দেখাই যায় না। পা-টা একটা গোল কাটা ডালের ওপর পড়ে হড়কে যাবার পর যে গর্তটার মধ্যে চলে গিয়েছিল ওপর থেকে তার অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায়নি।

অমন বেকায়দায় পড়ে গিয়েও পা-টা ভাঙেনি তারই জন্যে ভাগ্যের ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে নিজের জুতোটার দিকে নজর দিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

pathagar.net

পায়ে গোড়ালি-আঁটা স্যান্ডাল পরা ছিল।

পায়ে আর জুতোয় ওটা কি লেগে?

এ তো কীসের ছাই দেখা যাচ্ছে! এখানে এই জঙ্গলের ঠিক একটি জায়গায় এরকম ছাই থাকার মানে কী? কাছেপিঠে কেউ কোথায় আগুন জ্বালিয়েছে বা রাঁধাবাড়া করেছে এমন কোনো চিহ্নও নেই।

ওপরে নয়, ছাইটা এমন একটা গর্তের ভেতরই বা চাপা দেওয়া কেন?

যেভাবে গর্তের ভেতর রেখে ওপরে শুকনো ঝরাপাতা দেওয়া হয়েছে, তাতে লুকোবার চেষ্টাটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

গর্তের ভেতর ছাইয়ের সঙ্গে আর কী আছে দেখবার জন্যে সেখানে বসতে গিয়ে শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দে চমকে সেদিকে তাকালাম।

না ভয় পাবার মতো কেউ নয়। আমার দেরি দেখে ধৈর্য ধরতে না পেরে বঙ্কুবাবুই বকের মতো লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে খুঁজতে এসেছেন।

খিদের জ্বালায়, অধৈর্যে আর আমার বিরুদ্ধে অক্ষম রাগে তাঁর মুখখানার চেহারা যা হয়েছে তা অন্য কারোর হলে ভয় পাবার মতোই বলতাম, কিন্তু বঙ্কুবাবুর বেলা তাতে হাসিই পেল।

কাছে এসে প্রায় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর মেয়েলি সরু গলাটাকে যেন আরও তীক্ষ্ণ ছুঁচোলো করে তাঁর অভিমান আর অভিযোগটা প্রকাশ করলেন, 'আমায় এমনি করে জব্দ করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছেন! আমায় একলা ফেলে রেখে এসে আপনি খেলা করছেন এখানে!'

'খেলা নয় বঙ্কুবাবু, খেলা নয়,' বঙ্কুবাবুর গলার স্বরে আর বলার ধরনে হেসে ফেলেও তাঁকে ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'এই গর্তটায় কী পেয়েছি দেখছেন? ছাই।'

'ছাই!' আমি যেন তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছি এমনিভাবে কথাটা নিয়ে বঙ্কুবাবু আরও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'আমি না হয় মুখ্যু হাঁদা গাঁইয়া, কিন্তু দুটো ভালোমন্দ মাঝেমাঝে খাওয়ান বলে আমার সঙ্গে এরকম তামাশা করাটা কি উচিত ছোটোবাবু? গর্তে ছাই আছে তো আমাদের কী!'

বঙ্কুবাবু যত রাগেন তাঁর চেহারা আর গলা তত হাস্যকর হয়ে ওঠে। এবার কিন্তু হাসি সামলে গম্ভীর হয়েই তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে ব্যস্ত হলাম। নীচে থেকে খানিকটা ছাই হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'এ ছাইয়ের মধ্যে কী দারুণ রহস্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা এখন বুঝতে পারছেন না? ভালো করে চারিদিকে চেয়ে দেখুন। কোথাও আগুন জ্বালার কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন কি?

আমার দিকে যেভাবে বঙ্কুবাবু চাইলেন তাতে মনে হল আমার মাথা কতখানি খারাপ হয়েছে তা-ই যেন তিনি আঁচ করবার চেষ্টা করছেন। মুখে শুধু একটু বিস্মিত প্রশ্নই করলেন, 'আগুন না হলে ছাই এল কোথা থেকে?'

'ঠিক ধরেছেন!' আমি উৎসাহভরে উঠে দাঁড়ালাম, 'ছাই যখন রয়েছে তখন আগুন নিশ্চয়ই জ্বালা হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই কেন?'

বঙ্কুবাবুকে বোঝাবার নামে নিজের কাছেই যুক্তিগুলো ভালো করে সাজাবার চেষ্টা করে বললাম, 'আদিবাসীরা পাহাড়-জঙ্গলে আগুন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া জ্বালে না। তারা সাধারণত পাহাড়ের জঙ্গল সাফ করবার জন্যে বা চাষের জন্যে জমি উদ্ধার করতে বছরে একবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে বনে আগুন লাগায়। এখন সে সময় নয়, আর সে আগুনের প্রমাণ খুঁজতে হয় না। এখানকার আদিবাসীদের পাহাড়-জঙ্গলের যেখানে-সেখানে রান্নার জন্যে এক বেলার উনুন পাতা দস্তুর নয়, আর সে উনুনও লুকোনো থাকে না। এখানকার আগুনের কোনো চিহ্ন যখন নেই তখন নিশ্চয়ই তা জ্বেলে তারপর লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

বঙ্কুবাবুর চোখে-মুখেও অধৈর্য বিরক্তি কেটে গিয়ে তীব্র আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখে একটু থেমে প্রায় নাটুকে সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'লুকোবার কারণ কী?'

'খুনের ব্যাপারের নিদর্শন গোছের কিছু এখানে পুড়িয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলতে চাইছেন?' বঙ্কুবাবু দু-চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকেই যেন ভেদ করার চেষ্টায় বললেন, 'কিন্তু তাই যদি হয় তাহলেও প্রমাণ তো সব ছাই হয়ে গেছে। এখন আর ও ছাই কী কাজে লাগবে!'

'এখনও অনেক কাজে লাগতে পারে'—আমি জোর দিয়ে বললাম, 'প্রথমত এ গর্তটা থেকে ছাইয়ের সঙ্গে অন্য কিছুও হয়তো পাওয়া যেতে পারে। আর তা যদি না পাওয়া যায় তাহলেও ওই ছাই কীসের জানতে পারলে এ খুনের ব্যাপারের একটা কোনো হদিস হয়তো মিলে যেতে পারে!'

আর কিছু বলতে হল না। আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি বঙ্কুবাবু গর্তের ধারে বসে পড়ে মুঠো মুঠো ছাই তুলে তাঁর পকেটে ভরছেন।

তাঁর আগেকার রাগ বিরক্তি দেখে যেমন, বঙ্কুবাবুর এখনকার উৎসাহ দেখেও তেমনি হাসি পেল। সে হাসি চেপে গর্তের সব ছাই-ই শুধু নিয়ে দরকার নেই বলে তাঁকে থামাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার দরকার হল না।

বঙ্কুবাবু নিজেই হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাকেই যেন সাবধান করার ভঙ্গিতে বললেন, 'এ গর্ত এরকমভাবে ঘাঁটা খুব অন্যায় হচ্ছে তা জানেন। আমাদের আনাড়ি হাতের ঘাঁটাঘাঁটিতে আসল যা প্রমাণ তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর কিছু সুতরাং ছোঁয়াও চলবে না।'

বঙ্কুবাবুর কথাটা ঠিক। তবু মনের খুঁতখুঁতনিটা প্রকাশ না করে পারলাম না, 'কিন্তু গর্তের তলায় আর কিছু আছে কি না একটু দেখলে বোধ হয় হত।'

বঙ্কুবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমার একটা হাত ধরে ফেলে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'না, তা ছাড়া এখানে আর দেরি করে নাগাপ্পার কাছে কি ধরা পড়তে চান? সে যেকোনো মুহূর্তে এই পথেই ফিরতে পারে তা ভেবে দেখেছেন?'

এ কথার ওপর সত্যিই আর বলবার কিছু পেলাম না। বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়েই বঙ্কুবাবুর সঙ্গে সে তল্লাট ছাড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালালাম।

আট

বঙ্কুবাবুর একটা যুক্তি মেনে আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম কিন্তু তাঁর আরেকটা পরামর্শ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার জন্যে নিজেদের লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে এমন আফসোস সেদিন করতে হবে কল্পনাও করিনি।

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে তাঁর জানা 'সর্ট-কাট'-এ কিছুদূর নামবার পর একজায়গায় সাধারণ ব্যবহারের পাহাড়ি রাস্তাটা সামনে পড়েছিল। সেরকম সম্ভাবনা হলেও দুজনে একসঙ্গে যাতে নাগাপ্পার চোখে না পড়ি—তার জন্যে বঙ্কুবাবু আমায় সাধারণ রাস্তাটা ধরেই লোধমা পাহাড়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি যা কারণ দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে তখন কোনো খুঁত পাইনি। তাঁর পরামর্শ নিয়ে তাই একা একাই লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরেছিলাম।

ছাউনিতে পৌঁছে প্রথমেই অবাক হয়েছিলাম বঙ্কুবাবু তখনও ফেরেননি জেনে। তিনি যে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আসছেন তাতে তাঁর তো আমার আগে পৌঁছোবার কথা।

বিস্ময়টা শেষ পর্যন্ত ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও বঙ্কুবাবু না ফেরায়!

কাউকে কিছু তখনও জানাতে পারিনি। নিজেই খবর নিয়ে যা জেনেছি তাতে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। শুধু বঙ্কুবাবুই নয় লোধমা পাহাড়ে নাগাপ্পাকেও কেউ নাকি সারাদিন দেখেনি।

pathagar.net

নাগাপ্পাকে তার পরদিন সকালে ফিরতে দেখেছি কিন্তু বঙ্কুবাবু তখনও নিরুদ্দেশ। নেহাত বঙ্কুবাবুর মতো মানুষ বলেই আমি ছাড়া কেউ বোধ হয় তা লক্ষই করেনি।

পরের দিন বেলা দুপুর পর্যন্ত বঙ্কুবাবু যখন ফিরলেন না, তখন রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার ভয়টা শুধু নিজের মনের মধ্যে আর চেপে রাখতেও পারলাম না।

নিজেই একবার বঙ্কুবাবুর খোঁজ করতে যেতে পারতাম। সে কথা একবার ভেবেওছিলাম। কিন্তু তারপরই মনে হল ব্যাপারটা সম্ভবত অনেক বেশি গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আমার নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা করে একলা কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়।

মামাবাবু কিংবা তাঁর বদলে মহান্তিকে আগের দিন যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে আমার অনুমান আর আশঙ্কাটা জানানো দরকার বুঝেও বেশ কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে যুঝেই অবশ্য তাঁদের খোঁজে গিয়েছি।

মামাবাবু কীভাবে ব্যাপারটা নেবেন সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারি বলেই এই অনিচ্ছা। এত বড়ো গুরুতর ব্যাপারটাকে সম্ভবত তিনি আমলই দেবেন না।

বঙ্কুবাবু নিরুদ্দেশ!—বলে মিথ্যে আতঙ্কের ভান করে হয়তো শেষ পর্যন্ত হেসেই উঠে বলবেন, 'খ্যাটের লোভে আদিবাসীদের গ্রামেই হয়তো লুকিয়ে আছে! মহান্তি কাছে থাকলে তাঁরও সে পরিহাসে যোগ দেওয়াটা বেশ কল্পনা করতে পারি।'

সত্যি কথা বলতে গেলে বঙ্কুবাবুকে নিয়ে এরকম অস্থির হওয়াটা একটু যে হাস্যকর দেখায় তা আমিও বুঝি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিকমতো না জানলে তাঁকে নিয়ে দুর্ভাবনাটা আজগুবি মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সমস্ত ব্যাপারটা তাই মামাবাবু আর মহান্তিকে না জানালে নয়।

তারপরেও যদি তাঁরা নির্বিকার থাকেন তো নাচার।

কিন্তু মামাবাবু বা মহান্তির নাগাল পাওয়াই যে ভার।

তাঁরা লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাননি এইটুকু খবর পেয়ে আমাদের নিজেদের ছাউনি, তারপর সরকার সাহেবের আস্তানা দু-জায়গায় খোঁজ করে শেষে যা জানলাম তাতে বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করলাম। আর কোথাও নয়, নাগাপ্পার খাস তাঁবুতেই তাঁরা বিশেষ পরামর্শ-সভায় নাকি জড়ো হয়েছেন।

নাগাপ্পার তাঁবু শুনেই অবশ্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। আমার যা বলবার তার শ্রোতা হিসাবে নাগাপ্পাকে যে চাই না তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এখন আর উপায় কী! সময় আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। নাগাপ্পার তাঁবুর পরামর্শ-সভা থেকে কখন মামাবাবু বার হবেন তার জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না।

মরিয়া হয়ে নাগাপ্পার তাঁবুতেই তাই গিয়ে হানা দিলাম।

পরামর্শ-সভাটা যে অত্যন্ত গোপন ও জরুরি তা নাগাপ্পার বেয়ারার আচরণেই একটু বোঝা গেল। সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়েও সে একটু দরজা আটকাবার ভঙ্গিতেই বললে, 'ওঁদের জরুরি মিটিং হচ্ছে আজ্ঞে! কারুর ঢুকতে মানা আছে।'

'জানি!' বলে বেয়ারাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে পরদায় দরজা ঠেলে নাগাপ্পার খাস তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। ঢোকাটা যে অপ্রত্যাশিত আর অবাঞ্ছিত তা কয়েক জোড়া অপ্রসন্ন চোখের কোঁচকানো ভুরু দেখেই বুঝলাম। মহান্তির তাকানোটাও একটু যেন অস্বস্তির। শুধু মামাবাবুর দৃষ্টি নির্বিকার আর সহাস্য অভ্যর্থনা শুধু নাগাপ্পার মুখে।

'আসুন। আসুন মি. হাজরা!' তাঁর নিজের তাঁবুতে সভা বসেছে বলেই যেন উদার গৃহস্বামীর ভূমিকা নিয়ে নাগাপ্পা বেয়ারাকে একটা বাড়তি চেয়ার আনবার হুকুম দিলেন।

আমি ইতিমধ্যে কামরার সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। শুধু মামাবাবু, মহান্তি,

boighar.net

সরকার সাহেব আর নাগাপ্পা নয়, আরেকটি নতুন মুখ সেখানে দেখলাম। আমাদেরই বয়সি রোগাটে একজন ইউরোপিয়ান। ফিকে বাদামি পাতলা চুল আর ফ্যাকাশে কোঁচকানো মুখে কেমন একটু রুগ্নতার আভাস থাকলেও ইনি যে নাগাপ্পার বর্তমান অতিথি মহাবুয়াং-এর হাতি শিকারি তা তখন বুঝেছি।

বেয়ারার নিয়ে আসা ক্যানভাসের ফোল্ডিং চেয়ারটায় বসবার পর নাগাপ্পা পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় ইয়োরোপীয় শিকারির নামটাও জানলাম—জন কার্সন।

এ সভার আলোচনার বেশ একটা উত্তেজনার মুহূর্তে উপদ্রবের মতো যে এসে পড়েছি পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার আগেই বুঝলাম।

সরকার সাহেবই একটু অধৈর্যের সঙ্গে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে বললেন, 'এসব লৌকিকতার যথেষ্ট সময় পরে পাওয়া যাবে মি. নাগাপ্পা। এখন মি. সেন যা বলছিলেন সেটার মীমাংসা আগে দরকার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই!'—বলে নাগাপ্পা যেন মাপ চাইবার ভঙ্গি করলেন। কিন্তু তাঁর চোখের মধ্যে এক পলকের জন্যে যে চাপা আক্রোশের ঝিলিকটা খেলে গেল তা আর যারই হোক আমার দৃষ্টি এড়াল না।

মামাবাবু কিন্তু আগাগোড়া নির্বিকার। আমরা চুপ করতেই বই থেকে যেন মুখস্থ পড়ছেন এমনি ভাবে বললেন, 'আমরা তাহলে দু-ধরনের অদ্ভুত খেই এ রহস্যের পাচ্ছি। তার একটা এই খুনের ব্যাপারের সঙ্গে জড়ানো কি না তাও আমরা কেউ জোর করে এখন বলতে পারছি না। এ খেই কটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো বলা যেতে পারে। মি. সরকারই প্রথম এগুলো দৈবাৎ লক্ষ করেন। এ কাগজগুলোর ভেতর সাংঘাতিক কিছু লেখা-টেখা পাওয়া যায়নি। যা দেখা গেছে তা পড়লে আজেবাজে কথা কেউ অন্যমনস্ক ভাবে এখানে-সেখানে লিখেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু মন দিয়ে পরীক্ষা করলে সন্দেহ হয় কথাগুলো একেবারে আবোল তাবোল নয়। যেমন এই কাগজের টুকরোটাই দেখা যাক।

সামনের টেবিলটার ওপর একটি ছোটো খোলা বাকসের মধ্যে রাখা ছেঁড়া দলা-পাকানো টুকরো কাগজগুলো আগেই চোখে পড়েছিল। মামাবাবু তা থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে খুলে ধরে বললেন, 'এতে লেখা দেখছি, ইংরেজিতে 'সি. আর. ২৪ নং ৫২, ০১' তারপর নীচে এক জায়গায় বোলতার চাকের মতো একটা ছবি আঁকা।'

মামাবাবু ছবিটা আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'সবসুদ্ধ জড়িয়ে অর্থহীন খামখেয়ালি লেখা আর আঁকা বলে মনে হলেও এগুলির একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই আরেকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো দেখলেই সে তাৎপর্যটা কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে। এ কাগজটায় লেখা দেখছি 'মেটাল বুলেটিন, ১৯৩৮, ৭৮ নং আউন্স ৩৬ ডলার'।

'এ লেখার মেটাল বুলেটিন ১৯৩৮-এর মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু নেই। তারপরের ৭৮নং আর আউন্স ৩৬ ডলার-এরও একটু ভাবলেই মানে পাওয়া যায়। ৭৮ নং কী? সেটা হল প্ল্যাটিনম্ ধাতুর অ্যাটমিক নম্বর। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের বিলেতের মেটাল বুলেটিন থেকে প্ল্যাটিনম্ ধাতুর দর যে আউন্স পিছু ৩৬ ডলার তা টুকে রাখা হয়েছে। এই কাগজের টুকরোর পাঠোদ্ধারের পর আগেরটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। সি. আর. হল ক্রোমিয়াম ধাতুর সিম্বল, তার অ্যাটমিক নম্বর হল চব্বিশ, আর অ্যাটমিক ওজন হল ৫২.০১। কিন্তু এসবের সঙ্গে ওই বোলতার চাকের মতো ছবিটা কেন আর কীসের?

'ছবিটা ক্রোমিয়ম ও প্ল্যাটিনম যার মধ্যে পাওয়া যায় নাম না করে সেই পাথরটা বোঝাবার জন্যে। ও পাথরের বৈজ্ঞানিক নাম হল পেরিডোটাইট। পৃথিবীর গভীর বুকে প্রচণ্ড উত্তাপ আর চাপে তৈরি হয়। রং খুব গাঢ় সবুজ বা কালো।'

হেলাফেলার বলে যা মনে হয়েছে, তাঁর কুড়িয়ে আনা সেই ছেঁড়া কাগজের মধ্যে এত রহস্য পাওয়াটা যেন তাঁরই বাহাদুরি মনে করে সরকার সাহেব তখন উত্তেজিত। মামাবাবু একটু থামতেই তাঁকে আবার উসকে দিয়ে বললেন, 'এসব কাগজে যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে তাহলে কী বোঝা উচিত?'

মামাবাবু যেভাবে হাসলেন, তাতে সরকার সাহেবের এ উৎসাহে তিনি খুশি হয়েছেন বলেই মনে হল। হেসে তিনি বললেন, 'বোঝা উচিত যে এখানে কেউ পেরিডোটাইট আর তার মধ্যে ক্রোমিয়ম তো বটেই এমনকী প্ল্যাটিনমেরও সন্ধান বোধ হয় পেয়েছে।'

'পাওয়াটা তো অপরাধ নয়!'—নিজের কথাটা বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেও মামাবাবুদের এই নিরর্থক আলোচনায়ও মন্তব্যটুকু না করে পারলাম না।

'পাওয়া অপরাধ নয়,' মামাবাবুর বদলে মহান্তিই হেসে জবাব দিলেন, 'কিন্তু লুকিয়ে রাখাটা অপরাধ! এসব কাগজ দেখে মনে হয় কেউ এইরকম কিছু দামি খনিজের সন্ধান পেয়ে তা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে।'

'তাতে লাভ?' অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, 'খনি তো আর চুরি করে পকেটে নিয়ে পালানো যাবে না!'

'তা যাবে না!' নাগাপ্পাই এবার আমাকে জ্ঞান দিলেন, 'কিন্তু লুকিয়ে কিছু হাতিয়ে নিতে পারলে প্ল্যাটিনমের মতো ধাতু বেচে বেশ কিছু লাভ করা যায়। তা ছাড়া সরকারের কাছে যেসব কোম্পানি এসব খনি চালাবার অধিকার নেয় তাদের কাছ থেকেও গোপন খবর দেবার দরুন মোটা টাকা আদায় করা যেতে পারে।'

'শুধু তাই কেন!'—মামাবাবুই বুঝিয়ে দিলেন এবার, 'সেরকম ঠগ কোম্পানি হলে অন্য কিছুর নামে খনি চালিয়ে গোপনে এই দামি ধাতু পাচার করতে পারে। বেশিদিন তা পারা না গেলেও সেরকম চোরা দলের পক্ষে কিছুদিনের মধ্যেই যতখানি সম্ভব লুটেপুটে নিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

'কিন্তু লোধমা পাহাড়ে যারা আছে,' নাগাপ্পা এবার একটু তীব্র স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাদের মধ্যে এ কাজ কারোর পক্ষে সম্ভব বলে তো ভাবতে পারছি না।'

কয়েক মুহূর্ত সবাই একেবারে চুপ। মনের কথা কারোর যদি কিছু থাকে বলার দ্বিধা কেউ যেন কাটাতে পারছেন না।

দ্বিধা কাটালেন প্রথম সরকার সাহেব।

টেবিলের ওপর নাগাপ্পার কোম্পানির একটা ছাপানো প্যাড পড়েছিল। তা থেকে হঠাৎ একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নাগাপ্পাকে যেন চোখের দৃষ্টিতে গেঁথে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ প্যাড তো আপনার কোম্পানির?'

প্রশ্নটা আমাদেরও অর্থহীন বলে মনে হল। কিন্তু নাগাপ্পা যেন তাতে জ্বলে উঠে কোনোরকমে নিজেকে সামলে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বললেন, 'আপনি তো পড়তে জানেন। নামটা যখন ছাপাই আছে ওপরে তখন জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'জিজ্ঞাসা করছি এই কাগজটার জন্যে!'—সরকার সাহেব আমাদের সকলকে কাগজটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনাদের কোম্পানির কাগজ যেমন-তেমন নয়, একটু বিশেষ ও উঁচু দরের কাগজ। আমি যত দূর জানি এরকম কাগজের প্যাড লোধমা পাহাড়ে আর কেউ আমরা ব্যবহার করি না।'

'তাতে হল কী?' নাগাপ্পার গলা এবার শান্ত! কিন্তু চোখ দুটো যেন ছুরির ফলা।

'হয়েছে এই যে, এসব ছেঁড়া টুকরো আর আপনার প্যাডের কাগজ একই ব্র্যান্ডের। আপনারা মিলিয়ে দেখুন।'

anandapub.net

সরকার সাহেব ছেঁড়া কাগজের বাকসো আর প্যাডটা টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিলেন।

কেউ কিন্তু সংকোচের দরুনই বোধ হয় কাগজগুলো মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল না।

নাগাপ্পাই সেগুলো নিজের কাছে টেনে নিয়ে হেসে উঠে বললেন, 'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমার এ প্যাড টেবিলের ওপর অফিস ঘরে পড়ে থাকে। যে কেউ তা চুরি করতে পারে।'

'তা হয়তো পারে।' সরকার সাহেব বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনি যে কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে এখানে আছেন, তার কাজটা কী বলতে পারেন? কোম্পানিটা আসল না জাল তাই তো বোঝা যাচ্ছে না। আমি তো বড়ো বড়ো সব কটা ডিরেকটরি ঘেঁটে কোথাও আপনাদের কোম্পানির নাম পাইনি।'

ঘরের সবাই স্তম্ভিত বলে মনে হল। নাগাপ্পা কিন্তু এবার অবিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এত কষ্ট তাহলে করেছেন? কেন মিছে করতে গেলেন! তার বদলে আমায় জিজ্ঞাসা করলেই আমি বলে দিতাম আমাদের কোম্পানির নামটা আসল নয়।'

নাগাপ্পার কথায় প্রায় সবাই কিছুক্ষণ একেবারে নির্বাক!

নাগাপ্পা স্বীকার করছেন যে তাঁর কোম্পানির নামটা জাল!

সরকার সাহেব প্রথমটা বেশ একটু হতভম্বভাবে নাগাপ্পার বক্তব্যটাই আবার আওড়ালেন, 'আপনি বলছেন, আপনাদের কোম্পানির নামটা আসল নয়? তার মানে মিথ্যে একটা কোম্পানির নাম নিয়ে আপনি এখানে এতদিন ধরে আছেন!'

কথা বলতে বলতে সরকার সাহেবের গলা ও মেজাজ গরম হয়ে উঠল। রীতিমতো তীব্রস্বরে তিনি জানতে চাইলেন, 'আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আপনি কী মতলব এখানে হাসিল করছেন? শুধু নিজের মুখে স্বীকার করেই ঠগবাজির দোষ আপনি কাটাবেন ভাবছেন?'

'ধীরে, বন্ধু ধীরে!'

নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করেও নাগাপ্পা প্রায় নির্বিকার ভাবে একটু হেসে ইংরেজিতে যা জবাব দিলেন তার বাংলাটা ওইরকমই দাঁড়ায়।

সরকার সাহেব উত্তেজিতভাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাগাপ্পা একটু কৌতুকের স্বরেই বললেন, 'একদৌড়ে অতখানি যাবেন না! আমার কোম্পানির নামটা আসল নয় বলে কি আমি ঠগবাজ হয়ে গেছি? আমাদের কোম্পানির আগের নাম হল ভ্যালকান মিনারেলস্ লিমিটেড। বিদেশের কোম্পানি, ভারতবর্ষে এসে এখানকার অংশীদার নিয়ে নতুন করে গড়া হচ্ছে। এখন নাম হবে ইন্ডো ভ্যলকান মিনারেলস্ লিমিটেড। সে নামটা কিছুদিনের মধ্যেই রেজেস্ট্রি হয়ে যাবে, নিয়মকানুনের ফ্যাঁকড়ায় একটু দেরি হচ্ছে। এই সময়টায় পুরোনো নামে জরিপ-টরিপের প্রাথমিক কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি আমরা পেয়েছি। আমাদের আগের ও এখনকার দুটো নামের কোনোটাই ডিরেক্টরিতে না পাওয়ার কারণ এই।'

এত ফলাও করে দেওয়া সত্ত্বেও নাগাপ্পার ব্যাখ্যাটা বেশ কাঁচাই মনে হল। মুখে নির্বিকার ভাব দেখালেও এমন বিস্তারিত ভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টাটাই যেন একটু অস্বাভাবিক।

আচমকা ধরা পড়ে নাগাপ্পার এই সাফাই গাইবার দুর্বল চেষ্টায় মামাবাবুর মুখে পর্যন্ত সামান্য অধৈর্য ফুটতে দেখলাম।

'এসব কৈফিয়ত কেন দিচ্ছেন মি. নাগাপ্পা?' মামাবাবু একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন, 'আপনার কথা যাচাই করবার এখন তো উপায় নেই। সুতরাং কাগজগুলো আপনারি প্যাড থেকেই ছেঁড়া বলে ধরে নিয়ে তার কোনো হদিস পাওয়া যায় কি না দেখা যাক।'

'আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি?'

বেশ একটু অবাক হয়ে নাগাপ্পার শিকারি বিদেশি বন্ধু মি. কার্সনের দিকে তাকালাম। এতক্ষণ বাদে এই প্রথম তিনি মুখ খুললেন।

pathagar.net

'নিশ্চয়ই পারেন!' মহান্তিই তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত একটু যেন দ্বিধাভরে আমাদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কার্সন বললেন, 'ওই কাগজের টুকরোগুলোতে যা লেখা আছে যার-তার পক্ষে তা লেখা নিশ্চয় সম্ভব নয়?'

'না, তা তো নয়ই।'—সরকার সাহেবই সায় দিলেন, 'ওয়াকিবহাল ওপরওয়ালা বিশেষজ্ঞ কেউ ছাড়া বিজ্ঞান ও ব্যবসার এসব সাংকেতিক খুঁটিনাটি জানে কে? এসব লেখার স্বার্থও নেই অন্য কারোর।'

'তাহলে,' একটু থেমে আবার যেন একটু অস্বস্তি জোর করে জয় করে মি. কার্সন বললেন, 'ও লেখাগুলো এখানে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের কারোরই হবে নিশ্চয়।'

হঠাৎ সবাই যেন হকচকিয়ে গেলাম প্রথম কথাটা শুনে। তারপর সকলেই বোধ হয় বুঝলেন যে কার্সন অন্যায় কিছু বলেননি। মামাবাবু তো স্পষ্টই কার্সনকে সমর্থন করলেন।

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন মি. কার্সন।' লোধমা পাহাড়ে যে কটি কোম্পানি আছে, তার সব কর্তা ব্যক্তিই এখানে হাজির। এঁরা ছাড়া আর কে ওসব লিখতে পারে? লেখার গরজই বা কীসের?'

'তাই,' মামাবাবুর সমর্থন পেয়ে কার্সন এবার একটু জোর দিয়েই বললেন, 'আমি একটা অতি সহজ পরীক্ষায় আপনাদের রাজি হতে অনুরোধ করি।'

'কী পরীক্ষা?'—বন্ধু হলেও নাগাপ্পা সন্দিগ্ধভাবে কার্সনের দিকে চাইলেন।

'পরীক্ষা আর কিছু নয়,' কার্সন সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন, 'ওই ছেঁড়া কাগজগুলোয় যা লেখা আছে এখানকার প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে তা লিখবেন।'

'ও!' নাগাপ্পাই একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন, 'তুমি হাতের লেখা মিলিয়ে দোষী ধরবে? হাতের লেখা মিলবে বলে তোমার ধারণা?'

'একেবারে হুবহু হয়তো মিলবে না!' কার্সন একটু হেসে জানালেন, 'কিন্তু চেষ্টা করলেও হাতের লেখা একেবারে লুকোনো যায় না। কয়েকটা খোঁচা আর টানের ইশারা থেকে যায়ই। সুতরাং কারোর ধাঁচের সঙ্গে মিল পাবই বলে আশা করছি।'

'আপনি তাহলে শুধু শিকারি নন, হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ!' সরকার সাহেবের গলায় স্পষ্টই উপহাসের সুর শোনা গেল।

কার্সন সে উপহাস গায়ে না মেখে বিনীতভাবেই জানালেন যে ঠিক বিশেষজ্ঞ না হলেও এ বিদ্যার চর্চা তিনি সৌখিনভাবে কিছু করেছেন।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে সবাই নাগাপ্পার কোম্পানির প্যাডের কাগজেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোর লেখাগুলো আলাদা আলাদা লিখলেন। মামাবাবু আর আমিও বাদ গেলাম না। লেখবার তো বেশি কিছু নেই, সামান্য কয়েকটা কথা আর গোটাকতক সংখ্যা মাত্র। সকলের লেখা হবার পর কার্সন কাগজগুলো যেরকম উত্তেজিত আগ্রহভরে কাছে টেনে নিলেন তাতে মনে হল লোধমা পাহাড়ের রহস্যের একটা খেই ধরা পড়তে বুঝি আর দেরি নেই।

কিন্তু বৃথা আশা! ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলোর সঙ্গে আমাদের লেখা কাগজগুলো মিলিয়ে দেখতে দেখতে মিনিট দশেক পরে কার্সনের ভ্রূকুঞ্চন দেখেই সন্দেহ হল তিনি তাঁর বিদ্যেতে আর থই পাচ্ছেন না।

'কী বুঝছেন মি. কার্সন?' মহান্তি ঠাট্টা করে বললেন, 'দুশমন কে, তা ধরতে পারলেন?'

'না।' কার্সন দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

'কারোর লেখার সঙ্গেই মিল খুঁজে পাচ্ছেন না বুঝি?' মামাবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

'না, তা একটু পাচ্ছি।'—কার্সনকে বেশ কুণ্ঠিত মনে হল।

'মিল পাচ্ছেন!'

pathagar.net

আমরা সবাই চঞ্চল আর উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

'তাহলে অমন হতাশভাব দেখাচ্ছেন কেন?'—আমিই খোঁচা দিয়ে বললাম, 'দুশমন তো তাহলে ধরেই ফেলেছেন!'

'না, তা ধরা যাচ্ছে না।' কার্সন বেশ একটু সংকুচিতভাবে জানালেন, 'কারণ লেখাটা একটু যা মিলছে তা মি. নাগাপ্পার সঙ্গে।'

খানিকক্ষণ ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। যার যা বলবার যেন গলায় আটকে যাচ্ছে।

'তার মানে?' মামাবাবুই প্রথম এ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'মি. নাগাপ্পার লেখার সঙ্গে মিলছে, অথচ বন্ধু বলে তাঁকে দোষী ভাবতে আপনার আটকাচ্ছে?

'না, না ঠিক তা নয়!' কার্সন বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

'ঠিক তা নয় কেন বলছেন! ব্যাপারটা ঠিক তাই।' মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু নাগাপ্পা আপনার বন্ধু বলেই নির্দোষ হবেন এটা ঠিক উচিত কথা তো নয়।'

'না, মানে আমি বলতে চাইছি যে,' কার্সন বেশ একটু ফাঁপরে পড়ে তাঁর বক্তব্য গুলিয়ে ফেললেন, 'সামান্য মিল যা পেয়েছি তার ওপর নির্ভর করে সঠিক কিছু বলা যায় না।'

'কিন্তু মিল যেটুকু পেয়েছেন তা মি. নাগাপ্পার লেখার সঙ্গেই এটুকু তো স্বীকার করছেন?' সরকার সাহেব কার্সনকেই যেন আসামি খাড়া করলেন তাঁর জবরদস্ত জেরার ধরনে।

কার্সন কোনো জবাব দেবার আগে মামাবাবু এবার বাধা দিয়ে একটু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'মি. কার্সনের কথা আমরা শুনেছি, এখন মি. নাগাপ্পার নিজের এ বিষয়ে কিছু বলার আছে কি না সেটাই আগে আমাদের বোধ হয় জানা দরকার।'

'এইটুকু শুধু বলার আছে যে', বাঁকা বিদ্রূপের স্বরে বললেন নাগাপ্পা, 'জন কার্সন আমার বন্ধু। কিন্তু বড়ো শিকারি হলেও 'হস্তলিপি বিশারদ' বলে ওর পরিচয় আমার জানা ছিল না। সে পরিচয় দিতে গিয়ে ওর এমন দুরবস্থা না হলে খুশি হতাম।'

'তার মানে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রইলাম বলতে চান?' সরকার সাহেব নিজের বিরক্তিটা না লুকিয়েই বললেন, 'এতটা সময় আমাদের বৃথাই নষ্ট হল!'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত!' কার্সন সকলের কাছে মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে আরও কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন।

নাগাপ্পা তাতে বাধা দিয়ে বললেন, 'না, দুঃখিত হবার তোমার কিছু নেই জন! সময়টা আমাদের বৃথা নষ্ট হয়েছে বলে মনে করব কেন? দুটো অত্যন্ত দামি আবিষ্কার তো এঁরা করে ফেলেছেন। একটা হল এই যে মি. সরকারের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের টুকরোগুলো আমার কোম্পানির প্যাড থেকেই ছেঁড়া বলে ধরা যেতে পারে, কারণ দুটোই এক ব্র্যান্ডের কাগজ। দ্বিতীয়টা হল ছেঁড়া কাগজের লেখার সঙ্গে আমার হাতের লেখার মিল। এ দুটো গুরুতর আবিষ্কারের পর আমার সম্বন্ধে আরও নতুন কী বেরিয়ে পড়তে পারে কে জানে? আমি তো সেই অপেক্ষাতেই আছি।'

কথাগুলোয় নাগাপ্পার তাচ্ছিল্য আর উপহাসের সুরটাই আমার সবচেয়ে খারাপ লাগল! সুযোগটা যখন নাগাপ্পা নিজেই করে দিয়েছেন তখন আর নিজেকে সামলাবার দরকার বোধ করলাম না।

নাগাপ্পার সঙ্গেই প্রায় সুর মিলিয়ে বললাম, 'অপেক্ষা আপনার বৃথা হবে না মি. নাগাপ্পা। আপনার সম্বন্ধে আরও কটা আবিষ্কারের কথা আমিই জানাচ্ছি।'

pathagar.net

আমার কথায় নাগাপ্পার চমকে ওঠাটা স্পষ্টই টের পেলাম। অন্য সকলেও তখন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে।

'কী আবিষ্কার?' মামাবাবুই একটু যেন চড়া গলায় প্রশ্ন করলেন।

'প্রথম আবিষ্কার এই যে, সবাই যখন এখানকার নিষেধ মেনে লোধমা পাহাড় থেকে নামা বন্ধ করেছে নাগাপ্পা তখন লোধমা পাহাড় ছেড়ে তো গেছেনই, আদিবাসীদের নিষিদ্ধ এঞ্চা পাহাড়েও গোপনে উঠেছেন।'

আর সকলে তখন চুপ। আমার দিকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চেয়ে নাগাপ্পা শুধু বললেন, 'তারপর দ্বিতীয় আবিষ্কার?'

'দ্বিতীয় আবিষ্কার হল, আদিবাসী পিয়ন যেখানে খুন হয়েছে আপনার লুকিয়ে সেখানে গিয়ে খুনের প্রমাণ সরিয়ে ফেলা।'

'কী বলছ কী হাজরা!' মহান্তির রুক্ষস্বরে মনে হল আমার মাথা ঠিক আছে কি না তাই যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে।

নাগাপ্পা তখন কিন্তু স্থির অবিচলিত ঈষৎ ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দিকেই ফিরে বললাম, 'বলুন মি. নাগাপ্পা আমার আবিষ্কারগুলো মিথ্যে কি না।'

'তার মানে, ' আমার দিকে চেয়ে যেন অবিশ্বাসের সুরে বললেন নাগাপ্পা, 'আপনি ও পাহাড়ে তখন ছিলেন?'

'হ্যাঁ ছিলাম! আর খুনের জায়গা থেকে পাথুরে মাটি চেঁছে কিছু যে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাও দেখেছি। সে জিনিসটা কী এবার বলবেন?'

'বলব কেন,' আমার এতক্ষণের অভিযোগের যেন কোনো দামই না দিয়ে নাগাপ্পা উঠে পড়ে বললেন, 'সে জিনিসটা দেখিয়েই দিচ্ছি।'

নাগাপ্পা সত্যিই তাঁবু ঘরের একটা দেরাজ থেকে একটা কাগজের মোড়ক এনে সামনের টেবিলের ওপর খুলে ধরে বললেন, 'এই হল সেই জিনিস। জিনিসটা কী আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন কি?'

সকলেই বিস্মিত কৌতূহলে কাগজের মোড়কের জিনিসটা দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সবচেয়ে হতভম্ব তখন আমি। আমার অভিযোগ অস্বীকার না করে, নাগাপ্পা যে তা খেলো আর ভোঁতা করে দেবার অমন একটা প্যাঁচ কষবেন তা ভাবতে পারিনি।

'জিনিসটা তো কোনো জন্তুর বিষ্ঠা বলে মনে হচ্ছে।' প্রথম মন্তব্য করলেন মহান্তি।

'ঠিকই ধরেছেন।' নাগাপ্পা সায় দিয়ে জানালেন, 'কিন্তু কোন জানোয়ারের তা বুঝেছেন কি?'

মামাবাবু এ সভায় বেশির ভাগ একটু অস্বাভাবিকরকম নীরব হয়েই আছেন। এইবার একটু মুচকে হেসে বললেন, 'কোন জানোয়ারের? হাতির?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই!' নাগাপ্পা যেন একটা তর্কে জেতার ভঙ্গিতে বললেন, 'হাতের লেখা সম্বন্ধে না হোক, এ ব্যাপারে আমার বন্ধু জন কার্সনের মতামতের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। জনকে কালই আমি এ জিনিসটা দেখিয়েছি। ওর নিজের মুখেই ওর মতটা শুনুন।'

'হ্যাঁ', কার্সন স্বীকার করলেন, 'কালই আমি এটা পরীক্ষা করেছি। এটা যে হাতির বিষ্ঠা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু হাতির বিষ্ঠাই যদি হয় তাহলে আদিবাসী পিয়নের খুনের রহস্যটা প্রায় ভৌতিক

pathagar.net

হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে।' মামাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, 'মি. কার্সনের কথায় জানছি মহাবুয়াং-এর খ্যাপা হাতিটার পক্ষে সেদিন এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব। পিয়নের খুনের জায়গায় তাহলে এ আবার কোন হাতি কোথা থেকে এল?

'যেখান থেকেই আসুক,' সরকার সাহেব যুক্তির সামনে খানিকটা যেন নিরুপায় হয়েই স্বীকার করলেন, 'বিষ্ঠা যখন পাওয়া গেছে তখন হাতি একটা নিশ্চয় ওখানে এসেছিল।'

'তাহলে আবার তো সব ধারণা পালটাতে হয়।' মহান্তি বেশ দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'পিয়নটিকে যদি কোনো খ্যাপা হাতি মেরে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কিছু তো নেই।'

'একটু আছে।'—মামাবাবু ফ্যাকড়া তুললেন, 'হাতির বিষ্ঠা ঠিক ওই জায়গায় পাওয়া গেছে কি না সে বিষয়ে একটা সন্দেহ উঠতে পারে।'

'সে সন্দেহের বিরুদ্ধে আপনার ভাগনে মি. হাজরাই তো আমার সাক্ষী!' নাগাপ্পা এককথায় মামাবাবুকে চুপ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে আমাকেও হতভম্ব করে দিলেন। যা আমার অভিযোগ তাই সাক্ষ্য হিসেবে নিজের কাজে লাগানোটা নাগাপ্পার শয়তানি বাহাদুরির চূড়ান্ত বলে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু ওই প্যাঁচটুকুতেই হার মানবার পাত্র আমি নই। নাগাপ্পাকে যেন সমর্থন করেই বললাম, 'হ্যাঁ শুধু ওই একটা ব্যাপারে কেন, আমি আপনার আরেকটা বাহাদুরির সাক্ষী। পাছে কেউ আপনার লুকিয়ে ওখানে ঘোরা দেখে ফেলে সেই ভয়ে আপনার বেপরোয়া গুলি ছোড়াও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একটু হলে তার শিকারও হতাম।'

কামরার মাঝখানে একটা বোমা ফাটাবার মতো খবরই ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ফলটা যা আশা করেছিলাম তা পুরোপুরি পেলাম না।

নাগাপ্পাই বোমাটাকে কেমন যেন কাঁচিয়ে দিলেন, দিলেন অতি সস্তা একটি প্যাঁচে।

আমার মুখে নাগাপ্পার সেই নির্জন পাহাড়ি প্রান্তরে বেপরোয়া গুলি ছোঁড়ার খবর শুনে তার সকলে রীতিমতো হতভম্বই হয়ে যাচ্ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নাগাপ্পা হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে ওঠায় হাওয়াটা একেবারে হালকা হয়ে গেল।

'তাহলে তো খুব মজার নাটক হয়েছিল,' নাগাপ্পা হাসতে হাসতেই বললেন, 'আপনার হাত-পা নিশ্চয়ই তখন ভয়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছল! অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাননি তো?'

কথাগুলো বলার ধরনে অনেকের মুখেই তখন কৌতুকের হাসির রেখা একটু ফুটে উঠেছে। হাসি তামাশার সুরটা কাটাবার জন্যে যতদূর সম্ভব গম্ভীর ও কড়া গলায় বললাম, 'ব্যাপারটা ঠাট্টার নয় মি. নাগাপ্পা। ও গুলিতে একটা খুন জখমও হতে পারত!'

'হলে সেটা ভৌতিক ব্যাপার হত!' নাগাপ্পা আগের মতোই হাসতে হাসতে বললেন, 'কারণ পিস্তলে আসলে গুলি তো ছিল না। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম মাত্র।'

'ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন!' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম শুধু এ মিথ্যের প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই বুঝে। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন না সত্যিই গুলি ছুঁড়েছিলেন তা এখন কেমন করে প্রমাণ হবে? নিরুপায় হয়ে নাগাপ্পার কথাটাই যেন মেনে নিয়ে তারপর গলাটা সমান রুক্ষ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজই বা কেন করলেন বলতে পারেন?'

'কেন আর!'—নাগাপ্পা যেন আমার বুদ্ধির অভাবে অবাক, 'ভয় দেখাবার জন্যে!'

'কাকে?' এবার তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা সরকার সাহেবের।

'ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাওয়ানো যায় এমন কাউকে! মুখে বিদ্রূপের হাসি থাকলেও এবার উত্তরটা দিতে নাগাপ্পার যেন দু-এক মুহূর্তের দ্বিধা দেখলাম,—জায়গাটা তো ভালো নয়। বুনো হাতির তখনই চিহ্ন পেয়েছি, তা ছাড়া ভালুক কি চিতারও অভাব নেই। যেখানে বসেছিলাম তার

কিছু দূরে কয়েকটা ঝোপঝাড় পাথুরে ঢিবির পেছনে কীরকম একটা শব্দ যেন শুনতে পাই। সাবধানের মার নেই। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তাই দুটো ফাঁকা আওয়াজ করি। তেমন কোনো জানোয়ার থাকলে বেরিয়ে পড়ে ভয়ে ছুটে পালাবে।'

'জানোয়ার তো কিছু বার হয়নি?'—সরকার সাহেবই স্পষ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'তা তো হয়ইনি!' নাগাপ্পা এবার একটু বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর দিলেন, 'আর হয়নি বলেই ফিরে নিজের কাজে চলে যাই। ওখানে যে মি. হাজরা লুকিয়ে বসে আছেন তা তো তখন কল্পনাই করতে পারিনি।'

বলতে যাচ্ছিলাম যে, শুধু মি. হাজরা নয়, আরও একজন তার সঙ্গে সেখানে বসে তাঁর কীর্তিকলাপ সব দেখেছে। কিন্তু খুব সময়মতো নিজেকে সামলে গেলাম। সত্যিই নাগাপ্পাকে এভাবে জেরা করে কোনো লাভ নেই।

সোজাসুজি তাঁকে মুঠোয় ধরতে গেলে পিছল পাঁকাল মাছের মতো কীরকম হড়কে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন তা তো ভালো করেই দেখলাম। তাঁর শয়তানি প্রমাণ করবার জন্যে আরও তোড়জোড় ও কৌশল দরকার। প্রমাণের বেড়াজাল এমনভাবে তাঁর চারিদিক থেকে গুটোতে হবে যাতে পালাবার রাস্তা আর তিনি না পান।

মামাবাবুও সেই কথাই বুঝে নিশ্চয়ই এতক্ষণে একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'এ আলোচনা আর চালিয়ে কোনো লাভ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। যা যা সূত্র আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি সেগুলো নিয়ে সবাই আজকের দিনটা আমরা ভালো করে ভেবে দেখি। কাল সকালে আবার আমরা একসঙ্গে বসব। এবার বৈঠকটা আমাদের মহান্তির ছাউনিতেই হবে। ইতিমধ্যে এ রহস্যের নতুন কোনো সূত্র আর সমাধানের মালমশলা হয়তো আমাদের হাতে আসতে পারে।'

সেইরকম মালমশলাই মামাবাবুর হাতে তুলে দেবার সংকল্প করে নাগাপ্পার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাঁবু থেকে বার হবার সময় নাগাপ্পার নির্লজ্জ অন্তরঙ্গতার চেষ্টায় বেশ একটু অবাক হতে হল। আর সকলের সঙ্গে তাঁবুঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেও তখন একলাই আলাদা রাস্তায় চলেছি। যতক্ষণ এ সভায় ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে বঙ্কুবাবু ফিরে এসেছেন কি না খোঁজ নেওয়ার জন্যে সরকার সাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিনটা ঘুরে যাওয়াই উদ্দেশ্য।

কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে চমকে দাঁড়াতে হল। ডাকছেন আর কেউ নয় স্বয়ং নাগাপ্পা।

আমার মুখের ভ্রূকুটিটা তখন খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু নাগাপ্পা সেটা যেন লক্ষ্যই না করে পরম আপ্যায়নের হাসি হেসে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ক্যান্টিনে? নাই গেলেন আর। লাঞ্চটা আজ আমার এখানেই সারুন না।'

'না, ধন্যবাদ।' ভদ্রতার হাসির ভানটুকু পর্যন্ত না করে জবাব দিলাম।

'কিন্তু জন কয়েকটা ভালো টিনের খাবার এনেছে।' নাগাপ্পা তবু খাবারের ঘুস দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করলেন, 'ক্যান্টিনের সেই তো একঘেয়ে খানা! একটু মুখ বদলে যান না!'

'না, আমার এখন অন্য কাজ আছে।' বেশ রুক্ষভাবেই জানিয়ে এবার সোজা বেরিয়ে চলে গেলাম। নাগাপ্পার মুখের চেহারাটা এ জবাবে কীরকম হল, লোভ হওয়া সত্ত্বেও একবার ফিরেও দেখলাম না।

যেতে যেতে নাগাপ্পার এই নির্লজ্জ আপ্যায়নের কারণটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে কী মতলব সে হাসিল করতে চায়। আমি যে তার গোপন গতিবিধি জেনে ফেলেছি সে সম্বন্ধে তো আর কোনো প্রশ্নই নেই। সকলের কাছেই তা আমি

pathagar.net

প্রকাশ করেছি। এরপর জানাটা আমার কতদূর যেটুকু বলেছি তা বাদে আরও কিছু আমি হাতে রেখেছি কি না তাই বার করাই কি তার উদ্দেশ্য?

শুধু লাঞ্চ খাইয়েই কি তা সে বার করবার আশা রাখে? আর বার করতে পারলেও তাতে তার লাভ কি হবে কিছু?

আমার মুখ তো তাকে বন্ধ করতে হবে! কেমন করে তা সে করবে ভেবেছিল? লাঞ্চের টিনের খাবারের চেয়ে আরও বড়ো কোনো ঘুসের ব্যবস্থায়?

একবার এমনও মনে হচ্ছিল যে, নাগাপ্পার লাঞ্চের নিমন্ত্রণটা নিলেও মন্দ হত না। বেকায়দায় পড়ে কী চাল সে চালে তা অন্তত জানা যেত।

কিন্তু নাগাপ্পা কি এমন সোজা লোক যে, তার সব প্যাঁচ আমি এত সহজেই ধরে ফেলতাম।

সে একেবারে পাকা ঘুঘু। উদ্দেশ্যটা, তার যত স্পষ্টই হোক তা সফল করবার জন্যে সামনাসামনি ঘুস দেবার মতো এমন একটা মোটা চাল সে চালবে না।

লাঞ্চটা সুতরাং তার মতলব হাসিলের একটা নির্দোষ ভূমিকা মাত্র। সে ভূমিকা থেকে তার গোপন চাল ধরবার আশা করাই ভুল। লাঞ্চের নিমন্ত্রণ না নিয়ে খুব লোকসান তাই হয়নি।

কিন্তু এখন আমার কী করা উচিত?

সরকার সাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিন, দু-জায়গাতেই খোঁজ নিয়ে বঙ্কুবাবু এখনও ফেরেননি জানবার পর সেইটেই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

নাগাপ্পার তাঁবুঘরের সভায় বঙ্কুবাবুর কথাটা শেষ পর্যন্ত চেপেই গিয়েছিলাম। ভালোই করেছিলাম এ বিষয়ে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। তার গোপন গতিবিধির সাক্ষী যে একজন নয় দুজন, এখবরটা অন্তত নাগাপ্পা এখনও জানতে পারেনি।

কিন্তু বঙ্কুবাবুর নিরুদ্দেশ হওয়ায় ব্যাপারটা আর তো শুধু নিজের কাছে চেপে রাখা উচিত নয়।

বঙ্কুবাবুর যদি গুরুতর কিছু হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে নিজেকে অনেকখানি দায়ী না করে যে পারব না!

সাংঘাতিক কিছু যদি নাও হয়ে থাকে তাহলেও অস্বাভাবিক কিছু যে ঘটেছে এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। ওরকম একটা ভোজনরসিক বোকা-সোকা ভালো মানুষ শখ করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ তো আর বিশ্বাস করবার নয়।

কী যে বঙ্কুবাবুর হতে পারে তা নিয়ে নিজের মনে জল্পনাকল্পনা করতেও যেন ভয় করে।

আর যাই হোক আনাড়ি নতুন লোক তো নন যে, পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা ভুল করে পথ হারিয়ে বসে থাকবেন। বরং এসব অঞ্চলের পথঘাট তাঁর অন্য অনেকের চেয়ে ঢের বেশি মুখস্থ। আদিবাসীদের পাহাড়ের অজানা পাকদণ্ডীর রাস্তায় তিনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

তাঁর এক দিন, এক রাত না ফেরার কারণ তাহলে তো দুর্ঘটনা বলে ধরতে হয়। পাকদণ্ডীর পথে কোথাও বেকায়দায় পড়ে-টড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে আছেন? না দুর্ঘটনাটা তার চেয়ে বেশি গুরুতর? কোনো হিংস্র প্রাণী, মানে সেই বুনো হাতিটাই...

এর বেশি আর ভাববার চেষ্টা করিনি।

মনে মনে তখনই সংকল্প স্থির করে নিয়ে সোজা লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের ছাউনিতে গিয়ে ঢুকলাম।

pathagar.net

দশ

খাস তাঁবুঘরে মামাবাবু আর মহান্তি তখন লাঞ্চ খেতে বসেছেন।

তাঁদের সঙ্গে সরকার সাহেবও হয়তো জুটে গেছেন ভেবে যে ভয়টা পেয়েছিলাম তা অমূলক। ভাগ্য ভালো যে সরকার সাহেব এ বেলায় নিজের তাঁবুতেই খাওয়া সারতে গেছেন।

আমায় দেখে মহান্তি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'কোথায় ছিলে তুমি হাজরা! আমরা তো কতক্ষণ অপেক্ষা করে এই খেতে বসছি।'

মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'লোধমা পাহাড়ের যা সব গোলমেলে ব্যাপার, তোর জন্যে তল্লাশি পার্টি পাঠাব কি না ভাবছিলাম!'

'আমার জন্যে নয়, সার্চ পার্টি সত্যিই পাঠানো দরকার।' খাবার টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে জোর দিয়ে বললাম, 'আর এক্ষুনিই।'

'কার জন্যে!' মহান্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আচ্ছা, যার জন্যেই হোক সে পাঠানো যাবেখন।' মামাবাবু কথাটাকে আমলই না দিয়ে যেন ছেলেমানুষকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুই এখন খেতে বোস দেখি!'

'না, খেতে বসতে পারব না!' সত্যিই অস্থির হয়ে উঠলাম—আমায় যখন আরাম করে খেতে বসতে বলছ তখন একটা লোক কত বড়ো সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে যে পড়েছে তা ভাবতেও পারছি না। এখনও বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে!'

'কার কথা বলছিস?' মামাবাবুর মুখে সে তাচ্ছিল্যের ভাব আর নেই।

'বলছি বঙ্কুবাবুর কথা।' তীক্ষ্ণস্বরেই জানালাম।

'বঙ্কুবাবু! বঙ্কুবাবুর কথা বলছিস!'

মামাবাবু যেভাবে নামটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে উচ্চারণ করলেন তাতে তিনি যে রীতিমতো বিচলিত হয়েছেন তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাঁর টনক এতক্ষণে নড়াতে পেরেছি জেনে খুশি হলাম।

'কী হয়েছে বঙ্কুবাবুর?' মহান্তি একটু বিমূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ দু-দিন ধরে তিনি লোধমা পাহাড়ে ফেরেননি।'—বলে সেদিন সকালে আদিবাসীদের পাহাড়ে আমাদের অভিযানটার প্রায় পুরোপুরি বিবরণই দিলাম।

মামাবাবু আর মহান্তি দুজনেই অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তিতমুখে সমস্ত বিবরণ শুনলেন।

মামাবাবুর প্রথম মন্তব্যটা বেশ একটু তীক্ষ্ণই শোনাল তারপর। অভিযোগটা যেন আমার বিরুদ্ধেই, 'এসব কথা আগে বলিসনি কেন?'

'তোমায় পাচ্ছি কোথায় যে বলব!' আমিও অভিমানটা প্রকাশ করলাম, 'তা ছাড়া নাগাপ্পার ওখানে একথা জানাতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে যা দেখলাম শুনলাম তাতে একথাটা চেপে যাওয়াটাই ঠিক হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'হুঁ!' স্পষ্ট কোনো উত্তর না দিয়ে মামাবাবু তখন তন্ময় হয়ে আর একটা কী যেন ভাবতে ভাবতে উঠে পড়েছেন।

আমি যে হাজির আছি তা যেন ভুলেই গিয়ে মামাবাবু মহান্তিকে তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'নাও মহান্তি তাড়াতাড়ি তৈরি হও। এখুনি বেরোতে হবে। নাগাপ্পার শুধু একবার খোঁজ নাও।'

'নাগাপ্পার খোঁজ আবার কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার দরকার হল না।

নাগাপ্পার সেই হেডবেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে তখন সেলাম দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

pathagar.net

চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে খুলে পড়তে পড়তে মামাবাবুর মুখের চেহারা যা দেখলাম তাতেই চিঠিটায় গুরুতর কিছু আছে বলে সন্দেহ হল।

সে সন্দেহ আরো দৃঢ় হল নাগাপ্পার বেয়ারা চলে যাবার পর মামাবাবুর উত্তেজনাটুকু দেখে।

'মস্ত বড়ো একটা ভুল করে ফেলেছি মহান্তি!' নাগাপ্পার চিঠিটা মহান্তির হাতে দিয়ে মামাবাবু যেন একটু অস্থির যন্ত্রণার সঙ্গে বললেন, 'এই একটা ভুলের জন্যে আমাদের এত সব চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়ে সাংঘাতিক একটা সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। চলো আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়।'

আমাকে দুজনে মিলেই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করায় সত্যিই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী! কী লিখেছেন নাগাপ্পা তা আমি জানতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারো!' মহান্তি চিঠির চিরকুটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় নাগাপ্পার আমাদের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে একটা কজে থাকবার কথা ছিল। নাগাপ্পা চিঠিতে জানিয়েছে যে, অন্য বিশেষ দরকারে তাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বলে সন্ধ্যায় সে ল্যাবরেটরিতে আসতে পারবে না।'

'তার মানে নাগাপ্পা এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে?' আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ' মামাবাবু যেন নিজেকে ধিক্কার দিয়েই বললেন, 'আর একটু আগে হুঁশ হলে এই যাওয়াটা বন্ধ করতে পারতাম। এখন যেকোনো দুঃসংবাদের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। চলো মহান্তি। আজ রাত্তিরটা খোলা আকাশের নীচেই কাটাতে হবে। সামান্য যা একটু দরকার সঙ্গে নাও।'

মামাবাবুর কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমি তখন যেমন অবাক তেমনি দস্তুরমতো ক্ষুব্ধ। মহান্তি মামাবাবুর ফরমাশ রাখতে যাওয়ার পর বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তোমরা কোথায় কেন যাচ্ছ বুঝতে পারছি না। তা বোঝবারও এখন দরকার নেই। কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি তো?'

'তুমি?' মামাবাবু বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছেন মনে হল। একটু ইতস্তত করে শেষে একটু যেন অপ্রস্তুতভাবেই বললেন, 'তুই, গেলে এ লোধমা পাহাড়ে পাহারায় থাকবার আর কাউকে পাব না যে! মহান্তির এ অঞ্চল ভালো করে চেনা বলে তাকে সঙ্গে নিতে হচ্ছে। কিন্তু এখানেও হুঁশিয়ার বিচক্ষণ কারোর থাকা তো দরকার! এ ভার নেবার মতো আর কেউ যে নেই!'

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়, কিন্তু যুক্তির খাতিরে নয়, অভিমানেই টং হয়ে যাওয়া মেজাজে গোমড়া মুখে মামাবাবুর অনুরোধটা তখনকার মতো বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম।

লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে পাহারা দেবার ভার চাপিয়ে দিয়ে মামাবাবু শুধু মহান্তিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

মুখে প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে এ ব্যবস্থায় গুমরেছি।

লোধমা পাহাড়ে পাহারা দেবার জন্যে কারোর যে থাকা দরকার মামাবাবুর এ যুক্তির বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এ পাহারার দায় কি আর কারোর ওপর চাপানো যেত না? এ ভার নেবার সবচেয়ে উপযুক্ত লোক তো মহান্তি। তিনি এখানকার কর্তাব্যক্তিদের একজন। লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে এ সময়ে তাঁরই তো থাকা দরকার ছিল।

তা ছাড়া আদিবাসীদের পাহাড়ের রহস্য ভেদের সবচেয়ে দামি হদিস আমি যে কষ্ট করে জোগাড় করেছি এটুকু গর্ব নিশ্চয় করতে পারি।

বঙ্কুবাবুর দু-দিন ধরে নিখোঁজ হবার খবরটা আমার কাছেই পেয়ে আমাকেই এখানে ফেলে রেখে যাওয়াটা কি মামাবাবুর উচিত হয়েছে? কোথায় কী কী দেখেছি তা আমি সঙ্গে থাকলে তো ভালো করে বোঝাতে পারতাম।

pathagar.net

শুধু তাই নয়, বঙ্কুবাবুর খোঁজ করবার জন্যে কোথায় তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সে জায়গাটা জানা তো একান্ত দরকার। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। আমি সঙ্গে না থাকলে এখন থেকে সন্ধে পর্যন্ত মামাবাবুদের এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়ানোই তো সার হবে! রাত্রের অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি তাঁরা নিশ্চয় করবেন না।

মামাবাবু যাবার সময় বাইরে রাত কাটাবার কথা অবশ্য বলেছেন। তখন রাগে অভিমানে কথাটা ভালো করে খেয়াল করিনি। এখন কিন্তু ভাবতে গিয়ে মামাবাবুর মতলবটার কোনো মানে পেলাম না।

মামাবাবুর ওপর যতই অভিমান হোক তাঁর প্রতি অবিচার করতে পারব না। একেবারে কিছু না বুঝেসুঝে নেহাত ঝোঁকের মাথায় অকারণে কিছু করবার মানুষ তিনি নন। অত ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে রাত পর্যন্ত পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাবার মতলব যখন তিনি করেছেন, তখন কিছু একটা উদ্দেশ্য তার পেছনে নিশ্চয় আছে।

সে উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে বোঝবার চেষ্টায় এ পর্যন্ত আদিবাসী খুনের রহস্য সম্বন্ধে যা যা যতটুকু জানা গেছে মনের মধ্যে একবার আউড়ে নিলাম।

গোড়া থেকে এ পর্যন্ত পরপর সমস্ত ব্যাপার সংক্ষেপে এই এইভাবে সাজানো যায়।

প্রথম :—মহাস্তির লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের একজন আদিবাসী চাপরাসি বুনো খ্যাপা হাতির আক্রমণে মারা যাওয়ার খবর।

দ্বিতীয় :—আদিবাসীদের পবিত্র যে 'এঞ্জা' পাহাড়ে কারো ওঠা বারণ তাতে দূরবিনের সাহায্যে আমার কাউকে উঠতে দেখা। এই গোপন আরোহী নাগাপ্পা বলে পরে সন্দেহ হওয়া।

তৃতীয় :—লোধমা পাহাড়ে সরকার সাহেবের কিছু ছেঁড়া বাজে কাগজের দলা কুড়িয়ে পাওয়া। মামাবাবুর বিচক্ষণতায় সে কাগজে সাংকেতিক অক্ষরে প্ল্যাটিনামের বাজারদর আর যে পাথর থেকে তা পাওয়া যায় তার আঁকা ইঙ্গিত আবিষ্কার।

চতুর্থ :—নাগাপ্পার বন্ধু ইংরেজ শিকারির মারফত আদিবাসীর খুন হওয়ার দিন মহাবুয়াং-এর খ্যাপা হাতির এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব বলে জানা।

পঞ্চম :—আমার ও বঙ্কুবাবুর কাছে আদিবাসীর খুনের জায়গায় নাগাপ্পার গোপন রহস্যজনক গতিবিধি ধরা পড়া।

ষষ্ঠ :—বঙ্কুবাবুর আশ্চর্যভাবে নিখোঁজ হওয়া।

সপ্তম :—মহাবুয়াং-এর খ্যাপা হাতি এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব হলেও আদিবাসীদের পাহাড়ে নাগাপ্পার সযত্নে সংগ্রহ করা জিনিস হাতির বিষ্ঠা বলেই প্রমাণ হওয়া।

নবম :—নাগাপ্পা যে কোম্পানির প্রতিনিধি, তার নামটা সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণ পাওয়া।

দশম :—তাঁর গোপন গতিবিধি আমি লক্ষ করেছি জানবার পর নাগাপ্পার আমাকে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা।

একাদশ :—বঙ্কুবাবু দু-দিন ধরে নিখোঁজ জানবার পর মামাবাবুর অকস্মাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

দ্বাদশ :—বিকেলে মামাবাবুদের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে যোগ দেবার কথা দিয়েও নাগাপ্পার হঠাৎ লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাওয়া আর সে খবরে মামাবাবুর যেন বেশিরকম শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠা।

মোটামুটি এই বারো দফা খেই থেকে আপাতত একটি মাত্র ইঙ্গিত যা পাওয়া যাচ্ছে তা তো এই যে, সুস্পষ্ট অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এখনও না থাকলেও সমস্ত রহস্যের মধ্যে নাগাপ্পার নিশ্চিত একটা সন্দেহজনক ভূমিকা আছে।

pathagar.net

বন্ধুবাবু নিখোঁজ জেনে মামাবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু নাগাপ্পা হঠাৎ লোধমা পাহাড় ছেড়ে চলে গেছে জেনে সে উত্তেজনা যেন অস্থির আতঙ্ক হয়ে উঠেছে।

কেন?

নাগাপ্পার কোনো ভয়ংকর মতলব তিনি কি তাহলে আঁচ করতে পেরেছেন? বাইরে সারা রাত কাটাবার কথা তাঁকে কি নাগাপ্পার শয়তানি ব্যর্থ করবার জন্যেই ভাবতে হয়েছে?

তাই হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সারারাত বাইরে কাটালেই নাগাপ্পাকে কি তিনি ঠেকাতে পারবেন?

নাগাপ্পার শয়তানি মতলবই বা এখন কী হতে পারে?

কথাটা ভাবতে ভাবতেই পোড়ানো কাগজপত্রের ছাইয়ে ভরতি করা আদিবাসীদের পাহাড়ের সেই লুকোনো গর্তটার কথা মনে পড়ল। সেই লুকোনো গর্তে সমস্ত রহস্যের খুব দামি কিছু সূত্র যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আহাম্মক বন্ধুবাবুর যুক্তি শোনাই সেদিন ভুল হয়েছে, গর্তটা আরও ভালো করে হাতড়ে তার কিছু মালমশলা সেদিন সঙ্গে নিয়ে আসাই উচিত ছিল। নাগাপ্পার বিরুদ্ধে কিছু জোরালো প্রমাণ হয়তো তাহলে হাতে থাকত।

সেই গোপন গর্তটাই যে নাগাপ্পার এখন প্রধান লক্ষ হবে এ বিষয়ে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। আদিবাসী খুন হওয়ার ব্যাপারের এমন একটা সাক্ষ্য প্রমাণের পুঁজি নাগাপ্পা অন্যের হাতে নিশ্চয় পড়তে দেবেন না। তাঁর ওপর সন্দেহ যখন জেগেছে বলে তিনি টের পেয়েছেন, তখন সামান্য কিছু সূত্রও কোথাও তাহলে তিনি তা নষ্ট করবার চেষ্টাই আগে করবেন।

কিন্তু আর যাই বুঝে থাকুন, মামাবাবু এই গোপন গর্তের কথা তো কিছু জানেন না। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বললেও নিজে থেকে এ গর্ত খুঁজে পাওয়া মামাবাবুর পক্ষে অসম্ভব।

নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে এরপর মনে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। মামাবাবুর আমাকে সঙ্গে না নেওয়া ভুল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমারও অভিমান করে তাঁবুতে বসে থাকা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এতক্ষণে নাগাপ্পা অনেকখানি এগিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বন্ধুবাবুর দেখানো পাকদণ্ডীর পথ যদি তাঁর জানা না থাকে, তাহলে এখন হয়তো ঘুরপথে মাঝামাঝির বেশি তিনি পৌঁছোননি। একবার মাত্র দেখা পাকদণ্ডীর পথ ঠিক মতো চিনতে পারলে তাঁর আগে না হোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গায় আমি পৌঁছোতে পারি।

এগারো

এক মুহূর্ত আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম। সারারাত বাইরে কাটাবার সম্ভাবনায় একবার একটা কম্বল গোছের কিছু সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু চড়াইয়ের পথে তাড়াতাড়ি যাওয়ার তাতে বাধা হতে পারে ভেবে সে ইচ্ছাকে আর প্রশ্রয় দিইনি।

আমি যখন বেরিয়েছি, তখন রোদের তেজ কমতে শুরু করে একটু লাল আভা তাতে লেগেছে। পাহাড়ের যে পিঠটা দিয়ে উঠতে হবে ভাগ্যক্রমে সেটা পশ্চিম ঢাল। ঘণ্টা দুইয়ের মতো দিনের আলোয় পথ দেখে ওঠবার সুযোগ তাই পাওয়া যাবে। পাকদণ্ডীর পথ চিনতে ভুল না হলে এই ঘণ্টা দুয়েকই যথেষ্ট। তার মধ্যেই ওপারের উপত্যকায় পৌঁছোনো শক্ত হবে না।

প্রথম দিকটায় একটু ধুকধুকুনি থাকলেও কিছুদূর ওঠবার পর মনের জোর বেড়েছে। জংলা পাহাড়ে একবার মাত্র উঠে নির্ভুল পথের চিহ্ন মনে করে রাখা প্রায় অসম্ভব। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা সেরকম চিহ্নই যেন পেয়েছি বলে মনে হয়েছে।

পাহাড়ের পথে উঠতে মামাবাবু আর মহান্তির জন্যেও চারিদিকে নজর রেখেছি। কোনরকমে তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে গেলে এখন সবচেয়ে ভালো হয়, ঝোঁকের মাথায়

বেরিয়ে পড়ার সময় কম্বল তো নয়ই সঙ্গে একটা টর্চ বা অস্ত্রশস্ত্র গোছের কিছুও নিইনি। পাহাড়ের ওপরে ঠিক সময়ে পৌঁছে নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করতে পারলেও তারপর রাতের কথা ভাবতে হবে। চিতা বা ভালুকের মতো হিংস্র জন্তুজানোয়ার এ পাহাড়ে তো আছেই, তার ওপর নাগাপ্পা যার বিষ্ঠার নমুনা দেখিয়েছেন সে খ্যাপা হাতি থাকাও অসম্ভব নয়। আত্মরক্ষার কোনো কিছুই যখন সঙ্গে নেই, তখন মামাবাবুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ওপরই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু সে আশাই শুধু বিফল হল না, ওপরে ওঠবার পর চারিদিকে একেবারে শূন্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

ওপরের উপত্যকায় পৌঁছেই নাগাপ্পার সাড়া পাব জেনে শেষের দিকটা বেশ সন্তর্পণে উঠছিলাম। ভেবেছিলাম নাগাপ্পাকে একেবারে যথাস্থানে যদি না দেখি, তাহলে খানিকটা অপেক্ষা করলেই তিনি উদয় হবেন। গোপনে নিঃশব্দে তাঁর ওপর নজর রাখবার জন্যে জংলা গাছ আর পাথরের বড়ো বড়ো চাঁইয়ের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে গর্তের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম।

কিন্তু কোথায় নাগাপ্পা! প্রায় আধ ঘণ্টা বৃথাই অপেক্ষা করার পর চিন্তিত হয়ে উঠলাম। আমি পৌঁছোবার আগেই কি নাগাপ্পা তাঁর কাজ সেরে চলে গিয়েছেন? কিন্তু তা তো অসম্ভব।

তাহলে আমার সমস্ত অনুমানই কি ভুল? এই লুকোনো গর্তের মালমশলা সম্বন্ধে নাগাপ্পার কোনো মাথাব্যথা নেই? অন্তত আজই সেগুলো সরাবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হননি।

নাগাপ্পা তাহলে কোথায় কী মতলবে এসেছেন? মামাবাবুই বা মহান্তিকে নিয়ে কী কাজে কোথায় ঘুরছেন? নিজের বুদ্ধির দোষে এক আজগুবি ধান্দায় এখানে এসে যে আহাম্মকি করেছি তারপর কী এখন আমি করতে পারি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ পাহাড় থেকে নেমে লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা? এখনও পা বাড়ালে কিছুটা আলোয় আলোয় অবশ্য নামা যাবে, কিন্তু তারপর? লোধমার ছাউনি পর্যন্ত জঙ্গলের একেবারে জনমানবহীন পথ তো আগাগোড়া অন্ধকার।

অস্বীকার করব না যে, ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা বেশ একটু কেঁপে উঠল।

কিন্তু ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় যখন নেই, তখন সেইটাই মেনে নিতে হবে।

যাবার আগে শুধু লুকোনো গর্তটা একবার নিজের চোখে দেখে যেতে চাই। প্রায় অসম্ভব হলেও নাগাপ্পা আমার আগে এসে কাজ সেরে গেছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। এখনও পর্যন্ত যদি তা না পেরে থাকেন, তাহলে সেদিনকার ভুলটা সংশোধনও করতে হবে। গর্তটা ভালো করে তলা পর্যন্ত ঘেঁটে কাজে লাগাবার মতো যা কিছু পাই আজ আর সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলব না।

সেই উদ্দেশ্যেই টিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে লুকোনো গর্তটার কাছে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

চমকটা ভয়ের নয়। তার বদলে বিস্ময়, উল্লাস আর সেইসঙ্গে গভীর বিমূঢ়তার বললে কিছুটা বোঝানো যাবে।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমার বাঁ দিকে কিছু দূরে কটা জংলি গাছের জটলার মধ্যে বেশ চড়া গলার একটা বচসা শুনে। বচসা না বলে তাকে এক তরফা বকুনিই বলা উচিত। এক পক্ষ জ্বলন্ত স্বরে ধমক দিচ্ছে, আর অন্য পক্ষ ভয়ে ভয়ে যেন একটু প্রতিবাদ করে থেমে যাচ্ছে।

দু-পক্ষের গলাই আমার চেনা। তার মধ্যে একটি গলা আর কারুর নয়—বঙ্কুবাবুর।

বিস্ময় আর প্রায় অধীর উল্লাসটা সেই কারণে।

বঙ্কুবাবু তাহলে বেঁচে আছেন। শুধু বেঁচে নেই রীতিমতো বহাল তবিয়তে যে আছেন তাঁর ছুঁচের মতো সরু তীক্ষ্ণ গলার জোরেই তার প্রমাণ।

হ্যাঁ, বঙ্কুবাবুই রেগে কাঁই হয়ে কান ফুটো করা গলায় ধমক দিচ্ছেন আর ভয়ে ভয়ে তার মৃদু প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করছেন সরকার সাহেব।

আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে রীতিমতো বিস্ময়-বিমূঢ়তাটা এই উলটো পালার দরুন।

বিমূঢ়তাটা যত বেশিই হোক তার সঙ্গে বেশ একটু খুশিও তখন আমার মনে মেশানো।

আজীবন অন্যায় জুলুম সয়ে সয়ে বঙ্কুবাবুও তাহলে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, অসহ্য খোঁচানিতে নিরীহ পোকা যেমন রুখে দাঁড়ায়!

সরকার সাহেবের নাকাল অবস্থাটা চাক্ষুষ দেখবার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু কাছে যেতে গিয়ে ওঁদের চোখে পড়লে সরকার সাহেবের চেয়েও বঙ্কুবাবুই বেশি অপ্রস্তুত হবেন। তাই গর্তটা খুঁজে নিয়ে সেটার ছাই মাটি সরিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে দূর থেকেই বঙ্কুবাবুর বকুনি থেকে তাঁর রাগের কারণটা বোঝার চেষ্টা করলাম।

তাঁর এ দু-দিনের অন্তর্ধানের রহস্য থেকে শুরু করে বঙ্কুবাবুর কাছে অনেক কিছুই এখন জানবার আছে। কিন্তু তাঁর পাত্তা যখন পেয়ে গেছি, তখন আমি নিশ্চিন্ত। লোধমা পাহাড়ে ফেরা সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। নির্ভাবনায় এই লুকানো গর্তের মালমশলা যা যা দরকার আপাতত বাছাই করে নিতে পারি।

লুকোনো গর্তটায় ইতিমধ্যে আর যে কারুর হাত পড়েনি এটা সত্যিই আশ্চর্য।

সৌভাগ্যটা সত্যিই আশাতীত বলতে হয়।

নাগাপ্পার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই এটা হয়েছে বুঝলাম। এ গর্ত যে আর কেউ খুঁজে বার করে তার আসল মর্মটা আঁচ করতে পারে নাগাপ্পা তা কল্পনাই করেননি। সুবিধা ও সময়মতো এ গর্তের জিনিস সরালেই হবে—এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্তে হয়ে না থাকলে এ গর্তের জিনিস দ্বিতীয়বার ঘাঁটবার সুযোগ আমি পেতাম না।

ওপরের শুকনো পাতাটাতার জঞ্জাল সরিয়ে গর্তটার ভেতরে হাত চালাতে চালাতে বঙ্কুবাবুর প্রায় খেপে ওঠা গলার ধমক আর বকুনি শুনতে পাচ্ছিলাম।

ওপর ওপর যেটুকু শুনলাম, তাতে বঙ্কুবাবুর রাগের কারণটা ঠিক স্পষ্ট অবশ্য বোঝা না গেলেও এই দু-দিন ধরে তাঁর পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে বলেই সরকার সাহেবের ওপর মেজাজটা যে খিঁচড়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না।

তাঁর এক-আধটা কথায় সেই গায়ের জ্বালাই প্রকাশ পাচ্ছিল।

'বড়ো চাকরে হয়েছেন! সাহেব সেজে ডাঁট দেখাচ্ছেন অফিসে। ভাবছেন উনি একটা মস্ত কেওকেটা! ওঁকে ঘাড়ধাক্কায় একেবারে পাহাড়ের তলায় গড়িয়ে দেবার কেউ নেই! কোন মাতব্বরি করছিলেন ওখানে যে, একবার খবর নিয়ে যাবার ফুরসত হয়নি!'

জবাবে সরকার সাহেব কী যেন একটা বললেন। তাতে যেন আগুনে ঘি পড়ল। বঙ্কুবাবুর গলা আরও ছুঁচালো হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ আমি তো একটা হেঁজিপেঁজি আরদালি! ম্যানেজার সাহেব তাই আমার কথা ভুলেই গেছলেন...'

শুনতে শুনতে বঙ্কুবাবুর কথাগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেল। গর্তটা হাঁটকাতে হাঁটকাতে তখন এমন কিছু পেয়েছি যে, সমস্ত মন তাতেই মগ্ন হয়ে গেছে।

জিনিসটা সামান্য একটা পেতলের চাকতি। কিন্তু এই খুনের রহস্যের ব্যাপারে তার দাম যে কত তা আমার বুঝতে বাকি নেই।

পেতলের চাকতিটা পিয়ন বা আরদালিদের ব্যাজ-গোছের। তাদের জামায়, কোমরবন্ধে বা হাতার ওপরে লাগানো থাকে। এ চাকতিটা বিশেষভাবে আমার চেনা। মহান্তির লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের চাপরাসি পিয়নদের পোশাকে এ চাকতি আমি দেখেছি।

চাকতিটা পাবার পর উদগ্রীব হয়ে গর্তটা আরও তাড়াতাড়ি হাঁটকাতে লাগলাম।

pathagar.net

বেশির ভাগই শুধু ছাইপাঁশ। তার ভেতর থেকে অর্ধেক পোড়া কটা কাগজের টুকরো মাত্র উদ্ধার করা গেল। কিন্তু সেই একটা টুকরোই ভালো করে লক্ষ করে স্থান কাল সব ভুলে যেতে আমার দেরি হল না।

কাগজের টুকরোটার ওপর খুদে খুদে অক্ষরের লেখাগুলো কোনোটাই সম্পূর্ণ পড়বার উপায় নেই। কাটাকাটা কটা শব্দ আর সংখ্যা মাত্র তা থেকে পড়া যায়।

কিন্তু সেই সামান্য শব্দ আর সংখ্যাই মাথার টনক নড়াবার পক্ষে যথেষ্ট।

এক জায়গায় একটা শব্দ পাওয়া গেল ইংরেজিতে Olivi...

শব্দটা সম্পূর্ণ নয়, তার বাকি অংশটা পুড়ে গেছে। সেই টুকরো কাগজটাতেই আর একটা সংখ্যা লেখা—৩.৪!

সংখ্যাটার শেষে এই বিস্ময়ের চিহ্নটাই অদ্ভুত। আর তার চেয়ে বেশি অদ্ভুত আর একটা আধপোড়া কাগজের টুকরোয় বোলতার চাকের মতো একটা ছবির অংশ।

পোড়া কাগজে যেটুকু আছে তা দেখেই ছবিটা কীসের তা আমি এক নিমেষে বুঝলাম। এই ছবির মর্মই নাগাপ্পার আস্তানায় মামাবাবু আজই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ছবিটার নীচে একটা নতুন শব্দও পাওয়া গেল। শব্দের সামনের একটা অক্ষর নেই। পরে যা লেখা আছে তা হল... imberlite।

তন্ময় হয়ে এই কাগজগুলো দেখতে দেখতে বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেবের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একেবারে ঘাড়ের কাছে একটা নিশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে দেখি, বঙ্কুবাবু।

কখন যে তাঁদের ঝগড়া থামিয়ে বঙ্কুবাবু আমার পেছনে এসে কৌতূহলের উঁকি দিতে বসেছেন তা টেরই পাইনি।

উৎসাহভরে বললাম, 'কী পেয়েছি দেখছেন?'

'তা তো দেখছি!' বঙ্কুবাবু পাশে এসে বসে তার পেটেন্ট কাঁদুনে গলায় বললেন, 'কিন্তু আপনি কখন এখানে এলেন?'

পোড়া কাগজের টুকরোগুলো সযত্নে পকেটে রাখতে রাখতে হেসে বললাম, 'এসেছি বেশ কিছুক্ষণ। তখন আপনি সরকার সাহেবকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছেন! সত্যি এত দিনের অত্যাচারের শোধ যা নিয়েছেন তাতে কী খুশি হয়েছি কী বলব!'

বঙ্কুবাবুর মুখখানা এবার দেখবার মতো। আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুঁচালো গলায় যেন অভিযোগের সুরে বললেন, 'আপনি আমাদের ঝগড়াও তাহলে শুনেছেন?'

'সব কি আর শুনেছি!' বঙ্কুবাবুকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলাম, 'শুনতে শুনতে এই গর্তে যা পেলাম তাতে আর কোনো কিছুর হুঁশই রইল না।'

'পেয়েছেন তো ওই দুটো পোড়া কাগজকুচি', বঙ্কুবাবুর বিদ্রূপের চেষ্টা কাঁদুনে গলায় ঠিক ফুটল না।

'শুধু পোড়া কাগজকুচি!' এবার বঙ্কুবাবুকে অবাক করবার জন্যেই পকেট থেকে চাকতিটা বার করে বললাম, 'দেখেছেন, এটা কী?'

এবার বঙ্কুবাবুর চোখ দুটো সত্যিই বিস্ফারিত হল।

তাঁকে আরও ভালো করে আমার কৃতিত্বটা জানাবার জন্যে বললাম, 'এ চাকতিটার মানে বুঝতে পারছেন? এ হল লোকনাথ মাইনিং সিন্ডিকেটের পিয়ন চাপরাসিদের চিহ্নিত করবার চাকতি। আদিবাসী পিয়নটির এ চাকতি এই গর্তের ভেতর কে পুঁতে রাখতে পারে? খ্যাপা হাতি গোদা পায়ে থেঁতলে মেরে ওখানে গর্ত খুঁড়ে চাকতি পুঁতে নিশ্চয় রাখেনি। এ কাজ কোনো মানুষের আর এরকম ভাবে লুকোবার চেষ্টা থেকেই আদিবাসী পিয়নকে খুন করার আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়তে পারে।'

'তাহলে আদিবাসী পিয়নকে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ খুন করেছে, আপনি মনে করেন?' বঙ্কুবাবুর জিজ্ঞাসার ধরনে মনে হল আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলেই তাঁর সন্দেহ, 'কিন্তু একটা সামান্য জংলী পিয়নকে এত প্যাঁচ কষে খুন করবার সত্যি কোনো কারণ থাকতে পারে কি?'

'নিশ্চয় পারে।' জোর দিয়েই বলতে পারলাম এবার, 'আর সে কারণ যে কী তা এই পোড়া কাগজকুচির মধ্যেই পাওয়া অসম্ভব নয়। মামাবাবুর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেলে এখুনি হয়তো ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেত।'

'এখানে মামাবাবুর সঙ্গে দেখা!' বঙ্কুবাবু বেশ হতভম্ব, 'এখানে তিনি কোথা থেকে আসবেন! তাঁর তো আপনার মতো মাথায় পোকা ঢোকেনি!'

'ঢুকেছে আরও বেশি!'—বলে দুপুরে নাগাপ্পার ছাউনির সভায় যা যা হয়েছে ও তারপরে মামাবাবু ও মহান্তি যেভাবে এ পাহাড়ের দিকেই রওনা হয়েছেন তার মোটামুটি বিবরণ বঙ্কুবাবুকে দিলাম।

এ বিবরণ সত্যি কথা বলতে গেলে বঙ্কুবাবুর খাতিরে দিইনি। নিজের মনেই সমস্ত ব্যাপারটা আরও ভালো করে গুছিয়ে নেবার জন্যে প্রায় স্বগতভাবে মুখে বলে গিয়েছি।

বিবরণ দিয়ে নিজের আশাটার ওপর আর একবার জোর দিয়ে বললাম, 'সরকার সাহেবের ওই ছেঁড়া কাগজের দলা থেকে মামাবাবু যা উদ্ধার করেছেন এ পোড়া কাগজকুচি পেলে তার চেয়ে বেশি কিছু পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

'দেখি কাগজগুলো!' এতক্ষণে বঙ্কুবাবু আগ্রহ প্রকাশ না করে পারলেন না।

'না, আর এ কাগজ আপনার হাতেও দিচ্ছি না!' হেসে পকেটটায় হাত চাপা দিয়ে বললাম, আর এ কাগজ নিয়ে আপনি করবেনই বা কী। আপনি খনিজ বিশারদও নন, গোয়েন্দাও নন।'

'না, তা কিছুই নই!' করুণ কাঁদুনে গলায় স্বীকার করলেন বঙ্কুবাবু। 'আমি তো একটা আরদালির বেশি কিছু না!'

সরকার সাহেবের ওপর বঙ্কুবাবুর খানিক আগেকার তড়পানির কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে ফেলে বললাম, 'কিন্তু যেমন-তেমন আরদালি নন। খেপলে বড়ো সাহেবকে পর্যন্ত কেঁচো বানিয়ে ছাড়েন। আচ্ছা সত্যি আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? সেই আমার সঙ্গে এই পাহাড়ে ছাড়াছাড়ি হবার পর এ পর্যন্ত করছিলেন কী? ছিলেনই বা কোথায়?'

'কোথায় ছিলাম জিজ্ঞাসা করছেন! জিজ্ঞাসা করতে পারছেন? আপনার লজ্জা করছে না!' বঙ্কুবাবুর কাঁদুনে গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল অভিযোগে, 'একবার খোঁজ নিতে আসার কথাও মনে হয়েছিল কি? তিন দিন যে ফিরে যাইনি তা খেয়ালও বোধ হয় করেননি।'

বিরক্তি নয়, বঙ্কুবাবুর অভিযোগে তাঁর ওপর সহানুভূতিই হল। সত্যিই তাঁর পক্ষে নিজেকে সকলের এরকম পায়ে-ঠেলা ভাবা কিছু অন্যায় তো নয়। তিনি যে এ কদিন লোধমা পাহাড়ে নেই তা নিয়ে কারুর তো এতটুকু মাথাব্যথা দেখিনি।

মাথাব্যথা বেশিরকম থাকা সত্ত্বেও কেন যেন তাঁর খোঁজ নিতে আসতে পারিনি, সে কথা যথাসাধ্য বঙ্কুবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এরপর।

প্রথমত তিনি যে সেদিন সকালে আমার গোয়েন্দাগিরির ধান্দায় সহায় হয়ে গিয়েছিলেন, সে কথাটা জানালে সরকার সাহেবের কাছে তাঁর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না বলেই অনুমান করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁর চাকরি নিয়েই টানাটানি হতে পারে বলে ভয় হয়েছিল। অথচ তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে আমার সঙ্গে তাঁর আদিবাসীদের পাহাড়ে যাওয়ার কথাটা লুকোনো যেত না।

অত্যন্ত অস্থির হলেও এ বেলা কি ও বেলা ফিরে আসবেন আশা করে তাই দুটো দিন বাধ্য হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছে।

আমার কৈফিয়তে বঙ্কুবাবুর মুখে একটু প্রসন্নতার আভা দেখে আগের প্রশ্নটাই আবার করলাম।

'আচ্ছা সত্যি কী হয়েছিল বলুন তো এবার! দু-দিন দু-রাত ছিলেন কোথায়?'

'হয়েছিল যা তা ভয়নাক, আর'—বঙ্কুবাবু আমায় একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন, 'ছিলাম এঞ্চা পাহাড়ে।'

'এঞ্চা পাহাড়ে!' আমি অবিশ্বাস ভরে বেশ একটু ভ্রূকুটির সঙ্গে বঙ্কুবাবুর দিকে তাকালাম।

কিন্তু বঙ্কুবাবু তো ঠাট্টা করবার মানুষ নন। তাই কথাটা ঠিক শুনেছি কি না যাচাই করবার জন্যে আবার জিজ্ঞাসা করতে হল, 'এঞ্চা পাহাড়ে কি বলছেন? সেখানে পা দেওয়া বারণ আপনি জানেন না?'

'খুব জানি।' বঙ্কুবাবু এক কথায় স্বীকার করে বললেন, 'কিন্তু ওই বারণ বলেই সেখানে গিয়ে উঠেছিলাম আর তাতেই এ পর্যন্ত প্রাণটা ধড়ে আছে।'

'তার মানে!' রীতিমতো বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রাণ যাবার মতো কী হয়েছিল আবার এর মধ্যে?'

যা হয়েছিল বঙ্কুবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে সংক্ষেপে শুনলাম এরপর। শুনে সত্যিই অবাক হলাম।

আমায় সোজা পথ ধরিয়ে দিয়ে বঙ্কুবাবু সেদিন সাধারণের অজানা পাকদণ্ডীর পথে আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নামছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় বন্দুকের শব্দে তিনি চমকে থেমে যান।

পাহাড়ে জঙ্গলে কাছাকাছি কোনো শিকারির বন্দুকের আওয়াজ শুনেছেন বলে ভাববার তখন আর উপায় নেই। বন্দুকের গুলিটা তাঁর মাত্র হাত কয়েক দূরের একটা পাথরে লেগে ছিটকে গেছে।

এ গুলিটা আকস্মিকও যে নয়, একটু অপেক্ষা করার পর আবার নামতে গিয়েই তা টের পাওয়া গেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও আরেকটা গুলির শব্দ তখন প্রতিধ্বনি তুলেছে পাহাড়ময়। গুলিটা যে তাঁর উদ্দেশ্যেই ছোঁড়া, এ বিষয়ে তখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

গুলিটা নীচে থেকে কেউ ছুঁড়ছে। এই হয়েছে বঙ্কুবাবুর পক্ষে মুশকিল। ওপর থেকে কেউ ছুঁড়লে পাকদণ্ডীর পথে তাড়াতাড়ি নেমে গুলির নাগালের বাইরে পৌঁছে যাবার আশা করতে পারতেন। কিন্তু দুশমন নীচে থাকায় নামতে গিয়ে তার খপ্পরেই পড়বার ভয় হয়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে বঙ্কুবাবু ওপরেই ওঠবার চেষ্টা করেছেন এবার। যতদূর সম্ভব ঝোপজঙ্গলে আর চাঁইপাথরের আড়াল দিয়ে ওপরে উঠতে কম সময় লাগেনি, কিন্তু দু-একবার গুলির নিশানা হলেও শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় আদিবাসীদের পাহাড়ের মাথায় উঠে আসতে পেরেছেন।

ওপরে উঠে বঙ্কুবাবু আর দ্বিধা করেননি। লোধমা পাহাড়ে ফিরে যাবার চেষ্টা তখন বাতুলতা মনে হয়েছে। নীচে থেকে যে তাঁকে গুলি করতে চেষ্টা করেছে, সে এবারে হার মেনেই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র বোধ হয় নয়। এখানে বিফল হলেও লোধমা পাহাড়ে যাবার পথে কোথাও সে ওত পেতে থাকবেই। কোথায় যে থাকতে পারে তা ঠিকমতো জানা যখন অসম্ভব, তখন লোধমা পাহাড়ে যাবার ইচ্ছেটা অন্তত তখনকার মতো চেপে থাকাই উচিত বলে বঙ্কুবাবুর মনে হয়েছে।

লোধমা পাহাড়ে ফিরে না গেলে কোথায় বা নিরাপদে থাকা যায় ভাবতে গিয়ে হঠাৎ এঞ্চা পাহাড়ের বিদঘুটে চুড়োটার দিকে তাঁর দৃষ্টি গেছে। আর সেইসঙ্গে মনে হয়েছে আদিবাসীদের অভিশাপে ঘেরা হওয়ার দরুনই এঞ্চা পাহাড় তাঁর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ গোপন আশ্রয়।

বড়োবাবুর সমস্ত কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আপনাকে এভাবে গুলি করার চেষ্টা কে করতে পারে? যার পক্ষে করা সম্ভব সে তো আদিবাসীদের গাঁয়ের দিকেই উঠে গিয়েছিল!'

'উঠে যেতেই আমরা দেখেছি।' বঙ্কুবাবু, কাঁদুনে গলায় বললেন, 'তার সঙ্গে আমাদের চোখ দুটো তো আর পাঠাইনি। কিছুদূর যাবার পর অন্য পথে পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে নেমে ওত পেতে থাকা শক্ত কিছু নয়।'

'কিন্তু কেন আপনার ওপর এ আক্রোশ?'

'এঙ্কা পাহাড়ে গেলে বুঝবেন।' বলে বঙ্কুবাবু হাসলেন।

'এঙ্কা পাহাড়!' সবিস্ময়ে বললাম, 'সেখানেই যাচ্ছি নাকি?'

বারো

হ্যাঁ, এঙ্কা পাহাড়েই শেষ পর্যন্ত সেদিন গেলাম।

নিয়ে গেলেন অবশ্য বঙ্কুবাবুই। তিনি না পথ দেখালে আদিবাসীদের বসতির পাহাড় থেকে তাদের পবিত্র এঙ্কা পাহাড়ে যাবার গোপন রাস্তা সাত দিন সাত রাত খুঁজেও আমার পক্ষে বার করা সম্ভব হত না।

দুটো পাহাড়ের একটা জোড় অবশ্য এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করলে আমাদের মতো আনাড়ির চোখেও পড়তে পারে। কিন্তু বিরাট কোনো দানবীর ক্ষুরের খোলা ফলার মতো সে তো খানিকটা খাড়া আর সম্পূর্ণ ন্যাড়া পাথরের ফালি মাত্র। সে জোড়ের পাহাড়ের গা-টা একেবারে মসৃণ আর মাথাটা ধারালো ফলার মতো এমন সংকীর্ণ যে মানুষ তো ছার পাহাড়ি ছাগলও তার ওপর দিয়ে যেতে পারে না।

সেই জোড়ের মাথায় ওপর দিয়ে নয়, নীচের একজায়গার আধা সুড়ঙ্গ আধা খাঁজ গোছের একটি লুকোনো অজানা পথ দিয়ে বঙ্কুবাবু যখন আমাকে এঙ্কা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তুললেন তখন হাত-পা শুধু নয় বুকের ভেতরটা পর্যন্ত আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে।

শুধু যে অত্যন্ত দুর্গম সংকীর্ণ পাহাড়ি পথে প্রতি মুহূর্তে একেবারে অতলে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবার ভয়েই হাত পা আর বুকের ভেতরটা হিম হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে ঝড়বৃষ্টিরও বেশ একটু সাহায্য আছে।

আদিবাসীদের বসতির পাহাড় থেকে এঙ্কা পাহাড়ে যাবার গোপন রাস্তার মাঝামাঝি পৌঁছোবার পরই হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। তখন এগোনো আর পেছোনো দুই সমান। মরিয়া হয়ে তাই সামনেই কখনো কুঁজো হয়ে কখনো রীতিমতো হামাগুড়ি দিয়েই এগোতে হয়েছে। আগে আগে পথ দেখিয়ে গেলেও বঙ্কুবাবুকে আমার চেয়ে খুব সাহসী মনে হয়নি। এক-আধবার খুব অতল খাড়াইয়ের ধারে তাঁর মুখের চেহারা যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে অতি বড়ো গরজ না থাকলে শখ করে এরকম বিপদের রাস্তায় তিনি আসতেন না।

গরজটা যে কত বড়ো এঙ্কা পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছোবার খানিক বাদেই তা বোঝা গেছে। শুধু পাহাড়ের দুর্গম রাস্তায় আমাদের বিপদে ফেলবার জন্যেই ঝড়বৃষ্টিটা যেন কোথায় ওত পেতে ছিল। আমরা রাস্তাটা পেরিয়ে আসবার পরই তখন প্রায় থেমে এসেছে।

বিপদ কাটিয়ে বঙ্কুবাবুর চেহারাও তখন অন্যরকম। যেতে যেতে আমাকে উৎসাহভরে এঙ্কা পাহাড়ের পরিচয় দিচ্ছিলেন।

আদিবাসীদের এ পবিত্র পাহাড়টা সম্বন্ধে এখনকার মতো কড়াকড়ি বছর কুড়ি আগেও নাকি ছিল না। ইংরেজদের আমলে খনির কাজ-কারবারে প্রথম যে বিদেশিরা এ অঞ্চলে আসে

boiRboi.net

তারা লোধমার বদলে এই পাহাড়েই তাদের ঘাঁটি বসিয়েছিল। তাদের তৈরি দু-একটা বাড়িঘরের চিহ্ন এখনও এ পাহাড়ে দেখা যায়। পাহাড়ের এক-একটা জায়গার ইংরেজি নামেও সেকালের ছোঁয়া লেগে আছে, যেমন, ক্যামেল-হিল, পিক-ভিউ, স্নেক ভ্যালি ইত্যাদি।

উটের পিঠের কুঁজের মতো একটা পাথুরে টিবির তারা নাম দিয়েছিল ক্যামেল-হিল। চারিদিকের পাহাড় জঙ্গলের মাঝে কিছুটা সমতল একটা আঁকাবাঁকা উপত্যকা গোছের জায়গাকে বলত স্নেক ভ্যালি আর প্রায় খাড়া অতলে নেমে যাওয়া একটা খাদের পাহাড়ের খানিকটা খাঁজ তাদের কাছে ছিল পিক-ভিউ! প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু এ পিক-ভিউয়ের নামটা ভুল দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে দূরের দিকচক্রবালঘেরা যে দৃশ্য নীচে দেখা যায় তা সত্যিই অপূর্ব।

এঞ্ঝা পাহাড় যে আদিবাসীদের কাছে পবিত্র তা বিদেশিদের বোধ হয় জানাই ছিল না, কিংবা জানলেও তারা গ্রাহ্য করেনি। এ পাহাড়ে মৌরসি পাট্টা নিয়ে একটা মনোরম সাহেবি আস্তানা গড়ে তুলবে এই ছিল তাদের কল্পনা। যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না কোনোদিন, তার সত্যি সত্যি গণেশ উলটাবে তা কি তারা তখন ভাবতে পেরেছে?

কিন্তু সত্যিই অসম্ভব একদিন সম্ভব হল। রাজ্যপাট একদিন উঠল। সেই সঙ্গে কপালের দোষ কিংবা চেষ্টার ত্রুটিতে খনির কাজেও সুবিধে করতে না পেরে একদিন পাততাড়ি গুটিয়ে বিদেশির দল আর কোথাও পাড়ি দিলে।

দেশ নিজেদের হাতে আসবার পর আর কিছু না হোক আদিবাসীদের ওপর সুবিচারের চেষ্টা হয়েছে। তাদের পবিত্র 'এঞ্ঝা' পাহাড়ের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার এখন তাদেরই।

বঙ্কুবাবুর বিবরণ শুনতে ভালোই লাগছিল কিন্তু হঠাৎ সন্দেহ হল কথা বলার উৎসাহে কোথায় যাচ্ছেন বঙ্কুবাবু তা বোধ হয় ভুলেই গেছেন।

এদিকে ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলেও মেঘগুলো আরও ছড়িয়ে আকাশটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সূর্য ডুবতে তখন আর দেরি নেই। তার ওপর এই মেঘের আবরণের দরুন এই পাহাড়ের মাঝখানেও যেন সন্ধ্যার আগে থাকতেই ঘন হতে শুরু করেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে বঙ্কুবাবুকে বাধা দিয়ে সেই কথাই জানালাম, 'সন্ধ্যা হয়ে এল টের পাচ্ছেন?'

'সন্ধ্যা!' বঙ্কুবাবুর যেন সত্যিই এতক্ষণে সে হুঁশ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, তা সন্ধে হলে ক্ষতিটা কী? সন্ধে তো সময়মতো হবেই।'

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? এরপর আর কিছু দেখা যাবে?' একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললাম, 'মনে আছে এঞ্ঝা পাহাড়ে কী যেন আমায় দেখাবেন বলেছিলেন যা দেখলেই নাগাপ্পার কেন আপনার ওপর এত আক্রোশ বুঝতে পারব?'

বঙ্কুবাবু প্রথম আমার দিকে যেভাবে চাইলেন তাতে মনে হল আমি আবোল তাবোল কিছু বকছি বলেই তাঁর সন্দেহ হচ্ছে। তারপর নিজের প্রতিশ্রুতিটা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'সত্যি সে কথাটা ভুলেই গেছলাম। তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। এঞ্ঝা পাহাড়ে যখন এসেছেন, তখন যা দেখবার সবই দেখবেন। আর আমি যা দেখাবার কথা বলেছি রাত্রেও তা দেখা আটকাবে না।'

'রাত্রেও দেখা যাবে?' আমি সন্দিগ্ধভাবে বঙ্কুবাবুর দিকে চাইলাম। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবার স্পর্ধা তো বঙ্কুবাবুর হবার কথা নয়!

ঠাট্টা নিশ্চয় বঙ্কুবাবু করেননি, কিন্তু তাঁকে সে বিষয়ে জেরা করার ফুরসত তখন আর হল না। হঠাৎ আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরে তিনি হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে যেখানে দাঁড় করালেন, সেটা আগেকার সেই বিদেশি খনি-সন্ধানীদের একটা প্রায় ধসে-পড়া পোড়ো বাংলো। নেহাত তখনকার দিনের সরেস মশলায় মজবুত করে তৈরি বলে একেবারে ধূলিসাত

pathagar.net

হয়নি। ওপরের টালির ছাউনি নিয়ে থামসমেত একটা চওড়া বারান্দার খানিকটা অংশ এখনও খাড়া আছে।

সেই বারান্দারই একটা থামের আড়ালে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে হতভম্ব হয়ে চাপা গলাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী, হল কী হঠাৎ?'

কোনো উত্তর না দিয়ে বঙ্কুবাবু অত্যন্ত সন্তর্পণে বকের মতো পা বাড়িয়ে বারান্দার ধার থেকে একবার ঘুরে এলেন। তারপর সেই কাঁদুনে গলারই অদ্ভুত ফিসফিস সংস্করণ শুনিয়ে বললেন, 'এখানেও এসেছে!'

'এখানেও এসেছে!' শুধু কথাটার নয় বঙ্কুবাবুর বলার ধরনেও আপনা থেকেই একটু শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে এসেছে? নাগাপ্পা!'

বঙ্কুবাবু করুণভাবে মাথা নাড়লেন।

'আমাদের দেখতে পেয়েছে?' উদ্বেগের তীব্রতায় গলার স্বরটা চেপে রাখাই তখন শক্ত হয়ে উঠেছে।

'না, তা বোধ হয় পায়নি।' বঙ্কুবাবু কিছুটা আশ্বস্ত করে জানালেন যে নাগাপ্পা কোনো কাজ সেরে এঞ্চা পাহাড় থেকে ফিরে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। সুতরাং কিছুক্ষণ এই পোড়ো বাংলোতে লুকিয়ে থাকতে পারলে তাকে এখনকার মতো এড়ানো যেতে পারে।

বঙ্কুবাবুর যুক্তিটা না মেনে পারলাম না। বারান্দার এক কোণের ভেঙে-পড়া একটা থামকে বেঞ্চি করে বসে প্রথম দুর্ভাবনার কথাটাই বঙ্কুবাবুকে জানালাম। বললাম, 'রাতটা তো এ পাহাড়েই কাটাতে হবে মনে হচ্ছে। লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে আজ ফেরবার কোনো আশা বোধ হয় নেই?'

'লোধমা পাহাড়ের ছাউনি!' বঙ্কুবাবু যেন আমার বিরুদ্ধে করুণ নালিশ জানালেন, 'আপনি এখন ছাউনির কথা ভাবতে পারছেন! ক্যান্টিনের খাবার, ক্যাম্প খাটের মশারি-দেওয়া বিছানা, পেট্রোম্যাক্সের আলোর জন্যে মন কেমন করছে বোধ হয় আপনার! গোয়েন্দাগিরি করবেন অথচ গায়ে আঁচড়টি সহ্য করতে পারবেন না! এদিকে আমি, এই তিন দিন তিন রাত এই পাহাড়ে জঙ্গলে প্রাণ হাতে করে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো ওই জল্লাদ নাগাপ্পার...'

বঙ্কুবাবু মনের দুঃখে আরও অনেক কিছু নিশ্চয় বলে যেতেন। একটু হেসে তাঁকে থামিয়ে বললাম, 'থামুন! থামুন! আরামের জন্যে নয়, ওই জল্লাদ শয়তান নাগাপ্পার শেষ ব্যবস্থা করবার জন্যেই লোধমার ছাউনিতে ফিরে যেতে চাইছি তাড়াতাড়ি।—নাগাপ্পার মরণ-কাঠি এখন আমার হাতের মুঠোয়।'

'খুব তো বাহাদুরি তখন থেকে শুনছি।' বঙ্কুবাবু এবার একটু তেতো গলাতেই বললেন, 'আমাকে তো একবার ছুঁতেই দিলেন না! কিন্তু ওই ছাইপাঁশ ঘেঁটে মরণ-কাঠির মতো সত্যি কী পেয়েছেন শুনি! ওই আরদালির পেতলের চাকতিটা, ওরই জোরে নাগাপ্পার গলায় ফাঁস টেনে দেবেন!'

'শুধু চাকতিটা নয় বঙ্কুবাবু!' এবার তাঁকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'আমার কাছে সামান্য যা সব প্রমাণ এখন আছে তা আর কিছু না হোক নাগাপ্পাকে কাঠগড়ায় তুলে দায়রা সোপরদ্দ করবার পক্ষে যথেষ্ট। মামাবাবুর হাতে পড়লে এসব জিনিস গলা ছেড়ে কথা কইবে!'

'তিনি যখন নেই তখন আপনিই একটু বুঝিয়ে দিন না!'

বঙ্কুবাবুর অবিশ্বাসের সুরটাই মেজাজ গরম করে দিল। অবজ্ঞার হাসিটা পুরোপুরি লুকোবার চেষ্টা না করেই বললাম, 'বোঝালেই কি বুঝতে পারবেন! তবু শুনুন।'

পকেট থেকে বোলতার চাকের মতো জিনিসের ছবিটা বার করে দেখিয়ে বললাম, 'এটা কীসের ছবি জানেন?'

pathagar.net

বঙ্কুবাবুর বিদ্যেবুদ্ধিকে অতটা তাচ্ছিল্য করা উচিত হয়নি। ছবিটাকে তিনি বোলতার চাক বললেন না। দু-এক সেকেন্ড, বেশ মন দিয়ে দেখে বললেন, 'না জানার কী আছে! এ তো একরকম নুড়ি। এর ভেতর লোহাটোহা গোছের ধাতু পাওয়া যায়। পাহাড়ে জঙ্গলে এরকম নুড়ি আগেও দেখেছি।'

'দেখেছেন!' এবার বঙ্কুবাবুর ওপর একটু ভক্তি নিয়েই বললাম, 'আপনার তো তাহলে দেখবার চোখ আছে। অবশ্য খনির কাজেই এতকাল কাটাবার পর নজর একটু তীক্ষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।'

আমরা নিচু গলাতেই আলাপ করছিলাম। তবু তার মধ্যেই হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমায় চুপ করিয়ে বঙ্কুবাবু সাবধানে পোড়ো বাংলোর বাইরে একবার উঁকি দিয়ে এলেন।

'কি আবার আসছে নাকি!'—বঙ্কুবাবু ফিরে আসবার পর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'না, তা আসছে না!' বঙ্কুবাবু আশ্বস্ত করে বললেন, 'তবে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বার হওয়া ঠিক হবে না।'

তাড়াতাড়ি বার হওয়ার জন্যে আমিও তখন ব্যস্ত নই। বঙ্কুবাবুকে ব্যাপারটা বোঝাবার উৎসাহই তখন বেশি।

আগের কথার খেই ধরে ছবিটা আর একবার দেখিয়ে বললাম, 'এ ধরনের নুড়ি আপনি দেখেছেন বটে কিন্তু তার দাম যে কী হতে পারে কিছুই বোঝেননি। এ জাতের নুড়ির পরিচয় আজই অবশ্য দুপুরে মামাবাবুর কাছে পেয়েছি। বোলতার চাকের মতো এ নুড়ির নাম হল পেরিডোটাইট। এর ভেতরে নিকেল ক্রোমিয়ম গোছের ধাতু তো বটেই সোনার সমান দামি প্ল্যাটিনমও পাওয়া যায়। জঙ্গলের লুকোনো গর্তের মধ্যে আদিবাসী আরদালির পেতলের চাকতির সঙ্গে এই-আধপোড়া কাগজের ছবিটা আর টুকিটাকি লেখা পাওয়ার মানেটা এবার ধরতে পারছেন?'

হতভম্ব নয়, এবার বেশ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বঙ্কুবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি তাহলে সন্দেহ করছেন যে আদিবাসী আরদালিকে খুন করার আসল কারণ এই কাগজগুলো? সে এগুলো পেয়ে তার মনিব মহান্তিকেই সম্ভবত দেখাতে যাচ্ছিল। সেই দেখানোটা বন্ধ করবার জন্যে কেউ তাকে এই নির্জন পাহাড়ি রাস্তাতেই শেষ করে কাগজগুলো পুড়িয়ে দূরের ওই গর্তে পুঁতে রেখেছে!'

'ঠিক ধরেছেন!' বঙ্কুবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বললাম, 'শুধু তাই নয়, খ্যাপা হাতির কাজ বলে আদিবাসীর খুনটাকে একটা দৈব দুর্ঘটনার চেহারাও দিতে চেষ্টা করেছে।'

'কিন্তু আপনাদের নাগাপ্পা তো ওখান থেকে সত্যিই হাতির বিষ্ঠা চেঁছে পেয়েছে!'

বঙ্কুবাবুর কথাটায় বেশ একটু চমকে উঠলাম। শুধু বিচার বুদ্ধি নয় তাঁর স্মরণশক্তিরও পরিচয় পেয়ে! নাগাপ্পার হাতির বিষ্ঠা পাওয়ার কথাটা আমি যে তাঁকে বলেছি তাই আমার মনে ছিল না।

খুশি হয়ে উৎসাহভরে বললাম, 'খুব ভালো একটা পয়েন্ট ধরেছেন। কিন্তু ওই হাতির বিষ্ঠা পাওয়াই নাগাপ্পার একটা কারসাজি। মহাবুয়াংয়ের খ্যাপা হাতি এ অঞ্চলে সেদিন আসেনি বলে প্রমাণ পাবার পর, ব্যাপারটা নতুন করে ঘোরালো করবার জন্যে সে এই চাল চেলেছে বলে আমার বিশ্বাস। একটার জায়গায় আরেকটা খ্যাপা হাতির এ পাহাড়ে এসে দৌরাত্ম্য করা অস্বাভাবিক হলেও একেবারে অসম্ভব তো নয়, এই যুক্তিটাই সে কাজে লাগাতে চেয়েছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে!' বেশিরকম গম্ভীর হওয়ার দরুন বঙ্কুবাবুর গলার কাঁদুনে ভাবও যেন অনেকটা কেটে গেছে, মনে হল, 'এ কাগজগুলো যার কাছে অত দামি সে এগুলো বাইরে কারুর হাতে না পড়তে দেওয়ার জন্যে একটার ওপর দুটো খুন নিশ্চয় করতে

পারে। আপনার কাছে এখন এগুলো আছে জানতে পারলে আপনি যাতে আর লোধমা পাহাড়ে ফিরতে বা কারুর হাতে এসব দিতে না পারেন সে চেষ্টা কেউ করবে না মনে করেন?'

বুকের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠলেও মুখে সে ভয় ফুটতে না দিয়ে হেসে বললাম, 'জানলে নিশ্চয় করবে! কিন্তু জানতে তো এখনও পারেনি।'

'তাও জোর করে বলা যায় কি?' বঙ্কুবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, 'আমায় সে যখন গুলি করবার চেষ্টা করেছে, আর আপনি যে আমার সঙ্গে সেদিন ওখানে ছিলেন তা আপনার কাছেই জেনেছে, তখন দুই দুইয়ে চার করে গর্তের জিনিস আমরাই হাতড়ে বার করেছি বলে ধরে নেওয়া তার পক্ষে সহজ। আমরা দুজনই যখন তার চোখে দুশমন তখন বিপদের ঝুঁকিটাও ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত। তাই বলছি আপনার কাছে যা আছে তার কিছু অন্তত আমাকে দিন। একজনের কিছু নেহাতই যদি হয় তো সমস্ত প্রমাণ খোয়া যাবে না।'

আমায় একটু দ্বিধা করতে দেখেই বোধ হয় বঙ্কুবাবু আবার বললেন, 'আপনি না হয় চাকতিটা রাখুন, আমাকে কাগজগুলো দিন।'

'আমি কিন্তু ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। বিপদের ঝুঁকি যা নেবার একলাই নেব। অকারণে বঙ্কুবাবুকে তার মধ্যে জড়াব না। শক্ত হয়েই তাই বললাম, 'না বঙ্কুবাবু। নেহাত আমার অনুরোধে পথ দেখাতে এসে এর মধ্যেই যা ভোগান্তি আপনার হয়েছে তার জন্যেই আমি লজ্জিত, দুঃখিত। আর বিপদে আপনাকে ফেলতে চাই না। কিন্তু এ কী!'

চমকটা এবার ভয়ের নয়, বিস্ময়ের সঙ্গে খুশির। চারিদিকের অন্ধকার এতক্ষণে বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল। হঠাৎ সে অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠাতেই চমকে উঠেছিলাম। অবাক হয়েই হেসে বললাম, 'সূর্য আবার উলটো চলছে নাকি!'

সূর্য উলটো চলেনি। বঙ্কুবাবু সাবধানে একবার দেখে আসবার পর বাইরে বেরিয়ে দিনের আলো হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারলাম। প্রায় সারা আকাশ যে মেঘ ছেয়ে এসেছিল পশ্চিমের দিকে সেটা অনেকখানি ফাঁক হয়ে যাওয়ার দরুনই পড়ন্ত সূর্যের আলোও এতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে আলোয় এঞ্চা পাহাড়ের ওপরকার রূপ সত্যিই অপূর্ব আর পবিত্র বলে মনে হল। তারই মধ্যে দারুণ এক শয়তানির খেলা যে চলছে তা বিশ্বাস করাই শক্ত।

কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাসে কুৎসিত সত্যকে তো আর ভুলে থাকা যায় না। তাই বঙ্কুবাবুকে একটু ব্যাকুলভাবেই জিজ্ঞাসা করতে হল, 'আলো যা হয়েছে তাতে লোধমা পাহাড়ে ফেরবার চেষ্টা করলে হয় না? মহান্তি আর মামাবাবুর কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া সব চেয়ে এখন জরুরি তা বুঝছেন তো?'

'খুব বুঝছি!' বঙ্কুবাবু আমার বলার ধরনেই যেন একটু মজা পেয়ে বললেন, 'কিন্তু তার চেয়ে জরুরি একটা কাজ আগে না সারলে নয়। নাগাপ্পার কেন আমার ওপর এত আক্রোশ এঞ্চা পাহাড়ে গিয়ে বোঝাবো বলেছিলাম। চলুন, এমন কিছু আপনাকে দেখাচ্ছি, যার পর এখানকার কোনো রহস্য সম্বন্ধে আর আপনার জানবার কিছু থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস।'

বঙ্কুবাবুর মতো মানুষের মুখে এ ধরনের আস্ফালন শুনে মনে মনে একটু হাসি যে পেয়েছিল তা অস্বীকার করব না। সেই সঙ্গে কিছুটা হতভম্বও হয়েছিলাম।

কোনো প্রশ্ন আর না করে তাই তিনি যা যা বলেছিলেন শুনেছি।

বঙ্কুবাবু একটা বনের পথ দেখিয়ে একা একাই আমায় এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। পথটা যে পিক-ভিউয়ে শেষ হয়েছে তাও তিনি জানাতে ভোলেননি। পিক-ভিউয়ে গিয়ে তিনি আমায় খানিক অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে নাগাপ্পা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আমার কাছে এসে যা দেখাবার দেখাবেন।

pathagar.net

বৃষ্টি তখন আবার একটু ঝিরঝির করে পড়তে শুরু করেছে। আকাশের আলোও বেশ ম্লান হয়ে এসেছে। একা একা পিক-ভিউয়ে দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তিই লাগছিল। বঙ্কুবাবু এখান থেকে কী এমন দেখাতে পারেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নীচের দূর সমতল পর্যন্ত প্রায় সোজা দেয়ালের মতো যে ঢাল নেমে গেছে তাতে কিছু দেখতে গেলে তো কোমরে দড়ি বেঁধে নামতে হয়।

'কিছু পেলেন দেখতে?'

হঠাৎ বঙ্কুবাবুর মিহি কাঁদুনে গলায় চমকে উঠেছিলাম। তিনি কখন এসে পৌঁছেছেন টের পাইনি।

'কী আবার দেখতে পাব?' একটু রুক্ষ হয়েই বলেছিলাম, 'যা দেখলে এখানকার কোনো রহস্য সম্বন্ধেই আর কিছু জানবার থাকবে না, তাই দেখাবেন তো বলেছিলেন। কই দেখান?'

তেরো

বঙ্কুবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন।

হঠাৎ আচমকা আমায় প্রচণ্ড এক ঠেলা দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখুন এবার!'

আর কিছু যদি তিনি বলে থাকেন, শুনতে পাইনি। কারণ তখন আমি পা হড়কে সেই ভয়ংকর খাড়াই বরাবর পড়তে পড়তে বৃথাই পাহাড়ি ঢালের গাছপালা লতাপাতা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছি।

কতক্ষণ বেহুঁশ হয়েছিলাম জানি না, কিন্তু প্রথম যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন কী, কেন, কোথায় ঠিকমতো স্মরণ করতেই বেশ একটু সময় গেল।

শরীরটার কোথায় কী হয়েছে বা সেটা এখনও আস্ত আছে কি না তা বোঝবার ক্ষমতা তখন নেই। তার ওপর মাথাটাও বেশ একটু যেন গুলিয়ে গেছে।

মাথাটা একটু পরিষ্কার হতেই কোথায় আছি বোঝবার চেষ্টা করলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না প্রথমটায়। লতাপাতার ভেতর দিয়ে সন্ধের আকাশ একটু দেখা যাচ্ছে কিন্তু নীচে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ একটা পাঁকাল জঞ্জালের রাশের মধ্যে যেন আধডোবা অবস্থায় আছি।

যেটুকু সাড় ছিল তাতে ক্রমশ বুঝলাম শরীরটায় যা মাখামাখি হয়ে গেছে বিশ্রী দুর্গন্ধটা সেই নোংরা পাতলা গোছের কাদাটে জলের। জংলি লতাপাতা ডালপালা পচেই পাতলা নোংরা কাদাটা তৈরি হয়েছে। আর দুর্গন্ধ তার যত বিদঘুটেই হোক প্রাণটা যে আমার তাইতেই আপাতত বেঁচেছে তা বুঝতেও এবার দেরি হল না।

খাড়া পাহাড়ের তলার দিকে কোথাও একটা গভীর ডোবা বড়ো ইঁদারা গোছের গর্ত বর্ষার জল আর পাহাড়ি জঙ্গল থেকে খসে-পড়া ডালপালা লতাপাতা জমে পচা জঞ্জালের কুণ্ড গোছের হয়েছে। ওপর থেকে সবেগে গড়াতে গড়াতে সেই খাদের মধ্যে না পড়লে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে যেতাম।

ওপর থেকে হঠাৎ আচমকা কেন পড়ে গিয়েছি সেটা মনে করতে গিয়ে আরেকবার যেন শিউরে উঠলাম।

আর কেউ নয় স্বয়ং বঙ্কুবাবুই আমায় ঠেলে দিয়েছেন! তাঁর ঠেলে দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এরকম একটা ব্যাপার আমার কাছে কল্পনাতীত ছিল বললেও কম বলা হয়।

ব্যাপারটা এমন আজগুবি ও অবিশ্বাস্য যে এখন তা নিয়ে ভাবতে গেলে দিশাহারা হতে হয়। তাঁর হাতের ঠেলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোধমা পাহাড়ের ব্যাপারে যা কিছু এ পর্যন্ত বুঝেছি সব কিছুর মানে এক মুহূর্তে কতখানি যে বদলে গেছে, যত জরুরিই হোক সে বিচারের তখন কিন্তু আর সময় নেই।

পচা জঙ্গলের কুণ্ডটা কত গভীর জানি না, কিন্তু ক্রমশই তার মধ্যে একটু একটু করে যে ডুবছি সেটা টের পেয়েই বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে এল। অত উঁচু থেকে পড়েও প্রাণে বেঁচে গেছি বলে মনে যে আশাটুকু জেগেছিল তা আতঙ্ক হয়ে উঠল এবার। খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে নীচে চুরমার হওয়ার বদলে এই পচা জঞ্জালের কুণ্ডে একটু একটু করে দম বন্ধ হয়ে ডুবে মরাই কি আমার নিয়তি? তা যে আরও ভয়ংকর?

এর মধ্যেই পচা, আধ-পচা আর কাঁচা ও শুকনো লতাপাতার নোংরা জঞ্জালে আমার নাক মুখ পর্যন্ত চাপা পড়তে শুরু করেছে! মুখের ওপর থেকে সেগুলো সরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে এইটুকু শুধু দেখলাম যে হাত দুটো ক্ষতবিক্ষত হলেও একেবারে অকেজো হয়নি।

কিন্তু পঙ্গু না হলেও সে হাত দিয়ে করব কী! চিত অবস্থা থেকে কোনোরকমে কাত হয়ে কুণ্ডটার ধারের দিকে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সভয়ে টের পেলাম যে প্রাণপণে হাত চালিয়েও এক চুল এগোবার বদলে ধীরে ধীরে আরও তলিয়ে যেতেই শুরু করছি। তরল পাতা, কাদা আর লতাপাতার পচানির মধ্যে ধরবার তো কিছু নেই। আঁকুপাঁকু করে সাঁতারের মতো হাত চালাতে গেলে নাড়া খাবার দরুনই নীচের জঞ্জাল দেহের ভারে আরও নেমে যায়।

কোনোরকম নড়াচড়া না করে যতক্ষণ সম্ভব ওপরে ভেসে থাকবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু সুতরাং করবার নেই। শেষ পর্যন্ত তাতেও তলিয়ে যেতেই হবে। একটিমাত্র আশা এই যে, সে পরিণামের আগে যদি কেউ দৈবাৎ এদিকে এসে আমাকে দেখতে পায়। আকুলভাবে কয়েকবার নিজের বিপদ জানাতে চিৎকার করলেও আমার সাহায্যে কারুর ছুটে আসা যে প্রায় অলৌকিক ব্যাপার মনে মনে তা অবশ্য বুঝতে তখন আমার বাকি নেই। এই পাহাড়ি অঞ্চলেই মানুষজনের চলাফেরা একান্ত বিরল। তার ওপর এই এঞ্জা পাহাড়ের তলায় ঠিক আমি যেখানে জংলা জঞ্জালের খদে ডুবে মরতে বসেছি সেখানে হঠাৎ কার বেড়াতে আসার দায় পড়বে।

শেষ যা হবে তার জন্যে মনটা তৈরি করবার চেষ্টাই করতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম।

অবিশ্বাস্য আশাতীত অলৌকিক ব্যাপারই সত্যি ঘটছে। কিছু দূরে কটা পাথুরে ঢিবির পেছন থেকে দুটি মানুষ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

একজন নয় একেবারে দুজন মানুষ!

তাও আদিবাসীদের কেউ নয়। চেহারা পোশাকে রীতিমতো সভ্য মানুষ বলেই বোঝা যাচ্ছে।

আরও কাছে আসার পর মানুষ দুজনকে চিনতেও অসুবিধা হল না।

এই কি শেষ পর্যন্ত আমার আশাতীত অলৌকিক সৌভাগ্যের ব্যাপার?

আশায় উত্তেজনায় বুকের ধুকধুকানি যেমন বেড়ে গিয়েছিল তেমনি যেন হঠাৎ থেমে যাবার উপক্রম হল। কারণ প্রায় অলৌকিকভাবে যাঁরা আমার এই সর্বনাশা বিপদের মুহূর্তে এসে দেখা দিয়েছেন তাঁদের একজন হলেন সরকার সাহেব, আর একজন বঙ্কুবাবু।

তার পরও মনের মধ্যে ক্ষীণতম আশা যদি জেগে থাকে দুজনের প্রথম কথাতেই তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এঁরা পাহাড়ি খদটার ধারে এসে দাঁড়াবার আগেই খানিকটা ভয়ে খানিকটা কী করব ঠিক করতে না পারার বিমূঢ়তায় আমি চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছিলাম।

খাদের পাড় থেকে চোখবোজা অবস্থাতেই দুজনের আলাপ শুনতে পেলাম!

প্রথমেই সরকার সাহেবের গলা, 'শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে!'

'হওয়ারই কথা, তবে প্রাণটা একেবারে না গিয়ে থাকতে পারে। এখনও একটু ধুকধুকুনি হয়তো আছে!'

'তাহলে কি তোলবার চেষ্টা করবেন!'

pathagar.net

'তোলবার চেষ্টা করবে! আহাম্মক ইডিয়ট! ওই খদের মধ্যে তোমারও কবরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

কথাগুলো যা শুনলাম তা বুক কাঁপিয়ে দেবার মতো কিন্তু ওই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেও বক্তা দুজনের ভূমিকার অদলবদল আমায় তখন বিস্ময় বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চেহারা তো আগেই দেখেছি। দুজনের গলাও আমার নিতান্ত চেনা। প্রথমটা যে সরকার সাহেবের আর দ্বিতীয়টা বঙ্কুবাবুর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই।

কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সম্পর্কটা হঠাৎ এমন অদ্ভুত ভাবে পালটে গেল কী করে!

যাঁকে মনিব ও ওপরওয়ালা বলে জানি, সেই সরকার সাহেবের গলা থেকে কথাবার্তার ধরন তো একেবারে বশংবদ হাত-কচলানো গোলামের মতো, বঙ্কুবাবুর ঠিক যেন জাঁদরেল জবরদস্ত মালিকের।

গলার স্বরটা সরু খনখনে ধরনের হলেও তাঁর আওয়াজই এখন আলাদা।

পোড়া কাগজপত্র লুকানো গর্তটা ঘাঁটবার সময় বঙ্কুবাবুর এই ধরনের গলার আভাস যে পেয়েছিলাম এতক্ষণে সেটা খেয়াল হল। বঙ্কুবাবু তখন সরকার সাহেবকে ধাতাচ্ছিলেন। দুর্বল উৎপীড়িত অসহায়ের মরিয়া বিক্ষোভের জ্বালা বলে যা মনে করেছিলাম তাতেই যে বঙ্কুবাবুর আসল চেহারার প্রকাশ তা তখন বুঝতে পারিনি।

বুঝলে অমন আহাম্মকের মতো তাঁর শিকার হবার আগে একটু বোধ হয় সাবধান হতে পারতাম।

দুজনের কথাবার্তা তারপর যা শুনেছি তাতে আমার শেষ ধুকধুকুনিটুকুও ওইখানেই খতম করে দেওয়া যে বঙ্কুবাবুর মতলব তা বুঝতে তখন বাকি থাকেনি।

সরকার সাহেব ভয়ে ভয়ে তখন শুধু জানিয়েছেন যে, এদিকে লোকজনের যাতায়াত প্রায় না থাকলে খদের জঞ্জালের ওপর আমার ভেসে থাকা লাশটা দৈবাৎ কারুর নজরে পড়েও যেতে পারে।

বঙ্কুবাবু তার উত্তরে ধমক দিয়ে বললেন, 'তাহলে একটা বড়ো ডাল খুঁজে নিয়ে এসো ইডিয়ট! খুঁচিয়ে ঠেলে, যেমন করে হোক ওর লাশটা খদের তলায় নামিয়ে দিতে হবে।'

বুকের ভেতর একটা যেন বরফের চাঁই নিয়ে আমি তখন চোখ খুলে তাকিয়েছি।

বঙ্কুবাবুর ধমক খেয়েও সরকার সাহেব তখনও কিন্তু কেমন অসহায় কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

'দাঁড়িয়ে আছ যে!' একটা অত্যন্ত কুৎসিত গাল দিয়ে বঙ্কুবাবু এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কী বললাম তোমাকে?'

'আজ্ঞে।' সরকার সাহেব যেন ফাঁসির আসামির মতো কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'ডাল আমি এখুনি আনছি। কিন্তু আমার একটা কথা যদি শোনেন!'

'কী কথা?' বঙ্কুবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সরকার সাহেবের দিকে তাকালেন, চটপট বলে ফেলো! এখানে নষ্ট করবার মতো আমার সময় নেই!'

'আজ্ঞে', অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সরকার সাহেব এবার বললেন, খুঁচিয়ে লাশটা খদের তলায় নামিয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু খদটা খুব গভীর নয়। এদিকের আদিবাসী চাষিরা এ খদ থেকে কখনো কখনো জমির সারের জন্যে পাতা পচানি নিয়ে যায় তা তো আপনিও জানেন। তাদের কেউ তলার লাশটা দেখে ফেলতে পারে।'

'যখন দেখবে তখন আমাদের পাচ্ছে কোথায়!'

মুখে ধমক দিলেও বঙ্কুবাবুকে এবার একটু গুম হয়ে খানিক চুপ করে থাকতে দেখলাম।

তারপর কী ভেবে তিনি আমায় খদ থেকে পাড়ে তোলার হুকুমই দিলেন।

pathagar.net

'যাও লম্বা ডাল একটা,—না, না, চোরা সুড়ঙ্গ থেকে রশিটাই নিয়ে এসো। সাড় যদি এখনও কিছু থাকে তো ছুঁড়লে দড়িটা ধরে নিতে হয়তো পারবে। তখন টেনে তোলা শক্ত হবে না। আর এর মধ্যেই যদি খতম হয়ে গিয়ে থাকে তো মাথা গলিয়ে ফাঁস লাগিয়ে টেনে তুলতে হবে।'

বঙ্কুবাবুর এই বিস্তারিত নির্দেশ পেয়েও সরকার সাহেব যেন অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন, 'কিন্তু তারপর?'

'আবার তারপর কীসের?' বঙ্কুবাবু যেন জল বিছুটির ঘা দেওয়ার মুখ ভঙ্গি করে বললেন, 'মাথায় ষাঁড়ের গোবর নিয়ে এসেছ এ কারবার করতে! মরা আধমরা যাই হোক এখান থেকে টেনে তুলে নিয়ে চোরা সুড়ঙ্গে ফেলে রাখব। আমরা হাওয়া হয়ে যাবার পর যুগ যুগান্তের মধ্যেও ও সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে ওর হাড় কখানা কেউ সেখানে খুঁজে বার করতে পারবে না। বুঝলে এবার গবেট?'

বুঝুন বা না বুঝুন সরকার সাহেব এবার বঙ্কুবাবুর হুকুম মানতেই চলে গেলেন। বঙ্কুবাবু একাই রইলেন খদের পাড়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে।

আমি চোখ খুলে তাঁকে দেখছি কি না বঙ্কুবাবুর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। লতাপাতা ডালপালায় আমার মুখটা তখন প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে। তা ছাড়া মরা না হোক বেহুঁশ আধমরা বলেই তখন আমায় ধরে নিয়ে বাতিলদের খাতায় তিনি নিশ্চয় আমার নাম তুলে দিয়েছেন।

আমি কিন্তু একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করতে করতে তখন তাঁর যথার্থ পরিচয়টা বোঝবার চেষ্টা করার সঙ্গে এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার কোনো উপায় থাকা সম্ভব কি না তাই নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করছি।

সরকার সাহেব আর বঙ্কুবাবু, দুইয়ের জুটির মধ্যে, বঙ্কুবাবুই যে সর্বেসর্বা ও মাথা সেটা তো অনেক আগেই জলের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজের পরিচয় লুকোবার জন্য সরকার সাহেবের অনেক অত্যাচার-সওয়া সামান্য বেয়ারা গোছের সেজে থাকাও তাঁর খুব বড়ো চালাকি সন্দেহ নেই।

মানুষটা শুধু প্যাঁচাল বুদ্ধিতেই শয়তান নয়, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে পিশাচের মতো যে নির্মম নিষ্ঠুর হাড়ে হাড়ে সে কথা বোঝবার পরও এত সব কাণ্ডকারখানার মূলে আসল উদ্দেশ্যটা তাঁর কী, সে বিষয়ে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়। মামাবাবু যা অনুমান করেছেন তাই কি সব? সেই পেরিডোটাইট পাথরের ভেতরকার প্লাটিনামের লোভ দিয়েই কি বঙ্কুবাবুর চরিত্র আর তাঁর জটিল সমস্ত শয়তানি কাণ্ডকারখানা ব্যাখ্যা করা যায়? মন কেমন যেন তা মানতে চায় না।

অথচ সেই মুহূর্তেই সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, কারণ বঙ্কুবাবুর আসল উদ্দেশ্যটা না জানলে তাঁর হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো উপায় ভাবাই বুঝি সম্ভব হবে না।

এত কথা এমন গুছিয়ে সেই সময়টুকুর মধ্যে অবশ্য ভাবিনি। সামনে বঙ্কুবাবুকে খাড়া দেখে অস্থির মনের মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তার স্রোত যেন বয়ে গেছে।

সরকার সাহেব বঙ্কুবাবুর হুকুমে কোথাও কোনো চোরা সুড়ঙ্গ থেকে আমায় খদ থেকে তোলবার জন্যে দড়ি আনতে গেছেন।

সেটা আনবার পর কী কী হতে পারে তা একটু কল্পনা করবার চেষ্টা করছি। দড়ি এনে খদ থেকে আমায় যেমন করে হোক ওঁরা টেনে তুলবেন। তারপর চোরা সুড়ঙ্গে আমায় নিয়ে গিয়ে ফেলবার কথা বঙ্কুবাবু জানিয়েই দিয়েছেন।

চোরা সুড়ঙ্গ বলতে কী বুঝায়, জায়গাটাই বা কোথায় কিছুই আমার জানা নেই। কিন্তু

pathagar.net

সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেলা মানেই দুনিয়ার চোখের আড়াল করে দেওয়া, একথা তো বঙ্কুবাবু জোর গলায় শুনিয়েছেন। এ জোর তিনি পাচ্ছেন কোথায়?

চোরা সুড়ঙ্গের সঙ্গেই কি বঙ্কুবাবুদের শয়তানি কাণ্ডকারখানার আসল রহস্য জড়িত? সেখানে গেলে আর কিছু না হোক সমস্ত দুর্বোধ ভয়ংকর ব্যাপারের সঠিক ব্যাখ্যা কি পাওয়া যাবে?

তা যদি যায়, তাহলে চিরকালের মতো মানুষের জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিপদ মাথায় নিয়েই সেখানে যাবার জন্যে আমি তখন উদগ্রীব।

সবশুদ্ধ মিলে কতখানি জখম আমি যে হয়েছি তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু কী করে জানি না মনে এই বিশ্বাসটুকু জেগেছে যে একেবারে পঙ্গু যদি না হয়ে থাকি তাহলে বঙ্কুবাবুদের গোপন আসল ঘাঁটিতে একবার কোনোরকমে ঢুকতে পারলে তাঁদের শয়তানির রহস্যভেদের সঙ্গে সেখান থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায়ও করতে পারব।

চোদ্দো

বঙ্কুবাবুদের আসল গোপন ঘাঁটি এঞ্জা পাহাড়ের চোরা সুড়ঙ্গে শেষ পর্যন্ত সত্যিই ঢুকতে পারলাম।

কিন্তু ওই ঢোকা পর্যন্তই সার। সেখানে একবার ঢুকতে পারলে বঙ্কুবাবুদের শয়তানি চক্রান্ত ভেদ করে উদ্ধার পাবার উপায় একটা বার করে ফেলতে পারব বলে যে অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল সেটা নেহাত আশার ছলনা।

চোরা সুড়ঙ্গে ঢোকবার পরই নিজের যথার্থ অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। কোনো ফাঁক দিয়ে গলে পালাবার এতটুকু সুযোগ থাকলে বঙ্কুবাবুর মতো পাকা শয়তান আমায় এখানে যে নিয়ে আসত না একথা অবশ্য আগেই বোঝা উচিত ছিল। এই চোরা সুড়ঙ্গে একবার ঢোকানো মানেই জীবন্ত কবর দেওয়া। বিশেষ করে আমার মতো এই আধা পঙ্গু অবস্থায় বঙ্কুবাবু ও সরকার সাহেবের মতো দুজন সুস্থ এবং নিশ্চয়ই সশস্ত্র জোয়ান মানুষের সঙ্গে যুঝে পালাবার কথা ভাবা যখন বাতুলতা।

যে খদের মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিলাম তা থেকে উদ্ধার পাবার সময় চোরা সুড়ঙ্গের রহস্য জানবার আগ্রহ উত্তেজনাতেই বোধ হয় মনে অমন অবুঝ আশা জেগেছিল। আশা এই যে, গায়ের জোরে না হলেও বুদ্ধির প্যাঁচে বঙ্কুবাবুদের ওপর হয়তো টেক্কা দিতে পারব। নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে নেহাত আহাম্মকের মতো এ গর্ব চুরমার হতে দেরি হয়নি।

সরকার সাহেব দড়ি নিয়ে আসবার পর সামান্য একটু নড়েচড়ে একটু যেন সাড় ফেরবার ভান করেছিলাম। যেটুকু লক্ষ করে আমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানবার চেষ্টা আর বঙ্কুবাবু করেননি। দড়িটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন শুধু।

এবার আর ভান করতে হয়নি। আপনা থেকেই ব্যাকুল হয়ে সেটা দু-হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিলাম।

বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেব সে দড়ি ধরে টেনে আমায় পাড়ে এনে তোলার পর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যাওয়াটা অবশ্য বেশিরভাগই অভিনয়। পাড়ে এসে পৌঁছোবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম সর্বাঙ্গ বেশ একটু ক্ষতবিক্ষত হলেও হাড়গোড় কোথাও ভাঙেনি। ইচ্ছে করলে দাঁড়াতে শুধু নয়—একটু কষ্ট করে হেঁটে যেতেও পারি।

বঙ্কুবাবুদের সেটা বুঝতে না দিলে পরে সুবিধে হতে পরে ভেবেই পঙ্গু হবার অভিনয়

pathagar.net

করেছিলাম। কিন্তু চালাকিটা একেবারেই সফল বোধ হয় হয়নি। বঙ্কুবাবু কেমন একটু বাঁকা বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিলেন, 'ছোটোবাবুর পা দুটোর দফা রফা দেখছি যে! তবু সাবধানের মার নেই। চোরা সুড়ঙ্গে গিয়েই পা দুটোয় দড়ির একটা বাঁধন দিয়ো। আপাতত টেনে হিঁচড়েই নিয়ে চলো।

হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথায় মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু একবার পঙ্গু সেজে তারপর হঠাৎ খাড়া হয়ে ওঠা তো যায় না। বেশ কিছুক্ষণ কাতরাতে কাতরাতে অতি কষ্টে যেন খাড়া হবার চেষ্টার ভান তাই করতে হয়েছিল।

বঙ্কুবাবুকে তাতেও ফাঁকি দেওয়া যায়নি। বেশ একটু নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, 'অত কষ্ট করে দাঁড়াবার দরকার নেই ছোটোবাবু। পা আপনার খোঁড়া হলেও যা, মজবুত থাকলেও তাই। চোরা সুড়ঙ্গে ঢোকবার পর ও দুটো আর আস্ত রাখব না।'

সরকার সাহেব তখন আমায় ধরে নিয়ে চলেছেন। তাঁর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে যেতে, কিছুই যেন বুঝতে পারছি না এমনি আচ্ছন্নের মতো বঙ্কুবাবুর দিকে তাকিয়েছি। এ অভিনয়ও অবশ্য বৃথাই।

বুকের ভেতরটা তখন একেবারে হিম হয়ে গেছে। এই শয়তানের সঙ্গে বুদ্ধির প্যাঁচে জেতবার কথা ভাবার স্পর্ধার জন্যেই নিজেকে তখন ধিক্কার দিচ্ছি। উদ্ধার পাবার কি বঙ্কুবাবুদের ধরিয়ে দেবার সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চোরা সুড়ঙ্গের রহস্যটুকুই শুধু জেনে মরবার জন্যে মনকে তখন প্রস্তুত করেছি।

চোরা সুড়ঙ্গটা কোথায় আর কীরকম তা দেখবার পর সেখান থেকে মুক্তি পাবার আশা আপনা থেকেই মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। নিজের চোখে না দেখলে ওরকম জায়গায় একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারতাম না।

যে খদের মধ্যে আমি পড়েছিলাম তা থেকে পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শ খানেক গজ পায়ে চলার সরু আঁকাবাঁকা পথে যাবার পর আবার একটা পাহাড়ের ঢাল সামনে পড়ে। ওপরের চূড়া থেকে আমি প্রায় হাজার দুই ফুট নীচের খাদে পড়েছি। পাহাড়ের এ ঢালটা সেখান থেকে আরও প্রায় দু-হাজার ফুট নীচের সমতলে গিয়ে শেষ হয়েছে! পাহাড়ের এ ঢালটার খাড়াই ওপরের তুলনায় কম নয়, শুধু গাছপালা লতাপাতার জঙ্গল তাতে প্রায় নেই বললেই হয়। ওপরের খাঁজ থেকে তলার দিকে চাইলে হাত দশেক নীচে পাহাড়ের গায়ের একটা ফাটল চোখে পড়ে। তার ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা জলের ধারা বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। বর্ষাকালে এ জলের তোড় বেড়ে বেশ জমকালো চেহারাই নিশ্চয় নেয়। এখন ধারাটা নেহাত সুতোলি। গ্রীষ্মকালে হয়তো শুকিয়েও যায় একেবারে।

এদিকের জংলা পাহাড়ের গায়ে এধরনের খুদে ঝরনা একেবারে বিরল নয়। এ ঝরনার মুখের ফাটলটাও নেহাত ছোটো। ওপরে নীচে পাথরের খোঁচটোচ সমেত মোটামুটি ট্রেনের একটা জানলার মাপই হবে।

এই ফাটলটুকুই বঙ্কুবাবুদের গুপ্ত সুড়ঙ্গের দ্বার।

বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেব আমায় নিয়ে সেই ফাটলের ওপর পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়াবার পর নীচের দিকে চেয়ে দেখেও এরকম একটা ব্যাপার সম্ভব বলে ভাবতেই পারিনি।

ওই ফাটল দিয়েই প্রায় সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে ভেতরে গিয়ে ঢোকবার পরও সত্যিই সেটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ বলে বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছিল। একবার এমন সন্দেহও হল যে, চোরা সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ কিছু নয়, আমায় চিরকালের মতো গুম করে রাখার এটা একটা সুবিধেমতো জায়গা মাত্র।

কিন্তু আমার মতো একটা অসহায় শিকারকে তাঁদের ধোঁকা দেবার দরকারই বা কী! আর তার জন্যে নিজেরাই বা অত কষ্ট তাঁরা করতে যাবেন কেন?

pathagar.net

ও ফাটলের মুখে পৌঁছোতেই কম কসরত তো করতে হয়নি। ওপরের খাঁজ থেকে নীচের ঝরনার মুখ পর্যন্ত পাহাড়ি জংলা ডালপালা লতাপাতা জড়িয়ে এমন ভাবে বাঁধা যে সঠিক জানা না থাকলে তা দিয়ে লুকোনো সিঁড়ির কাজ যে হয় তা বোঝবার উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে জংলা লতাপাতার জট বলেই তা মনে হয়।

এই লুকোনো সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে নেমে গেছেন সরকার সাহেব। তারপর বঙ্কুবাবুর হুকুমে জখম শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমায় নামতে হয়েছে। নীচে ঝরনার মুখে দাঁড়িয়ে সরকার সাহেব অবশ্য আমাকে ধরে নিয়ে সাহায্য করেছেন।

ঝরনার মুখটা যে কত ছোটো জংলি লতার ঝুরি ধরে তার ধারে দাঁড়াবার পর বেশ ভালো করেই বোঝা গিয়েছে। সরকার সাহেব নিজেই প্রথমে সে ফাঁক দিয়ে বুকে হেঁটে ঢুকে না গেলে নিস্ফল জেনে একটু প্রতিবাদের চেষ্টা বোধ হয় করতাম।

প্রথমে সরকার সাহেব তারপর আমি আর শেষ বঙ্কুবাবু শ্যাওলায় পেছল ঝরনার খাতের নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে মিনিট দুয়েক একভাবে বুকে হেঁটে গিয়েছি। তারপরই সংকীর্ণ ফাটলটা নীচে ওপরে দুটো তলায় যেন ভাগ হয়ে গিয়েছে। জলের ধারাটা বেরিয়ে এসেছে নীচের ফাটল দিয়ে। তার ওপরের তাকটা কয়েক হাত পরেই হঠাৎ বেশ বড়োসড়ো গুহা হয়ে উঠেছে।

বুকে হাঁটা ছেড়ে মাথা তুলে এবার একটু দাঁড়াতে পারাটাই সৌভাগ্য মনে হয়েছে, সেই সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে অবাকও হয়েছি।

জায়গাটা যে শুধু একটা গুহা নয়, কোনো দীর্ঘ সুড়ঙ্গের একটা অংশ সামনের দিকে বহু দূরে অন্ধকারে তা মিলিয়ে যেতে দেখেই বোঝা গিয়েছে।

কিন্তু যেখানে উঠে দাঁড়িয়েছি সে জায়গাটাই যে অবিশ্বাস্য। পাহাড়ের বুকের ভেতর এরকম একটা লুকোনো ঘাঁটির কথা ভাবাই যায় না। হ্যারিকেনের আলো কাগজপত্রের ফাইল, নানারকম পাথরের নমুনায় কাঁড়ি থেকে জলের ঘড়া, স্টোভ বেশ কিছু খাবারের টিন গোছের বহু জিনিস মজুদ।

পনেরো

'কী বুঝছেন ছোটোবাবু!'

হঠাৎ বিদ্রূপের খোঁচারই উপযুক্ত বঙ্কুবাবুর ছুঁচালো সরু গলার স্বরে চমকে উঠলাম।

তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে বঙ্কুবাবু আবার ঘায়ের ওপর যেন নুনের ছিটে দিয়ে বললেন, 'জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে? এইখানেই আপনাকে থাকতে হবে কিনা।'

সব জেনেশুনেও ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করলাম 'কতদিন?'

অজ্ঞানের মতো খদের ভেতর পড়ে থাকার সময় বঙ্কুবাবুদের প্রথম দিকের আলাপ যে আমি সব শুনেছি, তা তখন জানতে দিতে চাইনি।

কিন্তু লুকোচুরির ধার দিয়েও গেলেন না। বেশ স্পষ্ট করেই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে জানিয়ে দিলেন, 'কতদিন আর থাকবেন! ওই টিনের খাবারগুলো আর কলসির জলটা দিয়ে যতদিন চালাতে পারেন! তারপর আপনার হাড় কখানা অবশ্য যুগযুগান্তর এখানেই পড়ে থাকবে।'

'তার মানে', স্থির ধীরভাবে কোনোরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা আমায় এখানে ফেলে চলে যাবেন!'

'সেইরকমই তো ইচ্ছে!' বঙ্কুবাবু হেসে উঠলেন খনখনে মিহি গলায়। 'শুধু ফেলে যাব না, যাবার আগে যে মুখ দিয়ে ঢুকেছি। সেটা একটি ডিনামাইটের কাঠি ফাটিয়ে চিরকালের মতো ধসে-পড়া পাথরে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে যাব।'

pathagar.net

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলেও বাইরে সেটা যথাসাধ্য গোপন করে যেন সহজ আলাপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আপনারা তাহলে যাবেন কী করে?'

'আমরা?' বঙ্কুবাবুর মুখে শয়তানি দম্ভের হাসি ফুটে উঠল, 'আমাদের জন্যে মিছে ভাবনা করবেন না। আমরা এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখের এমন গুপ্ত পথ দিয়ে যাব এখন পর্যন্ত কারুর যা জানা নেই। আমরা চলে যাবার পর সে পথ খুঁজে বার করার মিথ্যে কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। যাবার আগে আপনার পা দুটো সত্যিই খোঁড়া করে দিয়ে যাব।'

নিরুপায় রাগে বুকের ভেতরটা তখন জ্বলছে। তবু মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম, 'আমায় এই চোরা সুড়ঙ্গে কবর দিয়ে গেলেই কি আপনাদের কাজ হাসিল হবে আশা করেন!'

'তা করি বই কী!' বঙ্কুবাবু তাঁর পেটেন্ট গলায় হেসে বললেন, 'আপনি এখানে নিপাত্তা হয়ে থাকলে আমাদের কাজ হাসিলের আর বাধা কোথায়। আপনি অবশ্য নিজের আহাম্মকিতেই নিজেই নিজের এ সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরিতে গর্তটর্ত ঘেঁটে ওসব গোলমেলে জিনিস যদি না খুঁজে বার করতেন তাহলে আপনাকে এমন করে জ্যান্ত কবর দিয়ে যেতে হত না। এখন ওসব বাহাদুরির আবিষ্কার আপনার সঙ্গে এই সুড়ঙ্গেই পচবে। কেউ কোনোদিন আর খোঁজ পাবে না। আমাদের পথও একেবারে পরিষ্কার।'

উদ্ধারের কোনো আশাই যখন নেই তখন বঙ্কুবাবুদের আর ভয় করবার কী আছে! মরিয়া হয়ে তাই বেপরোয়া বিদ্রূপের সঙ্গে বললাম, 'স্বপ্নটা একটু বেশি রঙিন দেখছেন না কি বঙ্কুবাবু? আমাকে এখানে কবর দিলেই আপনাদের রাস্তা সাফ হবে না। ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আপনাদের ওই পেরিডোটাইট নুড়ির রহস্য আমার মামাবাবুর কাছে আর লুকোনো নেই।'

'আপনার মামাবাবু।' গা রি রি করে তোলা তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে বঙ্কুবাবুর বললেন, 'আপনার মামাবাবু পেরিডোটাইট পাথরের রহস্য ধরে ফেলেছেন? তাহলে শুনুন ছোটোবাবু। যা এবার বলব, তাতে এই চোরা সুড়ঙ্গে প্রাণটা বেরোতে যে কটা দিন লাগবে সেই সময়টা মনে মনে জাবর কাটার অন্তত একটা কিছু পাবেন। আপনার কাছ থেকে দু-কান হবার আর যখন ভয় নেই তখন সার সত্যটা আপনাকে অনায়াসে জানিয়ে দিতে পারি। প্রথমত আপনি নিজে একটি পয়লা নম্বরের উজবুক আর আপনার মামাবাবু তার চেয়ে এক কাঠি কম।'

কথা বলতে বলতে সরকার সাহেব ও বঙ্কুবাবু দুজনেই এ গুহা ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। বেশ লম্বা হাঁটা পথের পাড়ি যে তাঁদের দিতে হবে আধা মিলিটারি সাজপোশাক আর পিঠে বাঁধা হ্যাভারস্যাক বাঁধার ধরন থেকেই তা বুঝতে পারছিলাম। সাজগোজ প্রায় শেষ করে এবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বঙ্কুবাবু বেশ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শেষ কথাগুলো শোনালেন!

'হ্যাঁ, সত্যিই উজবুক। পেরিডোটাইট পাথরের মর্ম আপনার মামাবাবু ঘণ্টা বুঝেছেন। বোলতা চাকের মতো ওই পাথরের ডেলার ভেতর ক্রোমিয়ম আর প্ল্যাটিনাম ধাতু পাওয়া যায় ঠিকই। আপনার মামাবাবুকে এটুকুও নিজের চেষ্টায় জানতে হয়নি। তথ্যটা আমিই জুগিয়েছিলাম। নজরটা যাতে ওর বেশি না যায় তার জন্যে নাগাপ্পার প্যাডের কাগজে তার হাতের লেখার সঙ্গে নকল রেখে ইশারা দেবার মতো কিছু টুকে ছোঁড়া কাগজের দলার মতো পাকিয়ে সরকারের কাছে দিয়ে রেখেছিলাম। আসলে আরেক আহাম্মক হলেও সরকার ঠিক সময়েই কাগজের দলাগুলো কাজে লাগিয়েছিল। কাগজের দলা দিয়ে এক ঢিলে দু-পাখি মারা হয়েছে। এক, বিলেতের মেটাল বুলেটিনের ছিটেফোঁটা বাজার দর তুলে দেবার দরুন পেরিডোটাইটের খাস রহস্য থেকে দৃষ্টিটা ঘুরে গিয়েছে, আর দ্বিতীয়ত লোধমা অঞ্চলের সব ব্যাপারে গোপনে খবরদারি করবার জন্যে ছদ্ম পরিচয়ে যাকে আনিয়ে রাখা হয়েছে সন্দেহটা ফেলা হয়েছে সেই গোয়েন্দা বাহাদুরের ওপর।'

'তার মানে?' এই অবস্থাতেও মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, 'নাগাপ্পা গোয়েন্দা!'

'হ্যাঁ ছোটোবাবু!' নিজের বাহাদুরি শোনাবার নেশা বঙ্কুবাবুর এবার ধরেছে মনে হল—এই ধড়িবাজ গোয়েন্দাটাকে শেষ করবার জন্যেই দু-দিন দু-রাত্রি এই পাহাড় জঙ্গলে লুকিয়ে ওত পেতে ছিলাম। আদিবাসী পিয়নটা কীভাবে কে জানে এ গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে এখানে ঢুকেছিল। আসল ব্যাপার কিছু না বুঝলেও কাগজপত্রের ফাইল দেখে অবাক হয়ে সে মহান্তির কাছে যাচ্ছিল সেগুলো দেখাতে। খুব সময়মতো তাকে খতম করেছিলাম। নাগাপ্পার বন্ধু, ওই হতভাগা সাহেব শিকারিটা আচমকা উদয় হয়ে বেয়াড়া খবরটা ফাঁস না করে দিলে খ্যাপা হাতির নামেই ব্যাপারটা চালিয়ে দেওয়া যেত। নাগাপ্পা এসব পাহাড় জঙ্গল চযে ফেলেও আর কোনো হদিস তাহলে পেত না। সাহেব বন্ধুর কাছে মহাবুয়াংএর খ্যাপা হাতির খাঁটি খবর পেয়ে নাগাপ্পা সন্দিগ্ধ হয়ে নতুন করে তল্লাসি শুরু করে, আর তাইতেই আমাদের আসল ধান্দাটার কিছুটা আঁচ পেয়েছে বলে আমার ধারণা। নাগাপ্পাকেই আগে খতম করা তাই খুব দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে নিয়তি আপনাকেই টেনেছে। নাগাপ্পার হিসেবটা না চুকিয়েই তাই চলে যেতে হচ্ছে। তাতে অবশ্য এমন কিছু ক্ষতি নেই। আমাদের আসল যা কাজ তা আমরা গুছিয়ে নিয়েই যাচ্ছি।'

বঙ্কুবাবু যতক্ষণ তাঁর আস্ফালন শুনিয়েছেন, তার মধ্যে মাথার ভেতর আকাশ পাতাল ভয়-ভাবনার মধ্যে শেষ একটা চাল আমি ভেবে নিয়েছি।

বঙ্কুবাবু থামতেই যথাসম্ভব টিটকিরির সুর গলায় ফুটিয়ে বললাম, 'গুছিয়ে নিলেও এখান থেকে যাওয়া আর আপনাদের বোধ হয় ভাগ্যে নেই। খদের মধ্যে পড়বার পর আপনারাই প্রথম আমায় দেখেননি। তার আগে মামাবাবু এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছেন। তাঁর পরামর্শেই পঙ্গু সেজে আপনাদের অপেক্ষায় পড়ে ছিলাম। বুঝতেই পারছেন আপনাদের এ চোরা সুড়ঙ্গ মামাবাবুদের আর অজানা নয়। এতক্ষণে তাঁরা চুপ করে নিশ্চয় বসে নেই। সুতরাং এখন আর তাঁদের হাত থেকে ছাড়া পাবার আশা করেন কি?'

বঙ্কুবাবু যেরকম একটা অদ্ভুত মুখ করে আমার কথাগুলো শুনলেন, তাতে তাঁর মনে একটু ভয় ধরাতে পেরেছি বলে আশা হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর ছুঁচালো গলার বিদঘুটে হাসিতে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হল। হতাশার আশা আমার শেষ প্যাঁচটা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে।

বঙ্কুবাবু হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের হুলটা দ্বিগুণ ছুঁচালো করে ফুটিয়ে বললেন, 'আপনার মামাবাবু চোরা সুড়ঙ্গটা জেনে ফেলে তৈরি হয়ে আছেন? তাহলে তো সর্বনাশ! এক মুহূর্ত আর দেরি করবার সময় নেই। যাও সরকার, ঝরনার মুখে ডিনামাইটের কাঠিগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে এসো। লোহার ডান্ডাটাও দাও। ছোটোবাবুর পা দুটো ভেঙে দিয়ে যেতে হবে তো! আর সেই আসল থলিটাই শেষে ভুলে না যাই!'

এই পর্যন্ত বলে বঙ্কুবাবু থামলেন। তারপর চোরা সুড়ঙ্গের একটা কোণ থেকে কটা পাথর সরিয়ে সত্যিই একটা ছোটো চামড়ার থলে বার করে এনে আমার সামনে নেড়ে বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছেন ছোটোবাবু?'

সত্যিই কিছু না বুঝে আমি চুপ করেই রইলাম। বঙ্কুবাবু নিজেই আবার বললেন, 'এ থলির ভেতর কী আছে তা দেখলে আপনার তো বটেই আপনার মামাবাবুর চোখও চড়কগাছ হবে।'

বঙ্কুবাবুর মুখের ভাব ও গলার স্বর দুই-ই তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যেন চাবুক মেরে শিক্ষা দেবার ভঙ্গিতে তিনি বলে গেলেন, 'হ্যাঁ ছোটোবাবু আপনার ধুরন্ধর মামাবাবু ওই বোলতার চাকের মতো পাথর থেকে ক্রোমিয়াম আর বড়ো জোর প্ল্যাটিনামের বেশি কিছু পাবার কথা ভাবতে পারেননি।

পেরিডোটাইটে কিন্তু শুধু ক্রোমিয়াম প্ল্যাটিনাম নয় ম্যাগ্নেটাইট অলিভিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়। আর সব চেয়ে আশ্চর্য যা পাওয়া যায় তা হল হিরে। দক্ষিণ আফ্রিকার হিরের খনির অঞ্চল

থেকেই পেরিডোটাইটের আরেক নাম হয়েছে কিম্বারলাইট। এই নামের প্রথম অক্ষর K টা পুড়ে যাওয়াতেই গর্ত থেকে বার করা কাগজে imberlite শব্দটা আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। এই হিরে সমেত পেরিডোটাইট সব জায়গায় পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব বেশি, আমেরিকায় আরাকানসাসে, আর পাওয়া যায় আমাদের ভারতবর্ষে। এগ্গা পাহাড়ের এই চোরা সুড়ঙ্গের ভেতরে এ পাথরের একটা শিরা আছে। উঁচু দরের হিরে খুব বেশি সে খিলায় না থাকলেও যা আছে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আপাতত যতগুলো সম্ভব জোগাড় করে এই থলিতে নিয়ে যাচ্ছি। আপাতত যতগুলো সম্ভব জোগাড় করে এই থলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইয়োরোপ আমেরিকার হিরের চোরাবাজারে এগুলো বেচে যা পাওয়া যাবে তা বড়ো কম নয়। সে টাকার কাঁড়ি দু-দিনে উড়িয়ে দিয়েও আবার এখানে আসবার পথ আমাদের খোলা। গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ শুধু আমাদেরই জানা। তা দিয়ে কখন আসব-যাব কেই জানতেও পারবে না।

'আপনার মনে কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছি ছোটোবাবু। এত কথা জেনেও নিজের পোড়া বরাত আর বুদ্ধির দোষে এখানে খাঁচা কলে বন্দি ইঁদুরের মতো পচে মরবেন। এত দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনার জন্যে হিরেগুলোর চেহারা একবার দেখে একটু চক্ষু সার্থক করুন।'

চামড়ার থলে খুলে হিরে বার করতে গিয়ে বঙ্কুবাবুরই কিন্তু চক্ষুস্থির।

থলে থেকে দু-একটা যা তিনি বার করেছেন তা আমিও তখন দেখতে পেয়েছি।

হিরে কোথায়! সেগুলো তো নুড়ি পাথরের টুকরো!

বঙ্কুবাবুর কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখে আর্তনাদের সঙ্গে রাগের গর্জন মেশানো একটা আওয়াজ বার হয়ে এল, 'কে? কে এ কাজ করেছে!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ংকর গলার স্বরে সমস্ত সুড়ঙ্গও যেন গমগম করে উঠল, 'করেছি আমি! এগ্গা পাহাড়ের পবিত্রতা যে নষ্ট করেছে তার কোনো ক্ষমা নেই, নিস্তারও সে পাবে না!'

হতভম্ব হয়ে আমার হাত-পা তখন সত্যি অবশ হয়ে আসছে। সরকার সাহেবের অবস্থাও তথৈবচ।

বঙ্কুবাবু শুধু আরও কড়া ধাতুতে তৈরি। এই বিহ্বলতার মধ্যেও এক মুহূর্তে পকেট থেকে পিস্তল বার করে তিনি শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সুড়ঙ্গের অন্য মুখে বার বার গুলি ছুঁড়লেন।

তাতে অপ্রত্যাশিত ফলই কিন্তু ফলল। গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গ গুহায় আমাদের কাছেই ঝলক দিয়ে একটা বিদ্যুৎ শিখাই যেন জ্বলে উঠল সেই সঙ্গে আবার এক ঘোষণা।

গুলি ছুঁড়ে কোনো লাভ নেই বঙ্কুবিহারী! এ পাহাড়ের নাম করালী তা ভুলো না। তোমার সব খেল এবার খতম। বুঝতেই পারছ তোমার এ চোরা সুড়ঙ্গ এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের দখলে। তোমার পালাবার কোনো পথই আমরা রাখিনি।

ঘোষণার বক্তব্যের চেয়ে গলার স্বরে আমি তখন বিমূঢ় বিহ্বল। এবার গলা তো স্পষ্ট মামাবাবুর!

আমার মিথ্যে কল্পনাই তাহলে সত্য হয়ে উঠল?

হল সত্যিই তাই মামাবাবুই মহান্তি আর নাগাপ্পাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেবকে ওই চোরা সুড়ঙ্গের ভেতরেই ধরলেন।

বঙ্কুবাবু পালের গোদা বলে গোড়ায় সন্দেহ না করলেও এই চোরা সুড়ঙ্গের পেরিডোটাইটের রহস্য ভেদ করে মামাবাবু গোপনে অনেক দিন থেকেই তৈরি হচ্ছিলেন। আমিই আহাম্মকের মতো তাকে ভুল বুঝেছি।

pathagar.net